স্বদেশকথা

জাতীয় আন্দোলন : সংবিধান ও নাগরিকতা

Koushik Banerjee

P

[নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য]

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী

সেন্ট্রাল পাবলিশিং কনসার্ণ
৮/১ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৭০০০০৯

Recommended as a Text-Book for Classes IX & X of all schools of West Bengal and Tripura States by the West Bengal Board of Secondary Education
[Notification No. TB/76/90/H/2, dated 10-1-77.]

স্বদেশকথা

জাতীয় আন্দোলন : সংবিধান
ও
নাগরিকতা

[নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য]

ডক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী,
এম. এ., এল্-এল্. বি., পি-এইচ্. ডি.

STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING
25/3, Ballygunge Circular Road
Calcutta 700 019
80
13/1/84

সেন্ট্রাল পাবলিশিং কনসার্ণ
৮/১ চিন্তামণি দাস লেন • কলিকাতা ৭০০০০৯

পুনর্মুদ্রণ— জানুয়ারী, ১৯৮৩

[খোলা বাজার হইতে সংগৃহীত কাগজে মুদ্রিত সংস্করণ]

প্রকাশক
সেণ্ট্রাল পাবলিশিং কন্সার্ণের পক্ষে
শ্রীঅন্তনু সেন, বি. কম্.
৮/১ চিন্তামণি দাস লেন
কলিকাতা ৭০০ ০০৯

মুদ্রণে
রূপা প্রেস
২০৯এ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬
এবং
শ্রীঅনিল কুমার ঘোষ
দি অশোক প্রিণ্টিং ওয়ার্কস
২০৯এ বিধান সরণী
কলিকাতা ৭০০ ০০৬

STATE COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH & TRAINING
25/3, Ballygunge Circular Road
Calcutta 700 019
Acc. No. 80
dt. 13.1.84

দাম চব্বিশ টাকা

ভূমিকা

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য স্বদেশকথা (ভারতের সংবিধান ও নাগরিকতা সহ) একত্রে একটি বই হিসাবে প্রকাশ করা হইল।

এই পুস্তকখানাও শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক-শিক্ষিকার সহৃদয় আনুকূল্য লাভে সমর্থ হইবে এই আশা রাখি। পুস্তকের ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্পর্কে আমাকে জানাইলে কৃতজ্ঞ হইব। ইতি—

কলিকাতা
ডিসেম্বর, ১৯৭৭

গ্রন্থকার

বর্তমান পুনর্মুদ্রণ

নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্য 'স্বদেশকথা'র পুনর্মুদ্রণে পুনরায় বইখানির আগাগোড়া পরিমার্জন করা হইয়াছে। আশা করি ইহাতে বইখানির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতি—

কলিকাতা
২৩।১।৮৩

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

...নুষ ও তাহার পরিবেশ

প্রথম খণ্ড

...য় : ভূগোল : ভারত, ভারতবাসী ...

... প্রভাব

...লিক পরিবেশ, প...

[নবম ... র পাঠ্যাংশ]

সূচীপত্র

SYLLABUS FOR HISTORY

PART A (for Class IX)

HISTORY OF INDIA UP TO THE MIDDLE OF The 19th CENTURY

I. Geography : Its influence on the country, its people and History.
Elements of India's population—Evolution of composite culture—Fundamental unity.

II. Source material : Ancient, medieval and modern period.

III. Antiquity of India and her civilisation : Indus Valley Civilisation. Coming of the Aryans, Civilisation and religion as revealed in the Vedas and the Upanishads.

IV. Growth of Jainism and Buddhism.

V. (i) Foreign Invasions : Persian, Greek (Macedonian and Bactrian), Scythian (Saka-Parthians, Kusanas and Huns).
(ii) General nature of resistance. Impact of foreign inroads on the social and cultural life. Redisposition of Indian Society : Rise of the Rajputs.

VI. Bid towards Imperial Unity : its different phases ; Under Magadha : (i) From Bimbisara to Asoka, (ii) Chandragupta I to Skandagupta.
Under Kanauj : From Pusyabhuti Harsha to Pratihara Mahendrapala.
Under Gauda : From Sasanka to Devapala.

VII. Society and Culture (in North and South India)
From the 4th Century B. C. to the 14th Century A.D.

VIII. Indian Gulture and Civilisation beyond India.

IX. (a) Rise, growth and decline of Turco-Afghan power.
(b) Rise, growth and decline of Mughal power in India.

X. Impact of Mahomedan rule on social and economic life on art, architecture, literature, language and religion. Religious reformers.

XI. (a) The Mahrattas: From Sivaji to Baji Rao II (in outline).

(b) The Sikhs: From Nanaka's successors to Ranjit Singh (in outline).

XII. Advent of the Europeans: Their rivalries: Emergence of the English—From Trade to Political domination.

XIII. Expansion of British Power from Clive to Dalhousie (References to wars with the Sikhs, in outline).

XIV. (i) Reforms under Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, Dalhousie and Ripon.

(ii) Social, cultural and religious reforms under Indian initiative.

Rammohan Roy, Derozio and Young Bengal, Brahma Samaj leader, Iswar Chandra Vidyasagar, Syed Ahmed Khan, Prarthana Samaj, Dayananda, Ramkrishna Paramhansa.

XV. Reaction against British rule. Background of the Mutiny and Revolt of 1857—Causes, Progress, nature, its outcome. End of the rule of the East India Company. India on the threshold of a new era.

স্বদেশকথা

[প্রথম খণ্ড]

সূচনা
(Introduction)

মানুষ ও তাহার পরিবেশ (Man and his environment) : ইতিহাস কেবল রাজা-মহারাজাদের কাহিনী বা বড় বড় সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনের বিবরণ নহে। পৃথিবীর বৃহত্তর মানবসমাজ কিভাবে পরিবেশের সহিত যুঝিয়া বর্তমান সভ্যতায় আসিয়া পেঁাছিয়াছে, আদিম যুগের গুহা-মানব কিভাবে আজিকার সুসভ্য ও সুরুচিসম্পন্ন মানুষে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই কথার আলোচনাই হইল ইতিহাসের বিষয়বস্তু।* মানুষের আবির্ভাব হইতে শুরু করিয়া এবং মানুষের ক্রমবিবর্তনের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া যে ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা অবশ্য মানুষের সম্পূর্ণ ইতিহাস বলা চলে না। প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে গবেষণার ফলে আজ অনেক কিছুই জানা সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু আজও অনেক কিছুই অজানা রহিয়া গিয়াছে।

ব্যক্তির ক্ষেত্রে তাহার নিজ স্মরণশক্তির যে মূল্য জাতি তথা বৃহত্তর মানব সমাজের পক্ষে ইতিহাসের মূল্যও তাহাই। মানবজাতির বিগত কালের স্মৃতিই ইতিহাসে বিধৃত।†

সভ্যতার পথে মানুষের অগ্রগতি নির্ভর করে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা বা প্রতিভা ও পরিবেশের উপর, আর মানুষের পরিবেশ এবং কতক পরিমাণে তাহার নিজস্ব ক্ষমতা নির্ভর করে তাহার আবাসভূমির ভৌগোলিক অবস্থান ও বৈশিষ্ট্যের উপর। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মানবগোষ্ঠীর পরিবেশ একই প্রকার নহে, সেজন্য বিভিন্ন দেশের ইতিহাসও এক রূপ নহে। পরিবেশের সহিত খাপ খাওয়াইয়া লইবার ক্ষমতা এবং পরিবেশকে জয় করিবার মত প্রতিভা থাকিলেই সভ্যতার পথে অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। আজ মানুষ সত্যই চাঁদের দেশে পেঁাছিয়াছে, চাঁদের বুকে হাঁটিয়া বেড়াইয়াছে ; সে কৃত্রিম চাঁদ সৌর জগতে নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছে। চাঁদের দেশ আজ রূপকথার রাজ্য ছাড়িয়া বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন মানুষ সামান্য ঝড়-তুফান, বন্যা, দাবাগ্নি প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জন্তু-জানোয়ারের সম্মুখে অসহায় বোধ করিত।

ইতিহাস

কিন্তু আজ প্রকৃতি মানুষের কাছে পরাজিত ; জন্তু-জানোয়ার আজ মানুষের ভয়ে ভীত এবং মানুষের আজ্ঞাবহ। আদিম স্তর হইতে ধারাবাহিক চেষ্টা ও অগ্রগতির ফলেই আদিম মানুষের বংশধর আমরা আজিকার সভ্যতায় আসিয়া পেঁাছিয়াছি। মানবসমাজের এই ধারাবাহিক চেষ্টা ও অগ্রগতির কাহিনীই হইল 'ইতিহাস'। মানুষ ও তাহার পরিবেশ হইল ইতিহাসের মূল ভিত্তি। আবার মানুষের পরিবেশ এবং দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করে তাহার মাতৃভূমির

ইতিহাসের মূল ভিত্তি—মানুষ ও তাহার পরিবেশ

ইতিহাসের ধারাবাহিকতা

* cf. 'His (*i.e.*, Man's) Story' = History.

† "History, it has been remarked, is to the group. what memory is to the individual." Thompson and Johnson

ভূ-প্রকৃতি। জাতির অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব

ভারত তথা প্রত্যেক দেশেরই রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন সেই দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা অল্প-বিস্তর নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। সুতরাং জাতির চরিত্র, কৃষ্টি, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন—এক কথায় জাতির ইতিহাস গঠনে ভূগোলের প্রাভব অপরিসীম, একথা অনস্বীকার্য।

প্রথম অধ্যায়

ভূগোল: ভারত, ভারতবাসী ও ভারত-ইতিহাসের উপর ভৌগোলিক প্রভাব

(Geography : Its influence on the Country, its People and History)

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক পরিবেশ (Geographical Environment of India) : ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং ভারতীয়দের জাতীয় চরিত্র গঠনে ভারতের ভৌগোলিক পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। ভারতের উত্তর দিকে হিমালয় পর্বতমালা ভারতবর্ষকে এশিয়া মহাদেশের অপরাপর দেশ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতশ্রেণী আফগানিস্তান, রাশিয়া, ইরাণ প্রভৃতি দেশ হইতে এবং পূর্বে আরাকান পর্বত ব্রহ্মদেশ হইতে ভারতবর্ষকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। অপর প্রায় তিন দিক্, বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর দ্বারা বেষ্টিত। এইভাবে প্রকৃতি-প্রদত্ত সীমারেখা ভারতবর্ষকে শুধু অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্নই করে নাই, চতুর্দিক দিয়া রক্ষাও করিতেছে।

সুনির্দিষ্ট সীমারেখা

ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ। ইহা নিজেই একটি মহাদেশের ন্যায় সুবিশাল। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা ভারতবর্ষে স্বভাবতই থাকিবে, ইহা বলা বাহুল্য। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার দিক দিয়া বিচার করিলে ভারতবর্ষকে পাঁচটি সম্পূর্ণ পৃথক অংশে ভাগ করা চলে—যথা, (১) উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল, (২) সিন্ধু-গঙ্গা-যমুনা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত সমতল ভূমি, (৩) মধ্য ভারতের মালভূমি, (৪) দক্ষিণাপথ বা দাক্ষিণাত্যের মালভূমি, এবং (৫) সুদূর দক্ষিণের উপদ্বীপ অঞ্চল।

পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত

ভারতবাসী ও ভারত-ইতিহাসের উপর প্রাকৃতিক প্রভাব (Influence of Physical Geography on the Indians and India) : ভারতবর্ষ যেন প্রকৃতির কোলে সন্তান। উত্তরে অভ্রভেদী হিমালয় পর্বত ভারতবর্ষকে বহিরাক্রমণ হইতে কেবল নিরাপদে রাখিয়াছে এমন নহে, হিমালয় হইতে নির্গত নদ-নদী ভারতভূমিকে শস্য-শ্যামল করিয়া তুলিয়াছে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের বারিপাত হিমালয়ই নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। অরণ্য-সম্পদ, খনিজ-সম্পদ ও কৃষি-সম্পদে সম্পদশালী ভারতবর্ষের জনসমাজের জীবন-ধারণের কোন সমস্যা প্রাচীন কালে ছিল না। ফলে অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারতবাসী শ্রমবিমুখ, ধর্মপ্রবণ, কাব্য, শিল্প ও সাহিত্যে অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিল।

হিমালয়ের প্রভাব

ভারতের মধ্যস্থলে অবস্থিত বিন্ধ্য পর্বত ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া প্রাচীন কালে সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপনে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিন্ধ্য পর্বত দক্ষিণ ভারতের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিতে সাহায্য করিয়াছে। ভারত-ইতিহাসের কোন কোন কালে আর্যাবর্তের পরাক্রমশালী রাজগণ দাক্ষিণাত্য বিজয়ে সমর্থ হইলেও দাক্ষিণাত্য

অঞ্চলকে রাজনৈতিক দিক্ দিয়া সম্পূর্ণভাবে উত্তর ভারতের সহিত ঐক্যবদ্ধ করিতে পারেন নাই। বিন্ধ্য পর্বতই যে এজন্য বহুলাংশে দায়ী ছিল সে-

বিন্ধ্য পর্বতের প্রভাব

বিষয়ে সন্দেহ নাই। নতুবা সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য দৃঢ়তর হইত, বলা বাহুল্য।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমা সুদীর্ঘ পর্বতশ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত এবং দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব যথাক্রমে ভারত মহাসাগর, আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর দ্বারা বেষ্টিত। এইভাবে পৃথিবীর

স্বতন্ত্র সভ্যতা

অপরাপর অংশ হইতে প্রকৃতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হইবার ফলে ভারতবর্ষে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়িয়া উঠিবার সুযোগ হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃতি দ্বারা সুরক্ষিত বলিয়া ভারতবর্ষের সহিত বহির্জগতের কোন সম্পর্ক ছিল না, একথা মনে করিলে ভুল হইবে। সুদূর অতীত হইতেই ভারতবর্ষ এশিয়া ও

ভারত মহাসাগর ও অপরাপর সমুদ্রপথে বহির্জগতের সহিত যোগাযোগ

ইওরোপের বিভিন্ন দেশের সহিত স্থলপথে ও জলপথে বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। উত্তর-পশ্চিমের খাইবার, বোলান, গোমাল প্রভৃতি গিরিপথ ধরিয়া আর্যদের আগমন হইতে আরম্ভ করিয়া যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে। পারসীক, গ্রীক, শক, হূণ, তুর্কী, আফগান, মোঙ্গল প্রভৃতি জাতি বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া আমাদের জন্মভূমিকে এক মহামানবের

বহু জাতি ও ধর্মের লোকের মিলন-তীর্থ

মিলন-তীর্থে পরিণত করিয়াছে। ইহা ভিন্ন চীন, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতির সহিতও বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রাচীন কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ফলে নানা সংস্কৃতির দানে পুষ্ট ভারতীয় সংস্কৃতি এক অপূর্ব মহিমায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সুদীর্ঘ সমুদ্র উপকূলরেখার নানা স্থানে বাণিজ্য-বন্দর গড়িয়া উঠিবার ফলে সমুদ্রপথ ধরিয়া অতি প্রাচীন কালেই চীন, রোম, মিশর, চম্পা, কম্বোজ, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতি দেশের

সমুদ্রপথে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার

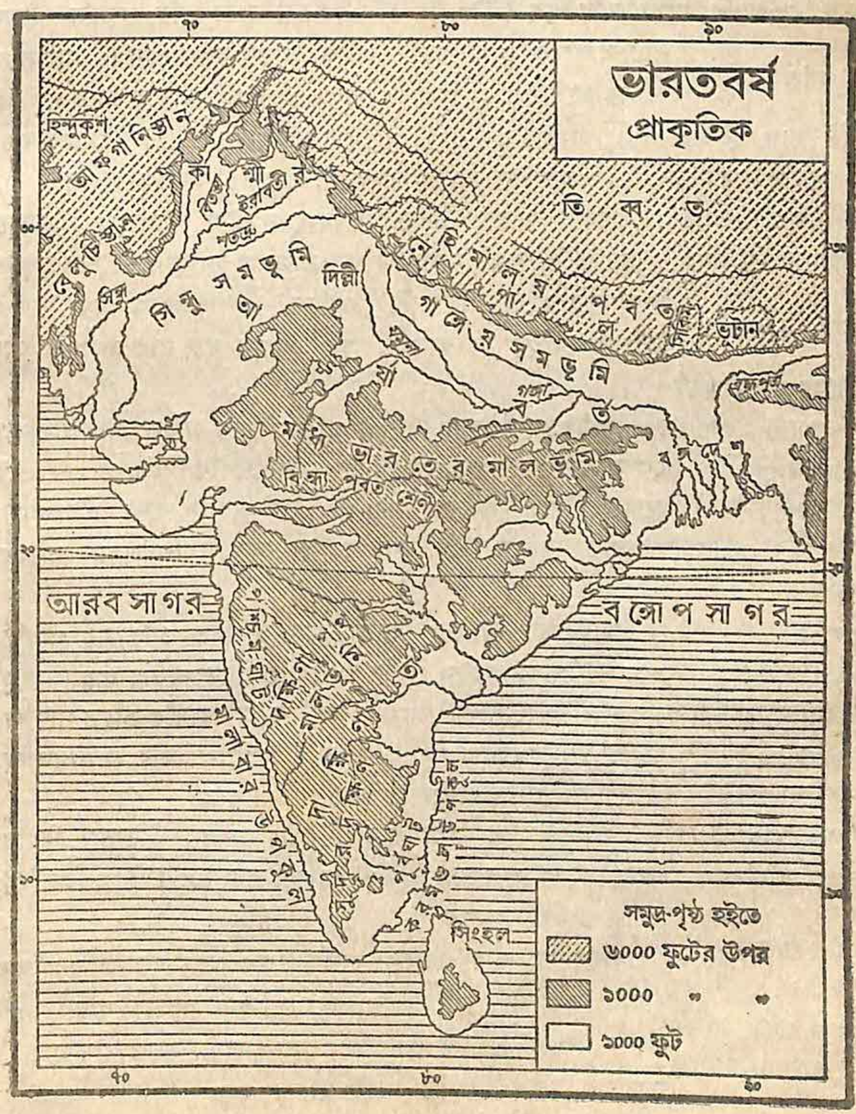
সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতের এই সকল বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতেই ক্রমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি চম্পা, কম্বোজ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দ্বীপপুঞ্জে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এমন কি, এই সকল অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রভাব ও নিদর্শন এই সকল অঞ্চলে আজিও বিদ্যমান আছে। সমুদ্রপথ ধরিয়াই আধুনিক কালে ইংরেজ বণিকগণ ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসিয়া ক্রমে এদেশে রাজনৈতিক প্রভুত্ব বিস্তার করিতে

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার

সমর্থ হইয়াছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি মধ্য এশিয়ায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। খোটান, ইয়ারখন্দ, তুর্ফান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলেও ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের দক্ষিণাংশ ক্রমশ সংকীর্ণ হইয়া ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণাংশের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অধিবাসিগণ সমুদ্রের সন্নিকটে থাকিবার স্বাভাবিক ফল হিসাবেই সমুদ্র-প্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু ভারতের উত্তরাংশের জনসাধারণ সেই পরিমাণ সমুদ্র-প্রবণ হইবার সুযোগলাভ করে নাই। উত্তর ভারতের কেবল বাংলাদেশের ন্যায় সমুদ্রোপকূলে অবস্থিত দেশ হইতে এবং সিন্ধু নদের গতিপথ ধরিয়া কতক পরিমাণ সমুদ্রবাহী বাণিজ্যের চলাচল ছিল। সমুদ্রের প্রতি দাক্ষিণাত্যবাসীর অধিকতর টান থাকিবার একমাত্র কারণ হইল প্রাকৃতিক প্রভাব—অর্থাৎ সমুদ্রের

ভারতের দক্ষিণাংশ ও উত্তরাংশের জনগণের মধ্যে সমুদ্র-প্রবণতার পার্থক্য



সান্নিধ্য। এইভাবে নানা দিক্ দিয়া ভারতবাসীর জাতীয় চরিত্র ও ইতিহাস প্রাকৃতিক প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছে।

ভারতের নরনারী (Indian People): ভারতের অধিবাসীর জাতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক্ দিয়া বিচার করিয়া বিভিন্ন পণ্ডিত ভারতবাসীকে বিভিন্ন জাতিতে ভাগ করিয়াছেন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের লোকগণনায় ভারত-সরকার ভারতবাসীকে মোট সাতটি জাতিতে ভাগ করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর হাটন (Dr. J. H. Hutton) ভারতবাসীকে মোট আটটি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক নৃতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে ডক্টর গুহ (Dr. B. S. Guha) নানা যুক্তি প্রদর্শন করিয়া ভারতবাসীকে মোট ছয়টি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। বর্তমানে তাঁহার মতই মোটামুটিভাবে সর্বজনগ্রাহ্য বলা যাইতে পারে। এই ছয়টি ভাগ হইল: (১) নিগ্রিটো, (২) প্রোটো-অষ্ট্রল্যায়ড, (৩) মোঙ্গল্যায়ড, (৪) মেডিটারেনিয়ান, (৫) ওয়েষ্টার্ন ব্র্যাকিসিফেলাস, এবং (৬) নর্ডিক বা আর্য।

বিভিন্ন নৃতত্ত্ববিদের মতামত

ছয়টি জাতি

নিগ্রিটো জাতির লোকেরা ভারতে একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একমাত্র আন্দামান-নিকোবর, আসামের আঙ্গামী নাগা, দক্ষিণ-ভারতীয় ইরুলবা, কুরুম্বা প্রভৃতি উপজাতির মধ্যে 'নিগ্রিটো' জাতির বংশধরগণকে দেখা যায়। ইহাদের দেহের রং কালো, চুল পশমের মত, নাক চ্যাপ্‌টা এবং শরীরের গড়ন বেঁটে।

নিগ্রিটো (Negrito)

প্রোটো-অস্ট্রল্যায়ড—অর্থাৎ অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন এক জাতির লোক ভারতের বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর ('lower castes') মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা), দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে এই জাতীয় লোকের বংশধরদের বসবাস এখনও আছে।

প্রোটো-অষ্ট্রল্যায়ড (Proto-Austroloid)

মোঙ্গল্যায়ড (Mongoloid)

মোঙ্গল্যায়ড জাতির লোকদিগকে প্রধানত চট্টগ্রামের পার্বত্য এলাকা, সিকিম, ভূটান প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মেডিটারেনিয়ান—অর্থাৎ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের আদিম অধিবাসীর সহিত সাদৃশ্যসম্পন্ন জাতির লোক গঙ্গা-উপত্যকা, সিন্ধু, পাঞ্জাব, রাজপুতানা, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখিতে পাওয়া যায়।

মেডিটারেনিয়ান (Mediterranean)

ওয়েষ্টার্ন ব্র্যাকিসিফেলাস জাতির লোকের বাস হইল বাংলা, উড়িষ্যা, বিহার, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাঞ্চল, গঙ্গা-উপত্যকা, কানাড়া, তামিল, গিলগিট, চিত্রাল প্রভৃতি অঞ্চলে।

ওয়েষ্টার্ন ব্র্যাকিসিফেলাস (Western Brachycephallous)

নর্ডিক বা আর্য জাতির বংশধরগণকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলেই অধিক সংখ্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতির লোক প্রধানত পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র (মারাঠী চিৎপাবন ব্রাহ্মণ) প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাস করে।

নর্ডিক বা আর্য (Nordic or Aryan)

এখানে উল্লেখ করিতে হইবে যে, উপরি-উক্ত জাতিগুলির বসবাসের স্থান সম্পর্কে কোন কঠোরতা নাই। সকল অঞ্চলেই এই সকল বিভিন্ন জাতির লোকের সংমিশ্রণ ও বসবাস পরিলক্ষিত হয়। কোন জাতিরই জাতিগত বিশুদ্ধতা বজায় রাখা সম্ভব হয় নাই।

বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ

ভারতবাসীর মধ্যে মৌলিক ঐক্য (Fundamental Unity among the Indians) : 'নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান' থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীদের মধ্যে এক মহামিলনের অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষকে 'মহামানবের সাগর' আখ্যা দিয়াছেন। বস্তুত বিভিন্ন ভাষা, বিভিন্ন আচার-আচরণ, বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের জনসমাজের এক অপূর্ব সমাবেশ আমাদের এদেশে ঘটিয়াছে। আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন, শক, হূণ, পাঠান, মোগল প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মহামিলন-তীর্থ আমাদের এই ভারতভূমি।* ধর্মের দিক্ দিয়া এদেশে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, মুসলমান, পারসীক, খ্রীষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর এক বিরাট সমন্বয় ঘটিয়াছে। ** সেই কারণে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি বিভিন্ন মত ও পথের, বিভিন্ন আচার-আচরণ ও ধ্যান-ধারণার এক সমষ্টিগত ফলস্বরূপ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভাষার ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈচিত্র্য বিরাজমান। নানা আচার-আচরণ, জাতি, ভাষা ও ধর্মের লোক দ্বারা অধ্যুষিত ভারতভূমি এক বিচিত্র দেশে পরিণত হইয়াছে। ভারতের বৈচিত্র্য শুধু জাতি, ভাষা, ধর্ম ও আচার-আচরণেরই বিভিন্নতা নহে, প্রাকৃতিক দিক্ দিয়াও এই বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়া বিচার করিলে আমাদের দেশে শস্য-শ্যামল উর্বর প্রান্তর যেমন আছে তেমনি অনুর্বর মরুদেশও দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চতার দিক্ দিয়া হিমালয় পর্বত পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাথায় ধারণ করিয়া ভারতের উত্তর সীমান্তে প্রহরীরূপে দণ্ডায়মান। আবার সুগভীর গুহা ও কন্দরের অভাবও এদেশে নাই। আবহাওয়ার দিক্ দিয়া বিচার করিলে ভারতে শীতল, উষ্ণ ও নাতিশীতোষ্ণ—তিন প্রকারের আবহাওয়াই পরিলক্ষিত হয়। আবহাওয়া, লতা, গুল্ম, জীবজন্তু, বৃক্ষাদি সব দিক্ দিয়াই ভারতবর্ষে এক চরম বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভৌগোলিক বৈষম্য ও বৈচিত্র্য ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনেও প্রতিফলিত

জাতি, ভাষা, ধর্ম ও আচার-আচরণের পার্থক্য

সমষ্টিগত সংস্কৃতি (Composite culture)

বিচিত্র দেশ

ভাষা, আচার-আচরণ ও জাতি-ধর্মের বৈষম্য

ভৌগোলিক বৈচিত্র্য

---

* "হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন দল পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন।"—রবীন্দ্রনাথ

** "From the human point of view India has been often described as an ethnological museum, in which numberless races of mankind may be studied, ranging from savages of low degree to polished philosophers. That variety of races, languages, manners, and customs is largely the cause of the innumerable political subdivisions which characterize Indian history before the unification effected by the British supremacy." V. A. Smith : *The Oxford History of India* (3rd edn, revised by T. G. P. Spear), p. 5.

হইয়াছিল। ফলে প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন রাজনৈতিক বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।*

কিন্তু নানা প্রকার বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতবাসীর মধ্যে এক গভীর একত্ববোধ প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অদ্যাপি বিরাজিত। ভারতীয় সভ্যতার মূল কথাই হইল সমন্বয়সাধন করা। সুতরাং প্রাকৃতিক, জাতিগত, ভাষাগত ও ধর্মগত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও ভারতীয়দের মধ্যে এক মূলগত ঐক্য গড়িয়া উঠিয়াছে। রাজনৈতিক ঐক্যের উপর এই ঐক্য নির্ভরশীল নহে। ইহা হইল মনের ঐক্য, অন্তরের ঐক্য, ধারণার ঐক্য। 'ভারতবর্ষ' নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আসমুদ্র হিমাচল এবং বিশাল ভূখণ্ডের ধারণা জাগে।** কাশ্মীর হইতে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত এই ঐক্যবদ্ধ এক বিশাল দেশের ধারণাই আমাদের মনে জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবও ভারতীয়দের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে। বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে বিভিন্ন জাতি ভারতবর্ষে প্রবেশ করা সত্ত্বেও হিন্দু সভ্যতার মূল কাঠামো অপরিবর্তিত রহিয়াছে। বিভিন্ন জাতির লোক বিভিন্ন সংস্কৃতি লইয়া এই দেশে প্রবেশ করিয়া এই সভ্যতা-সংস্কৃতিকে পুষ্ট করিয়াছে সত্য, কিন্তু এই মূল সভ্যতার কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। এই সভ্যতার একটি বিশেষ রূপ আছে, পৃথিবীর অপরাপর সভ্যতা-সংস্কৃতি হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক ও স্বতন্ত্র। একই সাংস্কৃতিক ঐক্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য স্বভাবতই ভারতবাসীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগাইতে সাহায্য করিয়াছে।† এই স্বাতন্ত্র্যবোধ ভারতবাসীকে অন্তরের দিক্ দিয়া ঐক্যবদ্ধ হইতে সাহায্য করিয়াছে, বলা বাহুল্য।

বিভিন্নতার মধ্যে একতা

'ভারতবর্ষ' নামের ঐক্য

সাংস্কৃতিক ঐক্য

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতির লোকের স্ব স্ব বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু মোটামুটি একই ধরনের জীবনযাত্রা, একই ধরনের খাদ্য-পানীয় ও পরিবেশ ভারতবাসীর মনে পরোক্ষভাবে এক ঐক্যবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছে।‡ প্রাচীন ভারতের রাজগণের 'একরাট্', 'সম্রাট্' প্রভৃতি হইবার আকাঙ্ক্ষা এবং বিশেষভাবে মৌর্য আমল, গুপ্ত যুগ প্রভৃতি বিভিন্ন কালে ভারতের এক বিশাল অংশের রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের ফলে ভারতীয়দের অধিকাংশের

জীবনযাত্রার মোটামুটি একতা

* Vide V. A. Smith : *The Oxford History of India* (3rd edn.), p. 4.

** "উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য
হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্ ভারতং নাম
ভারতী যত্র সন্ততিঃ॥" বিষ্ণু পুরাণ, ২॥৩॥১

† "The most essentially fundamental Indian unity rests upon the fact that the diverse peoples of India have developed a peculiar type of culture or civilization utterly different from any other type in the world." Smith (3rd edn.), p. 7.

‡ Vide Sir J. N. Sarkar's article : 'Unity of India', *Modern Review*, Nov., '42.

একই প্রকার রাজনৈতিক ভাগ্য পরোক্ষভাবে তাহাদের মধ্যে এক-জাতিবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল।

প্রাচীন অর্থাৎ হিন্দু যুগেই অন্তত দুইবার, প্রথমে মৌর্য সম্রাট্ অশোকের অধীনে পুনরায় গুপ্ত সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের আমলে প্রায় সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হইয়াছিল। সুলতানী ও মুঘল যুগে এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসনাধীনে রাজনৈতিক ঐক্য অধিকতর মাত্রায় সাফল্যলাভ করিয়াছিল। এই সকল কারণে ভারতবাসীর অন্তরে এক মৌলিক ঐক্যের ধারণা জন্মিয়াছিল।

রাজগণের রাজনৈতিক প্রাধান্যের প্রভাব

স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র ভারতবাসীকে এক গভীর দেশাত্ম-বোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তাহাদের ঐক্যবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়াছে। সুতরাং জাতি, ধর্ম, ভাষা, আচার-আচরণের বিভিন্নতা সত্ত্বেও এদেশের সকলেই 'ভারতবাসী'। এক গভীর আন্তরিক ঐক্যবোধ ভারতীয়দিগকে একই সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। এই ঐক্য রাজনৈতিক একতা বা ভৌগোলিক ঐক্যের উপর নির্ভরশীল নহে, ইহা হইল ভারতবাসীর অন্তরের একতা।*

'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের প্রভাব

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত-ইতিহাসের উপাদান

(Source Materials of Indian History)

ইতিহাসের উপাদান (Sources of History): সভ্যতার পথে মানুষ যতই অগ্রসর হইয়াছে তাহার বিভিন্ন কালের ঐতিহাসিক চিহ্নাদিও সে ততই অধিক পরিমাণে রাখিয়া গিয়াছে। এই কারণে ভারতের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানও ভিন্ন ভিন্ন। এই তিনটি পৃথক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি পৃথকভাবে আলোচনা করাই বাঞ্ছনীয়।

ভারত-ইতিহাসের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইতিহাসের ধারা নদীর স্রোতের মতই অবিচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। বৈশিষ্ট্যের তারতম্যের দিক্ হইতে এবং আমাদের সুবিধার জন্য ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করা হইলেও ইতিহাসের ধারা নদীস্রোতের মতই এক এবং অভিন্ন থাকে। এই ধারাবাহিকতা না থাকিলে ইতিহাস কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টি হইয়া দাঁড়াইবে। মানুষের অগ্রগতির ধারা ব্যাহত হইবে। কারণ প্রাচীনকে ভিত্তি করিয়াই মধ্য এবং মধ্যকে ভিত্তি করিয়া আধুনিক যুগের সূচনা হইয়াছে।

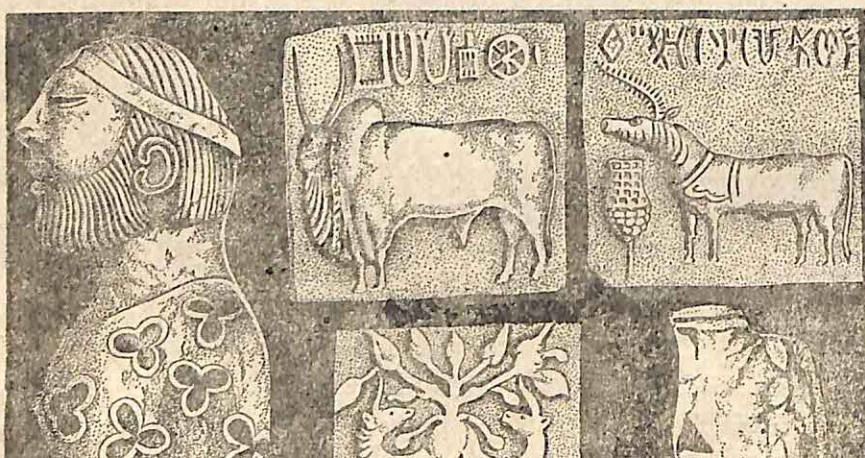
* "India beyond all doubt possesses a deep underlying fundamental unity, far more profound than that produced either by geographical isolation or by political suzerainty. That unity transcends the innumerable diversities of blood, colour, language, dress, manners, and sect." Smith: *The Oxford History of India* (3rd edn.), p. 7.

প্রাচীন যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Ancient Indian History) : ভারতবর্ষের প্রাচীন যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত করা যাইতে পারে—যথা, (১) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান : (ক) শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি, (খ) প্রাচীন মুদ্রা, (গ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প-চিহ্নাদি ; (২) কাহিনী-কিংবদন্তী, প্রাচীন সাহিত্য ও সমসাময়িক দেশীয় লেখকদের রচনা ; এবং (৩) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ।

বিভিন্ন উপাদান

(১) **প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান :** প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন ভারতের নানা স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-উপত্যকায় মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের ফলে এক অতি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ায় ভারতের আদি সভ্যতা যে পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি—যথা, মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, চৈনিক প্রভৃতির সমসাময়িক ছিল সেকথা প্রমাণিত হইয়াছে। কেবল সিন্ধু-উপত্যকায়ই নহে, সাঁচী ও সারনাথে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে মৌর্য আমলের বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। নালন্দায়ও তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ের চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাচীন যুগের লিখিত ইতিহাস না পাওয়া গেলেও এই সকল প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হইতে একটি মোটামুটি ইতিহাস রচনা করা যায়।

মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, সাঁচী, সারনাথ, নালন্দা প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত ঐতিহাসিক চিহ্ন



সিন্ধু-সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

(ক) **শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি :** প্রাচীন ইতিহাস রচনার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হইল শিলালিপি, তাম্রলিপি প্রভৃতি। প্রাচীন কালে যখন কাগজপত্রাদির ব্যবহার জানা ছিল না তখন রাজা-মহারাজারা পাথরের উপর অথবা

তামা, লোহা, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুর উপর তাঁহাদের আদেশ, দানপত্র প্রভৃতি খোদাই করিয়া দিতেন। এগুলি সেই সকল রাজার রাজত্বকালের অতিশয় নির্ভরযোগ্য উপাদান, সন্দেহ নাই। বিশেষত এগুলিকে পরবর্তী কালে অদল-বদল করিবারও কোন উপায় থাকে না।

পাথর ও বিভিন্ন ধাতুর উপরে খোদিত লিপি

প্রাচীন ভারতের শিলালিপিগুলির মধ্যে মৌর্য সম্রাট্ অশোকের শিলালিপি, স্তম্ভলিপি প্রভৃতি তাঁহার আমলের ইতিহাস রচনার এক অতি নির্ভরযোগ্য উপাদান। এইভাবে এলাহাবাদে গুপ্ত যুগের সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের বিজয় কাহিনী খোদিত এক স্তম্ভগাত্রে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল লিপি প্রাচীন ইতিহাস রচনার অমূল্য সম্পদ।

অশোকের শিলালিপি, সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রশস্তি

(খ) প্রাচীন মুদ্রা: প্রাচীন কালের রাজগণের মুদ্রা—অর্থাৎ ধাতু নির্মিত টাকাকড়ি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রায় রাজার নাম, তারিখ, রাজার বা কোন দেব-দেবীর প্রতিকৃতির ছাপ খোদাই করা আছে। এগুলি হইতে স্বভাবতই আমরা রাজার শাসন-কাল, সেই সময়কার ধাতুশিল্পের উন্নতি, রাজা-মহারাজাদের ধর্মমত, সঙ্গীতানুরাগ প্রভৃতি সম্পর্কে জানিতে পারি। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় তাঁহার বীণাবাদনরত মূর্তি হইতে তাঁহার সঙ্গীতানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন এক দেশের মুদ্রা অপর দেশে পাওয়া গেলে এই দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল একথাও অনুমান করা যাইতে পারে। গ্রীক, শক, বাহ্লিক প্রভৃতি যে-সকল বিদেশী জাতির রাজা ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকের নাম আমরা তাঁহাদের মুদ্রা হইতে জানিতে পারিয়াছি।



প্রাচীন মুদ্রা

ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে প্রাচীন মুদ্রার গুরুত্ব



প্রাচীন মুদ্রা

(গ) স্থাপত্য ও ভাস্কর্য নিদর্শন: প্রাচীন যুগে নির্মিত বাড়ী-ঘর, দালান-প্রাসাদ প্রভৃতির চিহ্নাদি প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে মাটির নিচ হইতে যেমন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তেমনি মাটির উপরেও যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে। এই সকল স্থাপত্য নিদর্শন হইতে তখনকার কালে স্থাপত্য শিল্প কতদূর উন্নত ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। এ-বিষয়ে সাঁচী স্তূপ এবং উহার রেলিং, তোরণ-দ্বার প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভাস্কর্য শিল্পেরও বহু প্রাচীন নিদর্শন ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রাচীন বাড়ী-ঘর, দালান-প্রাসাদ, মূর্তি প্রভৃতির গুরুত্ব

গান্ধার নামক স্থানের ভাস্কর্য রীতি বৌদ্ধ, গ্রীক ও রোমান ভাস্কর্য শিল্পের প্রভাবে যে এক অতি সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছিল তাহার নিদর্শন আজিও বিদ্যমান।

(২) কাহিনী-কিংবদন্তী, প্রাচীন সাহিত্য ও সমসাময়িক দেশীয় লেখকদের রচনা :

বেদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি : অর্থশাস্ত্র, হর্ষ-চরিত, গৌড়বহো প্রভৃতি

প্রাচীন কালে রচিত সাহিত্য-গ্রন্থাদিতে সন্নিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তী হইতেও ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ভারতের প্রাচীনতম গ্রন্থ বেদ হইতে বৈদিক যুগের সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। এইভাবে রামায়ণ, মহাভারত, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদি, হিন্দু ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ প্রভৃতি হইতেও প্রাচীন ইতিহাসের তথ্যাদি সংগ্রহ করা গিয়াছে। বস্তুত খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ হইতে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ (৩২৬ খ্রীঃ পূঃ) অবধি ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান উপাদানই হইল প্রাচীন সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট কাহিনী-কিংবদন্তী প্রভৃতি। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত দুইটি মহাকাব্য হইতে সমসাময়িক কালের সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। পুরাণ প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহাসিক তথ্যাদির দিক্ হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বায়ু পুরাণ, মৎস্য পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে প্রাচীন রাজবংশাবলী ও রাজগণের ইতিহাস পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক কাহিনী-কিংবদন্তীর দিক্ দিয়া মোট আঠারটি পুরাণের মধ্যে উপরি-উক্ত পাঁচটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মৌর্য যুগে রচিত কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, পরবর্তী কালের কবি বাণভট্ট-প্রণীত হর্ষ-চরিত, বাকপতির 'গৌড়বহো', কলহনের 'রাজ-তরঙ্গিণী', বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্ক-চরিত', সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ : অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদেশী ভ্রমণ-কারিগণ আমাদের দেশে আসিয়া তাঁহাদের ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মেগাস্থিনিস

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের অনুচরবর্গের অনেকে ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু কথা লিখিয়া গিয়াছেন। সীরিয়ার গ্রীক রাজা সেলুকাস মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে অবস্থানকালে মেগাস্থিনিস মৌর্য শাসন এবং তখনকার জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে বহু তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস ভিন্ন

ডেইমেকোস, ডাইওনিসাস, হেরোডোটাস, টেসিয়াস

ডেইমেকোস, ডাইওনিসাস প্রভৃতি গ্রীক দূতও অনুরূপ বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস ও গ্রীক চিকিৎসক টেসিয়াসের বিবরণে প্রাচীন ভারতের বর্ণনা পাওয়া যায়। জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রীক লেখক 'পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে ভারতীয় পোতাশ্রয় ও বাণিজ্য সম্পর্কে বর্ণনা রাখিয়া গিয়াছেন।

ঈ-সিঙ, ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ

প্রাচীন যুগে চীন হইতেও বহু পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ঈ-সিঙ, ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ প্রভৃতির নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। ফা-হিয়েন গুপ্ত সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসনকালে এবং হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে হিউয়েন-সাঙ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। গুপ্ত যুগ ও হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল সম্পর্কে বহু তথ্য ইঁহাদের রচনায় পাওয়া গিয়াছে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হইতে আরব লেখকদের রচনায় ভারতবর্ষ সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। আরব লেখকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্রজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ অলবিরুণী হিন্দু যুগের শেষভাগে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া হিন্দুদের সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'তহ্‌কক্‌-ই-হিন্দ্‌' গ্রন্থে সেই যুগের হিন্দুদের আচার-আচরণ, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে এক অতি সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়।

অলবিরুণী

মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Medieval Indian History): মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাস রচনার পর্যাপ্ত উপকরণ আছে। এগুলিকে সরকারী দলিলপত্র, সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা, বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ, মুদ্রা ও শিল্প নিদর্শন এবং হিন্দু লেখকগণের রচনা—এই কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

বিবিধ উপাদান

(১) **সরকারী দলিলপত্র**: সুলতানি আমল এবং মোগল শাসনকালের সরকারী দলিলপত্রাদি ভারতের মধ্যযুগীয় ইতিহাস রচনার অতি মূল্যবান উপকরণ। এগুলির অধিকাংশই যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে এবং সংরক্ষণের অভাবে বিনাশ-প্রাপ্ত হইয়াছে। মোগল সম্রাট্ আকবরের গ্রন্থাগারে এক বিপুল সংখ্যক পাণ্ডুলিপি ছিল কিন্তু সেগুলির একটিও আমাদের কাল পর্যন্ত আসিয়া পেঁছায় নাই।

সরকারী দলিলপত্র—বিনাশপ্রাপ্ত

(২) **সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের রচনা**: আমীর খুস্‌রু বা খুস্‌রভ মধ্য যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার রচনায় সমসাময়িক কালের ঐতিহাসিক তথ্যাদিও পাওয়া যায়। আমীর খুস্‌রু ভিন্ন মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ, শাম্‌স-ই-সিরাজ, হাসান নিজামী, জিয়া-উদ্দিন বর্‌নী, ফেরিস্তা প্রমুখ ঐতিহাসিকের রচনা সেই যুগের ইতিহাসের অমূল্য উপাদান। আবুল ফজ্‌ল-প্রণীত 'আকবর-নামা' ও 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থদ্বয় আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস রচনার অপরিহার্য উপাদান। ইহা ভিন্ন, বদাউনী-রচিত ইতিহাস গ্রন্থও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

আমীর খুস্‌রু, মিন্‌হাজ, হাসান, ফেরিস্তা, জিয়া-উদ্দিন, আবুল ফজ্‌ল, বদাউনী

সুলতানি ও মোগল সম্রাট্‌দের অনেকে নিজ নিজ জীবনচরিত রচনা করিয়া গিয়াছিলেন। এগুলিও সমসাময়িক ইতিহাস রচনার উপাদানে পরিপূর্ণ। এগুলির মধ্যে ফিরুজ শাহের স্বরচিত 'ফতোয়াৎ-ই-ফিরুজ শাহী', 'বাবরের জীবন-স্মৃতি', 'জাহাঙ্গীরের জীবন-স্মৃতি' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বাবর ও জাহাঙ্গীরের জীবন-স্মৃতি

উপরি-উক্ত উপাদানগুলি ভিন্ন 'আলমগীর-নামা', 'পাদশাহ্‌-নামা', খাফি খাঁ রচিত 'মুন্তাখাব্‌-উল্‌-লুবাব্‌' প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে।

'আলমগীর নামা', 'পাদশাহ্‌-নামা', 'মুন্তাখাব্‌-উল্‌-লুবাব্‌'

(৩) **বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনা :** সুলতানি ও মোগল শাসনকালে বহু বিদেশী পর্যটক ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের রচনা হইতে সেই সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে বহু তথ্য জানিতে পারা যায়। বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো, আফ্রিকার মরক্কোবাসী ইবন্-বতুতা, চৈনিক পর্যটক মাহুয়ান, মোগল যুগে জেস্যুইট্ ধর্মযাজকগণ, ইওরোপীয় পর্যটক বার্থেমা, বার্বোসা, র‍্যাল্ফ ফিচ্, টমাস রো, বার্ণিয়ে, তেভার্নিয়ে, টেরি প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পারসীক পর্যটক আব্দুর্ রজাক্, পোর্তুগীজ পায়েজ ও নুনিজ, ইতালীয় নিকোলো কণ্টি প্রমুখ পর্যটকের রচনায়ও গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক তথ্যাদি পাওয়া যায়।

মার্কো পোলো, ইবন্-বতুতা, মাহুয়ান, জেস্যুইট্ ধর্মযাজকগণ, পর্যটক র‍্যাল্ফ ফিচ্, টমাস রো, বার্ণিয়ে, তেভার্নিয়ে, টেরি প্রভৃতি

(৪) **মুদ্রা ও স্থাপত্য নিদর্শন :** মধ্য যুগের সুলতান ও সম্রাট্গণের মুদ্রা হইতে তাঁহাদের আমলে ধাতুশিল্পের উন্নতি এবং মুদ্রানীতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। সুলতানি ও মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্প ও চিত্রশিল্প হইতে সেই যুগের রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। কুতব মিনার, আলাই দরওয়াজা, তাজমহল, আগ্রা ও দিল্লীর কেল্লা প্রভৃতি এ-বিষয়ে উল্লেখ করা যাইতে পারে। মধ্য যুগের—অর্থাৎ সুলতানি ও মোগল যুগের স্থাপত্য শিল্পে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়।

হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য-রীতির সংমিশ্রণ

(৫) **হিন্দু লেখকদের রচনা :** মারাঠা ইতিহাস-গ্রন্থাদি, রাজপুত চারণ কবিদের রচনা প্রভৃতিতেও সেই যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপাদান পাওয়া যায়। টডের 'রাজস্থানের ইতিহাস' (Annals and Antiquities of Rajasthan) গ্রন্থখানি রাজপুত চারণ কবিদের রচনার উপর নির্ভর করিয়াই রচিত।

মারাঠা ইতিহাস-গ্রন্থাদি, রাজপুত চারণ কবিদের রচনা

আধুনিক যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান (Sources of Modern Indian History) : ভারতবর্ষের আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপকরণগুলির মধ্যে সরকারী কাগজপত্র, ইওরোপীয় বাণিজ্য কুঠির দলিলপত্র, দেশীয় ও বিদেশীয় ঐতিহাসিক রচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

(১) **সরকারী কাগজপত্র :** ভারতের আধুনিক যুগের ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উপকরণ সরকারী কাগজপত্র হইতে পাওয়া যায়। আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র-নীতি সম্পর্কে কাগজপত্র হইতে এই যুগের ইতিহাস রচনা করা যায়। ফরাসী পর্যটক 'জ্যাকেমোঁ' (Jaquemont) বলিয়াছিলেন যে, ভারত-সরকারের (ব্রিটিশ) শাসনকার্য 'কাগজ-কলমে'র দ্বারাই চলিতেছে। এই উক্তি হইতে ভারতের আধুনিক ইতিহাস রচনায় সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারা যায়।

সরকারী কাগজপত্রের গুরুত্ব

(২) ইওরোপীয় বাণিজ্য কুঠির দলিলপত্র : ইংরেজ, ফরাসী, পোর্তুগীজ, দিনেমার প্রভৃতি ইওরোপীয় বণিকের বাণিজ্য কুঠিতে যে-সকল কাগজপত্র পাওয়া গিয়াছে সেগুলি হইতেও ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাস রচনার উপকরণ সংগ্রহ করা যায়।

বাণিজ্য কুঠিতে প্রাপ্ত দলিলপত্রের গুরুত্ব

(৩) দেশীয় ও বিদেশীয় রচনা : ফারসী ভাষায় রচিত গ্রন্থ 'সিয়ার-উল্-মুতাখেরিণ', 'রিয়াজ-উস্-সালাতিন', 'খুলাসাৎ-উৎ-তোয়ারিখ্', তামিল ভাষায় লিখিত আর. এ. পিলাই-এর 'দিনপঞ্জী', ফরাসী গভর্নর দুপ্লের 'দুবাস', ইংরেজ ঐতিহাসিক মিলের 'ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাস', উইল্ক্স্ (Wilks)-এর 'মহীশূরের ইতিহাস', গ্র্যান্ট্ ডাফ রচিত 'মারাঠাজাতির ইতিহাস', কানিংহামের 'শিখজাতির ইতিহাস' প্রভৃতি গ্রন্থ এ-যুগের ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ।

ফারসী, তামিল, ফরাসী ও ইংরেজী গ্রন্থাদি

তৃতীয় অধ্যায়

ভারত ও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব

(Antiquity of India and Her Civilization)

পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্রস্থল আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। একমাত্র চীন ভিন্ন অপর কোন দেশ এত প্রাচীন এবং নিরবচ্ছিন্ন সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরবের অধিকারী নহে। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া এবং বিভিন্ন উপকরণে পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ভারত ও ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রাচীনত্ব

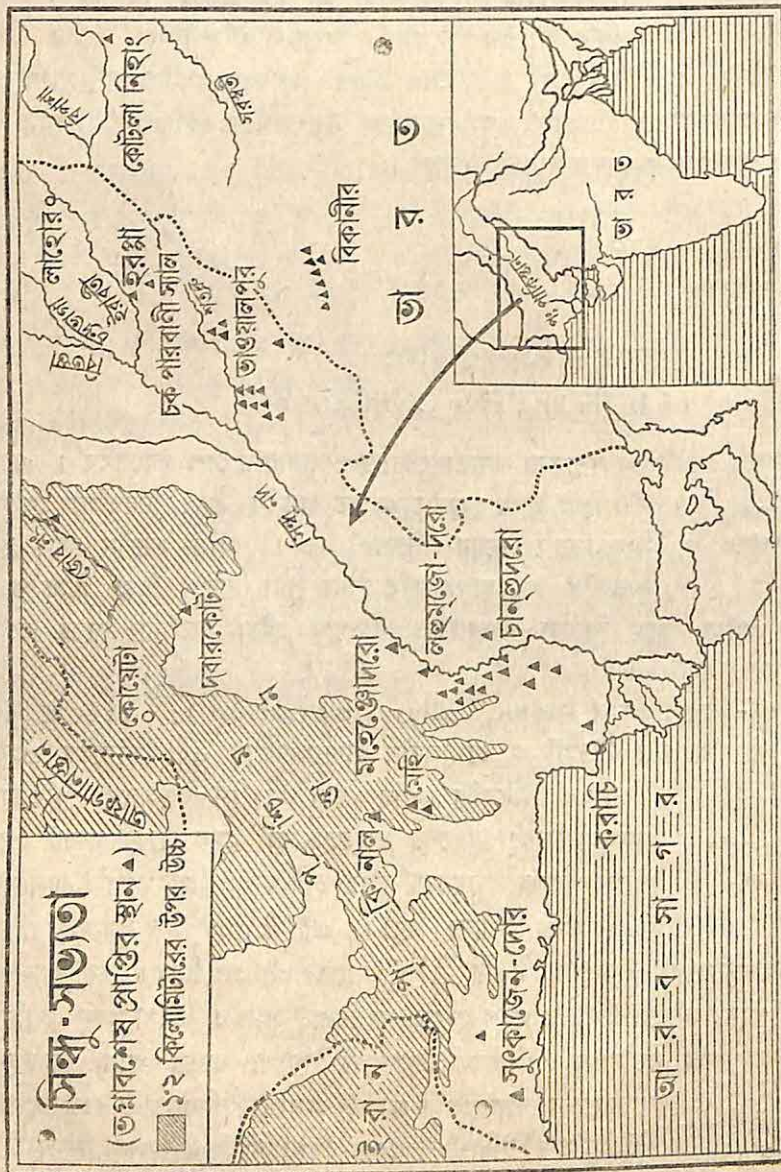
সিন্ধু-সভ্যতা (Indus Valley Civilization): ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে বাঙালী প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেক্টর স্যার্ জন মার্শাল বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু প্রদেশের 'মহেঞ্জোদরো' নামক স্থানে একটি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের খননকার্য আরম্ভ করেন। এই স্তূপটি একটি উঁচু ঢিপির উপর নির্মিত ছিল। এই ঢিপিটি সিন্ধুদেশের লোকের নিকট 'মহেঞ্জোদরো'—অর্থাৎ 'মড়ার ঢিপি' নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ স্তূপটির খননকার্য শুরু করিলে উহার তলদেশ হইতে এক বিরাট নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। ইহার পর বর্তমানে পাকিস্তান পাঞ্জাবের হরপ্পা নামক স্থান, চানহুদরো, সুৎকাজেন-দোর প্রভৃতি স্থানে খননকার্যের দ্বারা ঐ একই রূপ বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সকল নিদর্শন একই সভ্যতার পরিচয় বহন করে। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া এই সভ্যতা গড়িয়া

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক আবিষ্কৃত সিন্ধু-সভ্যতা

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা

উঠিয়াছিল বলিয়া এই সভ্যতার নামকরণ হইয়াছে 'সিন্ধু-সভ্যতা'। পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক যুগ হইতে শুরু হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে এখন ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৈদিক যুগের বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। এই সভ্যতা খ্রীষ্টের জন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্বে গড়িয়া উঠিয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করিয়া থাকেন। ইহা

'সিন্ধু-সভ্যতা' নামকরণ ও প্রাচীনত্ব



মিশরীয়, ব্যাবিলনীয়, আসিরীয়, চৈনিক প্রভৃতি প্রাচীনতম সভ্যতার সমসাময়িক ছিল এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

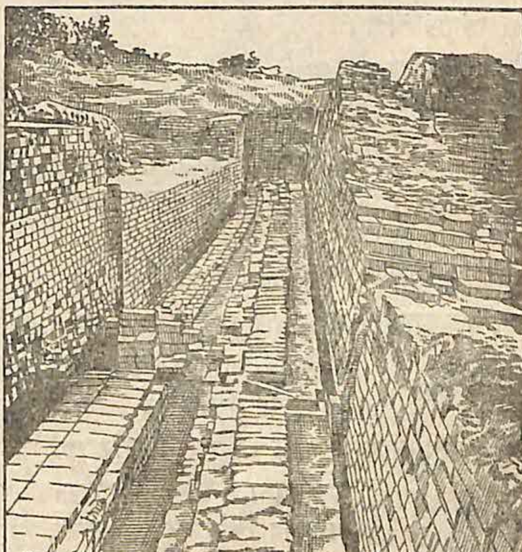
সিন্ধু-উপত্যকার মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা, চানহুদরো, সুৎকাজেন-দোর, ভাওয়ালপুর প্রভৃতি নানা স্থানে সিন্ধু-সভ্যতার চিহ্নাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এগুলির মধ্যে মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা নামক শহর দুইটিই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এই দুইটি শহরের মধ্যে কয়েক শত মাইলের ব্যবধান থাকিলেও জল-পথে সহজ যোগাযোগের উপায় ছিল।* এই দুইটি স্থানে আবিষ্কৃত প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে বুঝা যায় যে, উভয় শহরই পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছিল। উভয় শহরই রৌদ্রে পোড়া ইটের উচ্চ ভিত্তির উপর নির্মিত। দালান বা প্রাসাদ অবশ্য পোড়া ইটের প্রস্তুত ছিল। অপরাপর যে-সকল স্থানে খননকার্যের ফলে সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে সেগুলির মধ্যে পরিকল্পনা ও গঠনকৌশলের ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পা—সিন্ধু-সভ্যতার দুইটি শ্রেষ্ঠ শহর

পোড়া ইট ও রৌদ্রে পোড়া ইটের ব্যবহার

মহেঞ্জোদরো শহরের রাস্তাগুলি ছিল সোজা ও চওড়া। রাস্তার পাশ ধরিয়া সারিবন্ধভাবে ছোট-বড় অসংখ্য দালান নির্মিত ছিল। দালানগুলির গড়ন-ভঙ্গিমা, পরিসর প্রভৃতি দেখিয়া ধনী-দরিদ্রের বাসস্থানের পার্থক্য সুস্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায়। ক্ষুদ্র দুই-কক্ষযুক্ত দালান হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট প্রাসাদের ভগ্নাবশেষও মহেঞ্জোদরোতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। দালানগুলি যে দ্বিতল বা ততোধিক উচ্চ ছিল তাহা সিঁড়িগুলি দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। দালান মাত্রেরই দেওয়াল ও মেঝে অত্যন্ত মসৃণ ছিল। প্রত্যেক বাড়ীতেই কূপ, স্নানাগার প্রভৃতি ছিল। মহেঞ্জোদরোতে একটি বিরাট প্রাসাদ, একটি বিশাল স্নানাগার এবং চতুষ্কোণ স্তম্ভবিশিষ্ট একটি বিরাট হলঘর

হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোর পূর্ত কার্যাদি



রাস্তা ও রাস্তার নিচে পয়ঃপ্রণালী (মহেঞ্জোদরো)

* Vide Wheeler: *The Indus Civilization (The Cambridge History of India, Supplementary Volume)*, p. 2. ff.

আবিষ্কৃত হইয়াছে। হরপ্পার ভগ্নাবশেষের মধ্যে একটি বিশাল শস্যভাণ্ডার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে একই স্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট দালানের পাশাপাশি নির্মাণ-ভঙ্গী দেখিয়া এগুলি শ্রমিকদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

স্থাপত্য কার্য

মহেঞ্জোদরো, হরপ্পা প্রভৃতি শহরের পয়ঃপ্রণালী আধুনিক ধরনের ছিল। প্রত্যেক দালান হইতে জল-নিকাশের সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। নর্দমা রাস্তার তলদেশ দিয়া নির্মিত ছিল। এই সকল নর্দমা দিয়া জল যাইবার কালে আবর্জনাগুলি আটকাইয়া রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গর্ত করিয়া দেওয়া হইত। নাগরিক জীবনকে যথাসম্ভব স্বচ্ছন্দ করিয়া তুলিবার যাবতীয় ব্যবস্থা মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় ছিল।

আধুনিক ধরনের পয়ঃপ্রণালী

সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন যে-সকল স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে কোথাও কোন মন্দিরের বা উপাসনা গৃহের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নাই। ধর্মকর্মাদি ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ বাড়ীতেই সম্ভবত লোকে করিত। যাহা হউক, সিন্ধু-সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন হইতে সেই যুগের লোক যে অতি উন্নত ধরনের নাগরিক জীবন যাপন করিত সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

মন্দির বা কোনপ্রকার উপাসনা গৃহের নিদর্শন পাওয়া যায় নাই

সিন্ধু-সভ্যতার কালে লোকদের প্রধান খাদ্য ছিল গম, বার্লি, খেজুর প্রভৃতি। এগুলি ভিন্ন নানাপ্রকার ফলও তাহারা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিত। গরু, শূকর, ভেড়া, হাঁস, কচ্ছপ প্রভৃতির মাংস তাহারা খাইত। দুধ, শুকনা মাছ, সিন্ধু নদের টাটকা মাছ প্রভৃতি তাহাদের অপরাপর প্রধান খাদ্য ছিল।

খাদ্য

সূতী ও পশমী উভয় প্রকার বস্ত্র সে-যুগের লোকেরা ব্যবহার করিতে জানিত। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে পোশাক-পরিচ্ছদের কোন চিহ্নাদি পাওয়া যায় নাই। তবে প্রস্তর মূর্তির পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া মনে হয় যে, সে-যুগের লোকেরা শরীরের উপরাংশের জন্য একখণ্ড এবং নিম্নাংশের জন্য পৃথক একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করিত। অলংকারাদি স্ত্রী-পুরুষ সকলেই ব্যবহার করিত। তবে কানপাশা, নাকের অলংকার, হার, কোমরবন্ধ প্রভৃতি স্ত্রীজাতিই ব্যবহার করিতেন। সোনা, রূপা, ব্রোঞ্জ, তামা, হাতীর দাঁত এবং মূল্যবান পাথর অলংকার নির্মাণে ব্যবহৃত হইত। স্ত্রীজাতি আধুনিক কালের ভারতীয় নারীদের ন্যায় কেশবিন্যাস করিতেন। প্রসাধন সামগ্রীও যে তাঁহারা ব্যবহার করিতেন সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে।

পোশাক-পরিচ্ছদ

অলংকারপত্র

মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় এবং সিন্ধু-উপত্যকার অপরাপর স্থানে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র পাওয়া গিয়াছে। চীনা মাটির পাত্র, ব্রোঞ্জনির্মিত পাত্র, তামা ও রূপার পাত্র, সূচ, মাছ ধরিবার বড়শি, চিরুনি, কুঠার, বর্শা, থালা, বাটি, জগ, ক্ষুর, আয়না, কাস্তে প্রভৃতি

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত জিনিসপত্র, খেলনা

বহুপ্রকার জিনিস হইতে সিন্ধু-সভ্যতার যুগে লোকেরা যে এক অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছিল সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতে পারে। মাটির



সিন্ধু-সভ্যতার যুগে বাসনপত্র

পাখী ও ফাঁপা ঝুনঝুনি, ছোট ছোট চেয়ার, ঠেলাগাড়ী, গরুর গাড়ী, খাট, চারপাই প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের খেলনা হইতে মনে হয় যে, এইরূপ জিনিস দৈনন্দিন জীবনেও ব্যবহৃত হইত।

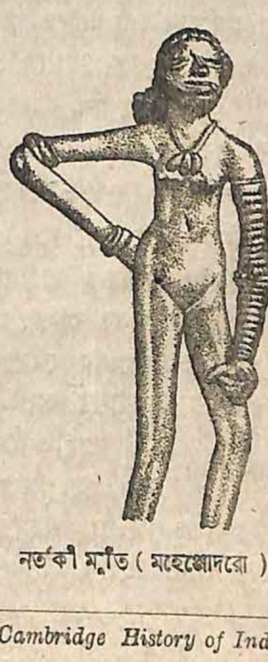
সামরিক সাজ-সরঞ্জাম বা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কোন উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হরপ্পা বা মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া যায় নাই। এই দুই শহরের অভ্যন্তরে অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে দুর্গ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল এই অনুমান করা হইয়া থাকে।* যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র হিসাবে ছুরি, তীর-ধনুক, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি তখন ব্যবহার করা হইত। কিন্তু ঢালজাতীয় কোনপ্রকার আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের সাজ পাওয়া যায় নাই। অস্ত্রশস্ত্র তামা ও ব্রোঞ্জ দ্বারা নির্মিত ছিল।

অস্ত্রশস্ত্র

সিন্ধু-সভ্যতার যুগে ব্রোঞ্জনির্মিত একটি নর্তকী-মূর্তি মহেঞ্জোদরোতে পাওয়া গিয়াছে। ইহা ভিন্ন বিভিন্ন পশুর প্রতিকৃতি অঙ্কিত বহু সীল-মোহর এবং মস্তক, হস্তপদহীন একটি মনুষ্য মূর্তির ভগ্নাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। এগুলির নির্মাণকৌশল এবং এগুলিতে অঙ্কিত পশুর প্রতিকৃতি ও মনুষ্য মূর্তির ভগ্নাবশেষ দেখিয়া, সে-যুগের শিল্পীদের শারীরতত্ত্ব সম্পর্কে যে যথেষ্ট জ্ঞান ছিল তাহা অনুমান করা যায়। এঁটেল মাটি এবং বালি দ্বারা নির্মিত কয়েকটি পশু ও মানুষের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিও উচ্চ শিল্পজ্ঞানের পরিচায়ক। সিন্ধু-উপত্যকায় মোট দুই হাজার সীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শিল্পকলা ও সীলমোহর

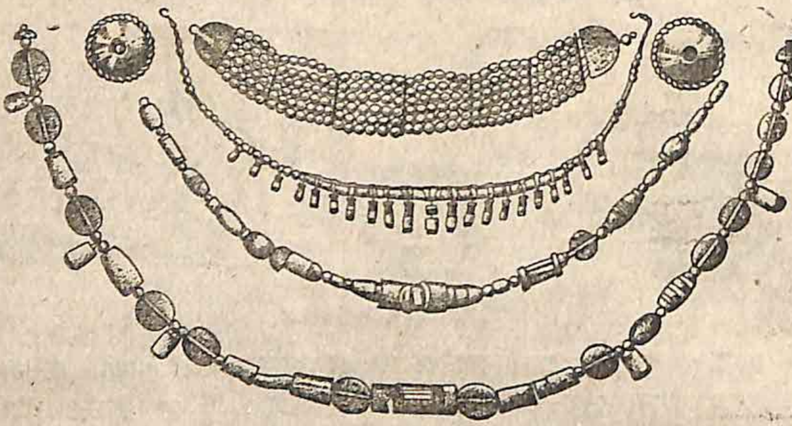
চিত্রলিপি



নর্তকী মূর্তি (মহেঞ্জোদরো)

* Vide Wheeler: *The Indus Civilization* (*The Cambridge History of India*, Supplementary Volume), pp. 52-53.

এগুলির উপরে একপ্রকার চিত্রলিপিও আঁকা আছে। কিন্তু এযাবৎ এই লিপিগুলির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

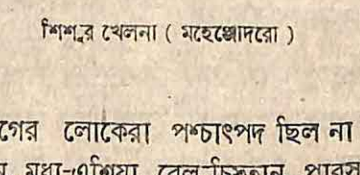


সিন্ধু-সভ্যতার যুগে অলংকার

কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য; মৃৎশিল্প, ধাতুশিল্প, বয়নশিল্প, ভাস্কর্য প্রভৃতি

সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা কৃষি, পশুপালন ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করিয়াই জীবনধারণ করিত। কৃষি ও পশুপালন প্রধান উপজীবিকা হইলেও মৃৎপাত্র-নির্মাণশিল্প, বয়নশিল্প, ভাস্কর্য, ধাতুশিল্প প্রভৃতিও জীবিকার্জনের বিভিন্ন বৃত্তি ছিল। গরু, মহিষ, ষাঁড়, হাতী, হরিণ, ভেড়া, উট প্রভৃতি জন্তুর কঙ্কাল ও সীলমোহরে খোদাই করা প্রতিকৃতি পাওয়া গিয়াছে। এই সকল পশুর মধ্যে কতকগুলি যে গৃহপালিত ছিল, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। শিশুদের খেলনার বাঘ, গণ্ডার, ভল্লুক, খরগোস, বিড়াল, বাইসন, বানর প্রভৃতির ছোট ছোট প্রতিকৃতি হইতে এই সকল জন্তু সিন্ধু-উপত্যকাবাসীদের জানা ছিল, নিঃসন্দেহে বলা চলে। মোরগ, টিয়া, ময়ূর, হাঁস প্রভৃতিও তাহারা পোষা পাখী হিসাবে পালন করিত বলিয়া মনে হয়।

গৃহপালিত পশু-পক্ষী



শিশুর খেলনা (মহেঞ্জোদরো)

ব্যবসায়-বাণিজ্য

ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও সিন্ধু-সভ্যতা যুগের লোকেরা পশ্চাৎপদ ছিল না। ভারতবর্ষের অপরাপর অংশ ভিন্ন আফগানিস্তান, মধ্য-এশিয়া, বেলুচিস্তান, পারস্য প্রভৃতি দেশের সহিতও তাহাদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। ইহা ভিন্ন মেসোপটেমিয়ার সহিতও যে তাহাদের যোগাযোগ ছিল সেই প্রমাণও পাওয়া গিয়াছে। সিন্ধু-সভ্যতার যুগে তামা, ব্রোঞ্জ, রূপা ও সোনার ব্যবহার জানা ছিল। সিন্ধু-উপত্যকায় তামা প্রয়োজনের তুলনায় কম পাওয়া যাইত বলিয়া দক্ষিণ ভারত ও আফগানিস্তান হইতে তামা আমদানি করা হইত। রাজপুতানা হইতে তাহারা স্থাপত্য শিল্পের প্রয়োজনীয় শ্বেত পাথর আমদানি করিত। জলপথে

এবং স্থলপথে বাণিজ্য পরিচালিত হইত। মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পার দুইটি সীলমোহরে নৌকার চিত্র দেখিয়া মনে হয় নৌচালনাও তাহাদের অজানা ছিল না। মহেঞ্জোদরোতে একটি ঘোড়ার কঙ্কাল আবিষ্কৃত হইয়াছে। উত্তর-বেলুচিস্তানের রানী ঘুনদাই নামক স্থানে ঘোড়া ও গাধার কঙ্কাল পাওয়া যাইবার ফলে একথা মনে করা হয় যে, উট ভিন্ন, ঘোড়া ও গাধা সিন্ধু-সভ্যতা যুগের পরিবহণের প্রধান সহায়ক ছিল।*

ধর্ম

সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা এক যোগী-পুরুষের পূজা করিত। এই যোগী-পুরুষের মস্তকে তিনটি শৃঙ্গ এবং তাঁহার চতুর্দিকে পশুর ছবি অঙ্কিত আছে। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে, তাঁহাকে পশুপতি শিবের আদি সংস্করণ বলিয়া মনে করা ভুল হইবে না।** ইহা ভিন্ন এক মাতৃমূর্তির—সম্ভবত মহাদেবীর, পূজাও সে-যুগে প্রচলিত ছিল।

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে সিন্ধু-সভ্যতা যে অতি উন্নত ধরনের সভ্যতা ছিল তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

সিন্ধু-সভ্যতার গুরুত্ব

সিন্ধু-সভ্যতার চিহ্নাদি আবিষ্কারের ফলে ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতি যে বৈদিক যুগের পূর্বেই যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল একথা বুঝিতে পারা গিয়াছে। পূর্বে ধারণা ছিল যে, ভারতীয় সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা বা আর্য সভ্যতা হইতে উদ্ভূত। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কার এই ধারণা ভ্রান্তিমূলক একথা প্রমাণ করিয়াছে। বস্তুত, ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির উৎস সিন্ধু-সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা এই উভয়ের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। ইহা ভিন্ন, ভারতীয় সভ্যতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতার অন্যতম একথাও সিন্ধু-সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে। স্যার্ জন্ মার্শাল প্রমুখ প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে সিন্ধু-সভ্যতা কোন কোন বিষয়ে সমসাময়িক মিশরীয় বা আসিরীয়-ব্যাবিলনীয় সভ্যতা হইতেও শ্রেষ্ঠতর ছিল।

সিন্ধু-সভ্যতা বিনাশের আনুমানিক কারণ

সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের আনুমানিক কারণও কোন কোন ঐতিহাসিক উল্লেখ করিয়াছেন। সিন্ধু-সভ্যতা যে বিস্তীর্ণ অঞ্চল লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা একাধিকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। বৈদিক যুগের প্রারম্ভে—অর্থাৎ মোটামুটিভাবে খ্রীষ্টপূর্ব দুই সহস্র অব্দের নিকটবর্তী কোন সময়ে সিন্ধু-সভ্যতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। প্লাবন, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই সাধারণত অনুমিত হইয়া থাকে। মাটির নিচ হইতে যে ধরনের মৃতদেহাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে কোন আকস্মিক কারণে সিন্ধু-সভ্যতার এক বিরাট অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল মনে করা যাইতে পারে। রন্ধনশালা, রাস্তাঘাট, স্নানাগার প্রভৃতি স্থানে মৃতদেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। পলিমাটি জমিয়া সিন্ধু নদের

* Wheeler: *The Indus Age*, p. 60.

** "It is very interesting to note how this figure corresponds with, and to a certain extent explains, the later conception of Siva ... ." *An Advanced History of India* (3rd edn., 1967), p. 20.

জলনিকাশের ক্ষমতা হ্রাস পাইবার ফলে প্লাবন যে পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছিল সে-প্রমাণ পাওয়া যায়। সেজন্য প্লাবন বা ভূমিকম্পই যে সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের আকস্মিক কারণ ছিল তাহা অনুমান করা ভুল হইবে না। মেসোপটেমিয়া হইতে আগত বহিঃশত্রুর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ, আর্যদের সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিও সিন্ধু-সভ্যতা বিনাশের কারণ বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সিন্ধু-সভ্যতা বিনাশের প্রকৃত কারণ এখনও জানা সম্ভব হয় নাই। উপরি-উক্ত কারণসমূহ সম্পূর্ণ আনুমানিক।

ইহা ভিন্ন সিন্ধু-সভ্যতার পতনের অন্যতম যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছিল সেই অঞ্চলের পরিবর্তনশীল ভূ-প্রকৃতি। বর্তমানে সিন্ধু নদ ও উহার শাখা-নদীর অববাহিকা অঞ্চল ভিন্ন সিন্ধু দেশের অপরাপর স্থান শুষ্ক মরুঅঞ্চলে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধু-সভ্যতার যুগে সেইসব অঞ্চল জলাশয়, ঘন অরণ্য প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ছিল। সিন্ধু-সভ্যতা ছিল নগর-সভ্যতা। ইহার প্রয়োজনে অসংখ্য পোড়া ইট প্রস্তুত করিতে গিয়া বনজঙ্গলের ধ্বংসসাধন স্বাভাবিক-ভাবেই বৃষ্টিপাতের মাত্রা হ্রাস করিয়া ক্রমে সেই অঞ্চলকে মরুঅঞ্চলে পরিণত করিয়াছিল। ইহা সিন্ধু-সভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম কারণ বলিয়া আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

অরণ্যের ধ্বংসসাধন

আর্যদের আগমন (Coming of the Aryans): আর্যগণ প্রথমে কোন্ দেশে বাস করিত সে-সম্পর্কে নানাপ্রকার মতবাদ আছে। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতবর্ষ আর্যদের মূল বাসস্থান ছিল। কিন্তু আধুনিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতদের অধিকাংশের মতে আর্যগণ ভারতের বাহির হইতে এদেশে আসিয়াছিল। কাহারও কাহারও মতে আর্যদের বাসস্থান ছিল এশিয়া-মাইনরের ক্যাপাডোসিয়া (Cappadocia) অঞ্চলে। এই মতের বিরুদ্ধেও নানা যুক্তি দেখানো হইয়াছে। এইভাবে আর্যদের মূল বাসস্থান ভিস্টুলা নদীর তীরে জার্মানিতে বা লিথুয়ানিয়ায় ছিল বলিয়া বিভিন্ন ঐতিহাসিক মত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, আধুনিক ঐতিহাসিকদের অনেকের, বিশেষত ব্র্যাণ্ডেনস্টিনের মতে, আর্যগণ প্রথমে আরল সাগরের দক্ষিণ তীরে বাস করিত। সেখান হইতে কোন এক অজ্ঞাত কারণে তাহাদের এক শাখা পারস্য ও ভারতবর্ষের দিকে এবং অপর এক শাখা ইওরোপের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আর্যদের যে শাখা প্রাচ্যের দিকে অগ্রসর হইয়াছিল উহার একাংশ ইরাণ এবং অপরাংশ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। মোটামুটিভাবে বলিতে গেলে খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্বে আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিল।

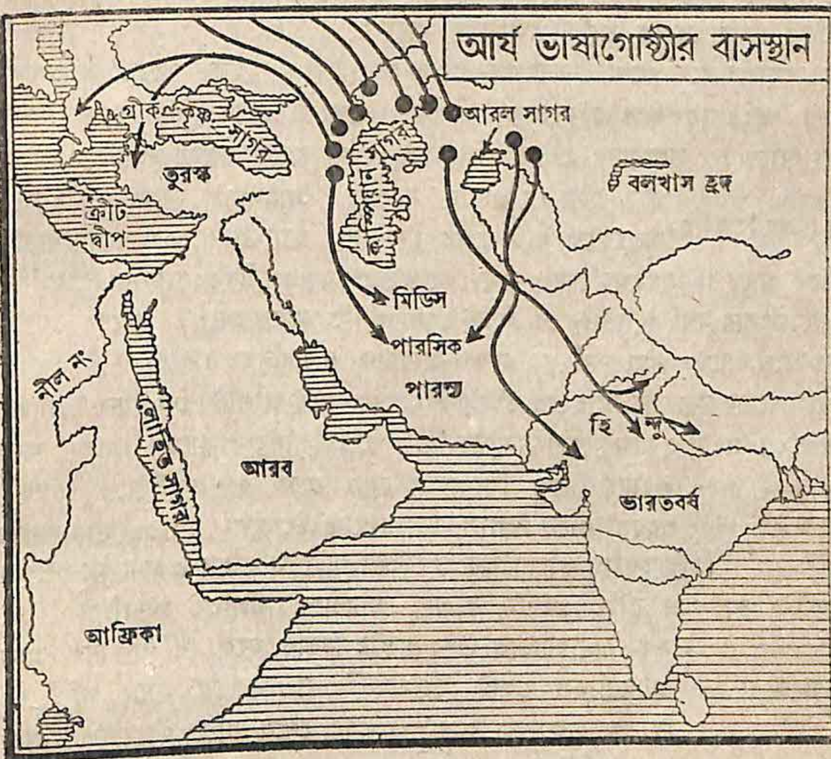
আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে মতবাদ

ব্র্যাণ্ডেনস্টিনের মত

আর্য বসতি : আর্য সভ্যতা : ভারতীয় আর্যদের আদি গ্রন্থ ঋগ্বেদে তাহাদের বাসস্থানের পরিবেশ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের প্রাকৃতিক বর্ণনা এবং বিভিন্ন নদ-নদীর নামের উল্লেখ আছে। এগুলি হইতে ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ অঞ্চলে

আর্যদের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল, তাহার একটি মোটামুটি ধারণা পাওয়া যায়। শতদ্রু, বিপাশা, ঝিলাম, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা—পাঞ্জাবের পঞ্চ নদী এবং সিন্ধু, সরস্বতী, গঙ্গা-যমুনা, সরযু প্রভৃতি নদ-নদীর অববাহিকা অঞ্চল ধরিয়া আর্যগণ বসতি বিস্তার করিয়াছিল। ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'সপ্তসিন্ধব' নামক দেশ পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী এবং সিন্ধু ও সরস্বতী,

ভারতে আর্যদের বসতি বিস্তার—'সপ্তসিন্ধব'



মোট এই সাতটি নদীর অববাহিকা অঞ্চল লইয়া গঠিত ছিল, একথা আধুনিক ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ মনে করেন। বৈদিক যুগের প্রথম দিকে আর্যগণ বাংলাদেশ, আসাম বা দাক্ষিণাত্য অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে নাই বলিয়াই মনে করা হইয়া থাকে, কারণ ঋগ্বেদে এই সকল অঞ্চলের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে এই সকল অঞ্চলে বৈদিক যুগের শেষভাগে আর্যদের বসতি বিস্তৃত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্য, বাংলাদেশ ও আসামে পরবর্তী কালে আর্য বসতি-বিস্তৃতি

বৈদিক সাহিত্য : চারি বেদ : পৃথিবীর কোন অংশের আর্যগণই ভারতীয় আর্যদের ন্যায় এত সুদূর অতীতে ঋগ্বেদের মত গ্রন্থ রচনা করিবার প্রতিভা প্রদর্শন করেন নাই। ভারতীয় আর্য ঋষিগণ চারিখানি গ্রন্থ বা চতুর্বেদ—যথা, ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ—রচনা করিয়া তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছিলেন।

চতুর্বেদ : ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব

Acc. No 80.
dt. 13.1.84
S.C.E.R.T.

'বিদ্'—অর্থাৎ জ্ঞান হইতেই 'বেদ' নামের উৎপত্তি হইয়াছে। বলা বাহুল্য, চারিখানি বেদে জ্ঞানেরই প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। আর্যগণ তথা পরবর্তী কালের হিন্দুমাত্রেই 'বেদ' ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। এজন্য বেদ মাত্রেই অপৌরুষেয় এই ধারণার সৃষ্টি হইয়াছে। ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিয়া বেদের জ্ঞান লাভ করা হইয়াছিল বলিয়া বেদকে 'শ্রুতি' বলা হইয়া থাকে।

'বেদ' অর্থ 'জ্ঞান'—বেদ অপৌরুষেয়

বেদগুলির মধ্যে ঋগ্বেদই সর্বপ্রথমে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে সহস্রাধিক স্তোত্রে প্রকৃতির স্তুতিগান করা হইয়াছে। সামবেদ ঋগ্বেদের শ্লোকগুলির উপর নির্ভর করিয়া রচিত। সামবেদের স্তোত্রগুলি যাগ-যজ্ঞের কালে গানের ন্যায় সুর করিয়া গীত হইত। এজন্য সামবেদ 'সামগান' নামেও পরিচিত। যজুর্বেদে যাগ-যজ্ঞের মন্ত্র-তন্ত্র, অনুষ্ঠানগুলির বর্ণনা প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট আছে। সর্বশেষ বেদ—অর্থাৎ অথর্ববেদে কতকগুলি রহস্যজনক সাঙ্কেতিক চিহ্ন, চিকিৎসার মন্ত্র, পৃথিবী-স্তব, সৃষ্টি-রহস্য প্রভৃতি বর্ণিত আছে। বেদের চারিটি করিয়া অংশ আছে--যথা, সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্।

বিভিন্ন বেদের বিষয়বস্তু

যাগ-যজ্ঞের মন্ত্র-তন্ত্র সংহিতায় সন্নিবিষ্ট আছে। এই অংশটি পদ্যে রচিত। ব্রাহ্মণ অংশে পূজা-পার্বণ ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি গদ্যে লিপিবদ্ধ আছে। ব্রাহ্মণ অংশ প্রধানত গদ্যে লিখিত হইলেও কতক পদ্যও ইহাতে আছে। পরবর্তী কালে সন্ন্যাস ধর্ম পালনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা বৃদ্ধ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া অরণ্যে চলিয়া যাইতেন তাঁহাদের জন্য অপেক্ষাকৃত কম জটিল যাগ-যজ্ঞ রীতি প্রবর্তন করিয়া 'আরণ্যকে' সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। এই সকল আরণ্যকের উপর গভীর চিন্তার ফলে যে দার্শনিক জ্ঞান জন্মিয়াছিল উহাই 'উপনিষদ্' বা 'বেদান্ত' নামে পরিচিত। বৈদিক গ্রন্থাদির 'অন্তে'—অর্থাৎ শেষে রচিত হইয়াছিল বলিয়া উপনিষদ্ 'বেদান্ত' নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পরবর্তী কালে বেদ হইতে আরও নানাপ্রকার ধর্মগ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছে। এগুলি সূত্র-সাহিত্য নামে পরিচিত। সূত্র-সাহিত্য আবার ছয়টি বেদাঙ্গ ও ছয়টি দর্শনে বিভক্ত।

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ বা বেদান্ত

সূত্র-সাহিত্য ছয় বেদাঙ্গ, ছয় দর্শন (ষড়দর্শন)

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে আর্যদের সাহিত্য—অর্থাৎ চতুর্বেদকে নির্ভর করিয়া যে বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। আর্য ঋষিগণ আয়ুর্বেদশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র—অর্থাৎ রাষ্ট্রনীতি, সঙ্গীতশাস্ত্র, নাট্যশাস্ত্র, চারুশিল্প, কারুশিল্প প্রভৃতি বিষয়ের উপরও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন। বৈদিক যুগের আর্য ঋষিগণ ভারতীয় মনীষীর যে পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা আজও আমাদিগকে বিস্মিত করে।

অপরাপর গ্রন্থ

বৈদিক আর্যদের মনীষার অভিব্যক্তি

আর্যদের সমাজ ও ধর্ম: আর্যগণ বিনা বাধায় ভারতবর্ষে বসতি বিস্তারে সমর্থ হয় নাই। অনার্যদের সহিত সংঘর্ষের মধ্য দিয়াই আর্যগণ প্রথমে ভারতে

বসতি বিস্তার করে। আর্যদের মধ্যে প্রথমে জাতিভেদ ছিল না। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমে বসতি বিস্তার করিলেও শেষ পর্যন্ত আর্য ও ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। ফলে সমাজে আর্য ও অনার্য দুই শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। আর্যগণ ছিল দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি, প্রশস্ত ললাট এবং উন্নত নাসিকাযুক্ত। পক্ষান্তরে অনার্যগণ ছিল কৃষ্ণকায়, খর্বাকৃতি এবং তাহাদের নাসিকা ছিল অনুন্নত। এই দুই শ্রেণীর লোকের বর্ণ—অর্থাৎ রঙের ভিত্তিতেই সর্বপ্রথম আর্য ও অনার্য বর্ণবিভাগ হইয়াছিল।

বর্ণবিভাগ—আর্য ও অনার্য

কিন্তু ক্রমে সমাজের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংগঠনকে অধিকতর সুষ্ঠু করিয়া তুলিবার প্রয়োজন হইল। তখন ক্ষমতা ও বৃত্তি—অর্থাৎ গুণ ও কর্ম অনুসারে সমাজকে চারি ভাগে ভাগ করা হইল। আধ্যাত্মিক কার্যাদি, জপ-তপ-যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতিতে যাঁহারা উৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন তাঁহারা ব্রাহ্মণ; দেশরক্ষা, শিকার প্রভৃতি কার্যে পারদর্শী শ্রেণী ক্ষত্রিয়; বাণিজ্য, কৃষি, পশুপালন প্রভৃতি অর্থনৈতিক কার্যাদিতে পারদর্শী ব্যক্তিগণ বৈশ্য বলিয়া পরিচিত হইলেন। সমাজের উপর তিন শ্রেণীর—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণের যাহারা সেবা করিত তাহারা শূদ্র নামে অভিহিত হইল। এইভাবে বৃত্তির ভিত্তিতে আর্য ও অনার্যগণ চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বলা বাহুল্য, সমাজের অধস্তন শূদ্রশ্রেণীতে স্থান হইল অনার্যদের। কিন্তু বৃত্তি অনুসারে চারিটি পৃথক শ্রেণী বিভক্ত হইলেও এগুলির মধ্যে কোনপ্রকার জাতিভেদ ছিল না বা সামাজিক আচার-আচরণে কোন ভেদাভেদ করা হইত না। এই সকল জাতির মধ্যে বিবাহও নিষিদ্ধ ছিল না। কিন্তু ক্রমেই দেখা দিল শ্রেণীগত সংকীর্ণতা। বৈদিক যুগের শেষভাগে এই সকল শ্রেণীর মধ্যে জাতিভেদ এবং বিবাহ ব্যাপারে রক্ষণশীলতা দেখা দিতে লাগিল।

গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ: ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

জাতিভেদহীন সমাজ

পরবর্তী কালে জাতিভেদের কঠোরতার উদ্ভব

আর্য সমাজের মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে 'কর্তা' বলা হইত। পারিবারিক জীবনে শৃংখলা রক্ষা করা ছিল তাঁহার দায়িত্ব। পরিবারের ব্যক্তিবর্গের উপর তাঁহার নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ছিল। বৈদিক আর্যগণের সামাজিক জীবন ছিল সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। সততা, ধর্মপরায়ণতা, পরস্পর শ্রদ্ধা, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ছিল সমাজের কতকগুলি প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য।

পরিবার ও পারিবারিক আদর্শ

আর্যদের সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল 'চতুরাশ্রম'। সমাজের ঊর্ধ্বতন তিন শ্রেণী—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগকে বাল্যকালে উপবীত ধারণের পর গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্র শিক্ষা করিতে হইত। জীবনের এই পর্যায়কে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বলা হইত। গুরুগৃহে থাকিয়া গুরুর জীবনের সুখ-দুঃখের অংশগ্রহণ করিয়া গুরুর ন্যায় নির্লোভ, সরল ও ন্যায়পরায়ণ জীবনের আদর্শে চরিত্র

চতুরাশ্রম:

(১) ব্রহ্মচর্য

গঠন করিতে হইত। শাস্ত্রশিক্ষা শেষ হইলে শুরু হইত জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়—গার্হস্থ্যাশ্রম। বিবাহাদি করিয়া পরমব্রহ্মের কথা স্মরণ রাখিয়া জীবন যাপন করাই ছিল এই আশ্রমের কর্তব্য। প্রৌঢ় বয়সে বানপ্রস্থ গ্রহণ করিতে হইত—অর্থাৎ সাংসারিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইয়া স্ত্রীকে পুত্রের নিকট রাখিয়া অথবা সঙ্গে লইয়া বনে গমন করিতে হইত। সেখানে কুটির বাঁধিয়া ধর্মাচরণের মাধ্যমে পরবর্তী আশ্রম—অর্থাৎ সন্ন্যাসের জন্য প্রস্তুত হইতে হইত।* চতুর্থ এবং শেষ পর্যায়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসীর ন্যায় অরণ্যে জপ-তপে জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইতে হইত। এইভাবে আর্যদের সমগ্র জীবনটাই যেন একটি মূর্ত ধর্মস্বরূপ ছিল।

(২) গার্হস্থ্য

(৩) বানপ্রস্থ

(৪) সন্ন্যাস

আর্য সমাজে নারীজাতি উচ্চ সম্মানের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহারা পারিবারিক জীবনে যেমন পুরুষদের সহধর্মিণী ছিলেন তেমনি পরিবারের বাহিরেও তাঁহারা পুরুষদের সাহায্য-সহায়তা দান করিতেন। জীবনযাত্রার প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর কাজ তাঁহারা করিতেন এবং উদ্বৃত্ত সময়ে স্বামীর সহিত ধর্মকর্মেও অংশগ্রহণ করিতেন। সে-যুগে কয়েকজন আর্য নারী শাস্ত্রালোচনা ও মন্ত্রাদি রচনায় অনন্যসাধারণ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অপলা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি আর্যনারীর নাম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

আর্য সমাজে নারীর স্থান

অপলা, ঘোষা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, গার্গী ও মৈত্রেয়ী

আর্য সমাজ সম্পূর্ণভাবে ধর্মভিত্তিক ছিল, একথার আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। এই ধর্ম ছিল প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির উপাসনা। ভারতীয় সভ্যতা তপোবনের সভ্যতা। স্বভাবতই এই সভ্যতায় ধর্ম বলিতে প্রাকৃতিক শক্তির উপাসনা বুঝাইত। প্রাকৃতিক প্রভাব বৈদিক আর্যদের সমাজজীবন, সাহিত্য, আচার-আচরণ, ধর্ম সবকিছুকেই প্রভাবিত করিয়াছিল। আর্যগণ প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিত। যথা, আকাশের দেবতা দ্যৌ, জলের দেবতা বরুণ, আলোকের দেবতা সূর্য, বৃষ্টি ও বজ্রের দেবতা ইন্দ্র, বাতাসের দেবতা মরুৎ, ঊষা, সরস্বতী প্রভৃতির তাহারা উপাসনা করিত। প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে স্তোত্রপাঠ, যজ্ঞ এবং আরও নানাপ্রকার জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদন করিতে হইত। মূলত আর্যদের মধ্যে মূর্তিপূজা প্রচলিত ছিল না। কিন্তু আর্য-অনার্য সংমিশ্রণের মাধ্যমে ধর্ম বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার ফলে মূর্তিপূজা, পশুবলি প্রভৃতি অনার্যদের ক্রিয়াকলাপও ক্রমে আর্যদের উপাসনা-পদ্ধতিতে স্থানলাভ করিয়াছিল।

প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে দেবতাজ্ঞানে উপাসনা—দ্যৌ, বরুণ, সূর্য, ইন্দ্র, মরুৎ, ঊষা, সরস্বতী প্রভৃতি

আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন: আর্যদের অর্থনৈতিক জীবনের মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। গরুর সাহায্যে লাঙ্গল টানানো হইত, এজন্য কৃষির সঙ্গে সঙ্গে

---

* মনুসংহিতা

গরুড় পুরাণে বানপ্রস্থ-আশ্রম স্বগৃহে থাকিয়া সংসারের দায়িত্বমুক্তভাবে জীবন-যাপন করিয়া পরবর্তী জীবনের—অর্থাৎ সন্ন্যাস-আশ্রমের জন্য প্রস্তুত হওয়ার উল্লেখ আছে। গরুড় পুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

গো-পালন অপরিহার্য ছিল। ইহা ভিন্ন, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও পশুপালন করিয়াও অনেকে জীবিকার্জন করিত। বৈদিক যুগের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তি ছিল গ্রাম। গ্রামগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। প্রতি গ্রামেই জীবনধারণের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি উৎপন্ন হইত। বৈদিক যুগে শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সূতী ও পশমের বস্ত্রাদি, মাটির পাত্র, ধাতুনির্মিত জিনিসপত্র, কাঠের নানাপ্রকার আসবাবপত্র প্রস্তুত করা হইত। নৌ-চালনা, গৃহনির্মাণ, কৃষির জন্য সেচ-ব্যবস্থা প্রভৃতি সে-যুগে জানা ছিল। বিদেশের সহিত বৈদিক আর্যদের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল এরূপ মনে করা ভুল হইবে না। বৈদিক আর্যগণ সামুদ্রিক বাণিজ্যেও অংশগ্রহণ করিত।* বৈদিক যুগে 'মনা' নামে একপ্রকার মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। সেই সময়ে ব্যাবিলনে 'মানা' নামে একপ্রকার মুদ্রার প্রচলন ছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৈদিক যুগের 'মনা' ব্যাবিলনের 'মানা' এবং ল্যাটিন 'মিনা'র অনুকরণ বলা যাইতে পারে। এইরূপ সামঞ্জস্য হইতে বহির্জগতের সহিত বৈদিক আর্যদের যোগাযোগ ছিল একথা অনুমিত হইয়া থাকে। 'মনা' ভিন্ন 'নিষ্ক' নামক অপর একপ্রকার মুদ্রা এবং গরু বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। বলি, শুল্ক ও ভাগ—এই তিন প্রকারের রাজস্ব সে-যুগে আদায় করা হইত।

কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্য

শিল্প : বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, গৃহনির্মাণ-শিল্প, ধাতুশিল্প প্রভৃতি

'মনা', 'নিষ্ক' ও গরু বিনিময়ের মাধ্যম

রাজস্ব : বলি, শুল্ক ও ভাগ

আর্যদের আহার্য ও পোশাক-পরিচ্ছদ হইতে তাহাদের উন্নত অর্থনৈতিক জীবনের ধারণা লাভ করা যাইতে পারে। যব, গম প্রভৃতি ছিল সে-যুগের প্রধান খাদ্যশস্য। ইহা ভিন্ন মাছ, মাংস, শাকসবজি প্রভৃতিও তাহারা খাইত। অনুষ্ঠান ও যাগ-যজ্ঞাদির সময় তাহারা সোমরস ও সুরা নামক মাদক পানীয় ব্যবহার করিত। গরুর দুধ ও দুধ হইতে প্রস্তুত নানাপ্রকার খাদ্য, পিষ্টক প্রভৃতি তাহাদের অত্যন্ত প্রিয় খাদ্য ছিল।

আর্যদের আহার্য—যব, গম, মাছ, মাংস, শাকসবজি ; পানীয়—সোমরস ও সুরা

পোশাক-পরিচ্ছদের দিক্ দিয়া আর্যদের কোন আড়ম্বর ছিল না। দেহের উপরাংশের জন্য 'উত্তরীয়' ব্যবহৃত হইত। নিম্নাংশের জন্য 'নিবি'—অর্থাৎ কৌপীনের মত একখণ্ড বস্ত্র ব্যবহৃত হইত। ইহাকে 'অন্তর্বাস' বলা হইত। 'নিবি'র উপরে 'বাস' বা 'পরিধান'—অর্থাৎ একখানা বস্ত্র ব্যবহার করা হইত। ইহাকে 'বহির্বাস'ও বলা হইত। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে অলংকার ব্যবহারের রীতি ছিল। অবশ্য কোন কোন প্রকার অলংকার কেবল আর্যনারীগণই ব্যবহার করিতেন।

পোশাক-পরিচ্ছদ ও অলংকারাদি

আর্যদের রাজনৈতিক জীবন: বৈদিক যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের আলোচনা হইতে একথা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, সে-যুগে

* Vide *The Vedic Age*, pp. 397, 461.

সামাজিক নিরাপত্তা, শান্তি ও শৃংখলা বজায় ছিল। সামাজিক নিরাপত্তা এবং শান্তি বজায় না থাকিলে ঐরূপ উন্নত ধরনের সামাজিক বা অর্থনৈতিক জীবন যে গড়িয়া উঠিত না, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। রাজনৈতিক ব্যবস্থার উপরই সমাজের শান্তি ও শৃংখলা নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, আর্যদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা সুদক্ষ ও সুশৃংখল ছিল।

সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা রাজনৈতিক দক্ষতার পরিচারক

আর্যগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল হিসাবে বিভিন্ন অংশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। এই সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসনকার্য প্রথমে দলপতির উপর ন্যস্ত ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা বসতি বিস্তারের ফলে দলপতিগণের প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি ক্রমে স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সমাজজীবনে শৃংখলা ও শান্তি বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে দলপতির আদেশ মানিয়া চলিবার প্রয়োজনীয়তাও সমাজের জনগণ উপলব্ধি করিয়াছিল। এইভাবে ক্রমে দলপতি 'রাজা' বা 'রাজন্' নামে পরিচিত হন। রাজা সমগ্র রাজ্যের শাসন ও সমাজ ব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন। আইনত তাঁহার ক্ষমতা ছিল অসীম, কিন্তু কার্যত তাঁহাকে 'সভা' ও 'সমিতি' নামে দুইটি পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে হইত। রাজ্যের বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধদের লইয়া 'সভা' গঠিত হইত। জনগণের পরিষদের নাম ছিল 'সমিতি'। রাজ্যশাসনে রাজা এই দুইটি পরিষদের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। রাজ্যকে 'জন' বা 'বিশ' বলা হইত এবং রাজাকে 'বিশপতি' বা 'রাজন্' নামে অভিহিত করা হইত। রাজ্যের ভিত্তি ছিল গ্রাম। সমগ্র রাজ্যটি কয়েকটি গ্রামে বিভক্ত ছিল। গ্রামের শাসনকার্যাদি পরিচালনার ভার ছিল 'গ্রামণী'র উপর। রাজকর্মচারীদের মধ্যে 'পুরোহিত', 'সেনানী' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজার সেনা-বাহিনীতে অশ্বারোহী, রথারোহী ও পদাতিক সৈন্য ছিল। তরবারি, কুঠার, তীর-ধনুক, বর্শা প্রভৃতি ছিল সে-যুগের যুদ্ধাস্ত্র।

রাজপদের উৎপত্তি

'রাজন্'—'সভা' ও 'সমিতি'

বিশ

গ্রাম—'গ্রামণী'

রাজকর্মচারিগণ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহাদি লাগিয়াই থাকিত। ফলে দুর্বল রাজ্যগুলি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী রাজ্যগুলি কর্তৃক অধিকৃত হইতে থাকে। এইভাবে বৈদিক যুগের শেষভাগে বড় বড় রাজ্যের যেমন উদ্ভব ঘটিয়াছিল তেমনি রাজ-ক্ষমতাও স্বৈরাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। এই সকল রাজা দিগ্বিজয়ে সাফল্যলাভ করিয়া 'অশ্বমেধ', 'রাজসূয়', 'রাজপেয়' প্রভৃতি যজ্ঞের অনুষ্ঠানাদি করিতেন এবং 'সম্রাট্', 'একরাট্', 'রাজচক্রবর্তী' প্রভৃতি উপাধি ধারণ করিয়া নিজ নিজ বর্ধিত ক্ষমতার পরিচয় দিতেন।

'সম্রাট্', 'একরাট্', 'রাজচক্রবর্তী'

বৈদিক যুগের শেষভাগকেই রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বলা হয়। বস্তুত, রামায়ণ-মহাভারতের যুগ বলিয়া কোন পৃথক যুগের উল্লেখ করিবার কোন যুক্তি নাই, কারণ রামায়ণ-মহাভারতের কাল বৈদিক যুগেরই অংশবিশেষ।

বৈদিক যুগের শেষভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম

(Jainism and Buddhism)

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া (Reaction against Brahmanism) : বৈদিক যুগের শেষভাগে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অত্যন্ত গতানুগতিক হইয়া পড়ে। কতকগুলি জটিল, সাধারণের নিকট দুর্বোধ্য ক্রিয়াকাণ্ড ও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেই ধর্মকর্ম সম্পন্ন হইল, এরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। আন্তরিক ভক্তি, সততা ও ধর্মপরায়ণতা অপেক্ষা বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান, হোম, মন্ত্রতন্ত্র প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করে। এই জটিল ক্রিয়াকাণ্ড সম্পাদনে সাধারণ লোক স্বভাবতই বিশেষজ্ঞদের সাহায্য গ্রহণ করিতে লাগিল। এই বিশেষজ্ঞগণ ছিলেন পুরোহিত শ্রেণী। এই সুযোগে পুরোহিত শ্রেণী সমাজের উপর এক প্রবল প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইয়াছিল। যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি, পুরোহিত শ্রেণীর প্রতি অচলা ভক্তি প্রভৃতি সেই যুগের ধর্মরীতি হিসাবে যেমন প্রচলিত হইল তেমনি নিম্ন শ্রেণীর লোকদের প্রতি ঘৃণা, অন্যায় আচরণ প্রভৃতিও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এরূপ আন্তরিকতাশূন্য জনকল্যাণের আদর্শচ্যুত ধর্মের প্রতি চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের মনে ক্রমেই বিরুদ্ধভাব জাগিতে লাগিল। সহজ, সরল এবং সাধারণের বোধগম্য ধর্ম-পন্থা উদ্ভাবন করিবার প্রয়োজন তখন অনুভূত হইতে লাগিল। উপনিষদের স্বাধীন চিন্তাধারার উপর নির্ভর করিয়া ধর্ম-বিষয়ে নূতন এবং স্বাধীনভাবে চিন্তা করা আরম্ভ হইল। ফলে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষে বহু ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটিল। ইঁহাদের মধ্যে জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীর এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক গৌতমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের জটিলতা

পুরোহিত শ্রেণীর প্রাধান্য

বৈদিক ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধভাব

জৈন ধর্ম : মহাবীর 'জিন' (Jainism : Mahavira) : মহাবীর 'জিন'-এর নামানুকরণেই তাঁহার প্রচারিত ধর্ম 'জৈন ধর্ম' বলিয়া পরিচিতি লাভ করিয়াছে। কিন্তু জৈন কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে মহাবীরের পূর্বে আরও তেইশ জন 'তীর্থঙ্কর'—অর্থাৎ মুক্তির পথ-নির্মাতা এই ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন। মহাবীর ছিলেন চতুর্বিংশ এবং শেষ তীর্থঙ্কর। জৈন ধর্মের মূল প্রবর্তক ছিলেন ত্রয়োবিংশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। মহাবীর জৈন ধর্মমতের কতক উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন এবং উহার বহুল প্রচার করিয়া গিয়াছিলেন। এজন্য সাধারণত তাঁহার নামানুকরণেই এই ধর্মমত 'জৈন ধর্ম' বলিয়া পরিচিত।

তীর্থঙ্করগণ

মহাবীর ছিলেন কুন্দপুর নামক স্থানের সিদ্ধার্থ নামে এক ক্ষত্রিয় দলপতির পুত্র। তাঁহার মাতার নাম ছিল ত্রিশলা। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং গৌতম বুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। মহাবীরের বাল্যজীবন সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। তবে জৈন কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে কতক

কতক তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। এই সকল কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে মহাবীর যশোদা নামে এক ক্ষত্রিয় রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত গৃহীর ন্যায় জীবন যাপন করেন।

মহাবীরের পরিচয়

তারপর—অর্থাৎ ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পরম সত্যের সন্ধানে তপস্যা শুরু করেন। গোঁসাল নামে জনৈক সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর এবং স্বাধীন-ভাবে আরও ছয় বৎসর—মোট বার বৎসর তপশ্চরণের পরও তিনি দিব্যজ্ঞান লাভে সমর্থ হইলেন না। একপ্রকার হতাশ হইয়াই তিনি ঋজুপালিকা নদীতীরে পুনরায় নূতনভাবে তপস্যায় রত হন। এইবার তাঁহার দিব্যজ্ঞান জন্মিল। এইভাবে দীর্ঘ বার বৎসর তপশ্চর্যা করিয়া ত্রয়োদশ বৎসরে দিব্যজ্ঞান লাভের পর তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ হয়। তিনি সর্বজ্ঞ হইয়া—অর্থাৎ কৈবল্য লাভ করিয়া তাঁহার ধর্মমত জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করিতে শুরু করেন। তিনি ইন্দ্রিয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া 'জিন'—অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় নামে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁহার প্রচারিত ধর্মমত, 'নিগ্রন্থ'—অর্থাৎ সংসারের যাবতীয় মায়া, মোহ, লোভ প্রভৃতি হইতে গ্রন্থিহীন (বন্ধনহীন)—নামে পরিচিত। সাধারণ্যে অবশ্য ইহা 'জিন' নামানুকরণে 'জৈন' ধর্ম নামেই পরিচিতি লাভ করিয়াছে। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসরকাল ধর্ম প্রচারের পর মহাবীর পাবাপুরীতে দেহরক্ষা করেন।*

গৃহত্যাগ ও তপশ্চরণ



মহাবীর

'কৈবল্য' লাভ: 'জিন' বা জিতেন্দ্রিয়

মহাবীর জিন-প্রবর্তিত ধর্ম 'নির্গ্রন্থ' বা জৈন ধর্ম নামে পরিচিত

মহাবীর জিন কোন নূতন ধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন না একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি পার্শ্বনাথ-প্রচারিত ধর্মমতের কতক পরিবর্তন করিয়া ব্যাপকভাবে উহার প্রচারের পথ করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। পার্শ্বনাথ-প্রবর্তিত ধর্মমতের মূল চারিটি সূত্র ছিল: সত্যবাদিতা, চুরি না করা, হিংসা না করা ও লোভ সম্বরণ করা। এই চারিটি সূত্রের সহিত ব্রহ্মচর্য পালন করিবার আরও একটি নূতন সূত্র মহাবীর যোগ করিয়াছিলেন।** মহাবীরের ধর্মনীতিতে

জৈন ধর্মের সার

* মহাবীরের দেহত্যাগের তারিখ সম্পর্কে মতানৈক্য রহিয়াছে। Vide *An Advanced History of India* (3rd edn., 1967), p. 80.

** "... he Parsvanath) enjoined on his disciples the four great vows of non-injury, truthfulness, abstention from stealing and non-attachment. To these Mahavira added the vow of *Brahmacharya* or continence." *Ibid.*, p. 81.

চরম অনাসক্তি পরিলক্ষিত হয়। তিনি পার্থিব কোন কিছুর প্রতি আসক্তি বা লোভ থাকা অনুচিত মনে করিতেন। এমন কি, পরিধানের বস্ত্রের জন্যও যাহাতে কোনপ্রকার আসক্তি জন্মিতে না পারে সেজন্য তিনি স্বয়ং দিগম্বর ছিলেন। তাঁহার শিষ্যগণও দিগম্বর ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর তিন শত বৎসর পর—অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে তাঁহার শিষ্যগণের অনেকে 'দিগম্বর' ধর্মরীতি ত্যাগ করিয়া 'শ্বেতাম্বর' নামে জৈন ধর্মেরই অপর এক শাখার সৃষ্টি করেন। অদ্যাপি জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে 'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' এই দুই সম্প্রদায় আছে। বলা বাহুল্য, 'দিগম্বর' সম্প্রদায় পরবর্তী কাল হইতেই বস্ত্রাদি পরিধান করিতে শুরু করিয়াছিল।

'দিগম্বর' ও 'শ্বেতাম্বর' সম্প্রদায়



পার্শ্বনাথ

আত্মার চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভই জৈন ধর্মের আদর্শ। জৈন ধর্মমতে 'নির্বাণলাভ'—অর্থাৎ পুনর্জন্ম হইতে আত্মার সম্পূর্ণ মুক্তিলাভের তিনটি পন্থা আছে—যথা, সৎ-জ্ঞান, সৎ-কর্ম ও সৎ-ব্যবহার। জৈন ধর্মমতে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। জৈনগণ বেদকে ভগবানের মুখ-নিঃসৃত বাণী বলিয়া মনে করে না। জাতিভেদও তাহারা মানে না। কর্মফল ও জন্মান্তরবাদে জৈনরা হিন্দুদের ন্যায়ই বিশ্বাসী। অহিংসা জৈন ধর্মের মূল ভিত্তি। অহিংসা নীতি প্রয়োগে জৈনগণ পাথর, ধাতু প্রভৃতির মধ্যেও প্রাণ আছে বলিয়া মনে করে। সৎ-কর্ম ও কঠোর তপশ্চর্যার মাধ্যমে আত্মার উন্নতিসাধন এবং ক্রমে পুনর্জন্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভই হইল জৈন ধর্মমতের উদ্দেশ্য। এই কারণে দেহকে যথাসম্ভব কঠোর শাসনে রাখা এবং কৃচ্ছ্রসাধনে কালাতিপাত করা একান্ত প্রয়োজন ছিল। সুতরাং প্রকৃতভাবে জৈন ধর্ম পালন করা গৃহীদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। একমাত্র সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের পক্ষেই এই কঠোর ধর্মরীতি পালন করা সম্ভব ছিল। পরবর্তী কালে অবশ্য জৈন ধর্ম অনেকটা বাস্তববাদী হইয়া উঠে। ফলে গৃহীদের পক্ষেও উহা পালন করা সম্ভব হয়। জৈন ধর্ম বলিতে বর্তমান কালে যাহা বুঝা যায় উহা মহাবীর জিন কর্তৃক প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে বহুলাংশে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এখন গণেশ, লক্ষ্মী প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীর উপাসনা জৈন ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের ন্যায় ভারতের বাহিরে প্রচারলাভ করে নাই।

জৈন ধর্মের আদর্শ—নির্বাণলাভ

জৈন ধর্মমতে অহিংস নীতির ব্যাপকতা

পরবর্তী কালে জৈন ধর্মের রূপান্তর

মহাবীরের ধর্মনীতিগুলি 'আগম' ও 'সূত্রজ্ঞান' বা 'সিদ্ধান্ত' নামে পরিচিত। তাঁহার মূল উপদেশাবলী চৌদ্দটি 'পূর্ব'—অর্থাৎ খণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। পাটলিপুত্র নগরে আহূত ধর্মসভায় জৈন ধর্ম বিষয়ে যে-সকল আলোচনা হইয়াছিল সেগুলি বারটি 'অঙ্গ'—অর্থাৎ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। পরবর্তী কালে (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে) গুজরাটে অপর একটি জৈন ধর্মসভার অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভা কর্তৃক জৈন ধর্ম-সাহিত্য অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র এই চারিটি ভাগে সংকলিত হইয়াছিল। জৈনধর্ম সম্পর্কে কাহিনী-কিংবদন্তী—যথা, 'পরিশিষ্ট পার্বণ', 'রাজাবলীকথে' প্রভৃতি জৈন ধর্ম-সাহিত্যের অংশ হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

জৈন ধর্ম-সাহিত্য: পূর্ব
পাটলিপুত্র নগরে ও গুজরাটে জৈন ধর্মসভা
অঙ্গ, উপাঙ্গ, মূল ও সূত্র
জৈন কাহিনী-কিংবদন্তী —পরিশিষ্ট পার্বণ, রাজাবলীকথে প্রভৃতি

বৌদ্ধ ধর্ম : গৌতম বুদ্ধ (Buddhism : Gautama Buddha) : বৈদিক ধর্মের জটিলতা ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান প্রিয়তার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে সহজ ও সরল ধর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য যে-সকল মনীষী সচেষ্ট হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মমত বৌদ্ধ ধর্ম নামে পরিচিত। নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তুর শাক্য জাতির নায়ক শুদ্ধোদন ছিলেন গৌতমের পিতা। তাঁহার মাতা ছিলেন মায়াদেবী। গৌতমের আদি নাম ছিল সিদ্ধার্থ। জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধার্থ মাতৃহীন হন। মাতৃস্বসা ও বিমাতা গৌতমী তাঁহাকে লালন-পালন করেন। এজন্য তাঁহার অপর নাম হয় গৌতম।

পরিচয়

বাল্যকাল হইতেই গৌতম ছিলেন ধর্মভাবাপন্ন। রাজপ্রাসাদের আবহাওয়ায় মানুষ হইলেও জীবের প্রতি দয়া, ধর্ম বিষয়ে চিন্তা প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হিসাবে বাল্যকাল হইতেই প্রকাশ পাইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই গৌতমের অন্তরের দয়া, জীবে প্রেম ও অহিংসার পরিচয় পাওয়া গেল। সেই সময়কার সামাজিক রীতি অনুসারে ষোল বৎসর বয়সেই গোপা বা যশোধরা বা বিম্বা প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিতা এক পরমা সুন্দরী রাজকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেওয়া হইল। ইহার পর কিছুকাল গৌতম গৃহী হিসাবেই কাটাইলেন। মানুষের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু প্রভৃতি তাঁহাকে ক্রমেই বিচলিত করিয়া তুলিল। কিভাবে মানুষকে এই দুঃখ-দুর্দশার হাত হইতে রক্ষা করা যায় সেই চিন্তাই তাঁহাকে পাইয়া বসিল। ২৯

বাল্যজীবন


গৌতম বুদ্ধ

বিবাহ

বৎসর বয়সে তাঁহার এক পুত্রসন্তান জাত হইল। পুত্রের নাম রাখা হইল রাহুল। কিন্তু পুত্র জন্মিবার সঙ্গে সঙ্গে গৌতম দেখিলেন যে, তিনি ক্রমেই সংসারের মায়ায় আবন্ধ হইয়া পড়িতেছেন। তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, রাজপ্রাসাদের ভোগবিলাস সবকিছু ত্যাগ করিয়া একদিন গভীর রাত্রিতে সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর জীবন গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বয়স তখন ২৯ বৎসর।

পুত্রসন্তান লাভ—রাহুল

গৃহত্যাগ

সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করিয়া গৌতম দিব্যজ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সাধু-সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। কঠোর তপস্যা, আত্মপীড়ন, কৃচ্ছ্রসাধন—সর্বপ্রকারের যোগসাধন করিয়া দেহকে অস্থিচর্মসার করিলেন, বহু তীর্থস্থান পর্যটন করিলেন। তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল না। অবশেষে তিনি উরুবিল্ব নামক স্থানে কঠোর তপস্যায় রত হইলেন। তাঁহার দেহ দুর্বল হইল, তাঁহার জীবনসংশয় দেখা দিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, কেবল কৃচ্ছ্রসাধন ও দেহপীড়নের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায় না ; দেহ যদি সুস্থ ও স্থির না থাকিল তাহা হইলে মানসিক একাগ্রতা আসিবে কোথা হইতে? সুতরাং তিনি নৈরঞ্জনা (বর্তমানে লীলাজান) নদীর জলে স্নান করিয়া বর্তমান বোধগয়ার এক বিশাল অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যানে বসিলেন। জনৈক ধনবান বণিকের কন্যা সুজাতা নিজ পুত্রসন্তান জাত হইয়াছে, সেই উপলক্ষে বনদেবতার পূজা দিতে গিয়া অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে গৌতমকে দেখিয়া তাঁহাকেই দেবতারূপে মিষ্টান্ন নিবেদন করিলেন। গৌতম সেই মিষ্টান্ন ভোজনের পর অনাহারক্লিষ্ট দেহে শক্তিলাভ করিলে তাঁহার ধ্যানের গভীরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। ঐ রাত্রিতেই তিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। এই দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি 'বুদ্ধ'—অর্থাৎ জ্ঞানী, 'তথাগত'—অর্থাৎ যিনি পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছেন—এই সকল বিভিন্ন নামে পরিচিত হন। যে অশ্বত্থ বৃক্ষের নিচে ধ্যান করিয়া তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহা 'বোধিদ্রুম' নামে এবং সেই স্থানটি 'বোধগয়া' বা 'বুদ্ধগয়া' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছে।

কঠোর তপস্যা

বোধগয়ায় তপস্যা

দিব্যজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভ

বুদ্ধত্ব লাভের পর গৌতম সারনাথের নিকট মৃগশিখাবনে তাঁহার সর্বপ্রথম বাণী প্রচার করেন। ইহার পর দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ধরিয়া বিহার ও অযোধ্যায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সমবায় ও একতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি বৌদ্ধ সংঘও স্থাপন করেন। আশী বৎসর বয়সে কুশীনগর নামক স্থানে গৌতম বুদ্ধ দেহত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুকাল সম্পর্কে যথেষ্ট মতানৈক্য রহিয়াছে।

বৌদ্ধ সংঘ স্থাপন

দেহত্যাগ

গৌতম বুদ্ধ-প্রবর্তিত ধর্ম কয়েকটি মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে মানুষের যাবতীয় দুঃখকষ্ট লোভ ও অজ্ঞতা হইতেই জন্মিয়া থাকে। অজ্ঞতা বা প্রকৃত জ্ঞানের অভাব এবং আসক্তি—অর্থাৎ পার্থিব সবকিছুর প্রতি লোভ হেতুই মানুষের আত্মার অবনতি ঘটে। এজন্য জন্ম-জন্মান্তরে

বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতি

তাহাকে জরা, ব্যাধি, দুঃখকষ্ট, মৃত্যু প্রভৃতি ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সৎ-কর্মের দ্বারা আত্মার উন্নতিসাধন করিতে পারিলে পুনর্জন্ম ও দুঃখকষ্ট ভোগ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। আত্মার এই চরম শান্তি বা মুক্তিকে তিনি 'নির্বাণ' আখ্যা দিয়াছিলেন।

গৌতম বুদ্ধের বাস্তববাদিতা

বুদ্ধদেব ছিলেন বাস্তববাদী ধর্মপ্রবর্তক। তাঁহার ধর্মমত সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর ধর্ম ছিল না। সংসারধর্মী জনসাধারণের জন্যই তিনি তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অত্যধিক কঠোর তপশ্চর্যার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার মতে অত্যধিক আত্মপীড়ন, তপশ্চরণ যেমন ধর্মপথে অগ্রসর হওয়ার বাধা সৃষ্টি করে তেমনি অত্যধিক ভোগবিলাসও আত্মার উন্নতির পথে বাধাদান করে। সুতরাং মধ্য-পথ* অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। এই কারণে বুদ্ধদেব নির্বাণলাভের একটি মধ্য-পন্থার নির্দেশ দিয়াছেন। এই মধ্য-পন্থা অনুসরণের আটটি রীতি তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' নামে পরিচিত। এইগুলি হইল সৎ-চিন্তা, সৎ-বাক্য, সৎ-দৃষ্টি, সৎ-শ্রম, সৎ-মনোবৃত্তি, সৎ-ব্যবহার, সৎ-জীবন ও সৎ-আদর্শ। এই 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' অনুসরণ করিলেই মানুষ আত্মার উন্নতিসাধন করিতে সমর্থ হইবে এবং ক্রমে চরম শান্তি বা নির্বাণ লাভ করিতে পারিবে। 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' ভিন্ন বুদ্ধদেব আরও কতকগুলি নীতি মানিয়া চলিবার উপদেশ দিয়াছেন।

মধ্য-পথ : অষ্টাঙ্গিক মার্গ

অপরাপর নীতি

এই সকল নীতি হইল : অহিংসা, সত্যবাদিতা, ব্রহ্মচর্য, অনাসক্তি, ঐশ্বর্য ত্যাগ, চুরি না করা, পরনিন্দা হইতে বিরত থাকা, অর্থলিপ্সা ত্যাগ করা ও পশুবলি না দেওয়া। বৌদ্ধ ধর্মে জাতিভেদ, বেদের অপৌরুষেয়তা বা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকৃত নহে। বুদ্ধদেব-স্থাপিত 'সংঘ'—অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের লইয়া গঠিত একটি সংগঠন ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গে পরিণত হয়। 'ত্রিপিটক' অর্থাৎ 'সূত্র-পিটক', 'বিনয়-পিটক' ও 'অভিধর্ম-পিটক' এই তিনটি অংশে বুদ্ধদেবের বাণী, উপদেশাবলী ও বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পালনীয় নিয়মাবলী এবং বৌদ্ধ দর্শন প্রভৃতি লিপিবদ্ধ হয়। বুদ্ধদেবের পূর্বজন্মের কাহিনীগুলি 'জাতক' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম-সাহিত্য ; ত্রিপিটক : সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম ; জাতক

চারিটি বৌদ্ধসভা বা বৌদ্ধ সঙ্গীতির অনুষ্ঠান

বৌদ্ধ ধর্মে কোনপ্রকার মতভেদ দেখা দিলে তাহা দূরীকরণের জন্য কয়েকবার বৌদ্ধসভা বা বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহূত হইয়াছিল। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে রাজগৃহে মহাকাশ্যপ সর্বপ্রথম সঙ্গীতি আহ্বান করিয়াছিলেন। ইহার প্রায় একশত বৎসর পর বৈশালী নগরীতে দ্বিতীয়, সম্রাট্ অশোক কর্তৃক পাটলিপুত্র নগরে তৃতীয় এবং কুষাণরাজ

* 'মধ্য-পথ' (Middle Path)—'মধ্যম পথ' (Middling Path) নহে। উত্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনের মধ্যে মধ্যম যেমন ভাল-মন্দের মাঝামাঝি, সেই অর্থে গৌতম বুদ্ধের ধর্মমতকে মধ্য-পথ বা মধ্য-পন্থা বলা হয় না। কোন কিছুরই বাড়াবাড়ি না করিয়া ধর্ম-বিষয়ে মাঝামাঝি পথে চলাই তিনি শ্রেষ্ঠ পথ বলিয়া মনে করিতেন। ইহা 'মধ্য-পথ' বা 'মধ্য-পন্থা'।

কণিষ্কের রাজত্বকালে কাশ্মীরে (মতান্তরে জলন্ধরে) চতুর্থ ও সর্বশেষ বৌদ্ধসভা আহূত হইয়াছিল।

ভারত-ইতিহাসে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব (Importance of Jainism and Buddhism in Indian History): জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মে সামাজিক জীবনে সরলতার আদর্শ প্রচারিত হইয়াছিল। জাতিভেদশূন্য সমাজ-ব্যবস্থা, ক্ষমা, মৈত্রী ও করুণার আদর্শে ব্যক্তিগত জীবন ও সমাজ-জীবন গড়িয়া তোলা প্রভৃতি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য। ভারতীয় সমাজ-জীবনের উপর প্রভাব বিস্তারে জৈন ধর্ম অপেক্ষা বৌদ্ধ ধর্মের গুরুত্ব অনেক বেশী, সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব বৌদ্ধ সঙ্ঘ স্থাপন করিয়া জাতিভেদজনিত সংকীর্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, প্রসেনজিৎ প্রভৃতি রাজা; অনাথপিণ্ডদ, সারিপুত্ত, মোগ্গলান প্রভৃতির ন্যায় ধনবান বণিক; আনন্দ, উপালি প্রভৃতির ন্যায় সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোক—সকলেই বুদ্ধের চক্ষে সমান ছিলেন।

ক্ষমা, করুণা ও মৈত্রী—ভারতের জীবনাদর্শ

এই পরম ভ্রাতৃত্ব, জাতিবৈষম্যহীন ঐক্যবোধ, ক্ষমা, করুণা, মৈত্রী প্রভৃতি মানবিকতার নীতিজ্ঞান প্রচার করিয়া গৌতম বুদ্ধ ভারতবাসীর জীবনাদর্শকে প্রভাবিত করিয়া গিয়াছেন। এই নীতি যুগ-যুগান্ত ধরিয়া ভারতবাসী অনুসরণ করিয়া আসিতেছে। গৌতম বুদ্ধ ও সম্রাট্ অশোক হইতে আরম্ভ করিয়া মহাত্মা গান্ধী এবং বর্তমান ভারতের মূল নীতি হইল ক্ষমা, করুণা ও মৈত্রী। ভারতের ইতিহাসে গৌতম বুদ্ধের বাণীর গুরুত্ব অত্যধিক, ইহা অনস্বীকার্য।

পঞ্চম অধ্যায়

(১) বৈদেশিক আক্রমণ
(Foreign Invasions)

ভারতের বিশাল ভূখণ্ডকে একটি মহাদেশ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সুবৃহৎ দেশের উর্বরতা ও প্রাকৃতিক সম্পদ অতি প্রাচীন কালে যেমন আর্য জাতিকে

বৈদেশিক আক্রমণের কারণ

আকৃষ্ট করিয়াছিল তেমনি পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময়ে বহু বিদেশী আক্রমণকারী ও লুণ্ঠনকারীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। এই সকল আক্রমণকারীর অনেকে এ-দেশকেই স্থায়ী বাসভূমি হিসাবে গ্রহণ করিয়া ভারতের বিশাল মানবসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছিল, আবার অনেকে এ-দেশকে শোষণ করিয়া, লুণ্ঠন করিয়া ফিরিয়া গিয়াছিল।

পারসীক আক্রমণ (Persian Invasion): খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মগধ রাজ্য যখন সাম্রাজ্যের পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন ভারতের উত্তর-পশ্চিম

অঞ্চল ছিল রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ঐক্যহীন। উত্তর-পশ্চিম ভারত তখন 'উত্তরাপথ' নামে অভিহিত হইত। উত্তরাপথের রাজ্যগুলির মধ্যে গান্ধার, কাম্বোজ ও মদ্র ছিল অন্যতম প্রধান। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস, টেসিয়াস্ প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় ভাগে পারস্য সম্রাট্ সাইরাস্ (খ্রীঃ পূঃ ৫৫৮-৫৩০) গান্ধার রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। গান্ধার রাজ্য জয় করিবার কালে জনৈক ভারতীয় সৈনিকের অস্ত্রাঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত সাইরাসের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া টেসিয়াস্ উল্লেখ করিয়াছেন। রোমান ঐতিহাসিক প্লিনির রচনায় সাইরাস্ কর্তৃক গান্ধার রাজ্য জয়ের কথার উল্লেখ রহিয়াছে। কিন্তু নিয়ারকাস্ প্রভৃতির রচনা হইতে জানা যায় সাইরাসের ভারত আক্রমণ বিফল হইয়াছিল। যাহা হউক, সাইরাসের পৌত্র দরায়াসের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে অধিকতর নির্ভরযোগ্য তথ্যাদি পাওয়া যায়। তাঁহার আমলে (খ্রীঃ পূঃ ৫২২-৪৮৬) গান্ধার ও সিন্ধু-উপত্যকা পারসীক সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের এই অংশকে পারসীক সাম্রাজ্যের বিংশতিতম প্রদেশে পরিণত করা হইয়াছিল। সমগ্র পারসীক সাম্রাজ্যের মোট রাজস্বের এক-তৃতীয়াংশ পারসীক সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতীয় দেশগুলি হইতে আদায় হইত। দরায়াসের পুত্র জারেক্সিসের আমলে পারসীক সাম্রাজ্য ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। পরবর্তী পারসীক সম্রাট্ তৃতীয় দরায়াস্ আলেকজাণ্ডারের হস্তে পরাজিত হইলে (খ্রীঃ পূঃ ৩৩০) ভারতে পারসীক আধিপত্য লোপ পাইয়াছিল।

সাইরাস্

দরায়াস্

জারেক্সিস্

তৃতীয় দরায়াস্: পারসীক অধিকারের অবসান

গ্রীক আক্রমণ (Greek Invasion): আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ: পারসীক আক্রমণের পরবর্তী বৈদেশিক আক্রমণ গ্রীসের ম্যাসিডন রাজ্যের রাজা আলেকজাণ্ডারের নেতৃত্বে ঘটিয়াছিল। পারস্য সম্রাট্গণ কয়েক শতাব্দী পূর্বে একবার গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার পারস্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। পর পর কয়েকটি যুদ্ধে তৃতীয় দরায়াস্‌কে চূড়ান্তভাবে পরাজিত করিয়া (খ্রীঃ পূঃ ৩৩০) আলেকজাণ্ডার সমগ্র পারস্য সাম্রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত করিলেন। অতঃপর তিনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সেই সময়ে (খ্রীঃ পূঃ ৩২৭) বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে রাজতান্ত্রিক ও প্রজাতান্ত্রিক উভয় প্রকার রাজ্যই ছিল। পুরু বা পৌরব, তক্ষশিলা, অভিসার, ক্ষুদ্রক, অস্মক, গান্ধার, সৌভূতি প্রভৃতি কয়েকটি রাজ্যের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

আলেকজাণ্ডারের পারস্য জয়

উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য

গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন তখন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন উত্তর-পশ্চিম ভারত তাঁহাকে স্বভাবতই প্রতিহত করিতে সমর্থ হইল না।

পরস্পর বিবদমান রাজ্যগুলির রাজগণ দেশরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হওয়া দূরের কথা, পূর্বাহ্নেই আক্রমণকারীর আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইয়া আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হইলেন।

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ

তক্ষশিলার রাজা অম্ভি আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করিয়া উপঢৌকন প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। পুরু রাজ্যের (বা পৌরব রাজ্যের) রাজা পুরুর সহিত অম্ভির শত্রুতা ছিল। পুরুকে তিনি কোনপ্রকারেই পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই। বিদেশী আক্রমণকারীর বশ্যতা স্বীকার করিয়া এবং তাঁহাকে সাহায্যদান করিয়া অম্ভি পুরুরাজের সর্বনাশসাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু

তক্ষশিলারাজ অম্ভি কর্তৃক বশ্যতা স্বীকার

স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক রাজা পুরু পরাধীনতা অপেক্ষা দেশ-রক্ষার্থে যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করা শতগুণে শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি ঝিলামের তীরে এককভাবে বিদেশী আক্রমণকারীর গতিরোধ

বীর রাজা পুরু

করিবার উদ্দেশ্যে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। সম্মুখ সমরে পুরুকে পরাজিত করা সহজ হইবে না মনে করিয়া আলেকজাণ্ডার ঝিলাম নদীর [গ্রীক নাম 'হাইডাস্‌পিস্‌' (Hydaspes)] অপর তীরে শিবির স্থাপন করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তারপর এক অন্ধকার রাত্রিতে গোপনে ঝিলাম নদীর গতিপথ ধরিয়া

হাইডাস্‌পিস্‌ বা ঝিলামের যুদ্ধ

সাতাশ কিলোমিটার (সতের মাইল) দূরে এক স্থানে উহা অতিক্রম করিয়া অতর্কিতে পুরুর শিবিরের দিকে অগ্রসর হইলেন।* পরে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছিল বুকিফালা। অতর্কিত আক্রমণ এবং পূর্ব-রাত্রের বারিপাতে কর্দমাক্ত যুদ্ধক্ষেত্রে পুরুর অশ্বারোহী তীরন্দাজগণ এবং তাঁহার যুদ্ধরথগুলি আশানুরূপ যুদ্ধ করিতে পারিল না। ফলে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। পুরু শরীরের নয়টি স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন। এমতাবস্থায় তাঁহাকে বন্দী করা সম্ভব হইল। আলেকজাণ্ডার পুরুকে কিরূপ-ব্যবহার প্রত্যাশা করেন প্রশ্ন করিলে বীর পুরু রাজোচিত সম্মান দাবি করিলেন। আলেকজাণ্ডার পুরুর বীরত্ব ও স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয়

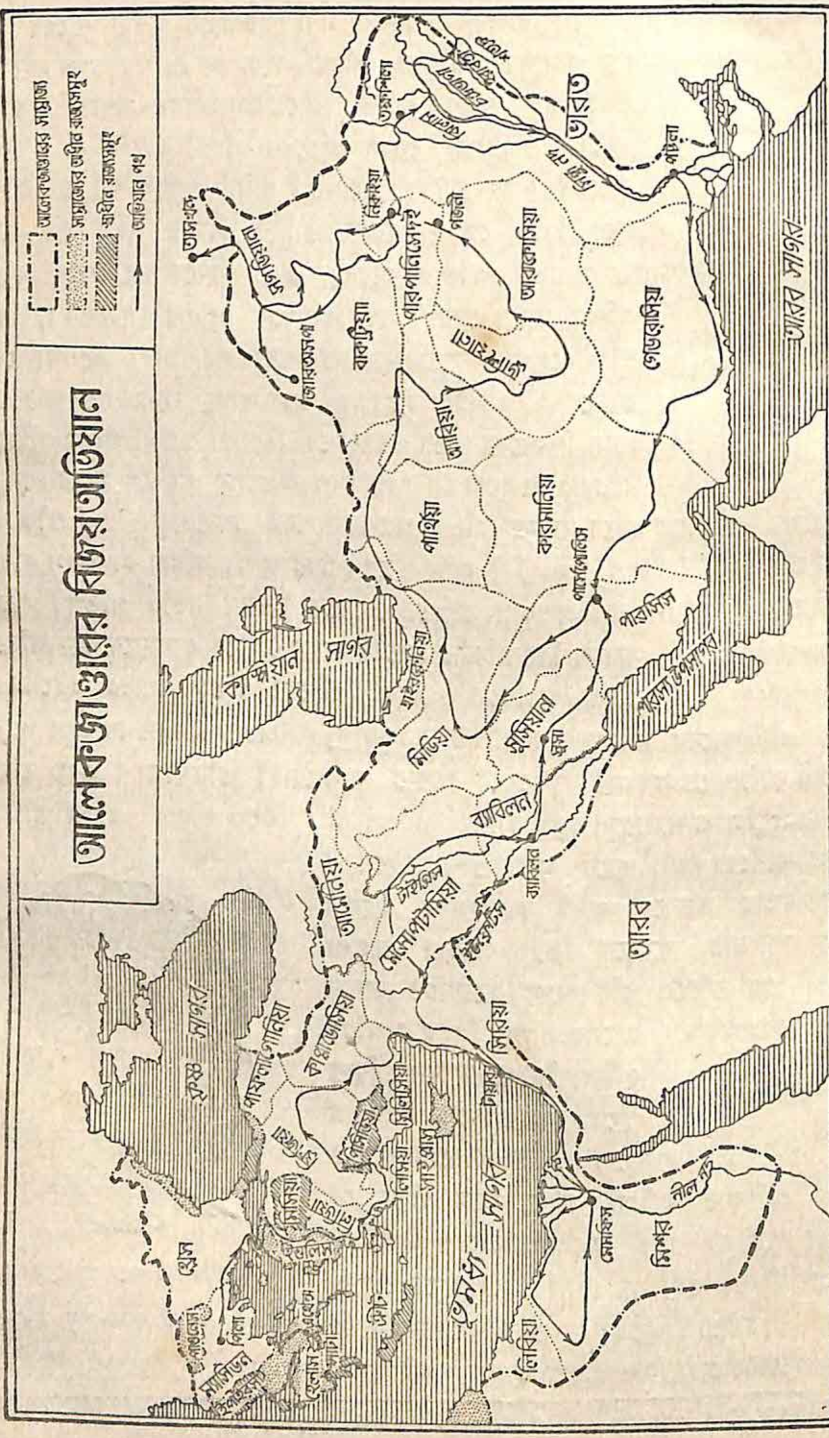
পুরু-আলেকজাণ্ডারের মৈত্রী

পূর্বেই পাইয়াছিলেন। একবার যুদ্ধে পরাজিত করিলেও পুরুর রাজ্য অধিকার করিয়া রাখা সহজ হইবে না একথা দূরদর্শী বীর আলেকজাণ্ডারের উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইল না। তিনি পুরুকে তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন। তদুপরি পার্শ্ববর্তী অপরাপর রাজ্য যাহা তিনি জয় করিয়াছিলেন সেগুলিও পুরুর রাজ্যভুক্ত করিয়া দিলেন।



গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার

* Vide V. A. Smith : *Early History of India*, pp, 68-69, 82-89.


আলেকজান্ডারের বিজয়অভিযান
আলেকজান্ডারের সাম্রাজ্য
সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যসমূহ
স্বাধীন রাজ্যসমূহ
অভিযান পথ
কাস্পিয়ান সাগর
আরব সাগর
ভারত
আরব
মিশর
নীল নদ
ব্যাবিলন
পারসিস
মিডিয়া
পার্থিয়া
ব্যাকট্রিয়া
গেড্রোসিয়া
আরাকোসিয়া
কারমানিয়া
সিরিয়া
মেসোপটামিয়া
আর্মেনিয়া
কাপাডোসিয়া
কৃষ্ণ সাগর
গ্রীস
সুসা
পারসিয়ান উপসাগর

পুরুর সহিত যুদ্ধের পর আলেকজাণ্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তাঁহার সেনাবাহিনী আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। পুরুর সহিত যুদ্ধে ভারতীয়দের সামরিক দক্ষতার যে পরিচয় গ্রীকগণ পাইয়াছিল এবং মগধের সামরিক শক্তির যে সংবাদ তাহাদের নিকট পেঁাছিয়াছিল তাহার ফলেই গ্রীকগণ আর অগ্রসর হইতে রাজী হয় নাই। বস্তুত, পুরুর সহিত যুদ্ধের পূর্বে ভারতীয় সৈন্যদের যুদ্ধ-ক্ষমতার প্রকৃত পরিচয় গ্রীকগণ পায় নাই। বাধ্য হইয়াই আলেকজাণ্ডার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি স্বয়ং একদল সৈন্যকে স্থলপথে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়া লইয়া গেলেন। অপর একদলকে জলপথে প্রেরণ করিলেন। ফিরিবার পথে আলেকজাণ্ডার মালব, ক্ষুদ্রক, অর্জুনায়ন, শিবি প্রভৃতি প্রজাতান্ত্রিক দলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ব্যাবিলনে পেঁাছিবার পর আলেকজাণ্ডার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। এই অসুস্থতার ফলে ব্যাবিলন নগরে তাঁহার মৃত্যু হইল (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩)। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে ভাগ হইয়া যায়। সেনাপতি সেলুকাসের অংশে সীরিয়া এবং ভারতবর্ষের বিজিত অঞ্চল পড়িয়াছিল। সেলুকাস ভারত আক্রমণ করিতে আসিয়া শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন।

আলেকজাণ্ডারের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

তাঁহার মৃত্যু (খ্রীঃ পূঃ ৩২৩)

ম্যাসিডনের রাজা ভিন্ন ব্যাক্‌ট্রীয় বা বাহ্লিক দেশের গ্রীকগণও ভারত আক্রমণ করিয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে ব্যাক্‌ট্রীয় বা বাহ্লিক দেশের গ্রীকগণ, পার্থিয়া বা পহ্‌লব দেশের পহ্‌লবগণ, শকস্তান হইতে আগত শকগণ এবং সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া অঞ্চল হইতে কুষাণগণ পর পর ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। এই সকল বৈদেশিক জাতির মধ্যে কুষাণগণই ছিল সর্বাধিক ক্ষমতাশালী।

বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির আক্রমণ

ব্যাকৃট্রীয় বা বাহ্লিক গ্রীকগণ কর্তৃক ভারত আক্রমণ (Invasion of India by the Bactrian Greeks): ব্যাক্‌ট্রীয়—অর্থাৎ বাহ্লিক দেশ ও পার্থিয়া বা খোরাসান সেলুকাসের উত্তরাধিকারীদের আমলে সীরিয়ার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়া যায়। সীরিয়ার রাজা তৃতীয় এ্যাণ্টিয়োকোস বহু চেষ্টা করিয়াও এই দুই অঞ্চল পুনরায় নিজ অধিকারে আনিতে অকৃতকার্য হন। বাহ্লিক গ্রীক রাজা প্রথম ডায়োডটাসের অধীনে ব্যাক্‌ট্রীয়া সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল। এই বংশেরই রাজা ডেমেট্রিয়স্ (Demetrios) আফগানিস্তানের একাংশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু-উপত্যকা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডেমেট্রিয়স্ যখন ভারতবর্ষে রাজ্য জয়ে ব্যস্ত সেই সময়ে ইউক্রেটাইডিস্ (Eukratides) ব্যাক্‌ট্রীয়ার সিংহাসন অধিকার করেন। ডেমেট্রিয়সের মৃত্যুর পর ইউক্রেটাইডিস্ সিন্ধু, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চল নিজ অধিকারভুক্ত করেন। অল্পকাল পরে ব্যাক্‌ট্রীয়া পার্থিয়ান বা পহ্‌লব নামে এক যাযাবর জাতি কর্তৃক অধিকৃত হইলে ব্যাক্‌ট্রীয়ার গ্রীকগণ কেবল ভারতবর্ষে তাঁহাদের বিজিত রাজ্যাংশের উপর রাজত্ব করিতে থাকেন। ঐ সময় হইতে তাঁহারা

ডেমেট্রিয়স্

ইউক্রেটাইডিস্

সম্পূর্ণ ভারতীয় রাজায় পরিণত হন। ব্যাক্‌ট্রীয় গ্রীক রাজগণের মধ্যে মিনাণ্ডার ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৌদ্ধ ধর্মাচার্য নাগসেনের নিকট মিনাণ্ডার বা মিলিন্দ বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিনাণ্ডার পাঞ্জাবের সাকল—অর্থাৎ শিয়ালকোট নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

মিনাণ্ডার

শক-পহ্‌লব ও কুষাণ আক্রমণ (Scythian, i.e. Saka-Parthian and Kushan Invasions): উত্তর ভারতে গ্রীকগণ কর্তৃক স্থাপিত রাজ্য পরবর্তী কালে শক-পহ্‌লব ও কুষাণ জাতির আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়। মধ্য-এশিয়ার যাযাবর শক জাতি ঈউ-চি নামে অপর এক জাতি কর্তৃক মধ্য-এশিয়া হইতে বিতাড়িত হয়। তাহারা খ্রীষ্টের জন্মের আনুমানিক একশত বৎসর পূর্বে কাবুল নদীর উপত্যকায় আসিয়া উপস্থিত হয়। শক জাতি কর্তৃক অধিকৃত স্থানসমূহ শকস্তান (বর্তমানে শিস্তান) নামে পরিচিতি লাভ করে। কালক্রমে শকগণ সিন্ধু-উপত্যকা ও পশ্চিম ভারতে অধিকার স্থাপনে সমর্থ হয়। ভারতের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম অংশের শকদের মধ্যে প্রথম পরাক্রমশালী রাজা হিসাবে মোয়েস্‌ বা মোগের নাম পাওয়া যায়। তিনি পশ্চিম ভারতে এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়াছিলেন। পুষ্করাবতী, তক্ষশিলা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিয়া মোগ রাজাধিরাজ উপাধি ধারণপূর্বক রাজত্ব করেন। তাঁহার পরবর্তী রাজগণ ছিলেন অয় বা অজেস্‌, অজিলিস্‌ ও দ্বিতীয় অয়।

শক আক্রমণ : ময়েস্‌ বা মোগ, অয়, অজিলিস্‌

পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের শকরাজগণ ক্ষহরত ও কার্দমক এই দুই শাখায় বিভক্ত ছিলেন। ক্ষহরত শাখার শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন নহপান। কার্দমক শাখার শকরাজগণ উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে চস্টন ও রুদ্রদামন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রুদ্রদামন ছিলেন তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ রাজা।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে পহ্‌লবগণ হিরাট, কান্দাহার প্রভৃতি অঞ্চলে বসতি বিস্তার করে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে পহ্‌লবগণ গান্ধারের একাংশ শক অধিকার হইতে জয় করিয়া লইয়াছিল। ক্রমে পহ্‌লবগণ উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাব অঞ্চলে অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। পহ্‌লবরাজগণের মধ্যে গণ্ডোফার্নিস্‌ (Gondophernes) ছিলেন সর্বাধিক পরাক্রমশালী। তাঁহারই আমলে খ্রীষ্ট ধর্মযাজক সেণ্ট্‌ টমাস (St. Thomas) তাঁহার রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কুষাণ বংশের হস্তে পহ্‌লব শাসনের অবসান ঘটে।

পহ্‌লব আক্রমণ : গণ্ডোফার্নিস্‌

চীনের উত্তর-পশ্চিম অংশে প্রাচীন কালে ঈউ-চি (Yue-chi) নামক এক যাযাবর জাতি বাস করিত। হিউং-নু নামে অপর এক জাতির লোক তাহাদিগকে সেই অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করে (খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক)। ঈউ-চি জাতি নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া, শেষ পর্যন্ত সিরদরিয়া নদীর এবং পরে অক্ষু নদীর (আমুদরিয়া) অববাহিকা অঞ্চলে আসিয়া বসতি বিস্তার করে।

কুষাণ আক্রমণ

এখানে বসবাসকালে তাহারা পাঁচটি অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল শাখার মধ্যে কুষাণগণই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং তাহারা ঈউ-চি জাতির পাঁচটি শাখাকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হয়।

কুষাণরাজগণ : কুজলকারা কদ্‌ফিসিস্ (প্রথম)

কুষাণ শাখার মধ্যে সর্বপ্রথম পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন কুজলকারা কদ্‌ফিসিস্ (প্রথম)। ইনি প্রথম কদ্‌ফিসিস্ নামেই সমধিক পরিচিত। প্রথম কদ্‌ফিসিস্ পারস্যের সীমা হইতে সিন্ধু-উপত্যকা পর্যন্ত কুষাণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

পরবর্তী রাজা দ্বিতীয় বা বীম কদ্‌ফিসিসের আমলে কুষাণ রাজ্য গান্ধার অঞ্চল হইতে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। মালব ও পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপগণ দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিস্‌কে তাঁহাদের অধিরাজ হিসাবে স্বীকার করিয়াছিলেন।

কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন কণিষ্ক। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণকাল এবং দ্বিতীয় কদ্‌ফিসিসের সহিত তাঁহার সম্পর্ক কি ছিল সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। যাহা হউক, কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠত্ব এবং ভারত-ইতিহাসে কুষাণ বংশের গুরুত্ব একমাত্র কণিষ্কের কৃতিত্বের ফলেই অর্জিত হইয়াছিল।

কণিষ্ক

কণিষ্ক কুষাণ সাম্রাজ্যের পরিধি বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছিলেন। তাঁহার সাম্রাজ্য খোটান ও খোরাসান হইতে আরম্ভ করিয়া বিহার ও কোঙ্কণ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। তিনি চীনের সেনাধ্যক্ষ প্যান চাওকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। কাবুল, পাঞ্জাব, বর্তমান উত্তরপ্রদেশ, মালব, রাজপুতানা, কাথিয়াবাড় প্রভৃতি তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল পুরুষপুর অর্থাৎ পেশোয়ার।

কণিষ্ক নিজে একটি অব্দের প্রচলন করিয়াছিলেন। ইহা শকাব্দ নামে পরিচিত। ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে যে অব্দ গণনা করা হইয়া থাকে উহাই কণিষ্ক প্রচলন করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

মহাযান ও হীনযান ধর্মমত : বৌদ্ধ সঙ্গীতি

তাঁহার আমলে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা হীনযান ও মহাযান এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। হীনযান ধর্মমত অনুসারে বুদ্ধের কোন মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। মহাযান ধর্মমতে বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ করিয়া উপাসনা করা হইত। কণিষ্ক নিজে মহাযান ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার আমলে কাশ্মীরে (কাহারও কাহারও মতে জলন্ধর বা গান্ধারে) এক বৌদ্ধ সঙ্গীতি বা ধর্ম-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বসুমিত্র উহার সভাপতি এবং অশ্বঘোষ উহার সহ-সভাপতি ছিলেন।

শিল্প-সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা : গান্ধার শিল্প

শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতার জন্য কণিষ্ক ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছেন। বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, নাগার্জুন প্রভৃতি বৌদ্ধ গ্রন্থ-রচয়িতা, আয়ুর্বেদশাস্ত্র বিশারদ চরক প্রভৃতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। গান্ধার তখন গ্রীক-রোমান-বৌদ্ধ শিল্পরীতির সংমিশ্রণে এক অতি উচ্চমানের ভাস্কর্য ও শিল্পরীতির কেন্দ্রে

পরিণত হইয়াছিল। সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্য রীতির উৎকর্ষও সেই সময়ে মথুরা ও অমরাবতী অঞ্চলে পরিলক্ষিত হয়।

এই সকল কৃতিত্বের জন্য কণিষ্ক কেবলমাত্র কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা বলিয়াই নহে, ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকেন। বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, জনস্বার্থে শাসন পরিচালনা প্রভৃতির জন্য তাঁহাকে ভারতের 'দ্বিতীয় অশোক' বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে।

কুষাণ শ্রেষ্ঠ

হূণ আক্রমণ (Huna Invasion): খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে উত্তর-পশ্চিম চীনের ঈউ-চি জাতিকে বিতাড়িত করিয়া হূণগণ পশ্চিম অভিমুখে অগ্রসর হয় এবং তাহাদের এক শাখা ইওরোপে ও অপর শাখা অক্ষু নদীর অববাহিকা অঞ্চলে বসবাস করিতে থাকে। হূণদের এই শাখাই গুপ্ত বংশের রাজা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দগুপ্ত এই আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। কিন্তু খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের শেষভাগে হূণ নেতা তোরমান ও মিহিরগুল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাংশ জয় করিয়া প্রায় মালব পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুপ্ত সম্রাট্ ভানুগুপ্ত তাঁহাদের এই অগ্রগতি প্রতিহত করিতে সমর্থ হন। গুপ্ত সম্রাট্ বলাদিত্য মধ্যভারত হইতে হূণ আধিপত্যের অবসান ঘটান। মিহিরগুল পুনরায় বিজয় অভিযানে অগ্রসর হইলে মালবরাজ যশোধর্মন তাঁহাকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। তথাপি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম ভারত ও মালবের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হূণ দল তাহাদের নেতাদের অধীনে স্বাধীনভাবে বসবাস করিত বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যায়।

হূণ নেতা তোরমান ও মিহিরগুলের ভারত আক্রমণ

(২) ভারত কর্তৃক বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার ধরণ
(Nature of Resistance to Foreign Invasions)

বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তি দেশবাসীর একতা, স্বাধীনতা রক্ষা করিবার দৃঢ় সংকল্প এবং দেশের সামরিক শক্তি ও কৌশলের উপর নির্ভর করে। পক্ষান্তরে আক্রমণকারীর সংকল্পের দৃঢ়তা, দেশজয়ের গৌরবলিপ্সা, সম্পত্তি লাভের উন্মাদনা, বসতি বিস্তারের অথবা নিছক লুণ্ঠনের মনোবৃত্তি আক্রমণকারীকে আক্রান্ত দেশের অধিবাসীদের তুলনায় অধিকতর দুর্ধর্ষ করিয়া তোলে। বিভিন্ন সময়-তরঙ্গে যখন বিভিন্ন বিদেশী জাতি ভারত আক্রমণ করিয়াছিল সেই সময়ে ভারতবাসীর বিরুদ্ধে তাহাদের সাফল্য এই উক্তির সত্যতা প্রমাণ করে।

বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার শক্তির মূল উৎস

আর্য জাতির ভারত আক্রমণ হইতে শুরু করিয়া ইওরোপীয়দের ভারত আগমনের পূর্বাবধি বহিরাগত সকল জাতি ও আক্রমণকারীই ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

পথে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল। তিন দিক্ সমুদ্র পরিবেষ্টিত এবং উত্তর সীমান্ত হিমালয় পর্বতমালায় সুরক্ষিত ভারতে স্থলপথে প্রবেশ করিবার একমাত্র সহজ উপায়ই ছিল উত্তর-পশ্চিম ভারতের গিরিবর্ত্ম। অথচ এই অঞ্চলে রাজনৈতিক ঐক্য প্রাচীন কালে বিদ্যমান না থাকিবার ফলে এবং বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার কোন সুচিন্তিত পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টার অভাব হেতু আক্রমণকারীদিগকে এই পথে ভারতে প্রবেশ করিবার সুযোগ দিয়াছিল।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে বৈদেশিক আক্রমণের সুযোগ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পারসীক আক্রমণের কালে উত্তর-পশ্চিম ভারত উত্তরাপথ নামে অভিহিত হইত। সেই সময়ে ঐ অঞ্চল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এগুলির মধ্যে গান্ধার, কাম্বোজ, মদ্র প্রভৃতি ছিল অন্যতম প্রধান। কিন্তু এই সকল রাজ্যের পারস্পরিক বিবাদ-বিসংবাদ এগুলিকে ঐক্যবদ্ধভাবে বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিতে উদ্বুদ্ধ করে নাই। ব্যক্তিগত সাহস, জীবন তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শন প্রভৃতিতে ভারতীয় সৈনিক পশ্চাৎপদ ছিল না। গান্ধার রাজ্য আক্রমণকালে জনৈক ভারতীয় সৈনিকের অস্ত্রাঘাতের ফলেই শেষ পর্যন্ত পারসীক সম্রাট্ সাইরাসের মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কিন্তু সংঘবদ্ধতার অভাব, সৈন্যসংখ্যার স্বল্পতা, সর্বোপরি সমরকৌশলের অপকৃষ্টতা ভারতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।

পারসীক আক্রমণের সাফল্যের কারণ

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন ও পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবদমান উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজগণ ম্যাসিডনের রাজা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণকালে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশরক্ষার চেষ্টা করা দূরের কথা, গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের সম্ভাব্য আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে নিজ নিজ স্বাধীনতা উপঢৌকন দিয়া এবং বিদেশী আক্রমণকারীকে সামরিক সাহায্যদান করিয়া অথবা রসদ যোগাইয়া নীচ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়াছিলেন। সেই সময়ে পৌরব রাজ্যের রাজা পুরু এককভাবে দেশরক্ষার জন্য আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া স্বদেশপ্রীতি ও স্বাধীনতাস্পৃহার এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। কেবল নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার মত দৃঢ়তা ও মর্যাদা-বোধ প্রদর্শন করিয়া পুরুরাজ ভারত-ইতিহাসে অমর হইয়া আছেন। রাজা পুরু ভিন্ন মালব, ক্ষুদ্রক, অর্জুনায়ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতান্ত্রিক দেশও নিজ নিজ স্বাধীনতা রক্ষার্থ আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে আপ্রাণ যুদ্ধ করিতে ত্রুটি করে নাই। তক্ষশিলার রাজা অম্ভির নীচ স্বার্থপরতার পার্শ্বে পুরুরাজ ও জাতান্ত্রিক প্রদেশগুলির দেশাত্মবোধ তাঁহাদিগকে ভারতবাসীর শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে।

আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ভারতীয়দের চেষ্টা

রাজনৈতিক ঐক্য ও স্বাধীনতা রক্ষার প্রতিজ্ঞা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিতে যে সমর্থ হয় তাহার দৃষ্টান্ত আমরা দেখিতে পাই মৌর্য সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালে। চাণক্য নামক তক্ষশিলার জনৈক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সমরকৌশল ও রাজনীতি

বিষয়ে শিক্ষালাভের পর চন্দ্রগুপ্ত দুর্বল অথচ অত্যাচারী নন্দ বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আলেকজাণ্ডারের বিজিত রাজ্যের গ্রীক শাসনকর্তাদিগকে পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চল বিদেশী শাসনমুক্ত করেন। এদিকে আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সেনাপতি সেলুকাস সীরিয়া ও ভারতে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিজিত রাজ্যের সর্বেসর্বা হন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের অধিকার হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজ্যাংশ পুনরুদ্ধার করিবার জন্য অভিযানে অগ্রসর হন। আলেকজাণ্ডারের সহিত ভারত-জয়ে আসিয়া ভারতের রাজাদের সামরিক দুর্বলতা এবং ঐক্যের অভাব সেলুকাস দেখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু এইবার তাঁহাকে এক ঐক্যবদ্ধ ভারতের সম্মুখীন হইতে হইল। তিনি চন্দ্রগুপ্তের হস্তে পরাজিত হইয়া কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট নামক চারিটি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে দান করিতে এবং তাঁহার সহিত এক বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হন। দেশরক্ষার তথা বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ঐক্য ও দেশাত্মবোধ যে প্রধান উপায় তাহা সেলুকাসের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের জয়লাভে প্রমাণিত হইয়াছিল।

সেলুকাসের আক্রমণ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কর্তৃক প্রতিহত

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতা ও দুর্বলতার সুযোগে বাহ্লিক বা ব্যাকট্রীয় (Bactrian) গ্রীকগণ, পার্থিয়া (Parthians) বা পহ্লবদেশের পহ্লবগণ, শকস্তান হইতে শকগণ এবং সিরদরিয়া ও আমুদরিয়া অঞ্চল হইতে আগত কুষাণগণ পর পর ভারত আক্রমণ করে। এই সকল বিভিন্ন জাতির আক্রমণকালে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অনৈক্য ও দুর্বলতা আক্রমণকারীদের সাফল্যের জন্য দায়ী ছিল। কিন্তু এই রাজনৈতিক দুর্বলতার কালেও স্বাধীনচেতা রাজগণের দেশাত্মবোধ ও বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য জীবনমরণ সংগ্রামের দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। সাতবাহন বংশের গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে মালব ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলের শকগণকে পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজ্যের অপহৃত অংশ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম দাক্ষিণাত্যে (নাসিকের সন্নিকটে) সাতবাহনদের রাজধানী ছিল প্রতিষ্ঠান (Pratishthana)। ইহার বর্তমান নাম পৈঠান (Paithan)।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখতার কালে বৈদেশিক আক্রমণ: গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর বিজয়

উপসংহারে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য বহিরাগত জাতিকে ভারত আক্রমণের যেমন সুযোগ দান করিয়াছিল তেমনি তাহাদিগকে ভারতের কতকাংশ, এমনকি কুষাণ আমলে এক বিশাল অংশ জয় করিয়া এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করিয়াছিল। বহিরাগত আক্রমণ প্রতিহত করিবার দৃঢ় সংকল্প ও দেশরক্ষার অঙ্গীকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজগণের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু পুরুরাজ, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর ন্যায় স্বাধীনচেতা, প্রদেশাত্মবোধসম্পন্ন নৃপতির অভাবও সেই যুগে ছিল না।

উপসংহার

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব (Impact of Foreign Inroads on the Social and Cultural Life): আর্যদের ভারত আগমনের পূর্বে সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে যে সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল উহা ছিল নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা। সেই যুগের সিন্ধু-উপত্যকাবাসীরা দ্রাবিড় জাতির লোক ছিল বলিয়া মনে করা হয়। সিন্ধু-সভ্যতা যে কেবল সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল এমন নহে, অনুরূপ সভ্যতার চিহ্নাদি উত্তর ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য সভ্যতার উৎকর্ষের তারতম্য থাকিলেও মোটামুটিভাবে সিন্ধু-সভ্যতার মৌলিক ধরণ উত্তর ভারতে আবিষ্কৃত চিহ্নাদিতে পরিলক্ষিত হয়। আর্যদের আগমনের পূর্বে কৃষিকার্যে ভারতীয়রা, যাহাদিগকে অনার্য নামে ব্যাপকার্থে অভিহিত করা হয়, যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়াছিল।* সিন্ধু-সভ্যতার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হরপ্পার অধিবাসীরা সর্বপ্রথম তুলার চাষ শুরু করিয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।† সিন্ধু-সভ্যতার যুগে সমাজব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না, তবে বর্তমান হিন্দু ধর্মের রীতি-নীতি ও দেব-দেবী অনেক কিছুরই মূল সিন্ধু-সভ্যতার আমল হইতেই চলিয়া আসিতেছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

আর্যদের আগমনের পূর্বে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি

আর্য আক্রমণের ফলে পূর্বতন সমাজব্যবস্থা ও সংস্কৃতির এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আর্য-অনার্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে যে সংস্কৃতি, সমাজব্যবস্থা ও ধর্মব্যবস্থার উদ্ভব ঘটিয়াছিল তাহা বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়া আসিবার পরও বর্তমান কাল পর্যন্ত মূল কাঠামোর দিক্ দিয়া অপরিবর্তিতই রহিয়াছে বলা যাইতে পারে। বৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারিভাগে সমাজকে গুণ ও কর্মের ভিত্তিতে বিভক্ত করা হইয়াছিল। পরবর্তী কালে এই শ্রেণীবিভাগ জাতিবিভাগে রূপান্তরিত হইয়া অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব ঘটাইয়াছিল সত্য, কিন্তু এই শ্রেণীবিভাগ যুগ-যুগান্তের ইতিহাস অতিক্রম করিয়া আজিও হিন্দু সমাজে বিদ্যমান রহিয়াছে। অবশ্য জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা বর্তমানে বহুলাংশে শিথিল হইয়াছে। বিদ্যাচর্চা, শাস্ত্র রচনা, শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা বৈদিক যুগের সমাজের সংস্কৃতির এক অভাবনীয় উৎকর্ষের পরিচায়ক। বেদ-উপনিষদের ন্যায় উচ্চাঙ্গের এবং দার্শনিক চিন্তাপ্রসূত সাহিত্য পৃথিবীর কোন অংশের আর্যগণ সেই যুগে রচনা করিতে সমর্থ হন নাই। বেদ-উপনিষদের চিন্তাধারা অদ্যাবধি ভারতীয়দের এক বিশাল অংশের জীবনযাত্রার নির্দেশক, বলা বাহুল্য। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মৌলিক বৈশিষ্ট্যের ইহা অন্যতম প্রধান।

আর্যদের আগমনের ফলে সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন

পারসীক বা গ্রীক আক্রমণের ফলে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের রাজনৈতিক ভাগ্যের তারতম্য ঘটিলেও ভারতীয় সমাজের উপর এই সকল আক্রমণের কোন প্রভাব

---

* Vide A. L. Basham : *The Wonder that was India*, pp. 25-26.

† *Ibid.*, p. 26.

পরিলক্ষিত হয় নাই। কিন্তু এই সকল আক্রমণ, বিশেষভাবে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভেদের প্রাচীর ভাঙিয়া দিয়া ভারত ও পাশ্চাত্য জগতের সহিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংযোগ স্থাপনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। এই সংযোগের মাধ্যমে পরবর্তী কালে গ্রীক ও রোমান শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব পাশ্চাত্য দেশেও বিস্তৃত হইয়াছিল। কুষাণ আমলে গান্ধার শিল্প গ্রীক, রোমান ও ভারতীয় শিল্পরীতির সংমিশ্রণেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। খ্রীষ্টধর্মের উপরও বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ভারতীয় বিজ্ঞান, মুদ্রানীতি প্রভৃতির উপর যেমন গ্রীক প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল তেমনি ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব

আর্যদের পরবর্তী বৈদেশিক জাতির ভারত আগমনের ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে কতক পরিবর্তন ঘটিয়াছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। মুসলমানদের ভারত আগমনের পূর্বাবধি ভারতীয় সমাজের তথা ভারতবাসীর পরকে আপন করিয়া লইবার মত প্রতিভা ছিল। ফলে শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি বহিরাগত জাতি ভারতের সমাজদেহে বিলীন হইয়া গিয়াছিল। গ্রীকদেরও কেহ কেহ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিয়া ভারতীয় সমাজের মধ্যে মিশিয়া গিয়াছিল এই প্রমাণও আছে। গ্রীক রাষ্ট্রদূত হেলিওডরাস (Heliodoros) বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া বেসনগর নামক স্থানে দেবাদিদেব বাসুদেবের নামে একটি গরুড়-স্তম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। উপরি-উক্ত উদাহরণ প্রাচীন কালে ভারতীয় সমাজের উদারতা ও পরকে আপন করিয়া লইবার মত বলিষ্ঠতা প্রমাণ করে।

আর্যদের পরবর্তী কালে সমাজের উপর বৈদেশিক আক্রমণের প্রভাব

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অব্যবস্থা এবং বহিরাক্রমণের ফলে ভারত-ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ কালের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু এই সূত্রে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ জাতির ভারত প্রবেশের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ইহার ফলে সেই যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ, ধর্মের প্রসার, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। সাহিত্য ক্ষেত্রে নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, নাগসেন, গুণাঢ্য ; চিকিৎসা ক্ষেত্রে চরক, সুশ্রুত প্রভৃতির অবদান সেই যুগকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল।

সাহিত্য শিল্প ও সংস্কৃতির উপর প্রভাবের ফলাফল

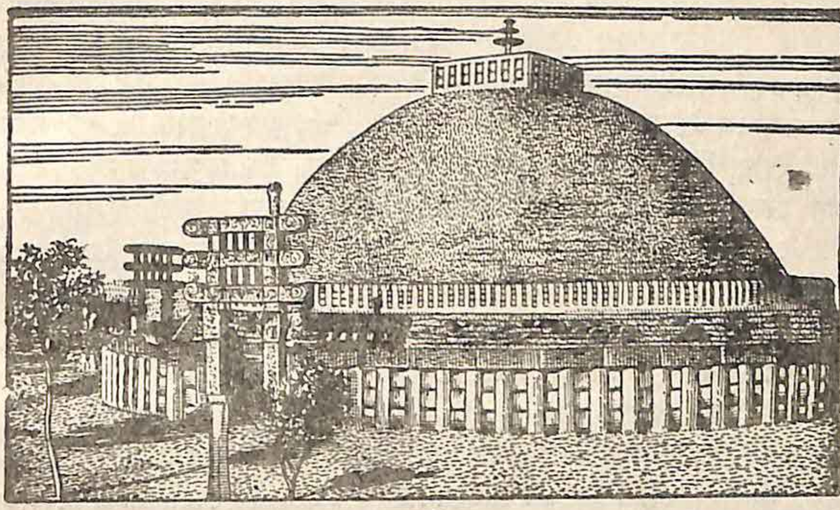
তক্ষশিলা সে যুগে বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

শিক্ষা

বৈদেশিক প্রভাব গান্ধার শিল্পে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক দেব-দেবী এ্যাপেলো, জিউস প্রভৃতি মূর্তির অনুকরণে গান্ধারের শিল্পিগণ বুদ্ধ মূর্তি নির্মাণ করিয়াছিলেন। বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পকলার পরিচয় পাওয়া

যায় সে যুগের অমরাবতী ও মথুরার শিল্প-রীতিতে। পুরুষপুরে কণিষ্ক-নির্মিত চৈত্য, সাঁচী স্তূপের তোরণদ্বারের আলংকারিক কারুকার্য, কান্‌হেরী, নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের গুহাচৈত্য, বরহুত, ভাজা, বুদ্ধগয়ার মঠ প্রভৃতি সে যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

শিল্প



সাঁচী স্তূপ ও তোরণ

মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে বৈদেশিক যোগাযোগের ফল হিসাবে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রীক, পারসীক ও শক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শক 'স্যাট্রাপে'র (Satrap) অনুকরণে ভারতের শক রাজগণ 'ক্ষত্রপ', 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করিতেন। গ্রীক 'স্ট্রাটিগোস' (Strategos)—অর্থাৎ সামরিক শাসনকর্তার অনুকরণে 'মহাসেনাপতি' উপাধি ভারতীয় প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণও গ্রহণ করিতেন।

রাজনীতি

কুষাণ আমলে সভ্যতা-সংস্কৃতির যে উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল উহার চরম অভিব্যক্তি গুপ্ত সাম্রাজ্যের আমলে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

রাজপুত জাতির মূল পরিচয় ও অভ্যুত্থান (The Origin and Rise of the Rajputs): কাহিনী-কিংবদন্তীতে রাজপুত জাতি কোন কোন স্থলে সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়, কোন কোন স্থলে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বস্তুত, তাহাদের আদি পরিচয় সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নাই। রাজপুতদের বিভিন্ন শাখা রামায়ণ-মহাভারতে উল্লিখিত বীরগণের বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিয়া থাকে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতগণ মূলত ভারতীয় জাতির লোক। ইহার যুক্তি হিসাবে বলা হয় যে, রাজপুতগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী এবং

রাজপুত জাতির মূল পরিচয় সম্পর্কে অনিশ্চয়তা

মুসলমান আক্রমণ হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে তাহারা প্রাণপণ যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া রাজপুতগণ যে মূলত ভারতীয় জাতির লোক এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হইবে না। কারণ সে যুগের হিন্দু সমাজের পরকে আপন করিয়া লইবার শক্তি ছিল। ফলে মূলত বিদেশী হইলেও রাজপুতগণ হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য চেষ্টা করিবে ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বহিরাগত জাতির সংমিশ্রণে রাজপুত জাতির উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বহু আধুনিক ঐতিহাসিক মনে করিয়া থাকেন। শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির ন্যায়ই ইহারা হিন্দু সমাজের সহিত সম্পূর্ণ মিশিয়া গিয়াছিল। রাজপুত জাতির কোন কোন শাখা—যেমন মধ্য ভারতের চন্দেল্ল বংশ ভারতীয় গোন্দ জাতি-সম্ভূত বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। যাহা হউক, রাজপুত জাতির মূল পরিচয় সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট কিছু বলা ঠিক হইবে না। খ্রীষ্টীয় সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপুত জাতি ভারতের বিভিন্ন অংশে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। রাজপুত জাতির মধ্যে চৌহান্, পরমার, তোমর, চন্দেল্ল, গাহ্ড়বাল, কলচুরি, গুর্জর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখা

ভারত-ইতিহাসের দশম শতকে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্যের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। গুর্জর-প্রতিহারদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া যে-সকল স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, সেগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল রাজপুত রাজ্য।

বিভিন্ন রাজপুত রাজ্যের উদ্ভব

গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলে চৌলুক্য (ইহারা সোলাঙ্কি নামেও পরিচিত) রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল 'অন্হিলবারা'। এই বংশের রাজগণের মধ্যে প্রথম ভীম (১০২২-৬৪ খ্রীঃ), জয়সিংহ (১০৯৪-১১৪৪ খ্রীঃ), কুমারপাল (১১৪৪-৭৩ খ্রীঃ) ও দ্বিতীয় ভীমের (১১৭৮-১২৪১ খ্রীঃ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চৌলুক্য বংশ প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। ইহার পর (খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকে) এই বংশেরই এক শাখা শক্তিশালী হইয়া উঠে এবং শাসনক্ষমতা হস্তগত করে। এই নূতন রাজবংশ 'বাঘেলা বংশ' নামে পরিচিত। বাঘেলা বংশের রাজা দ্বিতীয় কর্ণদেবের রাজত্বকালে আলা-উদ্দিন খল্জী গুজরাট জয় করিয়াছিলেন।

চৌলুক্য বা সোলাঙ্কি বংশ

রাজপুত জাতির মধ্যে চৌহান বংশ মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল। আজমীর ও দিল্লী অঞ্চল লইয়া চৌহান্ বংশের রাজ্য গঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে প্রায় তিনশত বৎসর—অর্থাৎ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত চৌহান্ বংশ প্রতিপত্তি সহকারে রাজত্ব করিয়াছিল। গঙ্গা-যমুনার অববাহিকা অঞ্চলে চৌহান্ রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলিয়া মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করা ছিল তাহাদের বিশেষ দায়িত্ব। তরাইনের প্রথম ও দ্বিতীয় যুদ্ধে তৃতীয় পৃথ্বীরাজের দেশরক্ষার চেষ্টা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

চৌহান্ বংশ

বুন্দেলখণ্ডের চন্দেল্ল বংশ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী হইতে প্রাধান্য অর্জন করে। এই বংশের সমরবিজয়ী বীর রাজা ধঙ্গ (৯৫৪-১০০২ খ্রীঃ) ছিলেন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চন্দেল্ল বংশের প্রধান কর্মকেন্দ্র ছিল খজুরাহো। এই বংশের রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় খজুরাহোর মন্দিরগুলি নির্মিত হইয়াছিল। এই সকল মন্দির সে যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

চন্দেল্ল বংশ

জব্বলপুর অঞ্চলে কলচুরি বা কলসুড়িগণ রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিল। ত্রিপুরি ছিল এই রাজ্যের রাজধানী। এই বংশের রাজগণের মধ্যে বিক্রমাদিত্য (১০৩০-৪১ খ্রীঃ) ও লক্ষ্মীকর্ণ (১০৪১-৭০ খ্রীঃ) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে একাদশ শতক পর্যন্ত এই বংশ শক্তি ও প্রতিপত্তি সহকারে রাজত্ব করিয়াছিল।

কলচুরি বা কলসুড়ি বংশ

মালবের পরমার বংশ ছিল রাজপুত জাতির বিভিন্ন শাখার অন্যতম প্রধান। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত প্রায় তিনশত বৎসর এই বংশ রাজত্ব করিয়াছিল। পরমার বংশের রাজা বাক্‌পতি প্রতিবেশী রাজগণের রাজ্যের কতক অংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন রাজা ভোজ (১০১০-৫৫ খ্রীঃ)। রাজা ভোজ ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক। তিনি নিজেও বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া জানা যায়।

পরমার বংশ

গাহ্‌ঢ়বাল বংশ-প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্র বারাণসীতে রাজত্ব শুরু করেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি কনৌজ পর্যন্ত সকল স্থান নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এই বংশের রাজগণের মধ্যে গোবিন্দচাঁদ (১১১৪-৫৪ খ্রীঃ), জয়চাঁদ বা জয়চন্দ্র (১১৭০-৯৩ খ্রীঃ) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। তৃতীয় পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চাঁদের মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া জয়চাঁদ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীঃ) পৃথ্বীরাজের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই। তিনি অবশ্য নিজে মোহম্মদ ঘুরীকে বাধাদানে ত্রুটি করেন নাই। মোহম্মদ ঘুরীর সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন।

গাহ্‌ঢ়বাল বংশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাম্রাজ্যিক ঐক্যের পথে
(Towards Imperial Unity)

মগধের অধীনে (Under Magadha):

(১) বিম্বিসার হইতে অশোক (From Bimbisara to Asoka): প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থাদিতে মগধ রাজ্য ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গঠনে অগ্রসর হইয়াছিল সেই কথা উল্লিখিত আছে। বিহার প্রদেশের দক্ষিণাংশ লইয়া মগধ রাজ্য গঠিত ছিল। বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিবার (খ্রীঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের মধ্যভাগ) সঙ্গে সঙ্গে মগধ রাজ্যের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বিম্বিসার মাত্র পনর বৎসর বয়সে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যাভিষেকের অল্পকাল পরেই তিনি অঙ্গ রাজ্যটি জয় করেন। অঙ্গ রাজ্য জয়ের সময় হইতেই মগধ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে অগ্রসর হইতে থাকে। বিম্বিসার বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমেও নিজ শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কোশল-কাশী রাজ্যের রাজা প্রসেনজিতের ভগিনী কোশল দেবী, লিচ্ছবি দলপতির কন্যা চেল্লনা, বিদেহ রাজ্যের রাজকন্যা বাসবী এবং মদ্র রাজ্যের রাজকন্যা ক্ষেমা ছিলেন যথাক্রমে তাঁহার প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া ও চতুর্থা পত্নী। এই সকল বিবাহ-সূত্রে বিম্বিসার মগধের শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। জৈন গ্রন্থাদিতে বিম্বিসারকে জৈনধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে তাঁহাকে বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ, উভয়ের সহিত বিম্বিসারের সাক্ষাৎকারের কথা উল্লিখিত আছে।

বিম্বিসার

বিম্বিসার কর্তৃক মগধের প্রাধান্যের সূচনা

বিম্বিসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু সিংহাসনলাভ করিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনি পিতাকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তিনিও মগধের সাম্রাজ্য বিস্তারে পিতার ন্যায়ই উৎসাহী ছিলেন। কোশল রাজ্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধের সৃষ্টি হইয়াছিল। অবশেষে কোশল রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া তিনি কোশল রাজ্যের উপর কতক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব ভারতের শক্তিশালী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘগুলি জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার আমলেই গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমস্থলে মগধের একটি বিকল্প রাজধানী—পাটলিপুত্র নগর স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহাকেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছিল। যাহা হউক, গৌতম বুদ্ধের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারের পর হইতে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। অজাতশত্রুর পরবর্তী রাজগণের দুর্বলতা এবং তাঁহাদের পারিবারিক কলহ প্রভৃতিতে অতিষ্ঠ হইয়া জনসাধারণ মন্ত্রী শিশুনাগকে মগধের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিল, একথা সিংহলী বৌদ্ধ গ্রন্থ মহাবংশে উল্লিখিত আছে।

অজাতশত্রু

পাটলিপুত্র নগর বিকল্প রাজধানী হিসাবে নির্মিত

বিম্বিসারীয় বংশের পতন: শিশুনাগের সিংহাসনলাভ

শিশুনাগ বহিরাক্রমণ হইতে মগধের রাজধানী রাজগৃহের নিরাপত্তা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং অবন্তী রাজ্যকে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। বৎস ও কোশল রাজ্যও তাঁহার আমলে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। শৈশুনাগ বংশের পরবর্তী রাজগণ খুব শক্তিশালী ছিলেন না। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে মগধের সিংহাসন নন্দ বংশের অধিকারে চলিয়া যায়। নন্দ বংশের স্থাপয়িতা নীচ কুল-সম্ভূত ছিলেন একথা পুরাণ, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদিতে উল্লিখিত আছে। মহাপদ্মনন্দ এই বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন। বিম্বিসার ও অজাতশত্রু গঠিত মগধ সাম্রাজ্যকে মহাপদ্মনন্দ বিশালতর ও অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। নন্দ বংশে মোট নয়জন রাজা রাজত্ব করেন। এই বংশের সর্বশেষ রাজা ছিলেন ধননন্দ। বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হইলেও নন্দরাজগণ জনসাধারণের শ্রদ্ধা অর্জন করিতে পারেন নাই। বিশেষত, সর্বশেষ নন্দরাজ ধননন্দ তাঁহার স্বার্থ-লোলুপতার জন্য জনসাধারণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিয়াছিলেন। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ধননন্দ মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলেকজাণ্ডার অবশ্য মগধ আক্রমণ করেন নাই, কিন্তু নন্দ বংশের ভাগ্যে আর অধিককাল রাজ্যভোগ ছিল না। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং চাণক্য নামে তক্ষশিলার জনৈক তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের হস্তে নন্দ বংশের পতন ঘটিয়াছিল।

শিশুনাগ কর্তৃক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

শিশুনাগ বংশের পতন—নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠা : মহাপদ্মনন্দ

'নব নন্দ' ('Nine Nandas')

ধননন্দ—নন্দ বংশের শেষ রাজা

মৌর্য বংশের উত্থান

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, খ্রীঃ পূঃ ৩২৪-৩০০ (Chandragupta Maurya): মগধের নন্দ বংশের রাজত্বের অবসান ঘটাইয়া চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের বংশপরিচয় সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত নহেন। প্রাচীন হিন্দু গ্রন্থাদিতে চন্দ্রগুপ্তকে নন্দ বংশ-সম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। গ্রীক ঐতিহাসিকদের মতে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ছিলেন নীচ বংশ-সম্ভূত। হিন্দু কাহিনী-কিংবদন্তী অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের মাতা 'মুরা' ছিলেন শূদ্রাণী। মুরার নাম অনুসারেই চন্দ্রগুপ্ত-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ 'মৌর্য বংশ' নামে অভিহিত হইয়াছিল। জৈন ও বৌদ্ধ গ্রন্থে চন্দ্রগুপ্তকে ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। বস্তুত, পিপ্পলীবনের ময়ূরপোষক প্রজাতান্ত্রিক গোষ্ঠীর সন্তান বলিয়া চন্দ্রগুপ্তের বংশ মৌর্য বংশ নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিল। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মৌর্য বংশকে ক্ষত্রিয় বংশ বলিয়াই মনে করেন।

চন্দ্রগুপ্তের পরিচয়

বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের পিতা যুদ্ধে প্রাণ হারাইলে তাঁহার মাতা শিশু চন্দ্রগুপ্তকে লইয়া মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একবার নন্দরাজসভায় চাণক্য নামে তক্ষশিলার জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রকাশ্যে অপমান করা হইয়াছিল। এজন্য তিনি নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তকে তিনি

চাণক্য

রাজসদৃশ লক্ষণযুক্ত দেখিয়া তাঁহার মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য সফল করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

চাণক্যের সাহায্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া চন্দ্রগুপ্ত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন করিলেন। ইহার অল্পকাল পরে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক শাসন-কর্তাদের পরাজিত করিয়া সেই অঞ্চল বৈদেশিক অধিকার হইতে মুক্ত করিলেন।

নন্দ বংশের উচ্ছেদ—গ্রীক প্রভুত্বের অবসান

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর গ্রীক সাম্রাজ্য তাঁহার সেনাপতিগণ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। সীরিয়া ও ভারতবর্ষে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক বিজিত অঞ্চল সেনাপতি সেলুকাসের অংশে পড়িয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক উত্তর-পশ্চিম ভারত অধিকৃত হইলে সেলুকাস সেই অংশ পুনরুদ্ধার করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইয়া কাবুল, কান্দাহার, মকরাণ ও হিরাট এই কয়টি প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তদুপরি উভয় পক্ষে এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইল। সাধারণ্যে একথাই অবশ্য প্রচলিত আছে যে, চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে শুরু করিয়া সীরিয়া তথা গ্রীক দেশগুলির সহিত মৌর্য বংশের সৌহার্দ্য দীর্ঘকাল অটুট ছিল। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস নামে জনৈক গ্রীক দূতকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মেগাস্থিনিস তদানীন্তন ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি সুন্দর বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। এই বিবরণটি অবশ্য সম্পূর্ণভাবে উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই।

সেলুকাসের ভারত আক্রমণ ও পরাজয়

সেলুকাস-চন্দ্রগুপ্ত মৈত্রী

মেগাস্থিনিস

চন্দ্রগুপ্ত প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে আফগানিস্তান হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। কুখ্যাত নন্দ বংশের উচ্ছেদসাধন, বৈদেশিক অধিকার হইতে দেশের একাংশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, সেলুকাসের আক্রমণ হইতে স্বদেশ রক্ষা প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ভারতে সর্বপ্রথম শক্তিশালী ও বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

বিন্দুসার, খ্রীঃ পূঃ ৩০০-২৭৩ (Bindusara): চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলে একবার তক্ষশিলায় বিদ্রোহ দেখা দেয়। যুবরাজ অশোককে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিন্দুসারের রাজত্বকাল সম্পর্কে কোন বিশদ বিবরণ আমাদের জানা নাই। গ্রীক গ্রন্থাদি হইতে জানা যায় যে তাঁহার আমলেও গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত ভারতবর্ষের সৌহার্দ্য পূর্বের ন্যায় বলবৎ ছিল।

গ্রীক রাজ্যগুলির সহিত সৌহার্দ্য

সম্রাট্ অশোক, খ্রীঃ পূঃ ২৭৩-২৩৬ (Emperor Asoka): বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অশোক মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

সেই সময়ে সিংহাসন অধিকার লইয়া এক তীব্র ভ্রাতৃবিরোধের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া বৌদ্ধ কাহিনী-কিংবদন্তীতে উল্লিখিত আছে। অশোক তাঁহার ভ্রাতৃবর্গের অনেকের প্রাণনাশ করিয়া সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু এই সকল তথ্য কতদূর সত্য সে-বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বলিয়া ঐতিহাসিকগণ মনে করিয়া থাকেন। অশোকের অভিষেকক্রিয়া চারি বৎসর পর (খ্রীঃ পূঃ ২৬৯) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনেকে মনে করেন যে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর এক ভ্রাতৃবিরোধ দেখা দিয়াছিল একথা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়ত ঠিক হইবে না। ভ্রাতৃহত্যার নির্মমতার কথা বাদ দিলেও ভ্রাতৃবিরোধ যে ঘটিয়াছিল একথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা অযৌক্তিক হইবে না।

সিংহাসনলাভ—ভ্রাতৃবিরোধ



রাজর্ষি অশোক

অশোক মৌর্য সম্রাট্‌সুলভ মনোবৃত্তি লইয়াই সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। পিতামহ চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় সাম্রাজ্য বৃদ্ধিতে তাঁহার স্বভাবতই আগ্রহ ছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বেই তিনি তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন সেই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। রাজ্যাভিষেকের (খ্রীঃ পূঃ ২৬৯) নয় বৎসর পরে—অর্থাৎ সিংহাসনলাভের ত্রয়োদশ বর্ষে তিনি কলিঙ্গ নামক প্রতিবেশী রাজ্যটি জয় করিবার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হন।

সম্রাট্‌সুলভ মনোবৃত্তি

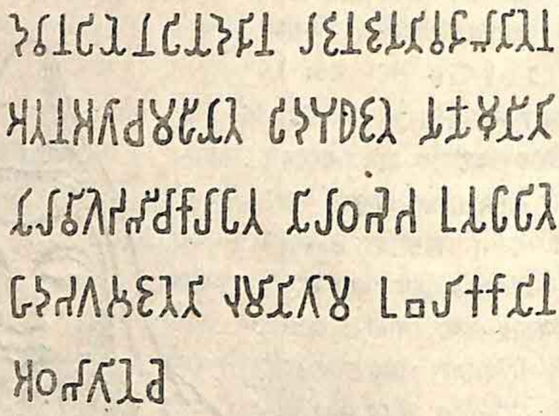
কলিঙ্গরাজের সৈন্যসংখ্যা রাজ্যের আয়তন বা লোকসংখ্যার অনুপাতে অত্যধিক ছিল। প্রতিবেশী কলিঙ্গ রাজ্যের এরূপ সামরিক শক্তি এবং সামরিক আস্ফালন স্বভাবতই মৌর্য সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার দিক্ হইতে কাম্য ছিল না। এজন্য সম্রাট্ অশোক কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে অশোক জয়লাভ করিলেন সত্য, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের মর্মান্তিক দৃশ্য অশোকের অন্তরকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। এক লক্ষ সৈন্য এই যুদ্ধে প্রাণ হারাইয়াছিল এবং কয়েক লক্ষ লোক যুদ্ধের আনুষঙ্গিক লুঠতরাজ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির ফলে মারা গিয়াছিল। বহু স্ত্রী স্বামীহারা, বহু জননী পুত্রহারা হইয়াছিলেন।

কলিঙ্গ যুদ্ধ—যুদ্ধের মর্মান্তিকতা

কলিঙ্গ যুদ্ধের মর্মান্তিকতা অশোকের অন্তরে এক বিরাট পরিবর্তনসাধন করিল। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করিয়া চিরকালের জন্য দিগ্বিজয় ত্যাগ করিলেন। সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব দ্বারা অপরের হৃদয় জয় করাই হইল তাঁহার জীবনের ব্রত। তিনি পর্বতগুহা এবং পর্বতগাত্রে ও স্তম্ভে তাঁহার ধর্মমত ব্রাহ্মীলিপিতে খোদাই করিয়া দিয়াছিলেন। অশোক পার্শ্ববর্তী রাজাগুলিকে আশ্বাস বাণী শুনাইলেন যে তাহাদের বিরুদ্ধে তিনি কোন

অশোকের মর্মবেদনা ও মানসিক পরিবর্তন

দিনই অনুধারণ করিবেন না। দিগ্‌বিজয়ের পন্থা ত্যাগ করিয়া অশোক ধর্মবিজয়ের পন্থা অনুসরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই মানসিক পরিবর্তন মৌর্য সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি সর্বক্ষেত্রেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।



ব্রাহ্মীলিপি

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে তিনি শাসনব্যবস্থাকে অধিকতর জনকল্যাণকর করিয়া তুলিলেন। প্রত্যেক তিন এবং পাঁচ বৎসর অন্তর অন্তর তিনি রাজ্যের দূরবর্তী অঞ্চলের শাসন ও বিচার কার্যাদি পরিদর্শনের জন্য এক এক দল রাজকর্মচারী প্রেরণের নীতি গ্রহণ করিলেন। তিনি সকল মানুষের এমনকি জীবমাত্রেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করিলেন। রাজকর্তব্যের আদর্শ তিনি পরিবর্তন করিয়া জনগণের কল্যাণসাধনই একমাত্র কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করিলেন। তাঁহার চেষ্টায় মৌর্য শাসনব্যবস্থা মানবধর্মী ও জনকল্যাণকামী হইয়া উঠিল। বিচার বিভাগের সংস্কার, রাজুক নামক রাজকর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বৃদ্ধি করিয়া অশোক শাসনব্যবস্থাকেও পূর্বাপেক্ষা অধিকতর জনমঙ্গলকর করিয়া তুলিলেন। তিনি সকল মানুষকে নিজ সন্তান বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন এবং পিতৃসুলভ দায়িত্ব লইয়া প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই মঙ্গল কেবল পার্থিব মঙ্গলেই সীমাবদ্ধ ছিল না, পরবর্তী জীবনেও প্রজাবর্গের মঙ্গলসাধন করা তাঁহার দায়িত্ব বলিয়া তিনি মনে করিতেন।

আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন

মানবধর্মী ও জনকল্যাণকামী শাসনব্যবস্থা

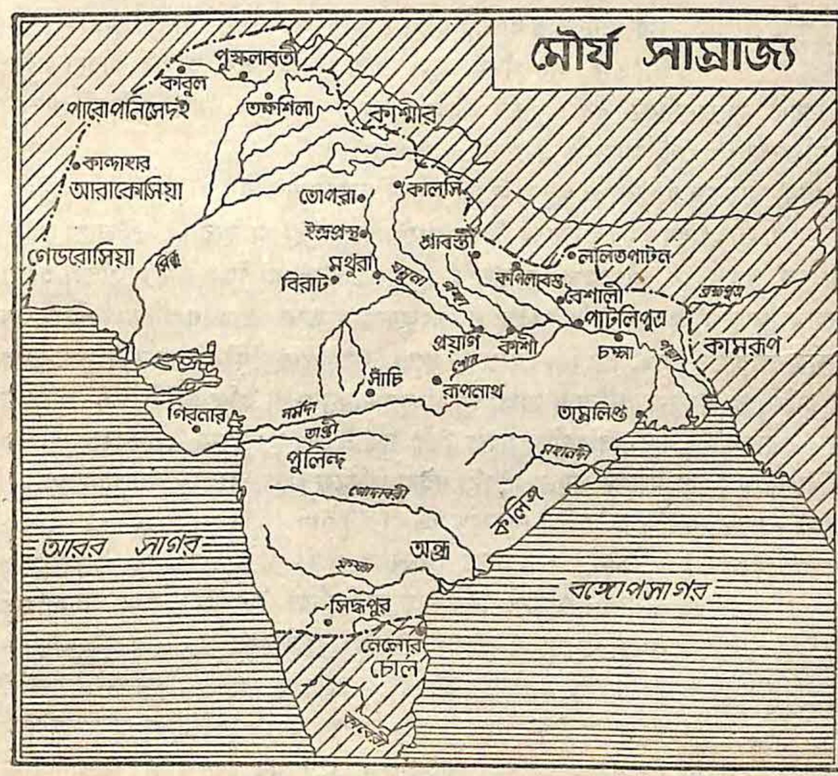
পিতৃসুলভ দায়িত্ববোধ

পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রেও অশোক এক নূতন নীতির প্রবর্তন করিলেন। তিনি দিগ্‌বিজয়ের স্থলে ধর্মবিজয় শুরু করিয়াছিলেন সেই কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি পররাষ্ট্র-ক্ষেত্রে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল দেশের সহিত সৌহার্দ্য স্থাপনে ব্রতী হইলেন। তিনি পররাষ্ট্রের প্রতি যুদ্ধনীতি নিজে ত্যাগ করিয়াছিলেন এমনকি নিজ পুত্র ও পৌত্রদেরও যুদ্ধনীতি ত্যাগের উপদেশ দিয়াছিলেন।

পররাষ্ট্র-নীতি : সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব

সম্রাট্ অশোক তাঁহার মানবতা ও রাজকর্তব্যের আদর্শের জন্য পৃথিবীর সর্বকালের রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসনলাভ করিয়াছেন। প্রজার মঙ্গলসাধনই যদি রাজার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয়ের মাপকাঠি হয় এবং মানবিকতাই যদি মনুষ্যত্ব বিচারের মানদণ্ড হয় তাহা হইলে এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে সম্রাট্ অশোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন রাজা বা সম্রাট্ কোন কালেই আবির্ভূত হন নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকগণ বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন জাতির রাজগণের সহিত সম্রাট্ অশোকের তুলনা করিয়াছেন। সকলেই সম্রাট্ অশোককে সর্বকালের রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সম্মান দান করিয়াছেন।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্



কলিঙ্গ যুদ্ধের হত্যাকাণ্ড দেখিয়া অশোকের অন্তরে যে গভীর অনুশোচনার সৃষ্টি হইয়াছিল উহার ফলে তাঁহার রাজকর্তব্যের আদর্শ সম্পূর্ণভাবে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। দিগ্বিজয়ী মৌর্য সম্রাট্ অশোক মানবধর্মী রাজর্ষি অশোকে রূপান্তরিত হইয়াছিলেন। অশোক এক নূতন আদর্শে—জনকল্যাণের তথা জীবজগতের কল্যাণে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ ও কার্যে কোনপ্রকার ব্যবধান ছিল না। সম্রাট্ অশোকের এই পরিবর্তন ভারতবর্ষ তথা ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের এক বিরাট পরিবর্তন বলিয়া বিবেচ্য।

অশোকের মানবতা

প্রজাবর্গের পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের উন্নয়নসাধন করা অশোক ভিন্ন অপর কোন সম্রাট্ কর্তব্য হিসাবে কল্পনায়ও আনেন নাই। অশোক রাজপদকে ভোগ-বিলাসের সুযোগ বলিয়া গ্রহণ করিতেন না। উপরন্তু তিনি মনে করিতেন যে, তিনি প্রজাবর্গের নিকট ঋণী। প্রজার সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন দ্বারা তিনি সেই ঋণ শোধ করিতে চাহিয়াছিলেন। 'সব মানুষ আমার সন্তান'* এইরূপ উদার বাণী পৃথিবীর অপর কোন রাজার বা সম্রাটের মুখে উচ্চারিত হয় নাই। পররাষ্ট্রের প্রতি সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি যে পথের সন্ধান দিয়া গিয়াছেন আজ বিংশ শতাব্দীতেও আন্তর্জাতিক শান্তির জন্য সেই পথ ভিন্ন অপর কোন শ্রেষ্ঠতর পথ আবিষ্কৃত হয় নাই। এই মানবতার বাণীই হইল রাজর্ষি অশোকের বাণী—ইহাই হইল ভারতীয় সংস্কৃতির মূল কথা। অপরকে আপন করিয়া লইয়া যে বিরাট সমন্বয়সাধন করা সম্ভব তাহাই সম্রাট্ অশোক নিজ জীবনে প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সেই আদর্শই অদ্যাবধি ভারতবাসীর জীবনাদর্শ।

প্রজাবর্গের পার্থিব ও পারলৌকিক উন্নয়ন

সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের বাণী

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতন ও গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের অন্তর্বর্তী কালে শুঙ্গ বংশ, কাণ্ব বংশ, সাতবাহন বংশ ভারতের বিভিন্নাংশে শাসন স্থাপন করে। এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্যের যুগে যে ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্রশক্তি ভারতে বিদ্যমান ছিল তাহা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে বাহ্লিক গ্রীকগণ, শক ও পহ্লবগণ এবং কুষাণগণ ভারত আক্রমণ করিয়া বিভিন্নাঞ্চল অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ইহাদের মধ্যে কুষাণগণই বিচ্ছিন্ন ভারতকে পুনরায় একই রাষ্ট্রশক্তির অধীনে আনিতে সমর্থ হয়। কুষাণদের মধ্যে কণিষ্কই ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। রাজনীতি, ধর্ম, সংস্কৃতি সকল দিক দিয়াই তিনি তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। কুষাণ বংশের শাসন দুর্বল হইয়া পড়িলে গুপ্ত বংশের অভ্যুত্থান ঘটে।

(২) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত (From Chandragupta I to Skandagupta): মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতবর্ষে যে রাজনৈতিক অনৈক্য ও বৈদেশিক আক্রমণ-জনিত অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল কুষাণ যুগের শাসনদক্ষতায় উহা বহুলাংশে দূরীভূত হইয়াছিল। ইহার পর প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশ গুপ্তদের উত্থান ঘটে। এই বংশের আদি রাজগণের মধ্যে মহারাজ শ্রীগুপ্ত (খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের শেষভাগ), ঘটোৎকচগুপ্ত প্রভৃতি রাজার নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহারা মগধের—অর্থাৎ দক্ষিণ বিহারের কোন স্থানীয় সামন্ত রাজা ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়।

প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজবংশ

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত **(Chandragupta I):** গুপ্ত বংশের সর্বপ্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী রাজা ছিলেন প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে (৩২০ খ্রীঃ) তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে গুপ্ত বংশের ইতিহাসের তথা ভারত-

গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠাতা

* 'সব মুনিসে পজা মমা'।

ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। পাটলিপুত্র নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল এবং তাঁহার রাজ্য অযোধ্যা ও এলাহাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বৈশালীর লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ মর্যাদা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনিই ছিলেন গুপ্ত রাজবংশের প্রকৃত স্থাপয়িতা।

সমুদ্রগুপ্ত (Samudragupta): মৃত্যুর পূর্বেই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত নিজ পুত্রগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন কুমারদেবীর সন্তান। সমুদ্রগুপ্ত পিতার প্রথম পুত্র ছিলেন না, তথাপি পিতার ইচ্ছা অনুসারে তিনিই সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই সমুদ্রগুপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ করিয়া নিজেকে 'একরাট্'—অর্থাৎ সার্বভৌম সম্রাটে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যে দিগ্বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হইলেন। আর্যাবর্তে তিনি "সর্বরাজোচ্ছেত্তা"র ভূমিকা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি আর্যাবর্তের রুদ্রদেব, নাগদত্ত, মতিল, অচ্যুত, গণপতি, নাগসেন, চন্দ্রবর্মণ, বলবর্মণ প্রভৃতি রাজাকে পরাজিত করিয়া সমগ্র আর্যাবর্ত নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন। ইহার পর তিনি মধ্য ভারতের আটবিক বা অরণ্য রাজ্যগুলি জয় করিলেন। তারপর শুরু হইল তাঁহার দাক্ষিণাত্য বিজয় অভিযান। আর্যাবর্তের রাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্ত নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলি সম্পর্কে তিনি ভিন্ন নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। সেই অঞ্চলের রাজগণের মধ্যে মহেন্দ্র, ব্যাঘ্ররাজ, দমন, বিষ্ণুগোপ, উগ্রসেন, ধনঞ্জয় প্রভৃতি বহু রাজাকে পরাজিত করিয়া এবং তাঁহাদের আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্য ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। দূরদর্শী সমুদ্রগুপ্ত হয়ত বুঝিয়াছিলেন যে, মগধ হইতে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির উপর অধিকার রক্ষা করিবার একমাত্র পথ ছিল সেই সকল অঞ্চলের রাজগণকে স্থানীয় শাসনাধিকার দান করা।

দিগ্বিজয় : উত্তর ভারত তথা আর্যাবর্ত

মধ্য ভারত

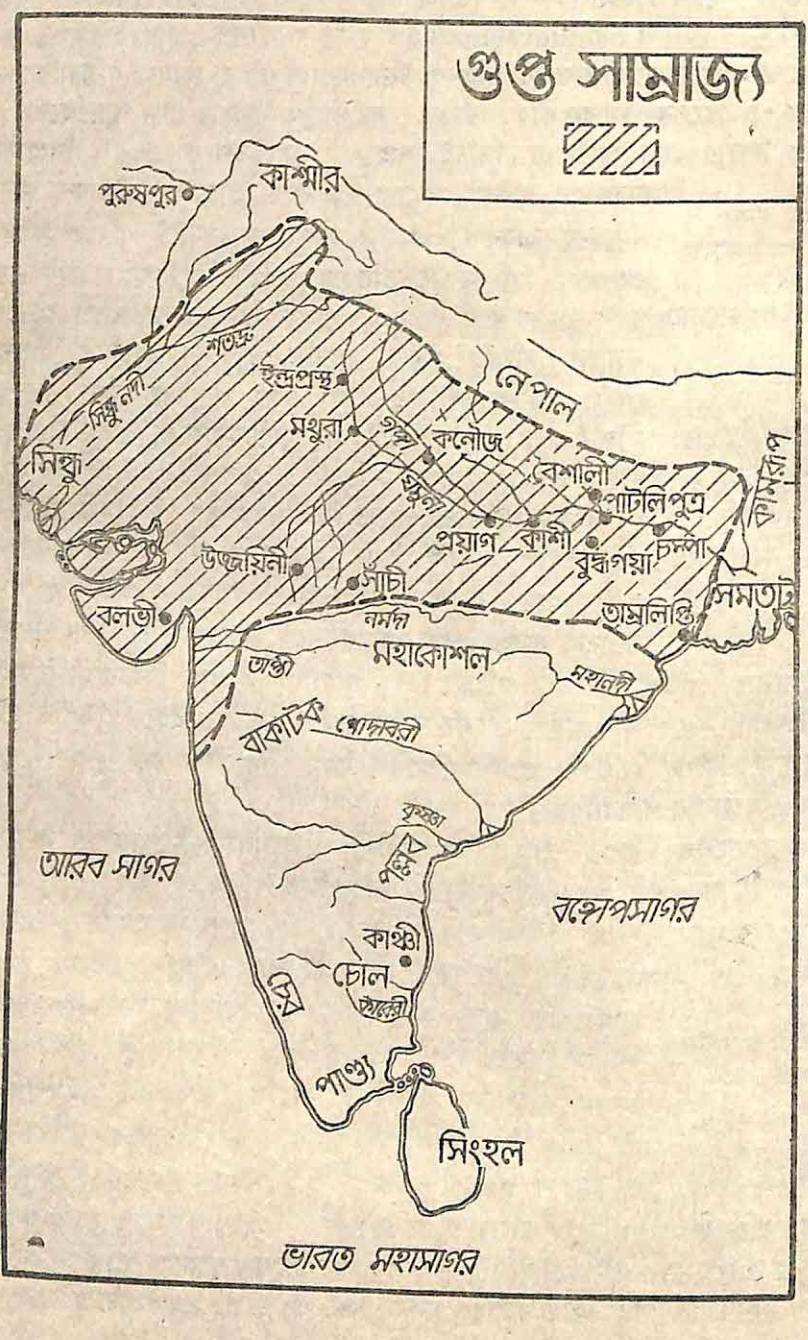
দাক্ষিণাত্য

সমুদ্রগুপ্তের বিজয় অভিযানের সাফল্য প্রতিবেশী, বিশেষভাবে ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় রাজগণের মনে ভীতির উদ্রেক করিয়াছিল। সমতট—অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের একাংশ, কামরূপ, দাভক (ঢাকা ?) প্রভৃতি স্থানের রাজগণ সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন মদ্রক, আভির, প্রার্জুন, যৌধেয় প্রভৃতি উপজাতীয় দলও সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। পশ্চিম ভারতের মালব, সৌরাষ্ট্র, দক্ষিণ ভারতের প্রতিবেশী রাজ্য সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতির রাজগণও সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য মানিয়া চলিতেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ সমুদ্রগুপ্তের অনুমতিক্রমে বোধগয়ায় একটি মঠ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দেশে কুষাণ বংশধরগণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহারাও সমুদ্রগুপ্তের প্রাধান্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এইভাবে সমুদ্রগুপ্তের আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত, পশ্চিমে যমুনা হইতে পূর্বে

প্রতিবেশী রাজ্যগুলির আনুগত্য

ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বিজেতা হিসাবে তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বস্তুত, নেপোলিয়নের মতই তিনি ছিলেন সমর-কুশল সেনাপতি, সাম্রাজ্য সংগঠক এবং কেন্দ্রীভূত শাসনের সহিত স্থানীয় শাসনাধিকারের মধ্যে সমন্বয়সাধক।

ভারতের নেপোলিয়ন



সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্বিজয়ী বীরই ছিলেন না। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা, সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতি অনুরাগ, সুদক্ষ শাসনক্ষমতা প্রভৃতির জন্য তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয় শেষ করিয়াই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগ থাকিলেও তিনি অপরাপর ধর্মের প্রতিও পরম শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। তিনি স্বয়ং কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এজন্য তিনি তদানীন্তন বিদ্বজ্জন সমাজে 'কবিরাজ' —অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবি নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে যে তাঁহার অনুরাগ ছিল তাহা তাঁহার বীণাবাদনরত মুদ্রা হইতে অনুমিত হইয়া থাকে। সমুদ্রগুপ্তের রাজসভা তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত হরিষেণ কর্তৃক অলংকৃত ছিল। হরিষেণ-রচিত 'এলাহাবাদ-প্রশস্তি'তে সমুদ্রগুপ্তের শাসনকালের এবং সমুদ্রগুপ্তের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের একটি নিখুঁত চিত্র পাওয়া যায়। এলাহাবাদে একটি পাথরের স্তম্ভে এই প্রশস্তিটি খোদাই করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু সমুদ্রগুপ্তের অযাচিত সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। ব্যক্তিত্ব, চরিত্রের ক্ষমতা, বীরত্ব, সমর-কুশলতা, সাহিত্য-শিল্প প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা—এই সকল বিভিন্ন দিক্ দিয়া সমুদ্রগুপ্ত ভারতীয় রাজগণের অন্যতম প্রধান হিসাবে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। এই সকল কারণেই ঐতিহাসিকগণ তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। চতুর্থ শতকের শেষভাগে (৩৭৫ ও ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে) তাঁহার মৃত্যু হয়।

সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

ভারতীয় রাজগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' (Chandragupta II 'Vikramaditya'): সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। পিতামহ প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পদাংক অনুসরণ করিয়া দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বৈবাহিক সূত্রে নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়াছিলেন। নাগ ও কদম্ব বংশের রাজকন্যাদের বিবাহ করিবার ফলে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শক্তি ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহা ভিন্ন বাকাটকরাজ রুদ্রসেনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া তিনি শকদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের পথ সহজ করিয়াছিলেন। শক দলপতিকে তিনি তাহার নিজ দেশের সীমার মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন সেজন্য তাঁহার উপাধি হইয়াছিল 'সাহসাংক' ও 'শকারি'।

বৈবাহিক সূত্রে, শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তারের উদ্দেশ্যে স্বীয় সেনাপতি বীরসেন সাবের সহিত যুগ্মভাবে মালব, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয় করিয়াছিলেন। তিনি উজ্জয়িনীতে একটি বিকল্প রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। গুপ্ত শাসনকালেও পাটলিপুত্র ছিল সাম্রাজ্যের প্রধান রাজধানী।

মালব, গুজরাট ও সৌরাষ্ট্র জয়

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বিবরণে পাটলিপুত্র নগর এবং বিশেষত মৌর্য সম্রাট্গণ নির্মিত

প্রাসাদের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা সমসাময়িক কালের বহু বিদ্বান্ মনীষী কর্তৃক অলংকৃত ছিল। কালিদাস প্রভৃতি নবরত্ন তাঁহার সভা অলংকৃত করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কাহিনী-কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য কি না সে-বিষয়ে কতক মতদ্বৈধ থাকিলেও আধুনিক ঐতিহাসিকগণ এই দুইজন এক ও অভিন্ন একথা মনে করেন। চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের শাসনব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হইয়াছে।

পাটলিপুত্র নগরের সৌন্দর্য

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজসভা

ফা-হিয়েনের বিবরণ (Fa-hien's Account): চীনে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের পর হইতে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তিস্থল ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থাদি সংগ্রহের জন্য পর পর বহু চৈনিক পরিব্রাজক আসিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে ফা-হিয়েন ছিলেন অন্যতম প্রধান। তিনি প্রায় দশ বৎসর (৪০১-৪১০ খ্রীঃ) এদেশে বাস করিয়াছিলেন। এই দশ বৎসরের মধ্যে ছয় বৎসর তিনি বিক্রমাদিত্যের সাম্রাজ্যে অতিবাহিত করেন। বাংলাদেশের তাম্রলিপ্ত বন্দরে তিনি দীর্ঘ তিন বৎসর ছিলেন।

ফা-হিয়েনের বিবরণে গুপ্ত শাসনের ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। গুপ্তরাজগণ এক অতি উদার শাসনব্যবস্থা স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। দেশের সর্বত্র শান্তি বিরাজিত ছিল। সমাজবিরোধী কার্যকলাপ, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি সেই সময়ে একপ্রকার ছিলই না। দণ্ডবিধির উদারতায় ফা-হিয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে অপরাধীর প্রাণদণ্ড দেওয়ার কোন প্রয়োজন হইত না। কঠোর অপরাধের শাস্তি ছিল অর্থদণ্ড। দেশের অভ্যন্তরে চলাচলের অবাধ স্বাধীনতা ছিল।

উদার শাসনব্যবস্থা : শান্তি ও সমৃদ্ধি

ফসলের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজকর্মচারিগণ নিয়মিত বেতন পাইতেন। শাসনকার্যে দক্ষতা এবং রাজকর্মচারিগণের কর্তব্যপরায়ণতা দেখিয়া ফা-হিয়েন অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। পাটলিপুত্র নগরীতে মৌর্য প্রাসাদ দেখিয়া তিনি এরূপ বিস্মিত হইয়াছিলেন যে উহা মানুষের দ্বারা নির্মিত নহে—এই মন্তব্য তিনি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মথুরায় তিনি বহু বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এগুলিতে তখন বহু সংখ্যক (৩ হাজার) বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিতেন। উত্তর ও পূর্ব ভারতের সর্বত্র বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল। একমাত্র চণ্ডাল শ্রেণী ব্যতীত মদ, মাংস তখন কেহ স্পর্শ করিত না এবং পিঁয়াজ, রসুন প্রভৃতিও কেহ খাইত না। জনসাধারণ কোন বিচারালয়ের ধার ধারিত না। জিনিসপত্র ক্রয়বিক্রয়ে রেজিস্ট্রি করিবার কোন প্রয়োজন হইত না। জনসাধারণ রাত্রিতে ঘরের দরজা-জানালা খোলা রাখিয়া নিদ্রা যাইত। রাস্তায় সোনা ফেলিয়া রাখিলেও কেহ তাহা লইত না। এই সকল উক্তি হইতে সে-যুগের জনসাধারণ যে অত্যন্ত সৎ এবং সন্তোষপূর্ণ জীবনযাপন করিত সে-বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল সেই সময়কার সমাজ-জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। গুপ্তরাজগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন বটে, কিন্তু বৌদ্ধ

রাজস্ব

শাসনকার্যে দক্ষতা

বৌদ্ধ ধর্ম-প্রভাবিত জীবনযাত্রা

জনসাধারণের সন্তোষ

পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁহাদের পরম উদারতা প্রদর্শনের কথা ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সময়ে জাতিভেদ-প্রথা কঠোর হইয়া উঠিয়াছিল। চণ্ডাল প্রভৃতি নীচ জাতির লোকদের অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণা করা হইত।

জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা খুবই সচ্ছল ছিল। তাহাদের সততা ও সৎকার্যে কালাতিপাতের কথাও ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছিলেন। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে দেশের বিভিন্ন অংশ রাজপথ দ্বারা সংযোজিত ছিল। রাজপথের পার্শ্বে পান্থশালা প্রভৃতিও স্থাপন করা হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে দাতব্য চিকিৎসারও ব্যবস্থা ছিল। ফা-হিয়েন পাটলিপুত্র নগরে একটি বিরাট দাতব্য চিকিৎসালয় দেখিতে পাইয়াছিলেন।

আর্থিক অবস্থা
পরিবহণব্যবস্থা
দাতব্য চিকিৎসালয়

পরবর্তী গুপ্তরাজগণ (The Later Guptas): দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালের পর প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনকাল সম্পর্কে বিশেষ কোন বিবরণ জানা যায় নাই। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং পরধর্মের প্রতি পরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তাঁহার রাজত্বকালে পুষ্যমিত্র জাতি গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। রাজকুমার স্কন্দগুপ্ত পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণ প্রতিহত করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত শক্তিশালী রাজা। তিনি পুষ্যমিত্র জাতির আক্রমণে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন গুপ্ত সাম্রাজ্য পুনর্গঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন হূণ আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য তিনি সীমান্ত রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তই ছিলেন গুপ্ত বংশের সর্বশেষ পরাক্রমশালী রাজা। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত বংশের পতন শুরু হয়। ক্রমে দুর্বল হইতে দুর্বলতর রাজগণের অধীনে গুপ্ত বংশের সাম্রাজ্য বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে জীবিতগুপ্তের (দ্বিতীয়) আমলে উহার বিলুপ্তি ঘটে। পরবর্তী কালেও গুপ্ত উপাধিধারী স্থানীয় রাজগণের পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পরবর্তী গুপ্ত বংশের পতন জীবিতগুপ্তের (দ্বিতীয়) আমলেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

প্রথম কুমারগুপ্ত
স্কন্দগুপ্ত
জীবিতগুপ্ত (দ্বিতীয়)

কনৌজের অধীনে (Under Kanauj)

গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ হইতে যে-সকল রাজ্যের উত্থান ঘটিয়াছিল সেগুলির মধ্যে কনৌজ, বঙ্গদেশ বা গৌড়, কাশ্মীর, বলভী, বাকাটক প্রভৃতি রাজ্য উল্লেখযোগ্য।

পুষ্যভূতি হর্ষবর্ধন হইতে প্রতিহার মহেন্দ্রপাল (From Pushyabhuti Harshavardhana to Pratihara Mahendrapala): কনৌজের মৌখরি বংশ গুপ্ত সম্রাট্‌দের সামন্তরাজ ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে এই বংশ উত্তর ভারতে অন্যতম শক্তিশালী রাজ্য হিসাবে গড়িয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। এই বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন হরিবর্মন। ঈশ্বরবর্মন, ঈশানবর্মন, সর্ববর্মন, অবন্তীবর্মন,

গ্রহবর্মন—দেবগুপ্ত কর্তৃক নিহত

গ্রহবর্মন প্রভৃতি ছিলেন এই বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা। গ্রহবর্মন থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের রাজকন্যা রাজ্যশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মালবরাজ দেবগুপ্তের হস্তে তিনি নিহত হইলে কনৌজ থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের অধীন হইয়া গিয়াছিল।

পুষ্যভূতি বংশের রাজা প্রভাকরবর্ধন ছিলেন সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য নরপতি। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগ হইতে পুষ্যভূতি বংশ থানেশ্বর নামক স্থানে ক্রমেই শক্তিশালী হইয়া উঠিতে থাকে। গুপ্ত বংশের সহিত পুষ্যভূতি বংশের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল। প্রভাকরবর্ধন কনৌজের মৌখরি বংশের সহিতও সম্পর্কিত ছিলেন। মৌখরি বংশের রাজা গ্রহবর্মনের সহিত তিনি নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ দিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্ধনের দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন ইতিহাস-বিখ্যাত হর্ষবর্ধন।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র রাজ্যবর্ধন (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (৬০৫ খ্রীঃ)। সেই সময়ে মালব ও কনৌজের মধ্যে তীব্র বিরোধিতা চলিতেছিল। মালবরাজ দেবগুপ্ত গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেন এবং কনৌজরাজ গ্রহবর্মনকে পরাজিত ও নিহত করেন। এমনকি, তাঁহার রাণী রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করিয়া রাখেন। রাজ্যবর্ধন ভগিনীপতিহন্তা দেবগুপ্তকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে দেবগুপ্ত পরাজিত হইলেন, কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইলেন।

রাজ্যবর্ধন

হর্ষবর্ধন, ৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ (Harshavardhana): রাজ্যবর্ধনের আকস্মিক মৃত্যুতে (৬০৬ খ্রীঃ) তাঁহার ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। গ্রহবর্মনের মৃত্যুতে কনৌজের সিংহাসনও শূন্য হইয়া গিয়াছিল। তথাকার সভাসদ্‌গণের ইচ্ছানুক্রমে কনৌজ রাজ্য থানেশ্বর রাজ্যের সহিত সংযুক্ত হইল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হর্ষবর্ধন ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শশাঙ্কের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই সংবাদ পাইলেন যে, রাজ্যশ্রী বন্দিদশা হইতে মুক্ত হইয়া বিন্ধ্য পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হর্ষবর্ধন কাল বিলম্ব না করিয়া ভগিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বিন্ধ্য পর্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। পার্বত্য জাতির লোকদের সাহায্যে তিনি শেষ পর্যন্ত ভগিনীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে সমর্থ হইলেন। রাজ্যশ্রীকে লইয়া তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার কিছুকাল পরই তিনি থানেশ্বর হইতে কনৌজে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন।

হর্ষবর্ধনের সিংহাসনলাভ

রাজ্যশ্রীর উদ্ধার

ভ্রাতৃহন্তা শশাঙ্ককে তখনও শাস্তি দেওয়া হয় নাই। এজন্য তিনি প্রথমে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন, কিন্তু ভাস্করবর্মনের সহায়তা গ্রহণ করিয়াও তিনি গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের অনিষ্টসাধন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা

হর্ষবর্ধন দীর্ঘ ছয় বৎসর অবিরত যুদ্ধ করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি বলভীর রাজা ধ্রুবসেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া সাময়িকভাবে বলভী রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেশী দিন তিনি এই প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। বলভীরাজ ধ্রুবসেন নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া লইয়াছিলেন। ধ্রুবসেন ও হর্ষবর্ধনের মধ্যে আত্মীয়তা স্থাপিত হওয়ার পর এই দুই রাজ্যের পরস্পর দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। সিন্ধুদেশেও সাময়িকভাবে হর্ষবর্ধনের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল বলিয়া বাণভট্টের হর্ষচরিতে উল্লিখিত আছে। হর্ষবর্ধন 'তুষারশৈল'—অর্থাৎ কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়াও প্রমাণ পাওয়া যায়। পানিক্কারের মতে নেপালও হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। দাক্ষিণাত্যের দিকে হর্ষবর্ধনের বিজয় অভিযান চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক প্রতিহত হইয়াছিল। হর্ষবর্ধন মগধ, কঙ্গোদ প্রভৃতি স্থানও নিজ অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন।

হর্ষবর্ধনের দিগ্বিজয়

দ্বিতীয় পুলকেশীর হস্তে পরাজয়



হর্ষবর্ধন

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার হিউয়েন সাঙের বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, সাধারণত হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে যে ধারণা আছে তাহা ভ্রান্ত। তাঁহার মতে হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য পূর্ব-পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ, মগধ, উড়িষ্যা ও কঙ্গোদ লইয়া গঠিত ছিল। বাংলাদেশের উপর হর্ষবর্ধনের অধিকার ছিল কি না সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে একথা ডক্টর মজুমদার মনে করেন।

হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে মতানৈক্য

হর্ষবর্ধন কেবল বীরযোদ্ধা হিসাবেই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এমন নহে। সুশাসক হিসাবেও তিনি সমধিক প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্যের সুষ্ঠু শাসন বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন। শাসনকার্য পরিচালনা ব্যাপারে তাঁহার এই অক্লান্ত চেষ্টার কথা চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের বর্ণনায়ও পাওয়া যায়। মৌর্য বা গুপ্ত আমলের মতই হর্ষবর্ধনের কালে শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক—এই দুই ভাগে বিভক্ত ছিল।

শাসনব্যবস্থা

ধর্ম বিষয়ে হর্ষবর্ধন প্রাচীন ভারতীয় সহিষ্ণুতা-নীতি অনুসরণ করিতেন। তিনি প্রথম জীবনে শৈব ছিলেন এবং পরে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইয়াছিলেন। কিন্তু অপরাপর ধর্মের প্রতিও তাঁহার গভীর শ্রদ্ধা ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি গভীর অনুরাগ সত্ত্বেও তিনি শিব এবং সূর্যের উপাসনা

ধর্ম-নীতি

করিতেন।* প্রজাবর্গের সুবিধার্থ রাস্তাঘাট নির্মাণ করাইয়া উহার পার্শ্বে সরাইখানা, বিশ্রামাগার তিনি স্থাপন করাইয়াছিলেন। তিনি চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের সম্মানার্থ কনৌজে এক ধর্মসভার আয়োজন করেন। এই ধর্মসভায় ভাস্করবর্মন, বলভীর ধ্রুবসেন প্রভৃতি মোট আঠার জন করদ-মিত্র রাজা উপস্থিত ছিলেন।

জনকল্যাণকর কার্যাদি
কনৌজের ধর্মসভা

কনৌজের ধর্মসভার পর হর্ষবর্ধন গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থল প্রয়াগে তাঁহার পঞ্চবার্ষিক মেলার আয়োজন করেন। হিউয়েন সাঙ্‌কেও এই মেলায় আমন্ত্রণ করা হইয়াছিল। দীর্ঘ ৭৫ দিন ধরিয়া এই মেলার অনুষ্ঠান চলিয়াছিল। বুদ্ধ, সূর্য ও শিবের উপাসনা এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্র ও বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী, সাধু-সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুদের তিনি নানাবিধ মূল্যবান সামগ্রী দান করিয়াছিলেন। পাঁচ বৎসরের রাজস্বের উদ্বৃত্ত অর্থ সম্পূর্ণভাবে দান করিয়া, এমনকি, একখানি সাধারণ বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহার নিজের মূল্যবান রাজকীয় বস্ত্রখানিও তিনি দান করিয়া দিতেন।

প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিক মেলা

হর্ষচরিত-রচয়িতা বাণভট্ট এবং চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ হর্ষবর্ধনের সাহিত্যসেবা ও সাহিত্যানুরাগ এবং সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতার উল্লেখ করিয়াছেন। নাগানন্দ, প্রিয়দর্শিকা ও রত্নাবলী—এই তিনখানি নাটক তিনি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন। বাণভট্ট, ময়ূর এবং আরও বহু সাহিত্যসেবী হর্ষবর্ধনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

সাহিত্যানুরাগ ও সাহিত্যসেবা

ধর্মের ব্যাপারেও হর্ষবর্ধন ছিলেন অত্যন্ত উদার। তিনি নিজে যেমন শিব, সূর্য ও বুদ্ধের উপাসনা করিতেন তেমনি সকল ধর্মের প্রতি তিনি পরম সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন।

ধর্ম-সহিষ্ণুতা

হিউয়েন সাঙ্‌ (Hiuen Tsang): চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্‌ বৌদ্ধ তীর্থ ভারতবর্ষ পরিভ্রমণে আসিয়া দীর্ঘ চৌদ্দ বৎসর বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং বুদ্ধের জীবনের সহিত জড়িত সকল স্থানে ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া নিজ দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সময়কার ভারতবর্ষ সম্পর্কে এক তথ্যবহুল বিবরণ তিনি লিখিয়াছেন।

হিউয়েন সাঙের ভারত পর্যটন (৬৩০-৪৪ খ্রীঃ)

উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজ্যসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া হিউয়েন সাঙ্‌ বারাণসী নগরে উপস্থিত হন। জনবহুল বারাণসী নগরে তিনি বহু হিন্দু মন্দির দেখিতে পান। হিন্দু ধর্মের প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও তিনি সেখানে বৌদ্ধ মঠ ও বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংখ্যাও যে নেহাৎ কম ছিল না তাহা উল্লেখ করিয়াছেন। মৌর্য আমলের পাটলিপুত্র নগরী, বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তিনি গিয়াছিলেন। নালন্দা ছিল তখনকার শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। এখানে হিউয়েন সাঙ্‌ দীর্ঘ পাঁচ বৎসর অধ্যক্ষ শীলভদ্রের

হিউয়েন সাঙের বিভিন্ন শহর পরিভ্রমণ

* Vide *An Advanced History of India*, p. 152 (3rd Edn. 1967).

নিকট বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নে কাটান। সেই সময়ে চীন, তিব্বত, যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি দেশ হইতে বহু ছাত্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য আসিতেন।


হিউয়েন সাঙ্

তাম্রলিপ্ত বাংলার শ্রেষ্ঠ বন্দর

তাম্রলিপ্ত বন্দরকে হিউয়েন সাঙ্ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। দক্ষিণ-পূর্ব-এশীয় দ্বীপগুলিতে ভারতীয় বণিকগণ তাম্রলিপ্ত হইতে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে যাতায়াত করিতেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী ও হর্ষবর্ধন শ্রেষ্ঠ রাজা

হিউয়েন সাঙ্ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি দ্বিতীয় পুলকেশী ও হর্ষবর্ধনকে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ দুইজন রাজা হিসাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

কনৌজ ও প্রয়াগের ধর্মানুষ্ঠান

হিউয়েন সাঙের সম্মানার্থে হর্ষবর্ধন কনৌজে এক ধর্মসভা আহবান করিয়াছিলেন এবং প্রয়াগের পঞ্চবার্ষিক ধর্মমেলায় হিউয়েন সাঙ্‌কে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। এই উভয় অনুষ্ঠানের বর্ণনা হিউয়েন সাঙের বিবরণে পাওয়া যায়।

দণ্ডবিধির কঠোরতা

দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্ত্বেও হর্ষবর্ধনের শাসনব্যবস্থা যে উদার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং কৃষকদের পীড়নের কোন প্রমাণ যে তিনি পান নাই, এইসব কথা বিদেশী পর্যটকের বর্ণনায় পাওয়া ভারতবাসীর শ্লাঘার বিষয়। জমির উৎপন্নের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করা হইত। রাজ-

উদার শাসনব্যবস্থা

কর্মচারিগণ বেতনের পরিবর্তে জমি ভোগদখল করিতেন, কিন্তু এইভাবে যে সামন্তব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সামন্তপ্রথার অত্যাচারী দিক্‌টা মোটেই ছিল না। শ্রমের অনুপাতে সকলকে পারিশ্রমিক দেওয়া হইত।

ফসল ও ফল

কৃষিজাত ফসলের মধ্যে ধান, গম, সরিষা, আদা, লাউ, কুমড়া ; ফলের মধ্যে আম, আপেল, বেদানা, পেয়ারা, তরমুজ, আঙুর, কমলালেবু প্রভৃতির উল্লেখ হিউয়েন সাঙের বিবরণে পাওয়া যায়।

ভারতবাসীর সততা ও সরলতা

ভারতবাসীর সততা, ব্যবহারিক সরলতা, সহজ জীবনযাপন প্রভৃতির কথা হিউয়েন সাঙ্ উল্লেখ করিয়াছেন। রাস্তাঘাট অবশ্য পূর্বেকার মত ততটা নিরুপদ্রব ছিল না।

প্রতিহার সাম্রাজ্য

হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কালে কনৌজের সাম্রাজ্য আভ্যন্তরীণ দুর্বলতার ফলে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। প্রায় অর্ধ-শতাব্দী কাল পর কনৌজের রাজনৈতিক ইতিহাসের অস্পষ্টতা যখন দূর হইল তখন কনৌজের সিংহাসনে যশোধর্মন অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

রাষ্ট্রকুট-পাল-প্রতিহার দ্বন্দ্ব (Conflict between Rastra-Kuta-Pala-Pratihar): হর্ষবর্ধনের আমলে কনৌজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রধান নগরীতে পরিণত হয়। সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসাবে কনৌজ হর্ষবর্ধনের অধীনে যে গৌরব অর্জন করিয়াছিল হর্ষের পরবর্তী যুগে সাময়িকভাবে উহা বিস্মৃতির অন্তরালে থাকিলেও কনৌজ ভারতের সাম্রাজ্যিক মর্যাদার কেন্দ্রস্থল হিসাবে বিবেচিত হইতে লাগিল। এই কারণে হর্ষবর্ধনের পরবর্তী কালে যে তিনটি হিন্দু সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলির পারস্পরিক রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা কনৌজকে কেন্দ্র করিয়াই সৃষ্টি হইয়াছিল। কনৌজ অধিকার করা সাম্রাজ্যের মর্যাদার দিক্ দিয়া অপরিহার্য বলিয়া বিবেচিত হইত। দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটশক্তি, বাংলার পালবংশ এবং গুর্জর দেশের প্রতিহার রাজগণের মধ্যে কনৌজ অধিকার করিবার এক ত্রি-পাক্ষিক দ্বন্দ্বের সূচনা হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগ হইতে দশম শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত উপরি-উক্ত তিনটি শক্তির মধ্যে ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্যলাভের আশা-আকাঙ্ক্ষা কনৌজকে কেন্দ্র করিয়াই আবর্তিত হইয়াছিল।

কনৌজকে কেন্দ্র করিয়া রাষ্ট্রকূট-পাল-প্রতিহার বংশের ত্রি-পাক্ষিক দ্বন্দ্ব

প্রথমে রাষ্ট্রকূট শক্তির অভ্যুত্থান ঘটে। প্রথম ইন্দ্রের পুত্র দন্তিদুর্গের রাজত্বকালেই রাষ্ট্রকূট-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। দন্তিদুর্গ চালুক্য সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া এবং সমগ্র দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া রাষ্ট্রকূট শক্তিকে সাম্রাজ্যের মর্যাদায় স্থাপন করেন। ঐ সময়ে বাংলার পালবংশের রাজা ধর্মপাল বাংলা রাজ্যকে এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করিয়াছেন। কিছুকালের মধ্যে রাজপুতানার গুর্জর-প্রতিহার বংশ উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তারে মনোযোগী হয়। গুর্জর-প্রতিহার রাজা বৎসরাজ কনৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। তিনি কনৌজের তদানীন্তন রাজা ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ দখল করিলেও ইন্দ্রায়ুধকেই নিজ তাঁবেদার রাজা হিসাবে কনৌজের সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন। বৎসরাজের সাফল্যে ঈর্ষাকাতর হইয়া পালরাজ ধর্মপাল বৎসরাজের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন কিন্তু যুদ্ধে তাঁহার হস্তে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। কিন্তু ধর্মপাল পুনরায় বৎসরাজের বিরুদ্ধে অভিযানে অগ্রসর হন। এদিকে রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কনৌজ দখল করিবার উদ্দেশ্যে সসৈন্যে অগ্রসর হন। বৎসরাজ এবং ধর্মপাল উভয়েই ধ্রুবের হস্তে পরাজিত হইলেন কিন্তু ধ্রুব নিজ রাজধানী হইতে কনৌজের দূরত্ব এবং নিজের বৃদ্ধাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কনৌজ অধিকার না করিয়াই দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া গেলেন (৭৯০ খ্রীঃ)। ধর্মপাল নিজ পরাজয়ের গ্লানি শীঘ্রই দূর করিয়া পুনরায় কনৌজের দিকে অগ্রসর হইলেন। এইবার তিনি কনৌজ অধিকার করিয়া ইন্দ্রায়ুধকে সিংহাসন হইতে অপসারিত করেন এবং নিজ তাঁবেদার চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। কিন্তু গুর্জর-প্রতিহার রাজা নাগভট্ট (২য়) চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন হইতে বিতাড়িত করিয়া সেখানে নিজ রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রাধান্য

ত্রি-পাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা

বিভিন্ন সময়ে ত্রি-পাক্ষিক দ্বন্দ্বে বিভিন্ন পক্ষের সাফল্য অর্জন

দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কনৌজ আক্রমণ করিয়া দ্বিতীয় নাগভট্টকে পরাজিত করেন। পাল রাজবংশও গোবিন্দের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কনৌজের উপর রাষ্ট্রকূট প্রাধান্যও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। প্রতিহার বংশের অর্থাৎ গুর্জর-প্রতিহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগভট্টের পৌত্র প্রথম ভোজ ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কনৌজের সিংহাসনে নিজেকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করেন এবং প্রতিহার সাম্রাজ্য বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। তিনি বাংলার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র প্রথম মহেন্দ্রপাল পিতার সাম্রাজ্য-সীমা যে কেবল অপরিবর্তিত রাখিয়াছিলেন তাহাই নহে পূর্ব দিকে তিনি সাম্রাজ্য-সীমা আরও বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রতিহার শাসনাধীনে কনৌজ রাজনৈতিক শক্তি, সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ এবং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে উন্নতির শিখরে পৌঁছিয়াছিল।

সর্বশেষে কনৌজে প্রতিহার প্রাধান্য স্থাপন

গৌড়ের অধীনে (Under Gauda)

শশাঙ্ক হইতে দেবপাল (From Sasanka to Devapala): গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে বাংলাদেশে প্রথমে পূর্ববঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ অংশ লইয়া 'বঙ্গ' নামে একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ফরিদপুরের কোটালিপাড়া ও বর্দ্ধমান জেলায় প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে এই রাজ্যের তিনজন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে—যথা, গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব। ইঁহাদের পরস্পর সম্পর্ক কি ছিল তাহা সঠিক জানা যায় নাই। তাঁহাদের মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ হইতে মনে হয় যে, তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজা ছিলেন। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের আমলে সম্ভবত বঙ্গ রাজ্য তাঁহার অধীন হইয়া পড়িয়াছিল।*

সূচনা

বঙ্গ: গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব

গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শশাঙ্ক। সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে পরবর্তী গুপ্ত বংশের (Later Guptas) রাজা মহাসেনগুপ্তের শাসনকালে শশাঙ্ক নামে তাঁহারই এক বাঙালী সামন্তরাজ গৌড়ে এক স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক কেবল স্বাধীন গৌড় রাজ্যের স্থাপয়িতাই ছিলেন না, তিনি গৌড়কে একটি সাম্রাজ্যে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি নামক স্থানটি সে-যুগে কর্ণসুবর্ণ নামে পরিচিত ছিল। গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক ছিলেন সম্রাট্ হর্ষবর্ধনের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। কনৌজের মৌখরি বংশের সাম্রাজ্য-স্পৃহা হইতে নিজ রাজ্য রক্ষা করাই ছিল শশাঙ্কের মূল উদ্দেশ্য। মালবরাজ দেবগুপ্তকে তিনি সপক্ষে টানিয়া মৌখরি বংশের বিরুদ্ধে নিজ শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্যেই দেবগুপ্ত মৌখরিরাজ গ্রহবর্মনকে

গৌড়: শশাঙ্ক

মালবরাজ দেবগুপ্ত ও শশাঙ্কের মিত্রতা

* *Classical Age*, p. 79.

পরাজিত ও নিহত করেন। রাজ্যবর্ধন এজন্য দেবগুপ্তের রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দেবগুপ্তের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। কিন্তু এই বিজয়ের অব্যবহিত পরেই দেবগুপ্তের মিত্র রাজা শশাঙ্কের হস্তে রাজ্যবর্ধন প্রাণ হারাইলেন। রাজ্যবর্ধনের ভ্রাতা হর্ষবর্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই ভ্রাতৃহন্তা গৌড়রাজ শশাঙ্ককে সমুচিত শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মনের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু শশাঙ্কের জীবদ্দশায় হর্ষবর্ধন বা ভাস্করবর্মন তাঁহার কোন ক্ষতিসাধন করিতে পারেন নাই। ৬১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৌড়, উৎকল, মগধ ও কঙ্গোদ শশাঙ্কের অধীনে ছিল বলিয়াই জানিতে পারা যায়।

শশাঙ্ক কর্তৃক রাজ্যবর্ধন নিহত

হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে শশাঙ্কের আত্মরক্ষার সামর্থ্য

শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তিনি তেমন উদারতা প্রদর্শন করেন নাই। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছিল ; পাল বংশের উত্থানের পূর্বাবধি এই অরাজকতা অপ্রতিহতভাবে চলিতেছিল।

শশাঙ্কের পরবর্তী কালে অরাজকতা

গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর পর কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন গৌড় রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। নিধনপুর তাম্রশাসনে ভাস্করবর্মন বঙ্গ রাজ্যের রাজা জ্যেষ্ঠভদ্রকে সামন্তরাজ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে ভাস্করবর্মন সাময়িক কালের জন্য বঙ্গ রাজ্যেরও আনুগত্যলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। অবশ্য অল্পকালের মধ্যেই বঙ্গ রাজ্য স্বাধীন হইয়া পড়িয়াছিল মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু ইহার পর অধিককাল জ্যেষ্ঠভদ্রের বংশধরগণ বঙ্গ রাজ্যে রাজত্ব করিবার সুযোগ পান নাই। খড়্গ বংশ নামে অপর এক বংশ কর্তৃক ভদ্র বংশ সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিল। খড়্গ বংশের রাজা ললিতচন্দ্রের রাজত্বকালে কনৌজের যশোবর্মন বঙ্গ রাজা আক্রমণ করিয়া উহার আনুগত্য আদায় করিয়াছিলেন। অবশ্য তাঁহার এই প্রাধান্য অতি অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল। খড়্গ বংশের রাজা ললিতচন্দ্রের মৃত্যুর পর বঙ্গ রাজ্যে পুনরায় এক ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়াছিল।

ভদ্র বংশ—জ্যেষ্ঠভদ্র

খড়্গ বংশ—ললিতচন্দ্র

যাহা হউক, শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড় রাজ্য রক্ষা করিবার মত আর কোন ক্ষমতাশালী শাসকের উদ্ভব ঘটে নাই। শশাঙ্কের পরবর্তী কালে বাংলাদেশের সর্বত্র এক ব্যাপক অরাজকতা ও অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল। এই সময়ে বাংলাদেশের অবস্থাকে 'মাৎস্য-ন্যায়' নামে অভিহিত করা হইয়া থাকে। বড় মাছ যেমন ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে সেইরূপ ধনী দরিদ্রের উপর, শক্তিশালী দুর্বলের উপর অপ্রতিহতভাবে অত্যাচার চালাইতেছিল, তাহাদের সম্পত্তি গ্রাস করিতেছিল। ক্ষত্রিয়, অভিজাত শ্রেণী, বণিক সম্প্রদায় ও ব্রাহ্মণগণ সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিবার ফলে বাংলাদেশে এক ঘোর দুর্দিন দেখা দিয়াছিল। এই দুর্বলতার সুযোগে শৈলোদ্ভব বংশের রাজগণ, চন্দেল্লরাজ যশোবর্মন, জয়াপীড় প্রভৃতি বাংলাদেশ আক্রমণ করিতে স্বভাবতই সাহসী হইয়াছিলেন।

'মাৎস্য-ন্যায়'

বৈদেশিক আক্রমণ

দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরিয়া এইরূপ অরাজকতা চলিতে থাকিলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে বাংলার নেতৃবর্গ দেশের মঙ্গল চিন্তা করিয়া সম্মিলিতভাবে গোপাল নামে জনৈক প্রতিপত্তিশালী স্থানীয় রাজাকে বাংলার সিংহাসনে স্থাপন করিলেন (৭৫০ খ্রীঃ)। দেশ ও দশের স্বার্থের কথা ভাবিয়া বাংলার নেতৃবর্গের গণতান্ত্রিক উপায়ে গোপালকে সিংহাসনে স্থাপন সেই যুগের বাঙালী জাতির জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের অতি চমৎকার দৃষ্টান্ত, বলা বাহুল্য। গোপালের ন্যায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির উপর বাংলার শাসনভার অর্পণ করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের মানসিক উৎকর্ষ ও দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

গোপালের নির্বাচন (৭৫০ খ্রীঃ)

বাঙালীর দেশাত্মবোধ

গোপাল, ৭৫০-৭৭০ খ্রীঃ (Gopala) : ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের সিংহাসনে গোপালের নির্বাচন বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা সন্দেহ নাই। সিংহাসনে নির্বাচিত হইয়াই গোপাল বাংলাদেশের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা দূর করিবার উদ্দেশ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনে মনোযোগী হইলেন। তাঁহার রাজত্বকাল প্রধানত শান্তি-শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। তাঁহার শাসনকালের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। খালিমপুর তাম্রশাসনে গোপালের পত্নীকে চন্দ্র, অগ্নি, কুবের, ইন্দ্র, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার পত্নীদের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইহা হইতে গোপাল ইন্দ্র, বিষ্ণু, অগ্নি, কুবের প্রভৃতি দেবতার ন্যায় ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন, একথা অনুমান করা ভুল হইবে না। মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনে গোপালের রাজ্য 'সমুদ্র পর্যন্ত' বিস্তৃত ছিল একথা উল্লিখিত আছে। ইহা হইতে তাঁহার রাজ্যের বিস্তৃতি সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নহে। যাহা হউক, গোপাল বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অরাজকতা দূর করিয়া বঙ্গ রাজ্যকে সংহতি দান করিয়াছিলেন একথা অনায়াসে স্বীকার করা যায়। গোপাল ঠিক কত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানা যায় না।* মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বকাল শেষ হইয়াছিল।

খালিমপুর তাম্রশাসন

গোপাল কর্তৃক শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন

ধর্মপাল, ৭৭০-৮১০ খ্রীঃ (Dharmapala) : গোপালের পুত্র ধর্মপাল আনুমানিক ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার আমলেই বাংলার পাল রাজ্য উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছিয়াছিল। তিনি বাংলাদেশকে উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের রচনায় উল্লেখ আছে যে, ধর্মপাল উত্তরে বঙ্গোপসাগর হইতে জলন্ধর দিল্লী প্রভৃতি স্থান পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি কনৌজের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এবং কনৌজের রাজা ইন্দ্ররাজকে (বা ইন্দ্রায়ুধ)

ধর্মপালের সাম্রাজ্যের সীমা

* Vide *History of Bengal* (D. U.) Vol. 1. p. 103.

পরাজিত করিয়া কনৌজের সিংহাসনে নিজ মনোনীত প্রার্থী চক্রায়ুধকে স্থাপন করিয়াছিলেন। খালিমপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, অবন্তী, গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণ ধর্মপাল কর্তৃক চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন সমর্থন করিয়াছিলেন। চক্রায়ুধের সিংহাসনে আরোহণকালে এই সকল রাজা উপস্থিত ছিলেন। একথা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ধর্মপাল উত্তর ভারতের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজা হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জনৈক গুজরাটী কবি ধর্মপালকে 'উত্তরাপথস্বামী' নামে অভিহিত করিয়াছেন। বাংলা ও বিহার ছিল ধর্মপালের সরাসরি শাসনাধীনে ; কিন্তু উত্তর ভারতের কনৌজ ও উহার নিকটবর্তী অপরাপর বহু দেশ ধর্মপালের আনুগত্যাধীনে ছিল। ধর্মপাল বাংলাদেশকে একটি সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন। তিনি 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

কনৌজের উপর প্রাধান্য

'পরমেশ্বর পরমভট্টারক' উপাধি ধারণ

অল্পকালের মধ্যেই প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন হইতে অপসারিত করিয়া কনৌজ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নাগভট্টের হস্তে ধর্মপাল পরাজিত হইয়াছিলেন মনে করা ভুল হইবে না। কিন্তু দ্বিতীয় নাগভট্ট স্বয়ং রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের হস্তে পরাজিত হওয়ায় ধর্মপালের সাম্রাজ্যের কোন ক্ষতি সাধিত হয় নাই বলিয়াই আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন।

দ্বিতীয় নাগভট্টের হস্তে পরাজয়

ধর্মপাল যে পাল বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন সে-বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। পিতার নিকট হইতে তিনি অতি ক্ষুদ্র রাজ্যের সিংহাসন উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। কিন্তু স্বীয় সামরিক প্রতিভা ও রাজনৈতিক বিচক্ষণতার সাহায্যে তিনি সেই ক্ষুদ্র রাজ্যকে সাম্রাজ্যের মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।

ধর্মপালের ব্যক্তিগত প্রতিভা

ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার আদেশে মগধে বিক্রমশীলা মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয় নির্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে যে, সে সময়কার শিল্পী ধীমান ও বীতপাল এই মহাবিহারের নির্মাণ-পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ছয়টি মহাবিদ্যালয়-সমন্বিত এই মহাবিহারটির ব্যয় নির্বাহের জন্য ধর্মপাল প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। মহাবিহারের সংলগ্ন একটি উচ্চ সমতলখণ্ডে একই সঙ্গে আট হাজার লোক বসিবার ব্যবস্থা ছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারে তিন হাজার বিদ্যার্থী অধ্যয়ন করিত। এই মহাবিহারের মধ্যস্থলে একটি মন্দির ছিল এবং উহার চতুষ্পার্শ্বে মোট ১০৭টি ছোট ছোট মন্দির ছিল। এখানে ছয়টি মহাবিদ্যালয়ে মোট ১৪৪ জন অধ্যাপক ধর্মশাস্ত্রাদি অধ্যাপনা করিতেন। নেপাল ও তিব্বত হইতে বহু বিদ্যার্থী এই মহাবিহারে অধ্যয়নের উদ্দেশ্যে যোগদান করিত। এই মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে তন্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ, চিকিৎসাশাস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা হইত। এই

বিক্রমশীলা মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণের মধ্যে রত্নাকর শান্তি, আচার্য শ্রীধর, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, অভয়াকরগুপ্ত, শুভাকরগুপ্ত, অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, রত্নবজ্র প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আচার্যগণ রাজার নিকট হইতে 'পণ্ডিত' উপাধিলাভ করিতেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের প্রতিকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহের প্রাচীর-গাত্রে অঙ্কিত থাকিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়টি দীর্ঘ চারিশত বৎসর উহার কীর্তি ও যশ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল।

কোন কোন পণ্ডিতের মতে ধর্মপাল ওদন্তপুরী মহাবিহারটিও স্থাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু অপর অনেকের মতে উহা গোপাল ও দেবপাল কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

ওদন্তপুরী মহাবিহার

ওদন্তপুরী মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন, ধর্মশাস্ত্র, বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সুযোগ ছিল। বৌদ্ধ ধর্ম আলোচনার কেন্দ্র হিসাবেই ওদন্তপুরী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। কোনপ্রকার দক্ষিণা না লইয়াই মেধাবী বিদ্যার্থীদিগকে এই মহাবিহারে অধ্যয়নের সুযোগ দেওয়া হইত। অতীশ এই বিশ্ববিদ্যালয়েরই আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানলাভ করিলে পর আচার্যদেব স্বয়ং তাঁহার নাম রাখেন 'দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান'। অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তিব্বতরাজের অনুরোধে বৌদ্ধ ধর্মের সংস্কার ও প্রচারার্থে তিব্বত গিয়াছিলেন।

সোমপুরী মহাবিহার

রাজসাহী জেলার পাহাড়পুর নামক স্থানে ধর্মপাল সোমপুরী মহাবিহার স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া কয়েকটি সীলমোহর হইতে জানা গিয়াছে। কিছুকাল পূর্বে এই মহাবিহারটির ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

বৌদ্ধ-সাহিত্যিক হরিভদ্র ধর্মপালের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। প্রায় সমগ্র রাজত্বকাল যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত করিলেও ধর্মপাল ধর্ম-বিষয়ক ও শান্তিমূলক

মন্তব্য

কার্যাদিতেও অবহেলা প্রদর্শন করেন নাই, ইহা তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক। বৌদ্ধ ধর্মানুরাগী হইলেও ধর্মপাল পরধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। হিন্দু দেবতার উপাসনার ব্যয়-সঙ্কুলানের উদ্দেশ্যে তিনি জমি দান করিয়াছিলেন, এই প্রমাণও পাওয়া যায়।

দেবপাল, ৮১০-৮৫০ খ্রীঃ (Devapala) : দেবপাল পিতা ধর্মপালের ন্যায়ই ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাল সাম্রাজ্যের বিস্তারসাধন করিয়াছিলেন। তিনি উৎকল, হূণ, গুর্জর ও দ্রাবিড়দের সমুচিত শিক্ষা দিয়াছিলেন বলিয়া সমসাময়িক

সামরিক অভিযান

লিপিতে উল্লিখিত আছে। উৎকলের রাজা দেবপালের ভ্রাতা জয়পালের নেতৃত্বে সামরিক অভিযানের সংবাদ পাইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজা বিনা যুদ্ধে তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দেবপাল উত্তর-পশ্চিমে কম্বোজ এবং দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেবপাল দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বৎসর বাংলার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার আমলে সাম্রাজ্যের গৌরব চরমে পৌঁছিয়াছিল। আসাম হইতে কাশ্মীরের সীমা,

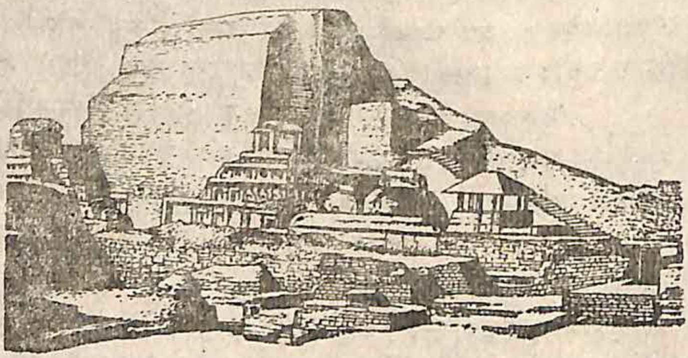
হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত দেবপালের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়াছিল। দেবপালের খ্যাতি ভারতবর্ষের সীমা অতিক্রম করিয়া সুবর্ণভূমি—অর্থাৎ সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

সেই অঞ্চলের শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজা বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণের জন্য পাঁচখানি গ্রাম প্রার্থনা করিয়া দেবপালের নিকট এক রাষ্ট্রদূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতি বহির্দেশেও আরও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী দেশ মাত্রেরই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা জানা ছিল। দেবপাল বালপুত্রদেবের অনুরোধ অনুযায়ী পাঁচখানি গ্রাম তাঁহাকে দিয়াছিলেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় দেবপালের উদার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। নগরহার (জালালাবাদ) নামক স্থানের ইন্দ্রগুপ্ত

বালপুত্রদেবের দূত প্রেরণ

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতা



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভগ্নাবশেষ

নামে জনৈক বৌদ্ধশাস্ত্রে পারদর্শী ব্রাহ্মণকে তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি
(Society and Culture from the 4th Century B. C. to 14th Century A. D.)

সমাজ (Society): খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে ভারতীয় সমাজব্যবস্থা বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থার অনুরূপ ছিল। চারি বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি ভাগে সমাজ বিভক্ত ছিল। বৈদিক যুগে জীবনযাত্রা যেমন চতুরাশ্রম—অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি পর্যায়ে বিভক্ত ছিল সেরূপ চতুরাশ্রমের উল্লেখ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রেও পাওয়া যায়। গ্রীক রাষ্ট্রদূত মেগাস্থিনিস অবশ্য ভারতীয় সমাজকে সাতটি ভাগে ভাগ করিয়া এগুলিকে সাতটি জাতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সেরূপ সাতটি জাতি তখন ছিল না। এগুলি ছিল বৃত্তি অনুসারে সমাজের সাতটি ভাগ। মেগাস্থিনিস এই বৃত্তিমূলক ভাগকেই 'জাতি' বলিয়া ভুল করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

সমাজের চারি ভাগ : চারি বর্ণ ও চতুরাশ্রম

জীবনের চারিটি আশ্রমেই কতকগুলি সদাচারের কথা কৌটিল্য উল্লেখ করিয়াছেন। সর্বজীবে অহিংসা, সত্যবাদিতা, শুচিতা, অপরের গুণগ্রাহিতা, সহিষ্ণুতা এবং ঈর্ষা-পরায়ণতা ও নৃশংসতা ত্যাগ করা ছিল অবশ্যপালনীয় আদর্শ। সহজ ও সরল জীবন যাপন এবং উন্নত ধরনের চিন্তা করা (plain living and high thinking) ছিল সমাজ-জীবনের আদর্শ। পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীনতা, আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কার্যকলাপে মনোযোগ, নির্ভীকতা, মৃত্যুভয়-শূন্যতা প্রভৃতিও সেই সময়কার অনুসরণীয় আদর্শ ছিল। সম্রাট্ অশোকের কাল হইতে শুরু করিয়া আধুনিক কালে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত এই সকল আদর্শ ভারতীয়দের জীবনাদর্শ রূপে অনুসৃত হইয়া আসিয়াছে।

সমাজ-জীবনাদর্শ

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এবং পরবর্তী কালেও পরিবারই ছিল সমাজের মূল ভিত্তি। যৌথ পরিবার প্রথা প্রাচীন যুগ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। অতি আধুনিক কালে অবশ্য যৌথ পরিবার প্রথা ক্রমেই লোপ পাইতেছে। প্রাচীন ভারতীয় সমাজে বহুবিবাহ প্রথা চালু ছিল। অবশ্য সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। সমাজে স্ত্রীজাতির স্থান ছিল উচ্চে। বৈদিক যুগ ও উহার পরবর্তী কালে স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা লাভ, শাস্ত্রালোচনা প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায়। উচ্চ শিক্ষা ভিন্ন সঙ্গীত, নৃত্যকলা, চিত্রাংকন প্রভৃতিতেও স্ত্রীজাতির পারদর্শিতার কথা উল্লিখিত আছে। মৌর্য যুগে স্ত্রীলোক-প্রহরীরা রাজার দেহরক্ষীর কাজ করিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে স্ত্রীজাতির শাসনকার্যে অংশ গ্রহণেরও প্রমাণ পাওয়া যায়।

পরিবার সমাজের ভিত্তি

মেগাস্থিনিস দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য জাতির শাসনকার্য স্ত্রীজাতি দ্বারা পরিচালিত হইত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে ক্রীতদাস প্রথা চালু ছিল। ক্রীতদাসদের প্রতি উদার ব্যবহার করা হইত। মেগাস্থিনিস সেই সময়কার ভারতীয় সমাজে মিতব্যয়িতা, শান্তিপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণের উল্লেখ করিয়াছেন। ভারতীয়গণ তখন সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিত।

মৌর্যোত্তর যুগ

মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে বাহ্লিক, পহ্লব, শক, কুষাণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির লোক ভারতে প্রবেশ করিবার ফলে চতুর্বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কে কতক পরিবর্তন দেখা দিয়াছিল। তখনকার ভারতীয় সমাজ ছিল অত্যন্ত উদার। পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতা তখন ভারতীয় সমাজের ছিল। বাহ্লিক, পহ্লব, শক প্রভৃতি বিদেশী জাতির লোককে ভারতীয় সমাজ গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। সাতবাহন আমলের ঐতিহাসিক তথ্য হইতে জানা যায় যে, সাতবাহন রাজপরিবারের সহিত বিদেশী রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে মৌর্য যুগের পরবর্তী কালে সমাজের চারি বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চারি ভাগ বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। মনুর ধর্মশাস্ত্রে যবন, শক, পহ্লব প্রভৃতি জাতিকে 'নীচ ক্ষত্রিয়' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা ভিন্ন তখনকার সমাজে 'নীচ জাতি' নামেও নূতন নূতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটিয়াছিল।

নূতন নূতন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের উৎপত্তি

মনুর ধর্মশাস্ত্র : জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা

গুপ্ত আমলের প্রারম্ভে মনুর ধর্মশাস্ত্র চতুর্বর্ণ—অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের ভাগকে অত্যন্ত কঠোর নিয়ম-কানুনে আবদ্ধ করে। এই শ্রেণীবিভাগ জাতিভেদ প্রথায় রূপান্তরিত হয়। প্রথমে অবশ্য উচ্চতর জাতির পুরুষ অপেক্ষাকৃত নীচ জাতির স্ত্রীলোককে বিবাহ করিলে জাতিভ্রষ্ট হইত না। কিন্তু ক্রমে ইহাও নিষিদ্ধ হইয়া যায়। মনু তাঁহার ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যবহারের যে সংকীর্ণ নির্দেশ দিয়াছিলেন তাহা বহুলাংশে অনুসৃত হওয়ার পূর্বে স্ত্রীজাতির প্রতি যে উদার ব্যবহার ভারতীয় সমাজে করা হইত তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ব্যক্তিগতভাবে শ্রদ্ধা ও সম্মানের অধিকারিণী হইলেও স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা একপ্রকার লোপ পাইয়াছিল। সমাজ-জীবনাদর্শ পূর্বের মতই সত্যবাদিতা, সংযম, শ্রদ্ধা প্রভৃতি সদ্‌গুণের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। সমাজ তখন পিতৃতান্ত্রিক ছিল—অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষই ছিলেন পরিবারের কর্তা। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ও তাঁহার আদেশ পরিবারস্থ অপরাপর সকলকে মানিয়া চলিতে হইত। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে অবশ্য মাতৃতান্ত্রিক সমাজও বিদ্যমান ছিল। সেইখানে বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকই ছিলেন পরিবারের কর্ত্রী।

পিতৃতান্ত্রিক ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজ

গুপ্ত সম্রাট্‌দের রাজত্বকাল এবং উহার পরবর্তী যুগে ভারতীয় সামাজিক অবস্থার দ্রুত ও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। বিভিন্ন বর্ণ, অর্থাৎ জাতির নির্ধারিত বৃত্তি অনুসরণ

আর তখন আবশ্যিক ছিল না। বৈশ্য ও শূদ্র বর্ণের বা জাতির লোকগণকে যেমন বড় বড় রাজ্যের রাজা হিসাবে শাসন করিতে দেখা যায়, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ জাতির লোকগণকে ব্যবসায়ীর বৃত্তি গ্রহণে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের স্ত্রীলোককে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করিতে এবং রাজ-মহিষীকে রাজার সহিত সম-মর্যাদার আসন গ্রহণ করিতে দেখা যায়। চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে গুপ্ত যুগের সমাজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ জীবনের কথা জানিতে পারা যায়। অতিথির প্রতি সেবা-পরায়ণতা, বিবাদ-বিসংবাদ ও মামলা-মকদ্দমা হইতে নিরস্ত থাকা প্রভৃতি সদ্গুণ সেই সময়কার ভারতীয় সমাজের বৈশিষ্ট্য ছিল বলিয়া ফা-হিয়েন উল্লেখ করিয়াছেন। চুরি, মিথ্যাবাদিতা, অসদ্ব্যবহার তখনকার ভারতীয়দের জানা ছিল না। হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতেও হর্ষবর্ধনের আমলের জনসাধারণের সাধুতা ও সরলতার কথা জানা যায়। জীবনযাত্রা তখন ছিল খুবই সরল ও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ। বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, অসাধুতা তখনকার ভারতবাসী করিত না।

গুপ্ত যুগ ও পরবর্তী যুগের ভারতীয় সমাজ

বাংলাদেশের পাল ও সেন যুগে সমাজে চারি জাতি বিদ্যমান ছিল। তদুপরি আরও বহু শ্রেণী ও উপ-শ্রেণীর উদ্ভব তখন ঘটিয়াছিল। বিভিন্ন জাতির লোকের সংমিশ্রণে বহু সঙ্কর শ্রেণীর সৃষ্টি হওয়াতে সেই যুগের বাঙালী সমাজ আধুনিক রূপ ধারণ করিয়াছিল। বৈদ্য, কায়স্থ, সৎ-শূদ্র বা গন্ধবণিক, মোদক প্রভৃতি নূতন নূতন শ্রেণী পাল ও সেন যুগ হইতে শুরু হইয়াছিল। সেন বংশের রাজা বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করিয়া হিন্দু সমাজকে নূতনভাবে গঠন করিতে চাহিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রচলন করিয়া বিবাহ, সামাজিক আচার-আচরণ প্রভৃতির ক্ষেত্রে কতকগুলি বাঁধা-ধরা নিয়ম ও রীতি মানিয়া চলিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন।

পাল ও সেন যুগে বাংলার সমাজব্যবস্থা

মুসলমান আক্রমণের পূর্বাবধি যে-সকল বহিরাগত জাতি ভারতে বসবাস শুরু করিয়াছিল তাহাদের সকলেই হিন্দু সমাজের অংশরূপে রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন হিন্দু সমাজের উদারতা এবং পরকে আপন করিয়া লইবার ক্ষমতার ফলেই এরূপ ঘটিয়াছিল, বলা বাহুল্য। মুসলমান আক্রমণকারীদের ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ভারতে প্রবেশকারী মুসলমানদের সভ্যতা ও সংস্কৃতির নিজস্ব রূপ এবং সে-সম্পর্কে তাহাদের সচেতনতা, মুসলমান আক্রমণকালে ভারতীয়দের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার এবং ধর্মোন্মত্ত ব্যবহার মুসলমান ও হিন্দু সমাজের সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতের অ-মুসলমানদের ক্ষেত্রে মুসলমানগণ ছিল 'যবন' এবং মুসলমানদের কাছে অ-মুসলমানগণ ছিল 'জিম্মি'। এই সকল কারণে মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রভাব হইতে হিন্দু সমাজকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজে নানাপ্রকার কঠোর বিধি-নিষেধ চালু করা হয়। স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা বহুগুণে বৃদ্ধি করা হয়। মুসলমান সমাজের

মুসলমান আমলে সমাজ

ন্যায় হিন্দু সমাজেও পর্দা প্রথার প্রচলন শুরু হয়। এই যুগে স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা অত্যাধিক মাত্রায় হ্রাস পাইয়াছিল।

কিন্তু মুসলমানদের আগমনে ভারতীয় সমাজে এক নূতন শ্রেণীর সূত্রপাত ঘটে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাসের এবং পারস্পরিক প্রভাব ও যোগাযোগের ফলে এই দুই শ্রেণী, অর্থাৎ হিন্দু তথা অ-মুসলমান ও মুসলমান উভয় সমাজেরই আচার-আচরণ, জীবনযাত্রা প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। একটি অপরটির প্রভাবে প্রভাবিত হয়। পরস্পর পরস্পরের প্রভাবে এক নূতন ধারার সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী হইলেও মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য নাই এই ধারণা হিন্দু-মুসলমান সকলের মধ্যেই জাগিয়া উঠে। পরস্পর পরস্পরের সহিত এই ঐক্যবোধ সেই সময়কার ভক্তিবাদ ও সুফী ধর্মমতের প্রসারে পরিলক্ষিত হয়। উভয় ধর্মমতেই ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে ভগবান্ প্রাপ্তি এবং মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও ভ্রাতৃভাবের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীচৈতন্যের ধর্মমতের উদারতা হিন্দু সমাজে সেই সময়ে যে সংকীর্ণতা দেখা দিয়াছিল তাহা বহুলাংশে দূর করিয়া সমাজ-সংস্কারের কাজ করিয়াছিল।

মুসলমান আমলে সমাজ : হিন্দু-মুসলমান সমাজে পারস্পরিক প্রভাব

সংস্কৃতি (Culture): খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রীক ও ল্যাটিন ঐতিহাসিক ও পর্যটকদের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। আলেকজান্ডারের ভারত-আক্রমণের সূত্র ধরিয়া পাশ্চাত্য জগতের সহিত যে সৌহার্দ্যপূর্ণ যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার ফলাফল পরবর্তী কালে গ্রীক ও রোমান শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। পক্ষান্তরে, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতির প্রভাব পাশ্চাত্য দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

মৌর্য যুগের সংস্কৃতি

ভারতীয় বিজ্ঞান, মুদ্রা নীতির উপর যেমন গ্রীক ও রোমান প্রভাব প্রতিফলিত হইয়াছিল সেইরূপ ভারতীয় গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য জ্ঞানভান্ডারকে প্রভাবিত করিয়াছিল। মৌর্য যুগের শিল্পকলার উৎকর্ষের কথা সেই যুগের কয়েক শতক পর চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতেও জানা যায়। মৌর্য প্রাসাদের নির্মাণকৌশল দেখিয়া ফা-হিয়েন বিস্ময়াভিভূত হইয়াছিলেন। সেই যুগের নির্মিত গুহা, স্তম্ভশীর্ষে পশুমূর্তির নিখুঁত গঠন ও আলংকারিক কারু-কার্য সে-যুগের ভাস্কর্য শিল্পে উৎকর্ষের পরিচয় আজিও বহন করিতেছে।

প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পারস্পরিক সংস্কৃতির প্রভাব

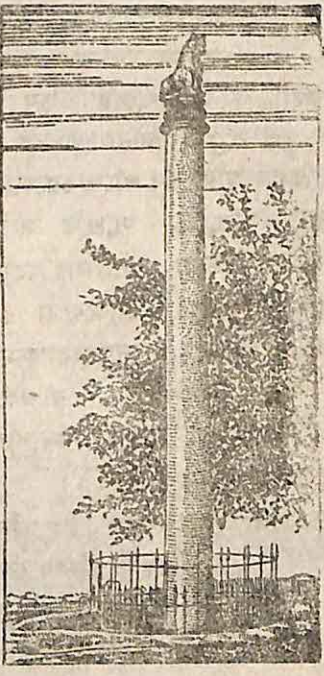
মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ অব্যবস্থা ও বহিরাগত আক্রমণে ভারতীয় ইতিহাসের এক দুর্যোগপূর্ণ কালের সূচনা হইয়াছিল। কিন্তু এক সূত্রে গ্রীক, শক, পহ্লব, কুষাণ প্রভৃতি জাতির ভারত-প্রবেশের ফলে বিভিন্ন সংস্কৃতির সহিত ক্রমে ভারতীয় সংস্কৃতির সমন্বয়ের সুযোগ ঘটিয়াছিল। রোমান সাম্রাজ্য ও চীন সাম্রাজ্যের সহিতও

বৈদেশিক সংস্কৃতির প্রভাব

সেই যুগে ভারতের যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই সূত্রে যে বিরাট সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল তাহার ফল সে-যুগের সাহিত্যের উৎকর্ষ, ধর্মের প্রসার, দর্শন, শিল্পকলা প্রভৃতির উন্নতিতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল।



অশোক স্তম্ভশীর্ষ



অশোক স্তম্ভ

কুষাণ আমলের শিল্প

কুষাণ আমলে গান্ধার শিল্প গ্রীক, রোমান ও বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পরীতির সংমিশ্রণে গড়িয়া উঠিয়াছিল। গ্রীক দেবতাদের প্রতিকৃতির অনুকরণে বুদ্ধমূর্তি নির্মাণে এই শিল্প সংমিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, গান্ধার শিল্পে বৈদেশিক শিল্পরীতির প্রভাব কতকটা অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। বস্তুত, গান্ধার শিল্প নিদর্শনগুলিতে প্রধানত ভারতীয় শিল্পী মনেরই অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয়। সেই সময়ে মথুরা এবং অমরাবতী উপত্যকায় বৈদেশিক প্রভাবমুক্ত সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্পরীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। অমরাবতীতে প্রাপ্ত একটি প্রস্তর-পদক এবং মথুরায় প্রাপ্ত কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। পুরুষপুরে কণিষ্ক-নির্মিত চৈত্য, সাঁচী স্তূপের তোরণদ্বারের আলংকারিক কারুকার্য, কানহেরি, নাসিক, নানাঘাট প্রভৃতি স্থানের গুহাচৈত্য, বরহুত বা ভারুত, ভাজা, বুদ্ধগয়ার মঠ প্রভৃতি সেই যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে।

সাহিত্যের উৎকর্ষসাধনে কুষাণ যুগে নাগার্জুন, বসুমিত্র, অশ্বঘোষ, চরক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অশ্বঘোষ-রচিত 'বুদ্ধ-চরিত', 'সৌন্দরনন্দ', 'সূত্রালঙ্কার' (?), 'বজ্রসূচী' প্রভৃতি; নাগসেন-রচিত 'মিলিন্দপঞ্‌হো'; নাগার্জুন-রচিত 'মাধ্যমিক সূত্র' বা 'মধ্যমক কারিকা' ও 'সুহৃল্লেখ'; বসুমিত্র-রচিত 'মহাবিভাষা'; গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা'; আর্যশূরের 'চর্যাপিটক' প্রভৃতি সেই যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে চরকের 'চরক সংহিতা', সুশ্রুতের 'সুশ্রুত সংহিতা', কাত্যায়নের 'বিভাষা', পতঞ্জলির 'মহাভাষ্য' প্রভৃতিও সে-যুগের উল্লেখযোগ্য রচনা। 'রামায়ণ-মহাভারত', বাৎসায়নের 'কামসূত্র', কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র', যাজ্ঞবল্ক্যের 'যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি', মনুর 'মনুসংহিতা' প্রভৃতি সে-যুগেই সঙ্কলিত হয়।

সাহিত্য



কণিষ্কের মস্তকহীন মূর্তি

তক্ষশিলা সেই যুগে বিদ্যাশিক্ষার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র শিক্ষার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল।

শিক্ষা

সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত-ইতিহাসে গুপ্ত যুগকে এক সুবর্ণ যুগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। বস্তুত, এই যুগের ব্যাপক উৎকর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে গুপ্ত যুগকে সুবর্ণ যুগ হিসাবে বিবেচনা করাই যুক্তিযুক্ত। এই উৎকর্ষ শাসনব্যবস্থা, শিক্ষা, শিল্পকলা প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রেই প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

গুপ্ত যুগ

গুপ্ত যুগের সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের পশ্চাতে দীর্ঘকালের বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগ এবং গুপ্ত শাসনব্যবস্থার দক্ষতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন কাল হইতে বহির্জগতের সহিত ভারতের যে যোগাযোগ হইয়াছিল উহা মৌর্য ও মৌর্যোত্তর যুগে বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই যোগাযোগের ফলে যে নূতন সাংস্কৃতিক প্রভাব ভারতে বিস্তৃত হইয়াছিল উহার পরোক্ষ ফল দেখা গেল গুপ্ত যুগের বলিষ্ঠ সৃজনী শক্তিতে। সাহিত্য, শিক্ষা, শিল্প প্রভৃতির ক্ষেত্রে তাহা পরিলক্ষিত হইল। রাজনৈতিক শান্তি এই সৃজনী শক্তির প্রকাশের সহায়তা করিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

বৈদেশিক সংস্কৃতির সহিত যোগাযোগ

সুবর্ণ যুগের আলোচনায় গুপ্তরাজগণের সুদক্ষ, পরধর্ম-সহিষ্ণু শাসনব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কারণ, এই দক্ষতা ও উদারতার ফলেই সুবর্ণ যুগের

রচনা সম্ভব হইয়াছিল। ফা-হিয়েনের বর্ণনায় গুপ্ত যুগের শাসনব্যবস্থার দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা রহিয়াছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল বলিয়াই সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে ভারতীয় মনীষার প্রকাশ সম্ভব হইয়াছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা এক ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল।

সাহিত্য

তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা প্রভৃতি অমর কাব্য এবং নাট্যগ্রন্থ-রচয়িতা কালিদাস, বৌদ্ধ দার্শনিক বসুবন্ধু এবং শূদ্রক, বিশাখদত্ত, হরিষেণ প্রভৃতি বিদ্বান্ মনীষী সে-যুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কালিদাস, শূদ্রক, অমর, বিশাখদত্ত, বসুবন্ধু প্রভৃতি মনীষীর সাহিত্য-সেবায় সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডার বহু গুণে সমৃদ্ধ হইয়াছিল। এই যুগকে ইংলণ্ডের ইতিহাসে এলিজাবেথের যুগ এবং গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিসের যুগের সহিত তুলনা করা হইয়া থাকে।

সঙ্গীতশাস্ত্র

গুপ্ত যুগের সঙ্গীতশাস্ত্রেরও যথেষ্ট উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। সমুদ্রগুপ্ত নিজেও সঙ্গীতের অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার বীণাবাদনরত মুদ্রার প্রতিকৃতি হইতে এ-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা—যথা, গণিতশাস্ত্র, জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যোতিষশাস্ত্র প্রভৃতিতে গুপ্ত যুগ বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। আর্যভট্ট ছিলেন গুপ্ত আমলের শ্রেষ্ঠ গণিতশাস্ত্র-বিশারদ। বরাহমিহির ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ্। কাহিনী-কিংবদন্তীর নবরত্নের সকলেই বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন কি না সে-বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তবে এই সকল মনীষীর অনেকে গুপ্ত যুগের বিভিন্ন কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন একথা মনে করা ভুল হইবে না। গুপ্ত যুগের চিকিৎসাশাস্ত্র অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছিল। অস্ত্রোপচার সে-যুগে জানা ছিল। ভারতবর্ষ হইতে চিকিৎসাশাস্ত্রের জ্ঞান আরব, পারস্য, গ্রীস প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল।

পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

ধর্মের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগের পরধর্ম-সহিষ্ণুতা গুপ্ত শাসনব্যবস্থাকে শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছে। গুপ্তরাজগণ নিজেরা হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বটে, কিন্তু পরধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহারা নিজেদের উন্নত মনের পরিচয় দিয়াছিলেন। গুপ্ত যুগে বিষ্ণু, শিব ও বুদ্ধ এই তিনের উপাসনারই ব্যাপক প্রচলন ছিল। গুপ্ত যুগে ভাগবত ধর্মের প্রাধান্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক 'পরম ভাগবত' উপাধি ধারণ হইতেই বুঝিতে পারা যায়। এই যুগে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি পূর্ণমাত্রায় সহিষ্ণুতা প্রদর্শিত হইলেও উহার অবনতির সূত্রপাত হইতে থাকে।

গুপ্তরাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগের শিল্প নিদর্শনের প্রায় সবকিছুই মুসলমান আক্রমণকালে বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। দেওগড় (উত্তরপ্রদেশ) ও ভিটারগাঁওয়ে আবিষ্কৃত দুইটি মন্দির হইতে গুপ্ত যুগের স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন পাওয়া যায়।

স্থাপত্য শিল্পের অন্যতম ও অপূর্ব অভিব্যক্তি দেখা যায় সে-যুগে নির্মিত অজন্তার গুহা-গুলিতে। কয়েকটি গুহা গুপ্ত যুগে নির্মিত হইয়াছিল। সেগুলির দেওয়ালের মসৃণতা আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে। এই সকল গুহার দেওয়ালে অঙ্কিত চিত্র সে-যুগের চিত্রশিল্প উৎকর্ষের অপূর্ব নিদর্শন। গুপ্ত যুগের দেবদেবীর মূর্তি, পশুমূর্তি ও বৃক্ষলতাদি সে-যুগের ভাস্কর্য ও আলঙ্কারিক শিল্পকৌশলের পরিচয় বহন করে। গুপ্ত যুগে নির্মিত চন্দ্ররাজ্যের লৌহস্তম্ভ ঐ যুগে ধাতুশিল্পের উন্নতির নিদর্শন-স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। গুপ্ত যুগের মুদ্রা এবং নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্র-নির্মিত একটি বুদ্ধমূর্তিও সে-যুগের ধাতু-শিল্পের নিদর্শন বহন করে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প

চিত্রশিল্প

ধাতুশিল্প



অজন্তার চিত্র

পরবর্তী কালে পাল সাম্রাজ্যের আমলে উত্তর ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাণ-কেন্দ্র ছিল বাংলাদেশ। পাল যুগে সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের এক অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। পাল বংশের রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতায় ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা ও সোমপুরী মহাবিহারগুলি নির্মিত হইয়াছিল। বিক্রমশীলা মহাবিহারে মোট ১০৭টি মন্দির ও ৬টি মহাবিদ্যালয় (কলেজ) ছিল। পাল যুগে নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয় পুনরায় প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিল। এই সকল মঠের নির্মাণ-পদ্ধতি সে-যুগের স্থাপত্য কৌশলের পরিচায়ক। সোমপুরী মহাবিহারের ভগ্নাবশেষ রাজসাহী জেলায় (বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে) আবিষ্কৃত হইয়াছে। সে-যুগের স্তূপ, মঠ ও মন্দিরের নির্মাণকৌশল ছিল বিভিন্ন ধরনের। পাল যুগে নির্মিত কয়েকটি

পাল যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতি

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প

মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির গড়ন দৃষ্টে পাল যুগের ভাস্কর্য শিল্পের উৎকর্ষের ধারণা লাভ করা যায়। ধীমান এবং তাঁহার পুত্র বীতপাল ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর, চিত্রশিল্পী ও ধাতুমূর্তি-নির্মাতা। তাঁহাদের শিল্পকৌশলের নিদর্শন এখনও বিদ্যমান।

ধীমান ও বীতপাল



পাল যুগের ভাস্কর্য নিদর্শন

পাল যুগ শিক্ষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাংলার ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। পাল যুগের শ্রেষ্ঠ আয়ুর্বেদশাস্ত্রজ্ঞ চক্রপাণি দত্ত, কবি সন্ধ্যাকর নন্দী প্রভৃতি তাঁহাদের রচনার দ্বারা সে-যুগের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষায় আদি রচনা বৌদ্ধ চর্যাপদ পাল যুগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। ঐ যুগের বহু বাঙালী মনীষী বাংলাদেশের বাহিরে বিভিন্ন দেশের রাজসভা অলংকৃত করিয়াছিলেন। সুমাত্রা অঞ্চলের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের কুলগুরু ছিলেন বাঙালী পণ্ডিত কুমার ঘোষ। নানা বিষয়ে শিক্ষার্জনের জন্য বাঙালী শিক্ষার্থীদের ভারতের অপরাপর স্থানে যাইবার প্রমাণ পাওয়া যায়। কাশ্মীরে বহু বাঙালী শিক্ষার্থীর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে যাইবার কথাও জানা যায়।

সাহিত্যসেবিগণ



অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক্‌ দিয়া বাংলাদেশ সেই যুগে এশিয়া মহাদেশের এক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছিল। বাংলাদেশের ধর্ম, সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব ব্রহ্মদেশ, নেপাল, তিব্বত, যবদ্বীপ তথা সুবর্ণভূমি, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইয়াছিল। বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্ত

বহির্জগতের সহিত বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

হইতে নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বত্র প্রেরিত হইত। বাঙালী আচার্য অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান আচার্য শীলরক্ষিতের নিকট ওদন্তপুরী মহাবিদ্যালয়ে বৌদ্ধ ধর্মমত সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া বিক্রমশীলা মহাবিদ্যালয়ের আচার্য নিযুক্ত হন। পরে তিনি তিব্বতের রাজার অনুরোধে তথাকার বৌদ্ধ ধর্মের ত্রুটি সংশোধন ও ব্যাপক প্রচারের জন্য তিব্বত গিয়াছিলেন।

অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

সেনবংশীয় রাজগণও শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বল্লাল সেন 'আচার্য-সাগর', 'প্রতিষ্ঠাসাগর', 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' নামে চারিখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। অদ্ভুতসাগর গ্রন্থখানি সম্ভবত তিনি নিজে শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার কৃতী পুত্র লক্ষ্মণ সেন উহার অসম্পূর্ণ অংশ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে শেষোক্ত দুইখানি এখনও বিদ্যমান। বল্লাল সেনের গুরুদেব অনিরুদ্ধ একজন সুপণ্ডিত ছিলেন। গুণবিষ্ণু, ধোয়ী, জয়দেব, হলায়ুধ, উমাপতিধর, ঈশান, পশুপতি প্রভৃতি ছিলেন সে-যুগের বিদ্বান্ মনীষী। ধোয়ী-রচিত 'পবনদূত' এবং জয়দেবের 'পদাবলী' তদানীন্তন সাহিত্য ভাণ্ডারের অপূর্ব রত্নস্বরূপ।

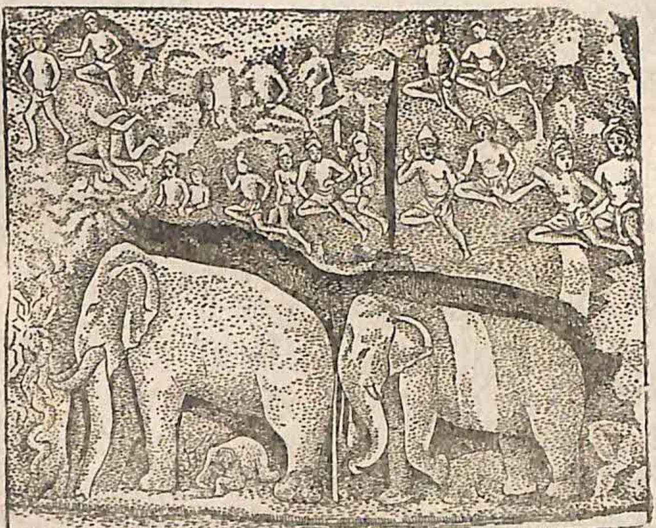
সেন যুগের সাহিত্য ও সংস্কৃতি

ধোয়ী, জয়দেব প্রভৃতি

সেন বংশের রাজগণ ছিলেন তান্ত্রিক হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। এই ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁহারা চট্টগ্রাম, আরাকান প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম

সেন যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্মৃতিশাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন শূলপানি। পালবংশীয় রাজগণের আমলে বাঙালী মনীষার যে প্রকাশ পরিলক্ষিত হইয়াছিল উহা সেন যুগেও



পর্বতগাত্রে খোদিত শিল্পকার্য (মহাবলীপুরম)

অব্যাহত ছিল। শিক্ষা, সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি—সর্বক্ষেত্রে পাল ও সেন বংশীয় রাজগণের শাসনকাল বাংলার ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ, বলা বাহুল্য।

শিল্প

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরবর্তী ছয়শত বৎসর, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ৬০০ হইতে ১২০০ পর্যন্ত ভারতীয় শিল্প স্থাপত্য শিল্পের মধ্যেই প্রধানত নিবন্ধ ছিল। এই শিল্পরীতি উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয়—এই প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। এই দুই শিল্পরীতিতে নির্মাণকৌশলের পার্থক্য ছিল। দেব-দেবীর মন্দিরই ছিল সেই সময়ের প্রধান স্থাপত্য শিল্পকার্য। উত্তর ভারতের মন্দির-গুলির চূড়া বা শিখর ছিল দেখিতে কতকটা কলসীর ন্যায় এবং উহার উপরিভাগ সুঁচালো। পক্ষান্তরে দক্ষিণ-ভারতীয় মন্দিরসমূহের শিখর ছিল ধাপে ধাপে পিরামিডের ন্যায় নির্মিত। উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর মন্দির, মধ্য-ভারতের খাজুরাহো মন্দির, রাজস্থানের দিলওয়ারা মন্দির এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

স্থাপত্য শিল্প

ভুবনেশ্বরের রাজরাণী মন্দির, লিঙ্গরাজের মন্দির, কোণারকের সূর্য মন্দির, পুরীর জগন্নাথ মন্দির, খাজুরাহোর মহাদেব মন্দির প্রভৃতি সেই যুগের স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবে আজিও সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। রাজস্থানের মাউণ্ট আবুতে দিলওয়ারা মন্দিরের নির্মাণকৌশল, উহার স্তম্ভ ও ছাদের কারুকার্য অবর্ণনীয় সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। তেজপাল মন্দিরও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

উত্তর ভারতের স্থাপত্যরীতি

দক্ষিণ ভারতের সমাজ ও সংস্কৃতি : দক্ষিণ ভারতে আর্য সমাজব্যবস্থা বা সংস্কৃতি রামায়ণ অর্থাৎ মহাকাব্যের যুদ্ধের পূর্বে বিস্তার লাভ করে নাই। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতি নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিল। কিন্তু মহাকাব্যের যুগ হইতে দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। রামচন্দ্রের গোদাবরী নদীতীরে পঞ্চবটী বনে বাস, লংকা বিজয় প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতে বৈদিক যুগের শেষে আর্য সভ্যতা বিস্তারের প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

দক্ষিণ ভারতে আর্য সভ্যতার প্রসার

মৌর্য আমলে সুদূর দক্ষিণের চের, চোল, পাণ্ড্য এই তিনটি স্বাধীন তামিল রাজ্য ভিন্ন সমগ্র দক্ষিণ ভারত মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। আর্য সভ্যতা তথা উত্তর ভারতের সামাজিক রীতি-নীতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করিলেও সেই অঞ্চলে দ্রাবিড় সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রভাব বিলীন হয় নাই। বস্তুত, আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতা তথা উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি প্রভাবের পারস্পরিক সংমিশ্রণে দক্ষিণ-ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য

মেগাস্থিনিস ভারতীয় সমাজকে সাতটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়াছিলেন। সমসাময়িক কালে এই সাতটি শ্রেণী ছিল সাতটি পেশাগত ভাগ। সেই সময়ে সুদূর দক্ষিণ ভারতে

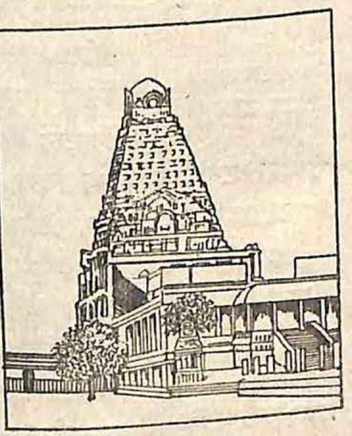
মোট পাঁচটি শ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। জনসাধারণ, পুরোহিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসক ও মন্ত্রী—এই পাঁচটি শ্রেণী।* মেগাস্থিনিসের বিবরণে পাণ্ড্য দেশের শাসনকার্য স্ত্রীজাতি দ্বারা পরিচালিত হইত একথার উল্লেখ আছে। ইহা ভিন্ন, দক্ষিণ ভারতে সমাজ মোটামুটিভাবে মাতৃতান্ত্রিক সমাজ বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। মৌর্য শাসনকালে উত্তর ভারতে ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল। অবশ্য ক্রীতদাসদের প্রতি যে উদার ব্যবহার করা হইত তাহা দেখিয়া মেগাস্থিনিস ভুল করিয়া মন্তব্য করিয়াছিলেন যে ভারতে ক্রীতদাস প্রথা বলিয়া কিছু নাই। যাহা হউক, সেই সময়ে সুদূর দক্ষিণ ভারতের তামিল রাজ্যগুলিতে (চের, চোল, পাণ্ড্য) ক্রীতদাস প্রথার প্রচলন ছিল না। দক্ষিণ ভারতের সহিত উত্তর ভারতের যোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতের জাতিপ্রথা (caste system) দক্ষিণ ভারতে ক্রমে প্রচলিত হইতে থাকে, কিন্তু উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতে জাতিপ্রথার কঠোরতা বহুগুণে বেশী ছিল। আধুনিক কালেও এই বৈশিষ্ট্য দক্ষিণ ভারতে পরিলক্ষিত হয়। টলেমি খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তামিল দেশগুলির সমাজ সম্পর্কে উল্লেখ করিতে গিয়া ভিল্লবার বা ভিল এবং মিন্নাবার বা মৎস্যজীবী এই দুই বিশেষ শ্রেণীর উল্লেখ করিয়াছেন। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে অন্ধ্র বংশের রাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বর্ণাশ্রম প্রথার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন।

সমাজ

দক্ষিণ ভারতে জাতিপ্রথার কঠোরতা

প্রাচীনকালে সুদূর দক্ষিণ ভারতে কোট্রাভাই নামে এক দেবীর আরাধনা করা হইত। এই কোট্রাভাই পরবর্তী কালে উমা বা দুর্গায় রূপান্তরিত হয়। মৌর্য সম্রাট্ অশোকের আমলে দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। ইহা ভিন্ন, জৈন ধর্মও দক্ষিণ ভারতে বিস্তারলাভ করিয়াছিল। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য জৈন ধর্ম গ্রহণ করিয়া শেষ বয়সে মহীশূরের শ্রবণবেলগোলায় চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রবণবেলগোলা জৈন ধর্মের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে কুমারিল ভট্ট বৈদিক আচার-অনুষ্ঠানের প্রাধান্য স্থাপন করেন এবং সমাজে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। অষ্টম শতকে শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ ভগবান্ এক ও অদ্বিতীয় এই দার্শনিক মতবাদ প্রচার করেন। শৃঙ্গেরীমঠ, দ্বারকামঠ, বদরিকাশ্রম প্রভৃতি বিভিন্ন মঠ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্থাপন করিয়া শিবের উপাসনা জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। পরবর্তী কালে বসব নামে অপর একজন ধর্মপ্রচারক শিবের উপাসনা

ধর্ম



চোল স্থাপত্য শিল্প (তাঞ্জোর)

* Smith : *Early History of India*, p. 460,

প্রচার করেন। তাঁহার শিষ্যগণ বীরশৈব নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন রামানুজ ও মাধবাচার্য।

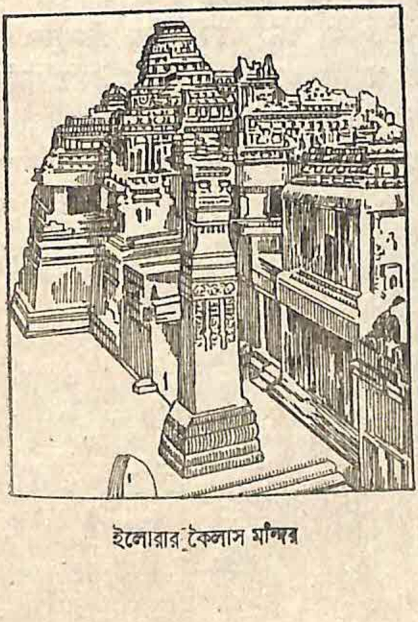
দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প সেই যুগে এক অত্যাশ্চর্য শিল্পকীর্তি। দক্ষিণ ভারতের শিল্পকলা পল্লব রাজত্বকাল হইতে শুরু হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। এখানে দ্রাবিড় শিল্পরীতির পরিচয় পাওয়া যায়। কাঞ্চী নগরের মন্দিরসমূহ, মহাবলীপুরম বা মামল্লপুরমে পাথরের পাহাড় কাটিয়া নির্মিত রথ আজিও দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া থাকে। এই স্থানে সাতটি রথ—ধর্মরাজরথ, ভীমরথ, দ্রৌপদীরথ প্রভৃতি পাণ্ডবদের নামে নির্মিত হইয়াছে। এগুলি পল্লব শিল্পের অমর কীর্তি হিসাবে আজিও বিদ্যমান।

সুদূর দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য ও শিল্পরীতি



নটরাজের মূর্তি (চোল শিল্প)

দক্ষিণ ভারতের গোঙ্গকোণ্ড চোলপুরমে বৃহদাকার বহু মন্দির রাজেন্দ্র চোল নামক চোল রাজা নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই শহরটি তিনি নূতন রাজধানী হিসাবে নির্মাণ করাইয়া তাহাতে একটি অতি সুন্দর রাজপ্রাসাদ নির্মাণ এবং পনর মাইল দীর্ঘ একটি সরোবর খনন করাইয়াছিলেন। চোল স্থাপত্য শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, শিল্পীরা বড় বড় পাথর হইতে মন্দির নির্মাণ করিলেও মণিকারের সূক্ষ্মতা সেই সকল মন্দিরের আলঙ্কারিক কারুকার্যে পরিলক্ষিত হয়। চোল শিল্পে কিছুকাল পরে একটি নূতন রীতি চালু হইয়াছিল। প্রত্যেক মন্দিরের প্রবেশপথে একটি বিশাল গোপুরম, অর্থাৎ তোরণ নির্মাণ করা হইত। এই সকল তোরণের



ইলোরার কৈলাস মন্দির

কারুকার্য ছিল যেমন নিখুঁত তেমনি সুন্দর। কুম্ভকনমের গোপুরম এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। মাদুরা, শ্রীরঙ্গম, রামেশ্বরম এবং অন্যান্য স্থানে নির্মিত সেই যুগের মন্দির এবং সেগুলির স্তম্ভ প্রভৃতি শিল্প-কীর্তির বিস্ময় হিসাবে আজিও বিদ্যমান। চোল শিল্পিগণ ধাতু দ্বারা মূর্তি নির্মাণে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। ব্রোঞ্জ-নির্মিত নটরাজের মূর্তি চোল শিল্পিগণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

দক্ষিণ ভারতের স্থাপত্য নিদর্শন

দাক্ষিণাত্যের চালুক্য ও রাষ্ট্রকূট শিল্পের উৎকর্ষের কথাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। চালুক্যদের রাজধানী বাদামী বা বাতাপি নামক স্থানে বহু গুহা-মন্দির সেই যুগে নির্মিত হইয়াছিল। এগুলির মধ্যে ইলোরার কৈলাস মন্দির পাথরের পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়া নির্মাণ করা হইয়াছিল। বোম্বাইয়ের সন্নিকটে এলিফ্যাণ্টা গুহাগুলিও নির্মাণ-কৌশলের অপূর্ব কীর্তি। পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূটদের ন্যায় হোয়সল-রাজগণও স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করিয়াছিলেন। দোরসমুদ্রের হোয়সলেশ্বরের মন্দির হোয়সল শিল্পরীতির নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। এই মন্দিরের স্তরে স্তরে হাতী, ঘোড়া ও নানাপ্রকার পশুমূর্তি নিখুঁতভাবে খোদাই করা ছিল।

দাক্ষিণাত্যের শিল্প

চিত্রশিল্পেও সেই যুগ সমৃদ্ধ ছিল। কৈলাস মন্দির, বাঘ গুহা, অজন্তার গুহা মন্দির, তাঞ্জোরের শিব মন্দির প্রভৃতির গাত্রে চিত্রশিল্প অত্যন্ত উন্নত ধরনের চিত্রকলার পরিচায়ক। সেই সময়কার পূর্ব-ভারত, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলেও চিত্রশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়।

চিত্রশিল্প

মুসলমানদের আগমন ভারতীয় সমাজের উপর যেমন কতকটা পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং ভারতীয় সমাজ কর্তৃক তাহারা নিজেরা প্রভাবিত হইয়াছিল, সেরূপ শিল্প, সাহিত্য, স্থাপত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই পারস্পরিক প্রভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ঐ সময়ে স্থানীয় ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ভক্তিবাদের উপর রচনা এবং অনুবাদ সাহিত্য ও বিবরণী ছিল তখনকার সাহিত্যকার্যের নিদর্শন। শিল্প ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দেশীয় চিরাচরিত রীতির সহিত মুসলমানদের নিজস্ব শিল্প ও স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ তখনকার মসজিদ ও অপরাপর স্থাপত্য কার্যে দেখা যায়। (দশম অধ্যায়ে এ-বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হইয়াছে।)

হিন্দু-মুসলমান শিল্পরীতির সংমিশ্রণ

অষ্টম অধ্যায়

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি

(Indian Culture and Civilization outside India)

বহির্জগতের সহিত ভারতের যোগাযোগ (India's Contacts with Outside World) : অতি প্রাচীন কাল হইতেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। রোম, মিশর, ব্যাবিলন হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্য-এশিয়া, চীন, তিব্বত, নেপাল, ব্রহ্মদেশ, সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা), সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্বীপপুঞ্জের সহিত এবং কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ছিল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের শেষভাগে জনৈক গ্রীক নাবিক জলপথে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত 'পেরিপ্লাস' (The Periplus of the Erythraean Sea) নামক গ্রন্থে তিনি সমসাময়িক ভারতের বন্দরসমূহের এক সুদীর্ঘ তালিকা দিয়াছেন। ভারতে সেই সময়ে সমুদ্রপথে চলাচলের জন্য বড় বড় বাণিজ্যপোত নির্মিত হইত, সেই কথারও তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। রোমান ঐতিহাসিক 'প্লিনি'র (Pliny) রচনায়ও পেরিপ্লাস গ্রন্থের বিবরণের সমর্থন পাওয়া যায়।* বাণিজ্যের মাধ্যমে উপরি-উক্ত দেশসমূহের সহিত ভারতের সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান স্বভাবতই চলিত। মৌর্য সম্রাট্ অশোকের ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা এবং সেজন্য বিদেশে দূত প্রেরণ সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তার ও যোগাযোগের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য অঞ্চলের সহিত প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ

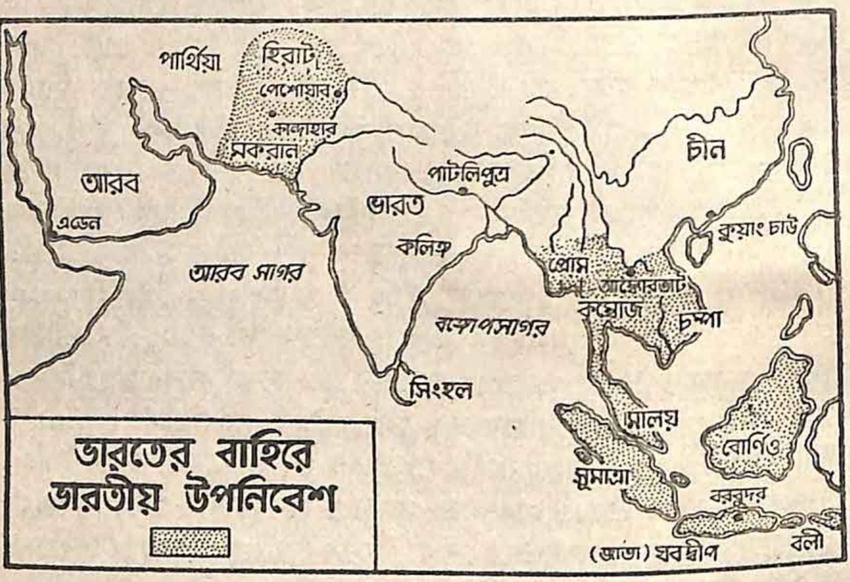
কুষাণ আমলে কুষাণরাজগণের রাজনৈতিক প্রাধান্য ও ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টা মধ্য-এশিয়াকে ভারতীয় উপনিবেশে রূপান্তরিত করিয়াছিল। বর্তমান খোটান অঞ্চলে স্যার অরেল স্টাইনের প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে সেই অঞ্চলে যে ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে। চীন, তিব্বত, কোরিয়া, জাপান, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, ব্রহ্মদেশ, সিংহল (অধুনা শ্রীলঙ্কা) প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক ও ধর্ম প্রচারের মাধ্যমে ভারতের ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতি বিশ্ব-বিদ্যালয়ে উপরি-উক্ত দেশসমূহের অনেকগুলি হইতেই বিদ্যার্থীরা বিশেষভাবে বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের জন্য আসিতেন। ধর্ম সংস্কৃতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের সূত্র ধরিয়া যে যোগাযোগ শুরু হইয়াছিল তাহা মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলি, বোর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল।

মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশ

* Vide Mazumdar, Raychaudhuri and Datta : *An Advanced History of India* (3rd ed., 1967), p. 203.

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতক ও পঞ্চম শতকের অন্তর্বর্তী কালে এই সকল দেশে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, একথা এই অঞ্চলে প্রাপ্ত সংস্কৃত লিপি ও চৈনিক পরিব্রাজকদের বিবরণ হইতে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহা স্পষ্টভাবেই বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতীয় উপনিবেশ মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল।



(১) মধ্য-এশিয়া (Central Asia): প্রাচীন কাল হইতে মধ্য-এশীয় অঞ্চলসমূহের সহিত বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার এবং বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব সেই সকল অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কুষাণ যুগে কুষাণ রাজগণের মধ্য-এশীয় অঞ্চলের সহিত জন্মগত যোগাযোগ এবং রাজনৈতিক প্রাধান্যের ফলে কাস্পিয়ান সাগর হইতে আরম্ভ করিয়া চীনের প্রাচীরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ভারতীয় উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছিল। মধ্য-এশিয়ার খোটান, কুচা, তুর্‌ফান, কাশগড় প্রভৃতি অঞ্চলে ঐ যুগে যে ভারতীয় উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মধ্য-এশিয়ার পথে ভারত পরিভ্রমণে আসিবার কালে এবং সেই পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের কালে হিউয়েন সাঙ্‌ সেই অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মধ্য-এশিয়ার পথ ধরিয়াই চীনে, চীন হইতে কোরিয়া, এবং কোরিয়া হইতে জাপানে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। স্যার্‌ অরেল স্টাইন কর্তৃক মধ্য-এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বিহার, হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির ও মঠ, বুদ্ধমূর্তি ও হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রাকৃত ও সংস্কৃত ভাষায়

মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় উপনিবেশসমূহ

রচিত বহু প্রাচীন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিও এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই অঞ্চলে যে ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তৃত হইয়াছিল সে-সম্পর্কে পণ্ডিতগণ একমত। স্যার অরেল স্টাইন মধ্য-এশিয়ায় খননকার্য সম্পর্কে তাঁহার নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন, খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত শহরের ধ্বংসাবশেষ-গুলির মাঝখানে চলাফেরা করিবার কালে একথাই মনে হইয়াছে যে, তিনি কোন প্রাচীন ভারতীয় নগরের মধ্য দিয়া চলিতেছেন।* এই সকল অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশগুলি সম্পূর্ণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল।

স্যার অরেল স্টাইনের মন্তব্য

(২) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (South-East Asia): ভারতীয় উপনিবেশ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চল—অর্থাৎ মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী, বোর্ণিও প্রভৃতি অঞ্চলেই বিশেষভাবে বিস্তৃত হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক হইতেই ভারতীয় নামধারী রাজগণ এই সকল অঞ্চলের কোন কোন অংশে রাজত্ব করিতেছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চল ভারতে সুবর্ণভূমি নামে পরিচিত ছিল এবং বহু ভাগ্যবিড়ম্বিত ক্ষত্রিয় রাজকুমার ও বণিক স্বদেশে রাজ্যচ্যুত হইয়া বা পৈতৃক সিংহাসন হইতে বঞ্চিত অথবা সর্বস্বান্ত হইয়া সুবর্ণ দ্বীপে ভাগ্যান্বেষণে যাইবার বহু কাহিনী প্রাচীন কালে প্রচলিত ছিল। যাহা হউক, এই অঞ্চলের ভারতীয় উপনিবেশ-সমূহের ইতিহাস এই সকল দেশে প্রাপ্ত সংস্কৃত লিপি এবং চৈনিক ঐতিহাসিক রচনায় পাওয়া গিয়াছে।

ভারতীয় উপনিবেশ বিস্তারের অঞ্চলসমূহ: মালয় উপদ্বীপ, কম্বোজ, আনাম, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী, বর্ণিও প্রভৃতি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপদ্বীপ ও দ্বীপগুলিতে স্থাপিত ভারতীয় উপনিবেশগুলি বিশাল রাজ্য হিসাবে শক্তি ও প্রতিপত্তি অর্জন করিয়াছিল। এগুলির মধ্যে কয়েকটি রাজ্য হাজার বৎসরেরও অধিক কাল, এমন কি ভারতে হিন্দুশাসন অবসানের পরও—পরাক্রম বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইন্দো-চীনে চম্পা ও কম্বোজ নামে দুইটি রাজ্য এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। বর্তমান ভিয়েৎনামের প্রায় সমগ্র অঞ্চল (আনাম) লইয়া চম্পা রাজ্যটি গঠিত ছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত চম্পা রাজ্যের রাজগণ যথেষ্ট পরাক্রমের সহিত রাজত্ব করিয়া গিয়াছিলেন। কম্বোজ রাজ্যের আক্রমণ এবং মোঙ্গল নেতা কুবলাই খানের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া এই রাজ্যটি নিজ স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই রাজ্যের রাজগণের মধ্যে জয়পরমেশ্বরবর্মন, হরিবর্মন,

চম্পা রাজ্য

জয়পরমেশ্বরবর্মন, হরিবর্মন, জয়ইন্দ্রবর্মন, জয়সিংহবর্মন—শ্রেষ্ঠ রাজগণ

* 'Sir Aurel Stein has remarked that whilst he moved in these excavated areas under the ground he could have believed himself to be in the familiar surroundings of an ancient Indian city in the Punjab, so complete was the Indianisation of these out-of-the-way colonies.' Vide *An Advanced History of India* (3rd Edn., 1967), p. 204.

জয়ইন্দ্রবর্মন, জয়সিংহবর্মন প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাহিনী-কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, একদল ভারতীয় বণিক এই রাজ্যটির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের নিজ অঞ্চলের নাম 'চম্পা'র (বর্তমানে বিহার রাজ্যে অবস্থিত) অনুকরণে এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজ্যটির নাম দিয়াছিলেন চম্পা। এই রাজ্যে প্রাপ্ত সে-যুগের বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দিরসমূহের ধ্বংসাবশেষ ভারতীয় ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতির পরিচয় আজিও বহন করিতেছে। ষোড়শ শতাব্দীতে মোঙ্গলদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে চম্পা রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

পতন

ইন্দো-চীনে স্থাপিত অন্যতম হিন্দু ঔপনিবেশিক রাজ্য ছিল কম্বোজ। কাহিনী-কিংবদন্তীতে কৌণ্ডিণ্য নামে জনৈক ভারতীয় এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত আছে। আবার অপর এক কাহিনীতে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা আদিত্য বংশের পুত্র এই রাজ্যটি স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করা হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকেই যে এই রাজ্যটি গড়িয়া উঠিয়াছিল সে-সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত। চৈনিকগণ এই রাজ্যটির নাম দিয়াছিল ফুনান। জনৈক চৈনিক ঐতিহাসিকের রচনা হইতে জানা যায় যে, ভারত হইতে আগত সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ এই দেশে বাস করিতেন এবং দিবারাত্র শাস্ত্র-গ্রন্থ অধ্যয়নে অতিবাহিত করিতেন। কম্বোজ রাজ্যের শ্রেষ্ঠ রাজগণের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও সপ্তম জয়বর্মন, যশোবর্মন, দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রাজ্যটি ক্যাম্বোডিয়া, কোচিন-চীন, লাওস, শ্যাম, মালয় উপদ্বীপ ও ব্রহ্মদেশের একাংশ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বহুসংখ্যক সংস্কৃত লিপি হইতে এই রাজ্যের রাজগণ সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। ইহা ভিন্ন আঙ্কোরভাট ও আঙ্কোরথোম নামক দুইটি মন্দির কম্বোজ রাজ্যের ঐতিহ্যের সাক্ষ্য আজিও বহন করিতেছে। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে আনাম ও থাই জাতির আক্রমণে এই রাজ্যটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

কম্বোজ রাজ্য

জয়বর্মন, যশোবর্মন, দ্বিতীয় সূর্যবর্মন—শ্রেষ্ঠ রাজগণ



আঙ্কোরভাটের মন্দির

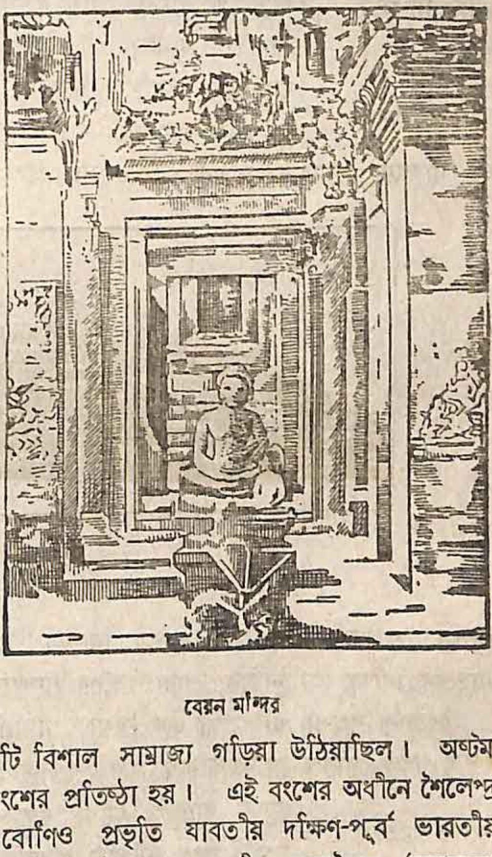
আঙ্কোরভাট মন্দিরটি মূলত বিষ্ণুর উপাসনার জন্য স্থাপিত হইয়াছিল। ভূপৃষ্ঠ হইতে ২১৩ ফুট উচ্চ, পূর্ব-পশ্চিমে ⅔ মাইল দীর্ঘ এবং উত্তর-দক্ষিণে ½ মাইল প্রশস্ত

এই মন্দিরটি পৃথিবীর আশ্চর্যজনক বস্তুসমূহের অন্যতম সন্দেহ নাই। ৭০০ ফুট চওড়া একটি পরিখা দ্বারা এই নগরটি পরিবেষ্টিত। এই মন্দিরটির ধাপে ধাপে বিভিন্ন ধরনের কারুকার্য করা হইয়াছে। শিব, অর্জুন, যম প্রভৃতি দেবতার মূর্তি এই মন্দিরটির গাত্রে খোদিত আছে।

আঙ্কোরভাটের বিষ্ণুমন্দির

কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী ছিল আঙ্কোরথোম। রাজা সপ্তম জয়বর্মন কর্তৃক এই রাজধানীটি স্থাপিত হইয়াছিল। এই নগরটি দুই মাইল দীর্ঘ এবং দুই মাইল প্রশস্ত ছিল। ৩৩০ ফুট চওড়া একটি পরিখা দ্বারা এই নগরটি পরিবেষ্টিত। আঙ্কোরথোন নগরটির কেন্দ্রস্থলে পিরামিড আকারে নির্মিত তিন ধাপযুক্ত বেয়ন মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরটিতে প্রায় চল্লিশটি গম্বুজ আছে। প্রত্যেকটি গম্বুজের শীর্ষদেশে একটি করিয়া চতুর্মুখ-বিশিষ্ট ধ্যানরত মূর্তি আছে। আঙ্কোরথোম শহরে ১০০ ফুট প্রশস্ত পাঁচটি রাজপথ আছে। ইহা ভিন্ন, প্রাচীর-বেষ্টিত বহু-সংখ্যক জলাশয় এই নগরের শোভাবর্ধনের জন্য খনন করা হইয়াছিল। আ ঙ্কো র থো ম নগরের ধ্বংসাবশেষ হইতে উহা যে একটি অতি সুন্দর পরি-কল্পনা অনুযায়ী নির্মিত নগরী ছিল সে-সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

আঙ্কোরথোম-কম্বোজ রাজ্যের রাজধানী : বেয়ন মন্দির



বেয়ন মন্দির

মালয় উপদ্বীপে একাদিক্রমে দুইটি বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীতে মালয় উপদ্বীপে শৈলেন্দ্র বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের অধীনে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলী, বোর্ণিও প্রভৃতি যাবতীয় দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় ঔপনিবেশিক অঞ্চল লইয়া গড়িয়া উঠে। শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট্গণ 'মহারাজ' উপাধি ধারণ করিতেন। আরব বণিকদের বর্ণনা হইতে শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট্গণের ঐশ্বর্য ও প্রতিপত্তি সম্পর্কে জানিতে পারা যায়। ভারত ও চীনের রাজগণও শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট্গণকে যথাযোগ্য সম্মানদানে ত্রুটি করিতেন না। শৈলেন্দ্র বংশীয় সম্রাট্ বালপুত্রদেব বাংলার পাল বংশীয় রাজা দেবপালের অনুমতি গ্রহণ করিয়া নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি মঠ নির্মাণ করাইয়া

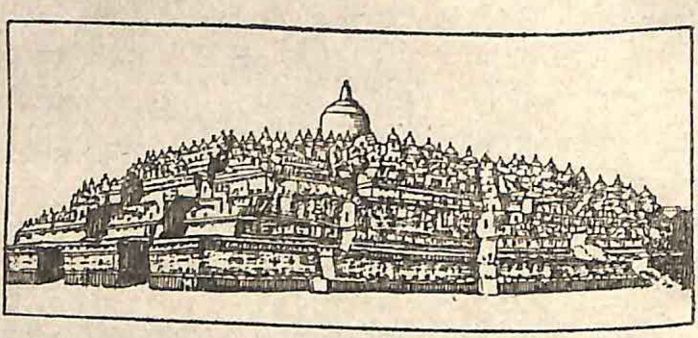
শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য

দিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে দেবপাল এই মঠের ব্যয়-সঙ্কুলানের জন্য পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ ছিলেন মহাযান বৌদ্ধ ধর্মমতাবলম্বী। ধর্মের ব্যাপারে শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ বাংলাদেশের সহিত সর্বদা সংযোগ রক্ষা করিয়া চলিতেন। বস্তুত, ধর্মের ক্ষেত্রে তাঁহারা বাংলাদেশের প্রভাবাধীনে ছিলেন। কুমার ঘোষ নামে জনৈক বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের ধর্মগুরু।

বালপুত্রদেব ও দেবপালের সৌহার্দ্য

শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ধর্মগুরু কুমার ঘোষের নির্দেশক্রমে শৈলেন্দ্র সম্রাট্ তারা মন্দির নামে একটি অতি সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বরবুদুরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ স্তূপটি শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের আমলে যবদ্বীপে নির্মিত হইয়াছিল। যবদ্বীপ সেই সময়ে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। বরবুদুরের মন্দিরটির কয়েকটি স্তর ছিল এবং প্রায় ৪০০ × ৪০০ বর্গ ফুট ছিল ইহার মোট আয়তন। এই মন্দিরের স্তরে স্তরে এবং মন্দিরগাত্রে অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি ভারতীয় ও যবদ্বীপের

শিল্পকলা : তারা মন্দির, বরবুদুরের মন্দির



বরবুদুর

ভাস্কর্য শিল্পকলার এক অতি সুন্দর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। প্রধানত জাতকের বিভিন্ন কাহিনীকে দেওয়ালগাত্রের ভাস্কর্যে রূপদান করা হইয়াছে।

শৈলেন্দ্র বংশের রাজগণের এক বিশাল নৌবাহিনী ছিল। খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক পর্যন্ত প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিবার পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য চোলরাজ রাজেন্দ্র চোলদেব কর্তৃক আক্রান্ত হয়। রাজেন্দ্র চোলদেব শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের এক বিরাট অংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুকাল পরই শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণ তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া লন। কিন্তু ইহার পর শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের গৌরব আর বৃদ্ধি না পাইয়া ক্রমেই স্তিমিত হইতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে শৈলেন্দ্র বংশের জনৈক রাজা সিংহলের বিরুদ্ধে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন। এই অভিযান সম্পূর্ণ বিফল হইলে শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যেরও পতন ঘটে।

শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের পতন

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে যবদ্বীপে ভারতীয় হিন্দু উপনিবেশ গড়িয়া উঠে। কিন্তু শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যবদ্বীপও শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া

পড়ে। নবম শতক পর্যন্ত শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিবার পর স্বাধীনতা লাভ করিয়া ক্রমে যবদ্বীপও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। বিজয় নামে জনৈক রাজা ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে তিক্ত-বিল্ব নামক স্থানে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করিয়া যবদ্বীপ রাজ্যটিকে শক্তি ও সম্মানের পথে ধাবিত করেন। ১৩৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে—অর্থাৎ প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে, যবদ্বীপ সমগ্র মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়া লয়। এই রাজ্যের জনৈক স্থানীয় নেতা দেশত্যাগ করিয়া গিয়া মালাক্কা দ্বীপে এক নূতন হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মালাক্কার রাজা ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত হইলে ক্রমে ইস্‌লাম ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের আক্রমণে যবদ্বীপের হিন্দু শাসনের অবসান ঘটে এবং এই রাজ্যে ইস্‌লাম ধর্ম প্রচারিত হয়। সেই সময়ে একদল হিন্দু বলি দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখানে একটি হিন্দু রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। মালয় উপদ্বীপ ও মালয় দ্বীপপুঞ্জে ইস্‌লাম ধর্মের প্রাধান্য স্থাপিত হইলেও অদ্যাবধি বলি দ্বীপটি হিন্দু ধর্মের অনুরাগী রহিয়াছে।

যবদ্বীপ

মালাক্কা

বলি

উপরি-উক্ত বিবরণ হইতে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুগণের যে সাহসিকতা, উদ্যমশীলতা ও কর্মপ্রচেষ্টার অভাব ছিল না এবং তাহারা বহির্দেশে উপনিবেশ স্থাপনে পশ্চাৎপদ ছিল না একথা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়।

নবম অধ্যায়

(ক) তুর্ক-আফগান শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন

(Rise, Growth and Decline of Turco-Afghan Power)

আরবগণ : সিন্ধু-উপত্যকা অঞ্চলে আরব অধিকার স্থাপিত হওয়ার সময় হইতে ভারতে মুসলমানদের অবসান ঘটে। ইস্‌লাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর (৬৩২ খ্রীঃ) তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আরব রাজ্য এক দুর্ধর্ষ শক্তি লইয়া চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিতে থাকে। অষ্টম শতকের শেষ দিকে ভারতের সিন্ধু প্রদেশ পর্যন্ত আরব রাজ্য বিস্তার লাভ করে। সেই সময়ে উত্তর ভারত অসংখ্য ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এগুলির মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য দূরের কথা, সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। খ্রীষ্টীয় নবম শতকে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে কতকগুলি রাজপুত রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যেও সর্বদা যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়া থাকিত। এই রাজনৈতিক অনৈক্য উত্তর ভারতের বিদেশী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল।

উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অনৈক্য ; আরব অধিকার

সিন্ধুর হিন্দু রাজা দাহিরকে পরাজিত করিয়া আরবগণ ক্রমে সমগ্র সিন্ধুদেশ দখল করিল। কিন্তু তাহারা যখন আরও দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা শুরু করিল তখন চালুক্য, গুর্জর-প্রতিহার ও কার্কটদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বাধিল। এই কারণে এবং বিশেষভাবে আরবদের মধ্যে শিয়া-সুন্নী ধর্ম-দ্বন্দ্বে আরবদের শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহম্মদ ঘুরীর হস্তে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকায় আরব শাসনের শেষ চিহ্নটুকুও লোপ পাইল।

সিন্ধু-উপত্যকায় আরব অধিকারের অবসান

গজনী সুলতানদের ভারত আক্রমণ: ভারতে মুসলমানদের স্থায়ী শাসনের সূত্রপাত হয় দশম শতকের শেষ দিক্ হইতে। আফগানিস্তানের পার্বত্য অঞ্চলে গজনী রাজ্যের সহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহীয়া বংশের রাজা জয়পালের যুদ্ধ বাধে (৯৭৫ খ্রীঃ)। জয়পাল ছিলেন স্বাধীনচেতা রাজা। তাঁহার রাজ্য চিনাব নদী হইতে কাবুলের লঘমান্ নামক স্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তাঁহার রাজধানী ছিল উদ্‌ভাণ্ড-পুর। গজনী রাজ্যের শক্তিবৃদ্ধি জয়পালের রাজ্যের পক্ষে মঙ্গলের কারণ হইবে না, এজন্য জয়পাল গজনী রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জয়পাল সাফল্যলাভ করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় আক্রমণও ব্যর্থ হইল। ইহার পর গজনীর সুলতান সবুক্তিগীন একাধিকবার জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া শেষ পর্যন্ত কাবুল এবং উহার নিকটবর্তী অঞ্চল অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পর সবুক্তিগীন আর ভারত অভিযানে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু তিনি ভারত আক্রমণের যে ইঙ্গিত রাখিয়া গিয়াছিলেন পরবর্তী কালে উহা অনুসরণ করিয়া তাঁহার পুত্র সুলতান মামুদ পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন।

গজনী কর্তৃক ভারত আক্রমণ

সুলতান মামুদ ঠিক কতবার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন সেই বিষয়ে মতানৈক্য থাকিলেও তিনি মোট সতর বার আক্রমণ করিয়াছিলেন এই সংখ্যা ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে।

১৭ বার আক্রমণ

সুলতান মামুদ পিতৃশত্রু জয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রু জয়পালের প্রতি অসৌজন্যমূলক ব্যবহার করায় জয়পাল নিজপুত্র আনন্দপালের হস্তে রাজ্যভার দিয়া আগুনে ঝাঁপ দিয়াছিলেন। আনন্দপাল উজ্জয়িনী, কালিঞ্জর, গোয়ালিওর, দিল্লী, কনৌজ, আজমীর প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণের সাহায্য লইয়া এক সম্মিলিত বাহিনীসহ সুলতান মামুদকে বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। নিশ্চিত জয়ের মুখে আনন্দপালের হস্তী আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলে আনন্দপালের সেনাবাহিনী আনন্দপাল পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছেন মনে করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিল। সুলতান মামুদ জয়ী হইলেন। ইহার পর নগরকোট, বর্তমান কাংড়া দুর্গ আক্রমণ করিয়া প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া গেলেন। সুলতান মামুদের অভিযানের মধ্যে মথুরা লুণ্ঠন, কনৌজ লুণ্ঠন এবং সোমনাথের মন্দির আক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। সোমনাথের মন্দিরটি অপবিত্র করিয়া উহার অভ্যন্তরস্থিত দুই কোটি মুদ্রা লইয়া

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ

সুলতান মামুদ চলিয়া গেলেন। সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের মূল উদ্দেশ্য ছিল ধনরত্ন লুণ্ঠন। ভারতবর্ষে রাজ্য বিস্তার করা তাঁহার তেমন ইচ্ছা ছিল না। পুনঃ পুনঃ পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া ভারতে প্রবেশ করিবার এবং ফিরিয়া যাইবার ফলে সেই অঞ্চলে গজনীর অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। সুলতান মামুদের সভায় সদ্ব্যবহার না পাইয়া সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ মনীষীর অন্যতম অল্‌বিরুণী ভারতে চলিয়া আসিয়া সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় দর্শন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। তাঁহার রচিত 'তহ্‌কিক্‌-ই-হিন্দ্‌' সমসাময়িক কালের ভারতীয় দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত, রসায়ন, নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও হিন্দু রীতি-নীতি সম্পর্কে একখানি অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

ঘুর বংশ: ভারতে স্থায়ী রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্য লইয়া ভারত অভিযান করিয়াছিলেন ঘুর রাজ্যের সুলতান গিয়াস-উদ্দিনের ভ্রাতা মহম্মদ ঘুরী। তিনি কাবুল ও গজনী রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে (১১৭৫ খ্রীঃ) তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে আরব শাসনের অবসান ঘটাইলেন। ইহার পর তিনি ক্রমে উচ্‌ ও পেশোয়ার জয় করিলেন। লাহোরও তাঁহার অধিকারভুক্ত হইল। রাজপুত জাতি তাঁহার অগ্রগতিতে ভীত-সন্ত্রস্ত হইল এবং ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরী চৌহান্‌ বংশীয় রাজা তৃতীয় পৃথ্বীরাজের রাজ্যাংশ ভাতিন্দা জয় করিলে পৃথ্বীরাজ উত্তর ভারতের রাজগণের সাহায্য লইয়া মহম্মদ ঘুরী অধিকৃত ভাতিন্দা পুনরুদ্ধার করিতে অগ্রসর হইলেন। ১১৯১ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তিনি মহম্মদ ঘুরীকে শোচনীয়-ভাবে পরাজিত করিলেন। কিন্তু পলায়মান শত্রুর পশ্চাৎধাবন না করিয়া মহম্মদ ঘুরীকে শক্তি সঞ্চয় করিবার এবং পুনরায় তরাইনের প্রান্তরে উপস্থিত হইবার সুযোগ দিলেন। ১১৯২ খ্রীষ্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে হিন্দু রাজগণ পরাজিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হইলেন। মহম্মদ ঘুরী নব-বিজিত ভারতীয় রাজ্যের ভার তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচর ও ক্রীতদাস কুতব-উদ্দিনের উপর ন্যস্ত করিয়া (১১৯২ খ্রীঃ) স্বদেশে ফিরিয়া গেলেন।

মহম্মদ ঘুরীর ভারত বিজয়

দিল্লী সুলতানি: **কুতব-উদ্দিন অইবক্‌**: কুতব-উদ্দিন অইবক্‌ শাসনভার গ্রহণ করিয়া দিল্লী, অন্‌হিলবার, কনৌজ, গোয়ালিওর প্রভৃতি জয় করিলেন। তিনি তাঁহার সহকর্মী ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ বিন্‌ বখ্‌তিয়ার খল্‌জীকে বিহার ও বাংলাদেশ জয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন। বখ্‌তিয়ার খল্‌জীর পুত্র ইখ্‌তিয়ার-উদ্দিন মহম্মদ খল্‌জী বিহার জয় করিয়া বাংলাদেশের সেনবংশীয় রাজা লক্ষ্মণ সেনের রাজ্য আক্রমণ করেন। আকস্মিক আক্রমণের প্রতিরোধ অসম্ভব বিবেচনায় লক্ষ্মণ সেন নিজ রাজধানী নদীয়া ত্যাগ করিয়া পূর্ববঙ্গে চলিয়া যান (১১৯৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১২০২ খ্রীঃ)। ইহার পর ঢাকার নিকট রাজধানী স্থাপন করিয়া তাঁহার বংশধরগণ কিছুকাল মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। কুতব-উদ্দিন দিল্লীর সুলতান হইয়া বসিলেন। তাঁহার রাজ্য দিল্লী, পাঞ্জাব, বিহার, বাংলাদেশের একাংশ, গুজরাট ও কালিঞ্জর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কুতব-উদ্দিন অইবক্‌ (১২০৬-১০ খ্রীঃ)

আরাম শাহ্ : ইল্‌তুৎমিস্ : পরবর্তী সুলতান আরাম শাহ্ ছিলেন কুতব-উদ্দিনের পোষ্য পুত্র। তিনি ছিলেন যেমন অকর্মণ্য তেমনি আরামপ্রিয়। দিল্লীর আমীর-ওম্‌রাহ্‌গণ তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া কুতব-উদ্দিনের জামাতা ইল্‌তুৎমিস্‌কে সিংহাসনে বসাইলেন। আরাম শাহের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানি প্রায় টলমল করিতেছিল। রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। দিল্লীর আমীর-ওম্‌রাহ্‌দের একাংশ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ইল্‌তুৎমিস্‌কে বাধা দিতে শুরু করিয়াছিলেন। ইল্‌তুৎমিস্ কঠোর হস্তে এই সকল ষড়যন্ত্রকারীকে দমন করিয়া এবং রাজ্যের যে-সকল অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল তাহা পুনরুদ্ধার করিয়া দিল্লী সুলতানিকে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিজ খাঁ পশ্চিম এশিয়ার খারিজম রাজ্য আক্রমণ করিলে সেখানকার শাহ্ জালাল-উদ্দিন পাঞ্জাবে উপস্থিত হন। সেই সূত্রে চিঙ্গিজ খাঁর সহিত যাহাতে দিল্লী সুলতানির সংঘর্ষ উপস্থিত না হয় সেজন্য ইল্‌তুৎমিস্ জালাল-উদ্দিনকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেন। এই দূরদর্শিতার ফলে তিনি মোঙ্গল আক্রমণ এড়াইয়া গিয়াছিলেন। কুতব-উদ্দিন দিল্লী সুলতানির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাকে সুদৃঢ় করিয়া উহার স্থায়িত্ব-দান করিয়াছিলেন ইল্‌তুৎমিস্।

আরাম শাহ্ (১২১০-১১ খ্রীঃ)

ইল্‌তুৎমিস্ (১২১১-৩৬ খ্রীঃ)

রাজিয়া : ইল্‌তুৎমিস্ তাঁহার কন্যা রাজিয়াকে সুলতানি-পদে মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার পুত্রগণ ছিলেন অলস ও অকর্মণ্য। প্রথম পুত্র অবশ্য পূর্বেই মারা গিয়াছিলেন। সুলতানা রাজিয়া ছিলেন অত্যন্ত বিদুষী ও বুদ্ধিমতী রমণী। কিন্তু দিল্লীর আমীর-ওম্‌রাহ্‌গণ স্ত্রীলোকের শাসন মানিবেন না স্থির করিয়া ইল্‌তুৎমিসের শেষ নির্দেশ অমান্য করিয়া তাঁহার মধ্যম পুত্র রুকন্-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার অকর্মণ্যতা ও অলসতায় বিরক্ত হইয়া তাঁহারা রাজিয়াকেই সিংহাসনে পুনরায় স্থাপন করিলেন। রাজিয়ার শাসনদক্ষতা অনেক আমীর-ওম্‌রাহের পছন্দ হইল না। ফলে নানাপ্রকার ষড়যন্ত্র এবং রাজিয়াকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পর পর সুলতান পরিবর্তন করিয়া শেষ পর্যন্ত ইল্‌তুৎমিসের কনিষ্ঠ পুত্র নাসির-উদ্দিন মামুদকে তাঁহারা সিংহাসনে বসাইলেন (১২৪৬ খ্রীঃ)। নাসির-উদ্দিন ছিলেন উদার, নিরবরোধী, ন্যায়পরায়ণ, ধর্মভীরু সুলতান। তিনি তাঁহার শ্বশুর ও মন্ত্রী উলুঘ্ খাঁর উপর সম্পূর্ণ শাসনভার ছাড়িয়া দিলেন। উলুঘ্ খাঁর মন্ত্রিত্বকালে রাজ্যে শাসন-শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ফিরিয়া আসিয়াছিল। অপুত্রক অবস্থায় নাসির-উদ্দিনের মৃত্যু (১২৬৬ খ্রীঃ) হইলে উলুঘ্ খাঁ গিয়াস-উদ্দিন বলবন নামে দিল্লীর সুলতান হইলেন।

রাজিয়া (১২৩৬-৪০ খ্রীঃ) ও পরবর্তী বিশৃঙ্খলা

গিয়াস-উদ্দিন বলবন : গিয়াস-উদ্দিন বলবন উদ্ধত আমীর-ওম্‌রাহ্‌দের দমন করিয়া এবং সেনাবাহিনী সংগঠন করিয়া দিল্লী সুলতানির শক্তি বৃদ্ধি করেন। ইহার পর মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া এবং মোঙ্গল আক্রমণের বিরুদ্ধে স্থায়ী প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া রাজ্যের নিরাপত্তা

গিয়াস-উদ্দিন বলবন (১২৬৬-৮৭ খ্রীঃ)

বৃদ্ধি করেন। মেওয়াটি দস্যুদের দমন, বাংলাদেশের বিদ্রোহী স্বাধীন সুলতান তুঘ্‌রিল খাঁকে দমন প্রভৃতি কাজ করিয়া বলবন দিল্লী সুলতানির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন এবং দিল্লী সুলতানির ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছিলেন।

বলবনের সুদক্ষ শাসনাধীনে দিল্লীর স্বার্থান্বেষী আমীর-ওম্‌রাহ্‌ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করিতে সাহসী হন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দিল্লীর সুলতানি নিজেদের প্রভাবে আনিতে চাহিলেন। বলবন তাঁহার পৌত্র কাইখস্‌রুকে পরবর্তী সুলতান মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু আমীর-ওম্‌রাহ্‌ তাঁহার অপর এক পৌত্র কাইকোবাদকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। কাইকোবাদ ছিলেন অত্যন্ত অকর্মণ্য ও অলস ব্যক্তি। তিনি বিলাস-ব্যসনে গা ঢালিয়া দিলেন। তুর্কী অভিজাতগণ ও খল্‌জী অভিজাতগণ সেই সুযোগে প্রাধান্য অর্জনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিলে দিল্লীতে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এই সুযোগে খল্‌জী বংশের জালাল-উদ্দিন নামে জনৈক ব্যক্তি কাইকোবাদকে হত্যা করাইয়া নিজে দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিলেন।

বলবনের পরবর্তী কালের দুর্বলতা : কাইকোবাদ (১২৮৭-৯০ খ্রীঃ)



গিয়াস-উদ্দিন বলবন

খল্‌জী বংশ : জালাল-উদ্দিন ফিরোজ খল্‌জী : জালাল-উদ্দিন ফিরোজ যখন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তাঁহার বৃদ্ধ বয়স। তিনি কাইকোবাদকে হত্যা করাইয়া সিংহাসন দখল করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ ও ক্ষমাশীল ব্যক্তি। তিনি নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র আলা-উদ্দিনের সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। শাসক হিসাবে জালাল-উদ্দিন দক্ষতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ ভারত আক্রমণ করিলে তিনি তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাদিগকে বিনা বাধায় ফিরিয়া যাইতে দিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন একদল মোঙ্গল দিল্লীর সন্নিকটে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে চাহিলে তিনি সেই অনুমতি দিয়াছিলেন। ইহারা ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া 'নব-মুসলমান' নামে পরিচিত হইয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলা-উদ্দিনকে তিনি কারা প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ১২৯২ খ্রীষ্টাব্দে আলা-উদ্দিন মালব জয় করিলে তিনি তাঁহাকে অযোধ্যার শাসনকর্তার পদও দান করেন। আলা-উদ্দিন বৃদ্ধ জালাল-উদ্দিনকে সরাইয়া কিভাবে নিজে সুলতান হইতে পারেন সেই পরিকল্পনা করিতে

খল্‌জী বংশ : জালাল-উদ্দিন ফিরোজ (১২৯০-৯৬ খ্রীঃ)

লাগিলেন। এজন্য কিছু ধনদৌলত হাতে থাকা প্রয়োজন মনে করিয়া সুলতানের বিনা অনুমতিতে দেবগিরির যাদব বংশীয় রাজা রামচন্দ্রের রাজ্য আক্রমণ করেন। রামচন্দ্র প্রচুর ধনরত্ন উপঢৌকন দিয়া আলা-উদ্দিনের সহিত সন্ধি স্থাপন করিলেন। দেবগিরি অভিযানে আলা-উদ্দিন কেবল প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ-রৌপ্য লুণ্ঠন করিয়াছিলেন এমন নহে, এই অভিযান বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিকে মুসলমান অভিযানের পথও প্রশস্ত করিয়াছিল। ইহাই ছিল আলা-উদ্দিনের দেবগিরি অভিযানের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

আলা-উদ্দিন খল্‌জী: আলা-উদ্দিন দেবগিরি হইতে আনীত ধনরত্ন দিল্লীর রাজকোষে জমা দিলেন না। কিন্তু স্নেহশীল জালাল-উদ্দিন ইহা দোষের কারণ বলিয়া মনে করিলেন না। তিনি আমীরদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া ভ্রাতুষ্পুত্রকে অভিনন্দন জানাইতে গিয়া আলা-উদ্দিনেরই ইঙ্গিতে প্রাণ হারাইলেন। আলা-উদ্দিন আমীর-ওমরাহদের প্রচুর অর্থ উৎকোচ প্রদান করিয়া সকলকে নিজ পক্ষে টানিয়া লইয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

আলা-উদ্দিন খল্‌জী (১২৯৬-১৩১৬ খ্রীঃ)

আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালের প্রথম কয়েক বৎসরে মোঙ্গলগণ মোট পাঁচ বার হানা দিয়াছিল। কিন্তু আলা-উদ্দিনের সুদক্ষ ব্যবস্থাপনায় প্রতিবারই তাহারা পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইহার পর মোঙ্গলগণ আলা-উদ্দিনের আমলে আর ভারত আক্রমণ করে নাই। আলা-উদ্দিন ছিলেন দূরদর্শী শাসক। মোঙ্গল আক্রমণের স্থায়ী প্রতিরোধের জন্য তিনি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কয়েকটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়া এবং পুরাতন দুর্গগুলির সংস্কার সাধন করিয়া দেশকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। তিনি সামান ও দীপালপুর নামক স্থানে স্থায়ী সৈন্য মোতায়েন করিয়াছিলেন।

মোঙ্গলদের প্রতিহত করিবার ব্যবস্থা



আলা-উদ্দিন খল্‌জী

আলা-উদ্দিনের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানির রাজ্যসীমা বহু দূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তিনি গুজরাট, রণথম্ভোর, চিতোর, মালব, পাণ্ডু, ধার, চান্দেরী জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলে মুসলমান অধিকার দক্ষিণ ভারতের বরঙ্গল, হোয়সল রাজ্য, মাদুরা এবং সেতুবন্ধ রামেশ্বরম্ পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তাঁহার পূর্বে দিল্লী সুলতানি রাজ্য এইরূপ বিশালতা লাভ করে নাই।

রাজ্য জয়

আলা-উদ্দিনের সমর বিজয়ের প্রয়োজনে সামরিক বাহিনীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সৈনিকদের স্বল্প বেতনে দৈনন্দিন ব্যয়-সঙ্কুলান সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া তিনি নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসপত্রের দাম বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। মূল্য নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সর্বপ্রথম আলা-উদ্দিন খল্‌জীই ভারতে

চালু করিয়াছিলেন। আমীর-ওম্‌রাহ্‌গণ অত্যধিক বিত্তশালী ছিলেন। তাঁহাদের অবাধ আমোদ-প্রমোদ, মদ্যপান প্রভৃতি সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার সুযোগ সৃষ্টি করে এই বিবেচনা করিয়া আলা-উদ্দিন সরকারী অনুমতি ভিন্ন আমীর-ওম্‌রাহ্‌ বিবাহ বা কোন সামাজিক অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন না বলিয়া ঘোষণা করিলেন। হিন্দুদের হাতে যে পরিমাণ অর্থ ছিল তাহা

শাসনব্যবস্থা



হ্রাস করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর ভিন্ন নানাপ্রকার করভার তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন। এইভাবে বিদ্রোহ করিবার সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বস্তু—অর্থ, তিনি কাহারও হস্তে রাখিতে দেন নাই। আলা-উদ্দিন শিল্পানুরাগ, সাহিত্য ও সাহিত্যকারদের পৃষ্ঠপোষকতার জন্যও উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিক জিয়া-উদ্দিন বর্ণী, কবি হুসেন দেহ্‌ল্‌বী প্রভৃতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। আমীর খস্‌রু ছিলেন তাঁহার সভাকবি। ইনি তাঁহার সুন্দর কাব্যরচনা ও যন্ত্রসঙ্গীতের জন্য 'হিন্দুস্তানের তোতাপাখী' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। নৃশংসতা দোষে দুষ্ট হইলেও আলা-উদ্দিন শাসনকার্য পরিচালনায় অপরিসীম দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন।

আলা-উদ্দিনের পরবর্তী খল্‌জী সুলতানগণ দিল্লী সুলতানির উপর তাঁহাদের অধিকার বজায় রাখিতে পারিলেন না। আলা-উদ্দিনের সেনাপতি মালিক কাফুর নিজ ইচ্ছামত আলা-উদ্দিনের নাবালক পুত্র শিহাব্‌-উদ্দিনকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া নিজে প্রকৃত শাসনক্ষমতা হস্তগত করিলেন। কিন্তু তিনিও বেশী দিন সেই ক্ষমতা ভোগ করিতে পারিলেন না। তাঁহার ঔদ্ধত্যে বিরক্ত হইয়া আলা-উদ্দিনের কয়েকজন বিশ্বস্ত ক্রীতদাস মালিক কাফুরকে হত্যা করিল। তাহারা আলা-উদ্দিনের তৃতীয় পুত্র মোবারক শাহ্‌কে সিংহাসনে স্থাপন করিল। ইহাতেও ষড়যন্ত্রের অবসান ঘটিল না। দিল্লীতে এক দারুণ বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। পর পর সুলতান পরিবর্তন এবং ফলে অরাজকতা ব্যাপকভাবে দেখা দিলে আমীর-ওম্‌রাহ্‌ গাজী মালিককে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। গাজী মালিক গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সুলতান হইলেন। এইভাবে খল্‌জী বংশের অবসান ঘটিল (১৩২০ খৃঃ)।

আলা-উদ্দিনের পরবর্তী কালে দুর্বলতা : খল্‌জী বংশের অবসান (১৩২০ খৃঃ)

তুঘ্‌লক বংশ : গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক : গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শাসনকার্যে প্রয়োজনীয় দক্ষতা তাঁহার ছিল। তিনি দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া এবং সুবিচারের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি আলা-উদ্দিনের কঠোর নীতিরও তিনি কতকটা হ্রাস করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসনকালে বাংলাদেশের শাসক-পদ লইয়া নানাপ্রকার গোলযোগ সৃষ্টি হইলে গিয়াস-উদ্দিন স্বয়ং বাংলাদেশে আসিয়া নাসির-উদ্দিনকে বাংলার শাসনকর্তার পদে স্থাপন করিয়া দিল্লী ফিরিয়া যান। দিল্লী প্রবেশ কালে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য যে তোরণ নির্মিত হইয়াছিল উহা ভাঙিয়া পড়ে এবং তাঁহার মৃত্যু ঘটে। তাঁহার পুত্র জুনা খাঁ-ই এজন্য দায়ী ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন।

তুঘ্‌লক বংশ : গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক (১৩২০-২৫ খৃঃ)

মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক : মহম্মদ জুনা খাঁ মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লক নাম ধারণ করিয়া দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার চরিত্রে নানা পরস্পর-বিরোধী গুণের সমাবেশ হইয়াছিল। নিজে কবি, সুসাহিত্যিক, চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্‌গুণের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। ধর্মান্ধতা, ব্যভিচার, মদ্যাশক্তি, বিলাস-ব্যসন প্রভৃতি সবকিছুর তিনি ঊর্ধ্বে ছিলেন।

আরবী ও ফারসী ভাষায় তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। এদিক্ দিয়া বিচার করিলে তিনি ছিলেন মুসলমান সুলতান-বাদশাহ্দের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ও গুণসম্পন্ন। কিন্তু তাঁহার অনন্যসাধারণ পারদর্শিতা এবং বিভিন্নমুখী প্রতিভা থাকা সত্ত্বেও বাস্তব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার অভাবহেতু তিনি নিজ পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করিয়া তুলিতে পারেন নাই। একবার কোন কার্যে অকৃতকার্য হইলে তিনি ধৈর্যহীন হইয়া পড়িতেন ফলে পরবর্তী পদক্ষেপে তাঁহার ভুলভ্রান্তি ঘটিত। এই সকল কারণে ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌-স্টোন, হ্যাভেল, টমাস, স্মিথ্ প্রভৃতি তাঁহাকে বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরিকল্পনার যৌক্তিকতার কথা বিচার করিয়া গার্ডনার, ব্রাউন, ঈশ্বরীপ্রসাদ প্রমুখ ঐতিহাসিক মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের বিরুদ্ধে বিকৃত মস্তিষ্কতার অভিযোগ অযৌক্তিক বলিয়া মনে করেন। ইবন্-বতুতা বা জিয়া-উদ্দিন বরণীর রচনায় বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক (১৩২৫-৫১ খ্রীঃ)

দিল্লী হইতে দেবগিরি বা দৌলতাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত করা অযৌক্তিক ছিল না। কারণ উহা ছিল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। কিন্তু স্থানান্তরের কাজ কিভাবে করা উচিত ছিল তাহা তিনি জানিতেন না। তিনি দিল্লীর সকল লোককে দেবগিরি যাইতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং সেখানে যাইবার পর সেই স্থানটি ভাল না লাগায় তিনি পুনরায় সকলকে দিল্লী ফিরিয়া আসিতে আদেশ দিয়াছিলেন। তিনি একথা উপলব্ধি করেন নাই যে, তাঁহার রাজসভা ও দপ্তর, বিচারালয় প্রভৃতি স্থানান্তরিত করিলে দিল্লীর জনসাধারণ আপনা হইতেই দেবগিরি যাইতে বাধ্য হইত। অনুরূপ তাঁহার কারাজল অভিযান, খোরাসান ও ইরাক জয়ের পরিকল্পনাও যুক্তির দিক দিয়া সমর্থনযোগ্য ছিল। মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক তামার নোট প্রচলন করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন। চীনের অনুকরণে তামার নোট চালু করিতে গিয়া উহা যাহাতে কেহ নকল না করিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিবার প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। রাজ্যের সর্বত্র উহা নকল করা শুরু হওয়ায় তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের পরিকল্পনাগুলি যুক্তিগ্রাহ্য হইলেও এগুলির ব্যর্থতা, তাঁহার নিজের অব্যবস্থিত চিত্ততা প্রভৃতি তাঁহার শাসনব্যবস্থাকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহের সংখ্যাও ক্রমে বৃদ্ধি পাইতে

তাঁহার পরিকল্পনার ব্যর্থতা



মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক

লাগিল। দক্ষিণ ভারত সুলতানি সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেখানে বিজয়নগর ও বহমনী নামে দুইটি রাজ্য গড়িয়া উঠিল। বাংলাদেশে ফকরুদ্দিন মুবারক শাহ্ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সিন্ধু অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দিল। সেই বিদ্রোহ দমন করিতে গিয়াই মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক মৃত্যুমুখে পতিত হন। দিল্লীর তুর্ক-আফগান সুলতানির পতনের সূত্রপাত তাঁহার রাজত্বকালেই হইয়াছিল।

সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশে বিদ্রোহ : সুলতানির পতনের সূত্রপাত

তাঁহার রাজত্বকালে আফ্রিকার মরক্কোবাসী পর্যটক ইবন্-বতুতা ভারতবর্ষে আসেন (১৩৩৩ খ্রীঃ)। সুলতান মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক তাঁহাকে দিল্লীর প্রধান কাজীর পদে নিযুক্ত করেন এবং ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে চীনে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। ইবন্-বতুতা তাঁহার সুখ্যাতি করিয়া গিয়াছেন।

মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লক ছিলেন এক অদ্ভুত, অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের লোক। ইতিহাসে তাঁহার স্থান নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে।

ফিরোজ তুঘ্লক : পরবর্তী তুঘ্লক সুলতান ছিলেন মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের পিতৃব্য রজবের পুত্র (খুড়তুত ভাই) ফিরোজ তুঘ্লক। বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়া তিনি তেমন সামরিক দক্ষতা দেখাইতে পারেন নাই। মহম্মদ-বিন্-তুঘ্লকের রাজত্বকালের শেষ দিকে সিন্ধু ও বাংলাদেশ স্বাধীন হইয়া গিয়াছিল। বাংলাদেশ তিনি পুনর্দখল করিতে গিয়া অকৃতকার্য হইয়াছিলেন। সিন্ধু অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল। তিনি বাংলাদেশ হইতে ফিরিবার পথে উড়িষ্যা জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন কাংড়া দুর্গটিও তিনি জয় করিয়াছিলেন। ফিরোজ শাহ্ তুঘ্লক প্রজাহিতৈষণার জন্য বিশেষভাবে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি কৃষি-ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য সেচব্যবস্থা, রাজস্বভার লাঘব প্রভৃতি করিয়াছিলেন। বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য একটি 'নিয়োগ পরিষদ' (Employment Bureau), চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছিলেন। হিন্দুদের উপর তিনি জিজিয়া কর ধার্য করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার কর স্থাপন করিয়াছিলেন। ধর্মের প্রতি তাঁহার অত্যধিক শ্রদ্ধাবশত তিনি ধর্মান্ধনীতি অনুসরণ করিতে দ্বিধা করেন নাই। নিজে তিনি ছিলেন সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান। সুন্নী সম্প্রদায় ভিন্ন অপরাপর সম্প্রদায়ের বিশেষভাবে শিয়া সম্প্রদায় এবং হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিতেও তিনি পশ্চাৎপদ হন নাই। ধর্মান্ধতাই ছিল তাঁহার চরিত্রের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ত্রুটি।

ফিরোজ তুঘ্লক (১৩৫১-৮৮ খ্রীঃ)

ফিরোজ তুঘ্লকের শাসন কতক পরিমাণে জনপ্রিয় হইলেও দিল্লী সুলতানির ভিত্তি তিনি দুর্বলতর করিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। রাজনীতিতে উলেমাদের প্রভাব বিস্তার, পদস্থ কর্মচারীদের অক্ষমতা ও অদক্ষতা, সামরিক কর্মচারীদের ও অভিজাতবর্গের প্রতি তাঁহার অযৌক্তিক ঔদার্য এবং সর্বোপরি জায়গির প্রথার পুনঃপ্রবর্তন দিল্লী সুলতানির পতনের পথ সহজতর করিয়া দিয়াছিল।

দিল্লী সুলতানির পতনের জন্য তাঁহার দায়িত্ব

সৈয়দ বংশ : লোদী বংশ : মহম্মদ-বিন্-তুঘ্‌লকের রাজত্বকালে দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের সর্বত্র যে অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল তাহা হইতে দিল্লী সুলতানিকে রক্ষা করিবার ক্ষমতা ফিরোজ শাহ্ তুঘ্‌লক বা তাঁহার পরবর্তী সুলতানদের ছিল না। দিল্লী সুলতানির শাসন যখন ক্রমেই শিথিল এবং দিল্লী সাম্রাজ্য যখন ক্রমেই ক্ষুদ্র পরিসর হইয়া পড়িতেছিল সেই সময়ে তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠন (১৩৯৮ খ্রীঃ) দিল্লী সুলতানিকে চরম আঘাত হানিয়াছিল। দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশ এই দুর্বলতার সুযোগে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। তুঘ্‌লক বংশের শাসনকালের শেষে এবং মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্তর্বর্তী কালে দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্যের যে অংশ টিকিয়াছিল উহার উপর সৈয়দ ও লোদী বংশের সুলতানগণ রাজত্ব করিতে-ছিলেন। তাঁহাদের শাসনব্যবস্থা যেমন ছিল শিথিল তেমনি অকর্মণ্য। ফলে লোদী বংশের ইব্রাহিম লোদী পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে (১৫২৬ খ্রীঃ) বাবরের হস্তে পরাজিত হইলে দিল্লীর তুর্ক-আফগান সুলতানির অবসান ঘটে।

সৈয়দ বংশ (১৪১৪-৫১ খ্রীঃ)

লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খ্রীঃ)

দিল্লী সুলতানির পতন : দিল্লী সুলতানি সাম্রাজ্য সুলতানদের ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নির্ভরশীল ছিল। জনসাধারণের আনুগত্য বা সহযোগিতার উপর উহা গড়িয়া উঠে নাই। এজন্য দিল্লী সুলতানির ভিত্তি ছিল অত্যন্ত দুর্বল। ইহা ভিন্ন সুলতানি শাসনব্যবস্থা ছিল সামন্ত প্রথার উপর নির্ভরশীল। ইহার প্রধান ত্রুটিই ছিল এই যে, কেন্দ্রীয় শাসন সামান্য দুর্বল হইলে সামন্তগণ স্ব স্ব প্রধান হইয়া উঠিত। বড় বড় জমিদার, অভিজাত ব্যক্তি, আমীর-ওমরাহ্, জায়গিরদার প্রভৃতি দিল্লী সুলতানি শাসনের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। স্থানীয় এলাকায় তাঁহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল অত্যধিক। কেন্দ্রীয় শাসন দুর্বল হওয়া মাত্র তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ একই রূপ ব্যবহার করিতেন। এই সকল কারণ ভিন্ন ক্রীতদাসের সংখ্যাধিক্য ও অকর্মণ্যতা এবং সরকারের উপর তাঁহাদের জন্য খরচের চাপ শাসনব্যবস্থার শক্তি বৃদ্ধি না করিয়া দুর্বলতর করিয়া দিয়াছিল। সুলতানি আমলের প্রথম দিকে কুতব-উদ্দিন, ইল্‌তুৎমিসের ন্যায় সুদক্ষ ক্রীতদাস আর শেষ দিকে পাওয়া যায় নাই। এদিকে রাজকর্মচারীদের ব্যভিচার, মদ্যাসক্তি, বিলাস-ব্যসন তাঁহাদের কর্মদক্ষতা লোপ করিয়াছিল। শাসনযন্ত্র অকর্মণ্য ও অচল হইয়া পড়িয়াছিল। সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতা, উচ্ছৃঙ্খলতা এবং রাজস্ব অপহরণের প্রবণতাও শাসনব্যবস্থার দুর্বলতার কারণ হইয়াছিল। হিন্দুদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, তাহাদের সম্পত্তি বিনাশ, তাহাদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন প্রভৃতি হিন্দুপ্রধান ভারতে অনুসরণ করিয়া দিল্লী সুলতানগণ ভারতের জাতীয় সুলতানে পরিণত হইতে পারেন নাই। এই সংকীর্ণতার ফলে প্রজাবর্গ সুলতানদের প্রতি অকপট আনুগত্য প্রদর্শন করিতে পারে নাই এবং অকপট আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল নহে এরূপ সাম্রাজ্য সহজেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল

দিল্লী সুলতানির পতন

আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও দুর্বলতা যখন চরমে পেঁাছিয়াছে সেই সময়ে তৈমুর লঙ কর্তৃক ভারত আক্রমণ ও দিল্লী লুণ্ঠন সুলতানিকে চরম আঘাত হানিয়া গিয়াছিল। ইহার পর লোদী বংশের আমলে নিজেদের মধ্যে কলহ প্রশাসন বিভাগকে দুর্বলতর করিয়া দিয়াছিল। এই আত্মকলহের সর্বনাশাত্মক ফল হিসাবে আলম খাঁ লোদী ও দৌলত খাঁ লোদী বিদেশী আমীর মোগল বীর বাবরকে আমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া সুলতানি সাম্রাজ্যের অবসান ঘটাইয়াছিলেন।

তৈমুর লঙ ও বাবরের আক্রমণ : দিল্লী সুলতানির অবসান

(খ) ভারতে মোগল শক্তির উত্থান, প্রসার ও পতন

(Rise, Growth and Decline of Mughal Power in India)

মোগলগণ : মোগল বা মুঘল কথাটি মোঙ্গল শব্দ হইতে উদ্ভূত। মধ্য-এশিয়ার বর্তমান মোঙ্গলিয়ায় মোঙ্গলদের আদি বাসভূমি ছিল। চিঙ্গিস খাঁ ছিলেন মোঙ্গল উপদলের নেতা। 'চিঙ্গিস' কথাটির অর্থ হইল 'অসাধারণ শক্তিশালী'। তিনি একবার খারিজমের শাহের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধুদেশের সীমা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। খারিজমের শাহ্ ভারতে আশ্রয় না পাইয়া ফিরিয়া গেলে চিঙ্গিস খাঁও ফিরিয়া যান। চিঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর মধ্য-এশিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র চাঘ্তাইয়ের অধিকারে আসে। এই রাজ্যের পশ্চিম অংশে তাতারদের সংখ্যা বেশী থাকায় ঐ অঞ্চলের তাতার ও মোঙ্গল জাতির মধ্যে বিবাহাদির মাধ্যমে সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটে। এই মোঙ্গল-তাতার জাতি হইতে তৈমুর লঙের উদ্ভব ঘটে। তৈমুর ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন সর্বপ্রথম মোঙ্গল নেতা যিনি দিল্লী পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছিলেন। তৈমুরের বংশধরই পরে দিল্লীতে মোঙ্গল বা মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন।

মোঙ্গলদের আদি পরিচয়

বাবর : জহির-উদ্দিন মহম্মদ বাবর নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। পিতার দিক্ দিয়া তৈমুরের এবং মাতার দিক্ দিয়া চিঙ্গিসের তিনি বংশধর ছিলেন। এই দুই দুর্ধর্ষ বীরের রক্ত তাঁহার শিরায় প্রবাহিত ছিল ; সুতরাং তিনি নিজেও একজন অসাধারণ বীর হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য কি ? মোঙ্গল বংশের সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া তিনি নিজেকে মোগল—অর্থাৎ মোঙ্গল নামেই পরিচয় দিতেন। এজন্য ভারতে তিনি যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন উহা মোগল বংশ নামে পরিচিত। মাত্র একাদশ বৎসর বয়সে পিতা ওমর শেখকে হারাইলে, তুর্কীস্তানের ফর্ঘনা রাজ্যের শাসনভার তাঁহার উপর পড়িল। বালক বাবর সিংহাসনে আরোহণ করিলে আত্মীয়-স্বজন অনেকেই নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু বাবর ছিলেন প্রতিভাবান ব্যক্তি। বাবর কথাটির অর্থ হইল 'সিংহ'। বস্তুত বাবর ছিলেন পুরুষসিংহ। তিনি শাসনকার্যে দক্ষতার পরিচয় দিলেন, স্বার্থান্বেষীদের তিনি কোন সুযোগ

বাবর (১৫২৬-৩০ খ্রীঃ)

গ্রহণ করিতে দিলেন না। তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ নিজ অধিকারে আনিয়া বাবর এক বিশাল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় উজ্‌বেগ্‌ সর্দার সাহেবানী খাঁ সমরখন্দ দখল করিয়া লইলেন। ফর্‌ঘনা হইতেও বাবর বিতাড়িত হইলেন। ভাগ্য-বিড়ম্বিতের ন্যায় তিনি স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিতে লাগিলেন। এমন সময় কাবুল রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় দুর্বলতা দেখা দিলে অতি অল্পসংখ্যক অনুচর লইয়া তিনি কাবুল দখল করিয়া লইলেন। কাবুলের আমীর-পদে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি হিন্দুস্থান জয়ের কল্পনা করিতে লাগিলেন। এমন সময় লোদী বংশের আত্মকলহে যখন সুলতানি রাজত্ব টলটলায়মান সেই সময়ে পাঞ্জাবের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদী ও সুলতান ইব্রাহিম লোদীর পিতৃব্য আলম খাঁ লোদী দিল্লীর সিংহাসন দখল করিবার আশায় বাবরের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। হিন্দুস্থান জয়ের সুযোগ আপনা হইতেই আসিয়াছে দেখিয়া বাবর তাহা সানন্দে গ্রহণ করিলেন এবং ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই লাহোর অধিকার করিয়া লইলেন। দৌলত খাঁ ও আলম খাঁর তখন ভুল ভাঙিল। বাবর তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে আসিয়া নিজে দেশ জয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা বাবরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। বাধ্য হইয়া বাবর নিজ দেশে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু পর বৎসর (১৫২৬ খ্রীঃ) এক বিশাল বাহিনী, কামান, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া তিনি দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইলেন। পাণিপথের প্রান্তরে ইব্রাহিম লোদী তাঁহাকে বাধা দিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। বাবর কামান ও বন্দুকের সাহায্যে ইব্রাহিম লোদীর এক লক্ষ সৈন্যের বিশাল বাহিনীকে পরাজিত করিলেন। পাণিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। বাবর দিল্লী ও আগ্রা দখল করিয়া ভারতে মোগল রাজত্বের সূচনা করিলেন। পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে দিল্লী সুলতানি শাসনের অবসান ঘটিল। কিন্তু মেবারের রাজপুত রাজ্য এবং বাংলা-বিহারের আফগান রাজ্য সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বাবরের ভীতির সঞ্চার করিল। বাবর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুনকে আফগানদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে প্রেরণ করিলেন।


বাবর

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬ খ্রীঃ)

হুমায়ুন কয়েক মাসের মধ্যেই এটক হইতে বিহারের সীমা পর্যন্ত যাবতীয় অঞ্চলের আফগান নেতৃবৃন্দকে বাবরের প্রভুত্ব স্বীকারে বাধ্য করিলেন। বাবর স্বয়ং মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহকে (রাণা সঙ্গ) খানুয়ার যুদ্ধে পরাজিত করিলেন (১৫২৭ খ্রীঃ)। খানুয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিবার ফলে তদানীন্তন ভারতের সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭ খ্রীঃ)

হইতে বাবর রক্ষা পাইলেন। তাঁহার দিল্লীর বাদশাহীও সুদৃঢ় হইল। ইহার পর চান্দেরী দুর্গ অধিকার করিয়া বাবর তাঁহার সাম্রাজ্যের সামরিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করিলেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপতিগণ সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে বাবরের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিলে গোগ্রার যুদ্ধে বাবর তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন। ফলে বাংলাদেশের সীমা পর্যন্ত বাবরের রাজ্যসীমা বিস্তৃত হইল। অল্পকালের মধ্যেই বাবরের মৃত্যু হইল (১৫৩০ খ্রীঃ)। বাবর অসামান্য কর্মশক্তি, অপরিসীম উদ্যম, ধৈর্য ও অনন্যসাধারণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। সামরিক সংগঠন, তুর্কী ও ফারসী ভাষার পৃষ্ঠপোষকতা, সন্তানবাৎসল্য, বন্ধুপ্রীতি প্রভৃতি তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল। তিনি নিজ জীবনস্মৃতি রচনা করিয়াছিলেন।

গোগ্রার যুদ্ধ (১৫২৯ খ্রীঃ)

হুমায়ুন: বাবরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ্ হইলেন। বাবর যে বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন উহার ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার অবকাশ তিনি পান নাই; সুতরাং সেই দায়িত্ব পড়িল তাঁহার পুত্র হুমায়ুনের উপর। বাবর মৃত্যুর পূর্বে হুমায়ুনকে নিজ ভ্রাতাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। হুমায়ুন পিতার শেষ নির্দেশ পালনে ত্রুটি করেন নাই। তিনি মধ্যম ভ্রাতা কামরানকে কাবুল ও কান্দাহার, তৃতীয় ভ্রাতা হিন্দালকে মেওয়াট এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা আস্করীকে সম্বল নামক স্থানটি দিয়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে কামরান সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি পাঞ্জাব, হিসারফিরোজা প্রভৃতি অঞ্চল বলপূর্বক দখল করিয়া লইলেন। হুমায়ুন ভ্রাতার এই বিদ্রোহাত্মক কাজের জন্য কোন শাস্তি দেওয়া দূরে থাকুক পাঞ্জাব ও হিসারের উপর তাঁহার অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহার ফলে মোগল সাম্রাজ্যের ঐক্য হুমায়ুন নিজেই বিনাশ করিলেন।

হুমায়ুন (১৫৩০-৫৬ খ্রীঃ)


হুমায়ুন

আফগান দলপতিগণ বাবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু হুমায়ুনের সিংহাসন আরোহণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা মোগল সাম্রাজ্যের বিরোধিতা শুরু করিলেন। গুজরাটের শাসনকর্তা বাহাদুর শাহ্ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া রাজপুতদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি চিতোর অধিকার করিলেন। বাংলা ও বিহারের আফগান দলপতিগণও নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে মনোযোগী হইয়া উঠিলেন। হুমায়ুন দোরাহের যুদ্ধে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিলেন বটে কিন্তু বিহারের আফগান বীর শের শাহ্ সেই সময়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিলেন।

হুমায়ুনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

শের শাহ্ : শের শাহের আসল নাম ছিল ফরিদ খাঁ। তিনি ছিলেন সাসারামের জায়গিরদার হাসানের পুত্র। বিমাতার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হইয়া তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং জৌনপুরে চলিয়া যান। সেখানে তিনি আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। এই দুই ভাষায় তাঁহার গভীর জ্ঞান জন্মায়। তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল। ইহার পর কিছুকাল তিনি সাসারামে পিতার সহিত বাস করেন এবং পিতা সাসারামের শাসনভার তাঁহার উপর ন্যস্ত করেন। কিন্তু বিমাতার ঈর্ষা তাঁহাকে পুনরায় গৃহত্যাগে বাধ্য করে। পিতার মৃত্যুর পর দিল্লীর বাদশাহ্ তাঁহাকে সাসারামের জায়গির দান করেন। তারপর তিনি বিহারের শাসনকর্তা বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। সেখানে তাঁহার কর্মদক্ষতা অল্পকালের মধ্যেই বহর খাঁর সন্তুষ্টি বিধান করিলে শের শাহের পদমর্যাদা ক্রমেই বাড়িতে থাকে। বহর খাঁর অধীনে কাজ করিবার সময় তিনি একা একটি বাঘের সহিত লড়াই করিয়া বাঘটি মারিয়াছিলেন। এজন্য বহর খাঁ তাঁহাকে 'শের'—অর্থাৎ 'বাঘ' উপাধি দিয়াছিলেন। বিহারের অভিজাতবর্গের অনেকে শের শাহের ভাগ্যোন্নতিতে ঈর্ষাকাতর হইয়া বহর খাঁর নিকট তাঁহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার অভিযোগ করিতে লাগিলেন। ফলে শের শাহের চাকরি গেল, সাসারামের জায়গিরও বাজেয়াপ্ত হইল। ইহার পর কিছুকাল বাবরের অধীনে সৈনিকের চাকরি করিয়া তিনি বাবরের সন্তুষ্টিবিধান করিলে শের শাহ্‌কে সাসারামের জায়গির ফিরাইয়া দেওয়া হইল। এদিকে বহর খাঁ লোহানীর মৃত্যু হইলে তাঁহার নাবালক পুত্র জালাল খাঁর অভিভাবকত্ব গ্রহণের জন্য শের শাহ্‌কে আমন্ত্রণ জানান হইল। শের শাহের উপর শাসনভার ন্যস্ত হওয়ায় তিনি ক্রমেই বিহারের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং কর্মদক্ষতা সমরবাহিনী ও প্রশাসনিক কর্মচারীদের উপর তাঁহার প্রভাব এবং আধিপত্য বিস্তারে সাহায্য করিল।

শের শাহের পরিচয়



শের শাহ্

চুণার দুর্গের অধিপতি সেই সময়ে মারা গেলে শের শাহ্ তাঁহার বিধবা পত্নী মালিকাকে বিবাহ করিয়া চুণার দুর্গের অধিপতি হইলেন। শের শাহের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া হুমায়ুন শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং চুণার দুর্গটি অবরোধ করিলেন। শের শাহ্ মৌখিকভাবে হুমায়ুনের বশ্যতা স্বীকার করিলেন, কিন্তু ইহা তাঁহার নিজ শক্তিবৃদ্ধির জন্য সময় লইবার উদ্দেশ্যেই তিনি করিয়াছিলেন।

জালাল খাঁ ইতিমধ্যে প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। তিনি এবং শের শাহের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ অভিজাতবর্গ শের শাহ্‌কে বিহারের শাসন অধিকার হইতে বিচ্যুত করিতে চাহিলে

সুরযগড়ের যুদ্ধে শের শাহ্ তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়া নামে ও কাজে বিহারের সর্বেসর্বা হইয়া উঠিলেন। শের শাহের আকাঙ্ক্ষা এখন স্বভাবতই বৃদ্ধি পাইল। তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্য সচেষ্ট হইলেন। ফলে হুমায়ুনের সঙ্গে শের শাহের সংঘর্ষ শুরু হইল।

সুরযগড়ের যুদ্ধ (১৫৩৪ খ্রীঃ)

চুণার দুর্গ অবরোধ করিবার পর শের শাহ্ কূটকৌশলে হুমায়ুনের বশ্যতা মুখেই স্বীকার করিয়া নিজ শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। হুমায়ুন শের শাহের মৌখিক আনুগত্য স্বীকারে সন্তুষ্ট হইয়া ফিরিয়া গিয়া অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যাহা হউক, ইতিমধ্যে গুজরাটের বাহাদুর শাহ্ ক্রমেই নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছিলেন এমন কি হুমায়ুনের বিরুদ্ধবাদী আফগান দলপতিদিগকে আশ্রয় দান করিয়া হুমায়ুনের প্রকাশ্য বিরোধিতা শুরু করিয়াছিলেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইলে সেই সুযোগে শের শাহ্ বাংলাদেশ আক্রমণ করিয়া কিউল হইতে সক্‌রিগলি পর্যন্ত স্থান দখল করিয়া লইলেন। ইহার পর অপর এক অভিযানে তিনি বাংলাদেশের রাজধানী গৌড় অবরোধ করিলেন। হুমায়ুন শের শাহ্‌কে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, কিন্তু প্রথমেই তিনি কূটনৈতিক ভুল করিয়া বসিলেন। বাংলার শাসনকর্তার সহিত যুগ্মভাবে শের শাহ্‌কে দমন করিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি প্রথমে চুণার দুর্গটি অবরোধ করিলেন। এই দুর্গ জয় করিতে তাঁহাকে দীর্ঘ ছয় মাস অতিবাহিত করিতে হইল। সেই সুযোগে শের শাহ্ গৌড় অধিকার করিলেন। হুমায়ুন যখন গৌড়ের দিকে অগ্রসর হইলেন তখন শের শাহ্ গৌড় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন এবং হুমায়ুন গৌড় দখল করিয়া যখন আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত শের শাহ্ সেই সময়ে চুণার দুর্গটি পুনর্দখল করিয়া লইলেন এবং জৌনপুর, বারাণসী প্রভৃতি জয় করিয়া কনৌজ পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এইভাবে তিনি হুমায়ুনের দিল্লী ফিরিবার পথ নিজ অধিকারে লইয়া গেলেন। হুমায়ুন কালক্ষেপ না করিয়া আগ্রা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে চৌসা নামক স্থানে শের শাহ্ তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিলেন। কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া হুমায়ুন আগ্রা ফিরিয়া গেলেন। পর বৎসর (১৫৪০ খ্রীঃ) হুমায়ুন শের শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হইলে কনৌজের যুদ্ধে শের শাহ্ তাঁহাকে পুনরায় শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিলেন। মোগল সাম্রাজ্য শের শাহের অধিকারে চলিয়া গেল। পরাজিত হুমায়ুন ভ্রাতাদের কাহারও কাছে এই দুর্দিনে আশ্রয় পাইলেন না। অমরকোটের রাজার নিকট তিনি আশ্রয় পাইলেন। সেখানেই আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২ খ্রীঃ)। কিছুকাল পর তিনি পরিবারসহ পারস্যে চলিয়া যান।

চৌসার যুদ্ধ (১৫৩৯ খ্রীঃ)

হুমায়ুন সিংহাসনচ্যুত

শের শাহ্ দিল্লীর বাদশাহ্ হইয়া রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হইলেন। বাংলাদেশের বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি উহা নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিলেন। গোয়ালিওর, মালব, রায়সিন দুর্গ জয় করিয়া মেবারের দিকে অগ্রসর হইলেন। রাণা মালদেবও শের শাহের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। শের শাহ্ এইভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্যের

অধিকারী হইলেন। এই বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনায়ও শের শাহ্ অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন। তিনি মাত্র পাঁচ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন, কিন্তু এরই মধ্যে তিনি এক সুদৃঢ় শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালেও এই শাসনব্যবস্থার অনেক কিছু অপরিবর্তিত ছিল। তিনি সমগ্র সাম্রাজ্যকে ৪৭টি সরকার এবং প্রতি সরকারকে কতকগুলি পরগনায় বিভক্ত করিয়াছিলেন। তিনি নানা পর্যায়ের রাজকর্মচারী নিয়োগ করিয়া এবং কিছুকাল পর পর তাহাদিগকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে বদলির ব্যবস্থা করিয়া এক পক্ষপাতশূন্য সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা চালু করিয়াছিলেন।

শের শাহ্ দিল্লীর বাদশাহ্

শের শাহের শাসন-ব্যবস্থা

শের শাহের রাজস্ব-ব্যবস্থা।

তাঁহার রাজস্বব্যবস্থা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। জমির উর্বরতার ভিত্তিতে তিনি রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রজাবর্গের নিকট হইতে রাজস্ব আদায়ের শর্ত স্বীকার করিয়া কবুলিয়ত নামক দলিল গ্রহণ করিবার এবং সরকারেরও পক্ষ হইতে জমির উপর প্রজার স্বত্ব, জমির সীমা ও রাজস্বের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া পাট্টা নামক দলিল প্রজাকে দিবার ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। মোগল সম্রাট্ আকবরের আমলে শের শাহের রাজস্বব্যবস্থার অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়। শের শাহ্ রাস্তাঘাট নির্মাণ, বিচারব্যবস্থার সংস্কার, ডাক, সেনাবিভাগ ও গোয়েন্দা বা গুপ্তচর বিভাগের উন্নতি সাধন করিয়া শাসনব্যবস্থাকে দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড শের শাহ্ কর্তৃক নির্মিত রাস্তার বর্তমান নাম। ঘোড়ার পিঠে করিয়া ডাক এক স্থান হইতে অন্যত্র প্রেরণের ব্যবস্থা তিনিই প্রচলন করিয়াছিলেন।

জাতীয় সম্রাট্

শের শাহের শাসনব্যবস্থার অন্যতম গুণ ছিল এই যে, উহাতে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ক্ষমতানুযায়ী কর্মচারিপদে নিযুক্ত হইবার সুযোগ দেওয়া হইত। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রজাদের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ তিনি স্বীকার করিতেন না ; হিন্দুপ্রধান ভারতের জাতীয় বাদশাহ্ বা সম্রাট্ হইতে হইলে ধর্মের ভিত্তিতে ভেদাভেদ করা মূর্খতা হইবে একথা শের শাহের ন্যায় দূরদর্শী বাদশাহ্ই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

হুমায়ুন কর্তৃক মোগল বাদশাহীর পুনঃপ্রতিষ্ঠা

শের শাহের উত্তরাধিকারিগণের দুর্বলতার জন্য শের শাহ্ প্রতিষ্ঠিত আফগান বাদশাহী শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। শের শাহের পরবর্তী বাদশাহ্দের অক্ষমতা ও আত্মকলহ হুমায়ুনকে তাঁহার হৃত সিংহাসন পুনরুদ্ধারের সুযোগ দান করিল। ১৫৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুন পারস্য সম্রাটের সাহায্য লইয়া পাঞ্জাব, দিল্লী, আগ্রা দখল করিয়া পুনরায় মোগল বাদশাহীর প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু মাত্র এক বৎসর পর নিজ গ্রন্থাগারের সিঁড়ি হইতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার মৃত্যু ঘটিল (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

আকবরের সিংহাসন লাভ (১৫৫৬ খ্রীঃ)

সম্রাট্ আকবর : হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র আকবর মাত্র তের বৎসর বয়সে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। বৈরাম খাঁ নামক হুমায়ুনের বিশ্বস্ত বন্ধুর চতুরতায় হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে আকবরের সিংহাসনলাভে কোন অসুবিধা ঘটে নাই

হুমায়ুন মোগল সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সেই সাম্রাজ্য দিল্লী, আগ্রা ও পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। সিন্ধু, কাশ্মীর, মালব, উড়িষ্যা, গুজরাট এবং দক্ষিণ ভারতে খান্দেশ, বেরার, আহ্মদনগর, গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য নিজ নিজ স্বাধীন সুলতানের অধীনে ছিল। আফগান অভিজাতগণও ভারতের বিভিন্নাংশে তখনও স্থানীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি ভোগ করিতেছিলেন। এদিকে পোর্তুগীজ বণিকগণও গোয়া, দিউ প্রভৃতি অঞ্চলে রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল।



মহামতি আকবর

হুমায়ুনের যখন মৃত্যু হয় তখন আকবর পাঞ্জাবের শাসনকর্তা ছিলেন এবং বৈরাম খাঁ ছিলেন তাঁহার অভিভাবক। হুমায়ুনের আকস্মিক মৃত্যুতে শূরবংশীয় অর্থাৎ শের শাহের বংশের আফগানদের জনৈক বংশধর আদিল শাহ্ ছিলেন খুব শক্তিশালী। তিনি আফগান প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের উদ্দেশ্যে তাঁহার সেনাপতি হিমুকে দিল্লী ও আগ্রা দখল করিতে প্রেরণ করেন। হিমু এই দুই স্থান দখল করিয়া নিজে বিক্রমজিৎ উপাধি গ্রহণ করিয়া রাজত্ব শুরু করেন। এদিকে বৈরাম খাঁ আকবরকে বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া পাঞ্জাব হইতে দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। পাণিপথের প্রান্তরে হিমুর সহিত আকবরের যুদ্ধ হয়। হিমু পরাজিত হইলে, আকবর দিল্লীতে বাবর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। এই যুদ্ধ পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত (১৫৫৬ খ্রীঃ)।

পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রীঃ)

ইহার পর আকবর কিছুকাল বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বাধীনে রহিলেন। বৈরাম খাঁ আফগান দলপতি আদিল শাহ্‌কে পরাজিত ও নিহত করিলেন। অপরাপর আফগান নেতাও আকবরের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। বৈরাম খাঁর তত্ত্বাবধানে তিন বৎসরের মধ্যে আজমীর, গোয়ালিওর ও জৌনপুর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইল। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে আকবর বৈরাম খাঁর নিকট হইতে শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু আরও দুই বৎসর আকবরকে তাঁহার ধাত্রীমাতা মহম্ অন্‌গা ও তাঁহার পুত্র আদম খাঁর প্রভাবাধীনে থাকিতে হইল। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে আকবর এই প্রভাব কাটাইয়া সম্পূর্ণ শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। এদিকে মোগল সাম্রাজ্যের সীমা ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছিল। ১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দে মোগলগণ মালব অভিযান করেন। ১৫৬২ খ্রীষ্টাব্দে অম্বর (জয়পুর) আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিল এবং রাজা বিহারীমল্ল তাঁহার সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিলেন। ১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে গণ্ডোয়ানা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত

এবং আকবর কর্তৃক জিজিয়া কর রহিত হইল। চিতোর, রণথম্ভোর, কালিঞ্জর, বিকানীর, জয়সলমীর প্রভৃতি একে একে আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইল। চিতোর মেবারের হস্তচ্যুত হইলে উদয়সিংহের পুত্র রাণা প্রতাপ উহা পুনরুদ্ধার করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। দেশপ্রেমিক, স্বাধীনচেতা রাণা প্রতাপ মোগল সম্রাট্ আকবরের প্রভুত্ব অস্বীকার করিয়া মেবারের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ লড়িয়া চলিলেন। তাঁহার কাজ যে কত কঠিন ছিল তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। তিনি তখন নিজ রাজধানী হইতে বিতাড়িত, স্বজাতি এমন কি, নিজ ভ্রাতার সাহায্য হইতে বঞ্চিত। অথচ প্রতিপক্ষ কেবল ভারতের সর্বাধিক বিত্তশালী ও শক্তিশালী সম্রাট্ই ছিলেন না, তিনি রাণা প্রতাপের স্বজাতির সাহায্যপুষ্ট দুর্ধর্ষ শত্রু ছিলেন। কিন্তু এইসব কোনকিছুই রাণা প্রতাপকে তাঁহার আদর্শ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে নাই। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এই দুর্ধর্ষ রাজপুত বীর মোগল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহ এবং সহকারী সেনাপতি আসফ খাঁর বিরুদ্ধে হলদিঘাটের যুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া পরাজিত হইলেন। এইভাবে আকবর রাণা প্রতাপকে পরাজিত করিলেন সত্য, কিন্তু প্রতাপের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে জয় করিতে পারিলেন না। রাণা প্রতাপের দুর্গগুলি একে একে আকবরের অধিকারে আসিলে রাণা প্রতাপ পর্বত-অরণ্যে আত্মগোপন করিলেন, কিন্তু আকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়া নিজ রাজ্য ফিরিয়া পাইবার হীন চেষ্টা তিনি কল্পনায়ও আনিলেন না। অনিদ্রা, অনাহার—সর্বপ্রকার দুঃখকষ্ট ভোগ করিয়াও তিনি মেবার পুনরুদ্ধার করিবার জন্য চেষ্টা চালাইলেন। তাঁহার চরম অর্থাভাবে তাঁহারই অনুগত মন্ত্রী ভাম্সা তাঁহার জীবনের সঞ্চিত সকল অর্থ রাণা প্রতাপের হস্তে তুলিয়া দিলেন এবং দেশ উদ্ধারের জন্য পুনরায় চেষ্টা করিতে বলিলেন। নূতন উৎসাহ লইয়া রাণা প্রতাপ মোগল বাহিনীর সহিত লড়িয়া শেষ পর্যন্ত মেবার রাজ্যের বহু স্থান পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইলেন। অবশ্য তাঁহার জীবনে মেবারের রাজধানী চিতোর উদ্ধার করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, রাণা প্রতাপ দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-স্পৃহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রাণা প্রতাপের মৃত্যু হইলে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র অমর সিংহ মোগলদের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। মানসিংহ মোগল বাহিনী লইয়া মেবার আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন। ইহার পর আকবরের জীবদ্দশায় মেবার আক্রমণের চেষ্টা আর করা হয় নাই।

রাণা প্রতাপ



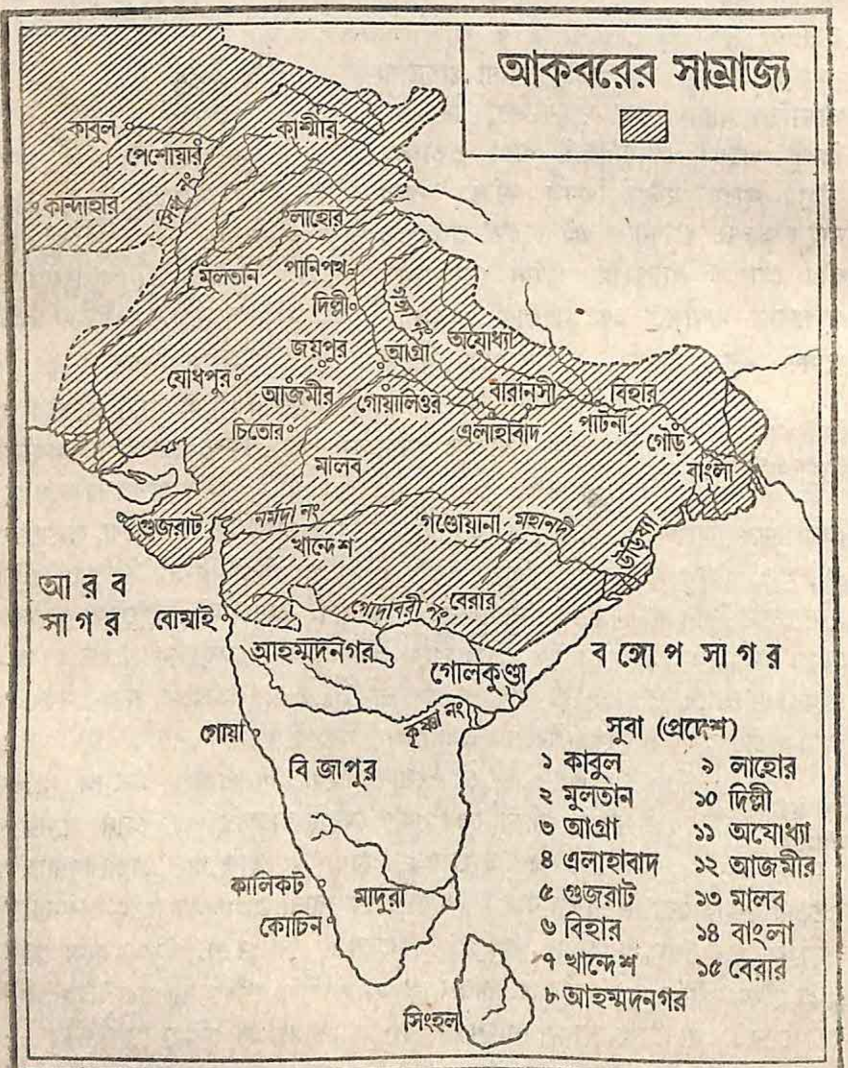
রাণা প্রতাপ

হলদিঘাটের যুদ্ধ (১৫৭৬ খ্রীঃ)

রাণা প্রতাপের দেশপ্রেম

আকবরের রাজ্যবিস্তার রাণা প্রতাপের হস্তে বাধাপ্রাপ্ত হইলেও তিনি গুজরাট, সুরাট, উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ জয় করিয়া নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। সুরাট অধিকারের ফলে পোর্তুগীজদের সহিত আকবরের সৌহার্দ্য জন্মে। ফলে পোর্তুগীজগণ ভারতের মুসলমানগণের নৌপথে মক্কা যাওয়া-আসার নিরাপত্তার ভার গ্রহণ করিয়াছিল। আকবর কাবুল, সিন্ধু, কাশ্মীর, বেলুচিস্তান মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইহার পর দাক্ষিণাত্যের আহম্মদনগর, খান্দেশও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। খান্দেশের শ্রেষ্ঠ এবং সুরক্ষিত দুর্গ অসীরগড় আকবর ঘুষ দিয়া জয়

আকবরের দাক্ষিণাত্য জয়



করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার চরিত্রের মাধুর্য ও মর্যাদাকে কতকাংশে ক্ষুন্ন করিয়াছিল। অসীরগড় দুর্গ জয়ই আকবরের সাম্রাজ্য বিস্তারের সর্বশেষ পদক্ষেপ (১৬০১ খ্রীঃ)।

একমাত্র শের শাহ্ ভিন্ন আকবরের পূর্ববর্তী মুসলমান সুলতান-বাদশাহ্গণ ধর্ম বিষয়ে উদারতা প্রদর্শনের প্রয়োজন উপলব্ধি করেন নাই। কেহই রাজনীতি হইতে ধর্মকে পৃথক করিয়া দেখিবার মত মানসিক উৎকর্ষ প্রদর্শন করেন নাই। ফলে তাঁহাদের রাজনীতি ধর্মমতের দ্বারা আচ্ছন্ন হইত। ভারত সম্রাটের পক্ষে কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের আনুগত্য লাভ করিলেই চলিবে না, জাতিধর্ম-নির্বিশেষে সকলের আনুগত্যের উপর নির্ভর করিয়াই প্রকৃত ভারতের জাতীয় সম্রাট্ হইতে পারা যাইবে এই সত্য আকবর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শের শাহ্ও করিয়াছিলেন। আকবরের এই উদারতার পশ্চাতে তাঁহার মাতা হামিদা-বানু ও শিক্ষক আব্দুল লতিফের উল্লেখ-যোগ্য অবদান ছিল। ফৈজী, আবুল ফজ্‌ল, শেখ মুবারক প্রভৃতির প্রভাবে আসিয়া ধর্ম সম্পর্কে আকবরের অনুসন্ধিৎসা বাড়িয়া গিয়াছিল। বিভিন্ন ধর্মের সারমর্ম জানিয়া আকবর সর্বধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয়দের এক উদার ধর্মমতে গ্রথিত করিতে চাহিয়াছিলেন। এজন্য তিনি 'দিন্-ইলাহি' নামে এক নূতন ধর্মমত প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ধর্মমতের সূক্ষ্ম নীতি জনসাধারণের মনে তেমন সাড়া জাগাইতে পারে নাই। আকবর বলপূর্বক তাঁহার এই ধর্মমত প্রচার করিবার চেষ্টা করেন নাই, ইহা তাঁহার উদারতারই পরিচায়ক, বলা বাহুল্য। হিন্দুদের প্রতি উদারতা, রাজপুতদের প্রতি উদারতা—এমন কি রাজপুতদের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আকবর তাঁহাদিগকে এক প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। আকবর তাঁহার শাসনব্যবস্থার মূল নীতি উদ্ভাবন করিয়াছিলেন এবং হিন্দু ও রাজপুতগণ তাঁহার শাসনব্যবস্থায় সেই নীতি কার্যকরী করিয়া তুলিয়াছিলেন। উদার মনোবৃত্তির সহিত রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সমন্বয় ঘটিলে যে সুফল পাওয়া যায়, আকবরের সংস্কার কার্যাদিতে তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। তাঁহার সংস্কারগুলি যেমন ছিল তাঁহার প্রতিভার পরিচায়ক তেমনি ছিল প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থক। অ-মুসলমানদের উপর হইতে আকবর জিজিয়া কর উঠাইয়া দিয়া সকল প্রজার সমান অধিকার—এই নীতি কার্যকরী করিয়াছিলেন। প্রায় দুই কোটি টাকা রাজস্ব ত্যাগ করিয়া তিনি হিন্দুদের উপর হইতে তীর্থকর


আবুল ফজ্‌ল

আকবরের ধর্মমত : হিন্দু, রাজপুত প্রভৃতির প্রতি তাঁহার নীতি; তাঁহার সংস্কার কার্যাদি

উঠাইয়া দিয়াছিলেন। পরাজিত শত্রুসৈন্যকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার প্রচলিত রীতি তিনি উঠাইয়া দিয়াছিলেন। ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে বিবাহ করা, অপরিণত বয়সে বিবাহ না করা, বলপূর্বক সতীদাহ নিষিদ্ধ করা প্রভৃতি ছিল তাঁহার সংস্কার কার্যাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতির প্রতি তাঁহার অনুরাগ, বিদ্বান মনীষীদের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা তাঁহার মহত্ত্বের পরিচায়ক ছিল। তাঁহার রাজত্বকাল ভারত-ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল যুগ। অনন্যসাধারণ প্রতিভা, সম্রাট্-সুলভ মর্যাদা, প্রজাহিতৈষণা প্রভৃতি গুণের জন্য আকবর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজগণের অন্যতম বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল।

জাহাঙ্গীর : আকবরের মৃত্যুর (১৬০৫ খ্রীঃ) পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম জাহাঙ্গীর উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোযোগী হন। তিনি পুনঃ পুনঃ অভিযান প্রেরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত মেবারের রাণা অমর সিংহকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। আকবরের আমলে বাংলাদেশ মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে জমিদারগণ মোগল আধিপত্য অস্বীকার করিয়া চলিতেছিলেন। জাহাঙ্গীরের আমলে ইস্‌লাম খাঁ সমগ্র বাংলাদেশের উপর মোগল আধিপত্য বিস্তারে সমর্থ হন। আকবর আহ্‌ম্মদনগরের একাংশের বশ্যতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। মালিক অম্বর নামক মন্ত্রীর পরিচালনায় অপরাংশ স্বাধীন রহিয়া গিয়াছিল।


জাহাঙ্গীর

কিন্তু জাহাঙ্গীরের আমলে মালিক অম্বর সাময়িকভাবে বশ্যতা স্বীকার করিলেও তাঁহার মৃত্যুর পূর্বাবধি মোগল বাহিনী দাক্ষিণাত্য সম্পূর্ণভাবে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই। জাহাঙ্গীরের শাসনব্যবস্থায় তাঁহার প্রধানা মহিষী নূরজাহান অপরিসীম ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন।

জাহাঙ্গীরের অদূরদর্শিতা

জাহাঙ্গীর একাধারে অমায়িক, স্নেহশীল, উদারচেতা এবং নৃশংস ও পরধর্ম-অসহিষ্ণু ছিলেন। পিতার ন্যায় ধর্ম সম্পর্কে উদারতা তিনি প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। শিখ গুরু অর্জুনকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তিনি অদূরদর্শিতা ও অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ন্যায়বিচার, শিল্পের, বিশেষভাবে চিত্রশিল্পের, পৃষ্ঠপোষকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের সঙ্গে সঙ্গে অত্যধিক মদ্যাসক্তি ও অহিফেন সেবন তাঁহার ব্যক্তিত্ব ও ক্ষমতাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছিল। সেই সুযোগে তাঁহার মহিষী নূরজাহান শাসনব্যবস্থার উপর তাঁহার নিরঙ্কুশ প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে শাহ্‌জাহান ও মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহান : জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর সময় তাঁহার তৃতীয় পুত্র শাহ্‌জাহান (শাহ্‌জাদা খুর্‌রম) দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। নূরজাহান শাহ্‌জাহানের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শাহ্‌রিয়ারকে সিংহাসনে স্থাপন করিলে আসফ্‌ খাঁ শাহ্‌রিয়ারকে পরাজিত ও বন্দী করিলেন এবং শাহ্‌জাহানকে দ্রুত দিল্লী পৌঁছিবার জন্য জানাইলেন। শাহ্‌জাহান দিল্লী পৌঁছিয়া ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন।

শাহ্‌জাহান
(১৬২৮-৫৮ খ্রীঃ)

শাহ্‌জাহান প্রথমে বুন্দেলখণ্ডের বিদ্রোহী রাজা যুঝর সিংহ এবং দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহী সুবাদার খান জাহানকে দমন করিলেন। পোর্তুগীজগণ বাংলাদেশে লুঠতরাজ, জলদস্যুতা, দেশীয় প্রজাদের নিকট হইতে শুল্ক আদায় প্রভৃতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ কাজ চালাইতেছিল। শাহ্‌জাহানের পত্নী মমতাজ বেগমের জন্য প্রেরিত দুইজন পরিচারিকাকে তাহারা ধরিয়া লইয়া যায়। শাহ্‌জাহান পোর্তুগীজদের সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য বাংলার শাসনকর্তা কাসেম আলিকে জানাইলে তিনি হুগলী আক্রমণ করিয়া পোর্তুগীজদিগকে উচিত শিক্ষা দিলেন। ইহার পর পোর্তুগীজগণ বাংলাদেশে আর ব্যবসায় করিতে সমর্থ হয় নাই।



নূরজাহান

পূর্ববর্তী মোগল সম্রাট্‌দের অনুসৃত দাক্ষিণাত্য জয়ের নীতি শাহ্‌জাহানও অনুসরণ করিলেন। শাহ্‌জাহান আহ্‌ম্মদনগর জয় করিলেন, গোলকুণ্ডা তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। বিজাপুরের সুলতানও তাঁহার বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হইলেন। শাহ্‌জাহান মধ্য-এশিয়াস্থিত কান্দাহার জয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি উৎকোচ দান করিয়া কান্দাহারের শাসনকর্তাকে সাময়িকভাবে বশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু পারস্যের রাজা উহা অল্পকালের মধ্যেই পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহান শেষ পর্যন্ত কান্দাহার জয়ের আশা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

দাক্ষিণাত্য নীতি

শাহ্‌জাহানের জাঁকজমকপ্রিয়তা এক প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল। তাঁহার আদেশে নির্মিত তাজমহল তাঁহার পত্নীপ্রেমের এক অমর নিদর্শন হিসাবে আজিও বিদ্যমান। তাঁহার আদেশে নির্মিত ময়ূর সিংহাসনটিও ইতিহাসে প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছে। স্বর্ণ ও মণিমুক্তা খচিত এই অপূর্ব সিংহাসনটি ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে পারস্য সম্রাট নাদির শাহ্‌ ভারত আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠনকালে নিজ দেশে লইয়া গিয়াছিলেন।

শাহ্‌জাহানের
জাঁকজমকপ্রিয়তা

শাহ্‌জাহানের জীবদ্দশায়ই তাঁহার পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ শুরু হইয়াছিল। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে দারাশিকো ছিলেন তাঁহার সর্বাধিক প্রিয়। তিনি ছিলেন উদারচেতা, সুশিক্ষিত এবং শাসনকার্যে সুদক্ষ। দ্বিতীয় পুত্র সুজা ছিলেন

অলস, আরামপ্রিয় ও বিলাসব্যসনে নিমজ্জিত। তৃতীয় পুত্র ঔরংজেব ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা এবং অত্যন্ত কূটকৌশলী, বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান। সর্বকনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ ছিলেন মদ্যপায়ী, বিবেচনা-বুদ্ধিহীন। শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তাঁহার পুত্রগণ দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। দারা অবশ্য দিল্লীতে থাকিতেন। তিনি ছিলেন এলাহাবাদ ও মুলতানের শাসনকর্তা। ঔরংজেব মুরাদকে সাম্রাজ্যের অংশ দিবেন এই আশা দিয়া নিজ পক্ষে টানিয়া লইলেন। সুজা দিল্লীর পথে বারাণসীর নিকট সম্রাটের বাহিনীর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। ঔরংজেব ও মুরাদের যুগ্মবাহিনী ধর্মাট নামক স্থানে এক যুদ্ধে মোগল সম্রাটের সৈন্যকে পরাজিত করিল। ইহার পর দারা ঔরংজেব ও মুরাদকে বাধা দিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সামুগড়ের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলে ঔরংজেব আগ্রা দুর্গ অধিকার করিলেন (১৬৫৮ খ্রীঃ) এবং বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহানকে বন্দী করিলেন। এইভাবে স্বার্থসিদ্ধির পর তিনি মুরাদকেও বন্দী করিলেন। বন্দী অবস্থায় কয়েক বৎসর পর ঔরংজেব তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। এদিকে সুজা ঔরংজেবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া খাজোয়ার যুদ্ধে (১৬৫৯ খ্রীঃ) পরাজিতহইয়া আরাকানে পলাইয়া গেলেন। পলাতক অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু হইল। দারাশিকো ঔরংজেবের বিরুদ্ধে শেষ চেষ্টা করিতে গিয়া দেওরাইয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইলেন এবং পলায়ন করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন। ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। এইভাবে দারা, সুজা ও মুরাদের মৃত্যু ঘটিলে ঔরংজেবের সিংহাসন নিষ্কণ্টক হইল। বৃদ্ধ শাহ্‌জাহান ৮ বৎসর বন্দী অবস্থায় নানাপ্রকার নির্যাতন ভোগ করিয়া ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে মরিয়া বাঁচিলেন।

শাহ্‌জাহানের পুত্রদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া যুদ্ধ



শাহ্‌জাহান

ঔরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ)

ঔরংজেব : ধর্মাট, সামুগড়, খাজোয়া ও দেওরাইয়ের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া এবং একে একে সকল ভ্রাতাকে হত্যা করাইয়া ও বৃদ্ধ পিতা শাহ্‌জাহানকে বন্দী করিয়া ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেব দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি 'আলমগীর' অর্থাৎ পৃথিবী-বিজয়ী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

ঔরংজেবের চরিত্রে নানাপ্রকার দোষ ও গুণের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। তিনি যেমন ছিলেন সাহসী, বুদ্ধিমান ও পরিশ্রমী তেমনি ছিলেন পরধর্ম-অসহিষ্ণু, নিষ্ঠুর ও সঙ্কীর্ণমনা। সমরকুশল সেনাপতি, তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন, কূটকৌশলী হিসাবে

তিনি যেমন ছিলেন উল্লেখযোগ্য তেমনি নৃশংসতা, স্বার্থ-লোলুপতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি ত্রুটির জন্য তিনি ছিলেন নিন্দার্হ।

ঔরংজেবের সিংহাসনে আরোহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাম্রাজ্যের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম অংশে নানাপ্রকার গোলযোগ শুরু হয়। উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অহোম জাতি অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইয়া উঠে এবং মোগল সাম্রাজ্যের সীমার অভ্যন্তরে আসিয়া হানা দেয়। আরাকানে মগ জাতি, উত্তরবঙ্গে কোচ জাতি অনুরূপ উপদ্রব শুরু করে। ঔরংজেব মীরজুম্‌লাকে উপদ্রবকারীদের দমন করিবার জন্য প্রেরণ করেন। মীরজুম্‌লা সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ করিলেও স্থায়ীভাবে তিনি তাহাদিগকে দমন করিতে পারেন নাই। ইহার পর ঔরংজেবের মাতুল শায়েস্তা খাঁ যখন বাংলার সুবাদার তখন তিনি মগদের পরাজিত করিয়া চট্টগ্রাম দখল করেন এবং পোর্তুগীজ জলদস্যুদের ঘাঁটি সন্দ্বীপ নামক দ্বীপটি অধিকার করিয়া লন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগান উপজাতিগুলিকে ঔরংজেব স্বয়ং দমন করিতে অগ্রসর হন। তিনি ইহাতে সফলকাম হইলেও দীর্ঘকাল সেখানে ব্যাপৃত হওয়ার সুযোগে রাজপুত ও মারাঠাগণ শক্তি সঞ্চয় করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল।

উত্তর-পূর্ব সীমান্তে রাজ্য বিস্তার : উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের উপদ্রব দমন



ঔরংজেব 'আলমগীর'

দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যগুলি—বিজাপুর, গোলকুণ্ডা জয় করিবার ইচ্ছা ঔরংজেব যখন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা ছিলেন সেই সময় হইতে পোষণ করিতেছিলেন। তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুইটি অধিকার করিতে সমর্থ হন। ইহা ভিন্ন তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লীর হিন্দু রাজ্য দুইটিও তিনি অধিকার করেন। এইভাবে ঔরংজেব মোগল সাম্রাজ্যের সীমা দাক্ষিণাত্যে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তার করিতে সমর্থ হন।

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, সম্রাটের মর্যাদা প্রভৃতির দিক্ হইতে বিচার করিলে ঔরংজেবের দক্ষতার পরিচয় কতকটা পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁহার সংকীর্ণ, পরধর্ম-অসহিষ্ণু নীতি, হিন্দুদের উপর জিজিয়া কর স্থাপন, শিখ, মারাঠা, রাজপুত জাতির প্রতি তাঁহার অদূরদর্শী নীতি সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। জাঠ, বুন্দেলা ও সৎনামী বিদ্রোহ, শিখ বিদ্রোহ, রাজপুত জাতির বিরোধিতা, দাক্ষিণাত্যে মারাঠা জাতির বিরোধিতা আকবরের উদার নীতির ফলে গঠিত মোগল সাম্রাজ্যের পতন অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল। ঔরংজেব ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত গোঁড়া ও ধর্মভীরু ছিলেন, কিন্তু তিনি ধর্মের দ্বারা তাঁহার রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধি ও দূরদর্শিতাকে সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন হইতে

ঔরংজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

দিয়া মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানদের দমন করিতে গিয়া কালক্ষেপ যেমন মারাঠা ও রাজপুত জাতিকে শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগ দিয়াছিল তেমনি দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় এবং মারাঠাদের সহিত যুঝিতে গিয়া কালক্ষেপের ফলে উত্তর ভারত বিদ্রোহী হইয়া উঠিবার শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইয়াছিল, কেন্দ্রীয় শাসনও দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

ঔরংজেবের অনুদার সন্দিগ্ধ মন অপরের সততায় বিশ্বাস করিতে পারিত না। ফলে তাঁহাকে নিজেই সবকিছুর উপর দৃষ্টি রাখিতে হইত। কিন্তু অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও এইরূপ বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন ও সামরিক দায়িত্বসংক্রান্ত সবকিছু সুদক্ষভাবে পরিচালনা তাঁহার পক্ষে কেন, কাহারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। আকবরের উদার পরধর্ম-সহিষ্ণু নীতি এবং প্রজাবর্গের প্রতি সমব্যবহার যেমন তাঁহাকে ভারতের জাতীয় সম্রাটে পরিণত করিয়াছিল তেমনি ঔরংজেবের ধর্মান্ধ, পরধর্ম-অসহিষ্ণু, সংকীর্ণ নীতি তাঁহাকে সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমানদের সম্রাটে রূপান্তরিত করিয়াছিল। হিন্দু, রাজপুত—এক কথায় অ-মুসলমান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চেষ্টা ও অখণ্ড আনুগত্যে যে বিশাল মোগল সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল ঔরংজেবের অনুদার নীতি অ-মুসলমানদের বিদ্রোহী করিয়া এমন কি, সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমান ভিন্ন অপরাপর মুসলমানের বিরাগ উৎপাদন করিয়া সেই সাম্রাজ্যের ভিত্তি পর্যন্ত দুর্বল করিয়া দিয়াছিল।

ঔরংজেবের সংকীর্ণতা মোগল সাম্রাজ্যের ভিত্তির দুর্বলতার কারণ

মোগল সাম্রাজ্য পতনের কারণ (Causes of the Fall of the Mughal Empire): স্পর্ধিত মোগল সাম্রাজ্য যাহা সর্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তারলাভ করিয়াছিল প্রাকৃতিক কারণেই সেই বিশালায়তন মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিল। মোগল সাম্রাজ্যের স্মৃতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বিধৃত হইয়া রহিল। পৃথিবীর কোন প্রান্তের কোন সাম্রাজ্যই চিরস্থায়ী হয় নাই, হইতে পারে না। যুগধর্মের পরিবর্তন, শাসক সম্প্রদায়ের শাসনক্ষমতা ও ব্যক্তিত্বের তারতম্য, হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরায়ণতা, স্ব স্ব প্রাধান্যের আকাঙ্ক্ষা সবকিছু মিলিয়া যে অবক্ষয়ের সূচনা করে তাহার ফলেই আসে পতনোন্মুখতা ও অবশেষে পতন। মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়াছিল।

সাম্রাজ্যের পতন প্রাকৃতিক কারণেই অবশ্যম্ভাবী

ঔরংজেবের শাসনকালের শেষার্ধে যে পতনোন্মুখতার সূচনা হইয়াছিল তাহা তাঁহার দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে পতনে পর্যবসিত হয়। প্রজাবর্গের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গলসাধন যদি শাসনকার্যের সাফল্য ও সার্থকতার মাপকাঠি হয় তাহা হইলে একথা স্বীকার না করিয়া গত্যন্তর নাই যে একমাত্র আকবর ভিন্ন অপরাপর মোগল বাদশাহদের শাসনকালের সাফল্য ছিল অকিঞ্চিৎকর।* সম্রাট্ আকবরের অনুসৃত উদার, পরধর্ম-সহিষ্ণু, সর্বজনকল্যাণকামী শাসনের আদর্শ পরবর্তী মোগল সম্রাট্দের আমলে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। ইসলামধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে শরিয়ৎ আইন প্রয়োগের

আকবরের পরবর্তী কালে উদার জনকল্যাণকামী, পরধর্ম-সহিষ্ণু নীতি পরিত্যাগের কুফল

* *Hindusthan Standard* Article by Sir Jadunath Sarkar, (Puja Annual, 1951)

ফলে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়কে "বিধর্মী" ও "ইসলামধর্ম-বিশ্বাসী" এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করায় মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক শাসনের কুফল

মোগল সম্রাট্‌দের শাসনক্ষমতা ছিল ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সম্রাটের সুদৃঢ় ব্যক্তিত্ব, সমরকুশলতা, শাসনদক্ষতা প্রভৃতি গুণ থাকিলেই তাঁহার শাসন সুষ্ঠুভাবে চলিত। কিন্তু এই সকল গুণের অভাব সম্রাটের মধ্যে দেখা দিলে সাম্রাজ্য ও শাসন উভয়ই বিধ্বস্ত হইয়া পড়িত। ঔরংজেবের পরবর্তী সম্রাট্‌দের আমলে তাহাই ঘটিয়াছিল। প্রথম বাহাদুর শাহ্‌ হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌ পর্যন্ত—অর্থাৎ সর্বশেষ মোগল সম্রাট্‌ পর্যন্ত সকলেই ছিলেন যেমন সম্রাটোচিত ব্যক্তিত্বহীন, তেমনি শাসনকার্যে দক্ষতাহীন। ইঁহারা সকলেই বৃদ্ধ বা প্রায়-বৃদ্ধ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। এরূপ বয়সে শাসনকার্য পরিচালনার উৎসাহ, উদ্যম বা শক্তি স্বভাবতই তাঁহাদের ছিল না।

ক্ষমতাবান উত্তরাধিকারীর অভাব

অভিজাতবর্গের প্রতিযোগী দলসমূহ

তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে মোগল দরবারের ইরাণী (শিয়া মুসলমান) ও তুরাণী (সুন্নী মুসলমান) এই দুই পরস্পর প্রতিযোগী ও বিদ্বেষী ভাগে বিভক্ত হইয়া নিজ নিজ প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি ও স্বার্থসিদ্ধির দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইল। অপরদিকে এই দুই দলের এক বিরোধী দল নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের নেতৃত্বে গঠিত হইল। ইহার নাম হইল 'হিন্দুস্তানী' দল। ইহা ভিন্ন সাম্রাজ্যের বিভিন্নাংশের শাসনকর্তারাও প্রায় স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এইভাবে মোগল সম্রাটের ক্ষমতা দরবারের অভিজাতবর্গ ও বিভিন্নাংশের শাসনকর্তাদের মধ্যে ভাগ হইয়া গেল।

বিভিন্নাংশের শাসকদের স্ব স্ব প্রাধান্যের প্রচেষ্টা

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়

বিহারের সুবাদার সৈয়দ হুসেন আলি ও এলাহাবাদের সুবাদার সৈয়দ আব্দুল্লা মোগল সম্রাট্‌গণকে হাতের ক্রীড়নকে পরিণত করিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় 'সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়' নামে পরিচিত।

সাম্রাজ্যের বিশালতা পতনের পরোক্ষ কারণ

মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আমলে ইহার শাসন দক্ষতা ও কেন্দ্রীয় শাসনের শাসনযন্ত্রের উপর প্রয়োজনীয় দৃঢ়তা রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। উত্তরে কাশ্মীর হইতে দক্ষিণে মহীশূর এবং পূর্বে আসাম হইতে পশ্চিমে আফগানিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসন পরিচালনা সেই যুগে সহজ ছিল না, বিভিন্নাংশের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলাও ছিল অত্যন্ত কঠিন। এইভাবে সাম্রাজ্যের বিশালতাই পরোক্ষভাবে উহার পতনের অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

বহিরাগত আক্রমণ

এইভাবে যখন সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ক্রমেই বাড়িয়া চলিল তখন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সুবাদারগণ এবং বিভিন্ন জাতি স্বাধীন হইয়া যাইতে লাগিল। এই ব্যাপক বিশৃঙ্খলা ও দুর্বলতার সুযোগে পারস্যের সম্রাট্‌ নাদির শাহ্‌ এবং আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালী বা দুর্‌রানী ভারত আক্রমণ করিয়া মোগল সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া গিয়াছিলেন। নাদির শাহ্‌ ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এবং আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালী ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন। মোগল সাম্রাজ্য শুধু নামেই টিকিয়া রহিল, সাম্রাজ্য বা সম্রাট্‌সুলভ ক্ষমতা আর তখন ছিল না।

মোগল সাম্রাজ্যের বিশালতা, ঔরংজেবের ধর্মান্ধ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া, আকবরের পরবর্তী সম্রাট্‌দের জাতীয়তাবোধের অভাব, অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে কলহ ও ক্ষমতা লাভের প্রতিযোগিতা, ঔরংজেবের ভ্রান্ত দাক্ষিণাত্য নীতি সবকিছু মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ঔরংজেবের আমলে মোগল সাম্রাজ্যের যে পতনোন্মুখতার সূচনা হইয়াছিল তাহা রোধ করা তাঁহার দুর্বল বংশধরদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্বলতা দেখা দিলে প্রদেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা করা সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা মাত্রেরই প্রধান ত্রুটি ছিল। মোগল সাম্রাজ্য সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিল বলিয়া ঔরংজেবের রাজত্বকালের শেষ দিকে কেন্দ্রীয় শাসনে দুর্বলতা দেখা দিলে মোগল সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। এমতাবস্থায় বহিরাগত আক্রমণ মোগল সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত হানিয়া গিয়াছিল। এই সকল আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত উভয় প্রকার কারণে মোগল সাম্রাজ্যের পতন ঘটিয়াছিল।

মোগল সাম্রাজ্যের পতন

দশম অধ্যায়

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে ইস্‌লামের প্রভাব
(Impact of Islam on Indian Society and Culture)

ইস্‌লামীয় সভ্যতার প্রভাব (Impact of Islam) : মুসলমানদের আগমনের পূর্বাবধি যে-সকল বৈদেশিক জাতি, সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল সেগুলিকে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব করিয়া লইয়াছিল। বহিরাগত সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে সম্পূর্ণভাবে মিশিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মুসলমানদের ক্ষেত্রে তাহা ঘটে নাই। ইহার প্রধান কারণ ছিল এই যে, মুসলমানগণ যখন ভারতে আসেন তখন মুসলমান সভ্যতার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি রূপ ছিল। মুসলমানগণ এ-সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। ইহা ভিন্ন মুসলমান আক্রমণের কালে জনসাধারণের উপর যে-সকল নিষ্ঠুরতা এবং ভারতীয় সমাজের উপর যে ধরনের অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাও ভারতীয় সভ্যতা ও ইস্‌লামীয় সভ্যতার সংমিশ্রণের পথে বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। মুসলমানদের নিকট অ-মুসলমানগণ হইলেন 'জিম্মি' আর ভারতীয়দের নিকট মুসলমানগণ হইলেন 'যবন' বা 'ম্লেচ্ছ'। ফলে এই দুই সমাজ ও সংস্কৃতি পরস্পর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিবার জন্য সচেষ্ট হইল। ইস্‌লাম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রভাব হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সমাজে নানাপ্রকার কঠোর বিধি-নিষেধও চালু হইল। স্মৃতিশাস্ত্রের নূতন নূতন ব্যাখ্যা করিয়া হিন্দু ধর্মের ও সমাজের রক্ষণশীলতা বহু গুণে বাড়ানো হইল। স্মৃতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে বাংলার রঘুনন্দন শিরোমণি এবং বিজয়নগরের মাধবাচার্য ছিলেন সর্বাধিক বিখ্যাত।

ইস্‌লামীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সংঘাত

হিন্দু ধর্ম ও সমাজের রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি : রঘুনন্দন, মাধবাচার্য

উপরি-উক্ত কারণে হিন্দু ও মুসলমানদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংমিশ্রণের পথে প্রথম দিকে কঠোর বাধার সৃষ্টি হইয়াছিল।

সুলতানি আমলে (Under the Sultanate)

দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করিবার ফলে ইস্‌লামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি ও হিন্দু তথা ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির মধ্যে যে বিভেদের মনোভাব প্রথম হইতে সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। ক্রমে বিদ্বেষ ও পারস্পরিক অসহিষ্ণুতা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুসলমান মনীষী অল্‌বিরুণী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া উপনিষদ্ পাঠে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। উপনিষদের একেশ্বরবাদ ও ইস্‌লাম ধর্মের একেশ্বরবাদের সামঞ্জস্য ক্রমে মুসলমান সমাজকে হিন্দু ধর্মের প্রতি আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিল। একে অপরের ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করিবার ফলে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাইল। ইহা ভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার ফলে ও হিন্দু সমাজের বহু আচার-ব্যবহার মুসলমান সমাজে বিস্তারলাভ করিল। হিন্দুদের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া সুলতানদের পদস্থ কর্মচারী হিসাবে নিযুক্ত হইবার ফলে মুসলমান সমাজের আদব-কায়দা, পোশাক-পরিচ্ছদও হিন্দু সমাজে স্থানলাভ করিতে লাগিল। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমেই প্রীতি ও সৌহার্দ্য জন্মিতে লাগিল।

পরস্পর প্রভাব বিস্তার

এই পরস্পর প্রীতির মনোভাব হইতে বাংলাদেশে সত্যপীরের পূজার উদ্ভব ঘটে। হিন্দুদের মধ্যে মুসলমান পীরদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মুসলমানদের মধ্যে হিন্দু সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফলে রামানন্দ, বল্লভাচার্য, নামদেব, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি ধর্মজ্ঞানীর উদ্ভব ঘটিল। ইঁহারা প্রত্যেকেই হিন্দু-মুসলমান ভাই ভাই এই ধারণা প্রচার করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্ম বা মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরকে পাইবার বা ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথমাত্র, একথাই এই সকল ধর্মজ্ঞানী বলিতেন। নামদেব, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষের শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, উভয় শ্রেণীর লোকই ছিল। যবন হরিদাস ছিলেন প্রথমে একজন মুসলমান। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইভাবে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এই সমন্বয়ের চেষ্টা সুলতানি আমলের শেষভাগে পরিলক্ষিত হয়। বাংলাদেশের উদারচেতা সুলতানদের চেষ্টা এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পারস্পরিক শ্রদ্ধা

ধর্মের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের চেষ্টা

হুসেন শাহ্ যখন বাংলাদেশের সুলতান ছিলেন তখন তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দু ধর্মগ্রন্থ মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত গীতা প্রভৃতির বাংলা অনুবাদ করা হইয়াছিল। হুসেন শাহ্ ছিলেন পরধর্ম-সহিষ্ণু সুলতান। তাঁহার আমলে হিন্দু-মুসলমান সমাজে প্রীতি ও সৌহার্দ্যের এক অতি সুন্দর অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এজন্য কেহ কেহ তাঁহাকে 'বাংলার আকবর' বলিয়া সুখ্যাতি করিয়াছেন। হুসেন শাহের পুত্র নুসরৎ শাহ্

হুসেন শাহের আমলে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা

এমন কি হুসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খাঁও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুটি খাঁর নামও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। হিন্দু পণ্ডিত ও বিদ্বান্ ব্যক্তিরা আরবী ও ফারসী ভাষায় তখন যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন।

বাংলাদেশ ভিন্ন কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবিদিন হুসেন শাহের ন্যায় উদারচেতা সুলতান ছিলেন। তাঁহার পিতা ছিলেন হিন্দু-বিদ্বেষী। তাঁহার পিতার রাজত্বকালে বহু ব্রাহ্মণ দেশত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু জৈনুল আবিদিন তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া আনেন। তিনি হিন্দুদের উপর হইতে ঘৃণ্য জিজিয়া কর তুলিয়া দিয়া মহাভারত, রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি সংস্কৃত এবং কাশ্মীরী গ্রন্থের আরবী ও ফারসী অনুবাদ করাইয়া নিজ মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত গ্রন্থাদি যেমন আরবী ও ফারসী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন সেরূপ বহু আরবী ও ফারসী গ্রন্থ হিন্দী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তাঁহার উদারতা ও প্রজাবাৎসল্যের জন্য তিনি 'কাশ্মীরের আকবর' নামে পরিচিতি লাভ করিয়াছিলেন।

কাশ্মীরের জৈনুল আবিদিন

হিন্দু ও মুসলমান সমাজের পরস্পর প্রভাব ও মিলনের ফল অপর একটি ধারায় প্রকাশলাভ করিয়াছিল। ইহা ভক্তিবাদ নামে পরিচিত। হিন্দু ধর্মে ভাগবত ধর্ম ও ভক্তিবাদ এবং ইস্‌লামের সুফীবাদে মানুষকে মানুষ হিসাবে এবং সকল মানুষকে সমান চক্ষে দেখিবার নীতি প্রচার করিয়াছিল। এই সমন্বয়ের প্রয়োজন যখনই হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মহাপুরুষগণ উপলব্ধি করিলেন তখনই ধর্মের ক্ষেত্রে আসিল এক নূতন ভাব। ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবানের উপাসনা, মানুষকে ভালবাসিয়া সেই ভালবাসার মাধ্যমে ভগবানের সৃষ্ট সবকিছুকে ভাল বাসিবার ইচ্ছা সেই যুগে প্রকাশ পাইল। সুফীবাদ ও ভক্তিবাদ উভয় ধর্মমতই ভগবানের সহিত মানুষের একাত্মবোধ এবং মানুষে মানুষে সমতা প্রচার করিয়াছিল। সুফী ধর্মজ্ঞানীদের মধ্যে নিজাম-উদ্দিন আউলিয়া, মইন-উদ্দিন চিস্‌তি প্রভৃতি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। নিজাম-উদ্দিন এবং মইন-উদ্দিন হিন্দু ও মুসলমান সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন।

ভক্তিবাদ ও সুফীবাদ

বিজাপুরের আদিল শাহী সুলতান বংশের ইয়ুসুফ্ আদিল শাহ্ এবং দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহের আমলে বিজাপুরে পরধর্ম-সহিষ্ণুতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মেডোস্ টেলর (Meadows Taylor) নামক জনৈক ইংরেজ বিজাপুরের সুলতানদের উদারতা ও দক্ষতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন।*

আদিল শাহী বংশের উদারতা

ধর্ম-সংস্কারকগণ (Religious Reformers) : দাক্ষিণাত্যে চতুর্দশ শতকে রামানন্দ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ রাম-সীতার উপাসনার মধ্য দিয়া ভগবানকে উপলব্ধির চেষ্টা করেন। তিনি ভক্তিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন রামানুজের শিষ্য। গুরু রামানুজের নিকট হইতে তিনি ভক্তি ও ভালবাসার মাধ্যমে ভাগবানকে পাওয়া যায় এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন।

রামানন্দ

* Vide *An Advanced History of India*, p. 358 (3rd Edn., 1967)

জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি সকলকে তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন। মুচি, মেথর, হিন্দু, মুসলমান সকল শ্রেণীর ও জাতির লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। বিখ্যাত মুসলমান ধর্মজ্ঞানী কবীর তাঁহার শিষ্য ছিলেন। রামানন্দ সমগ্র উত্তর ভারতে তাঁহার ধর্ম প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। রাম ও রহিম এক এবং অভিন্ন একথা তিনি বলিতেন।

বল্লভাচার্য দক্ষিণ ভারতের এক তেলেগু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুদের অন্যতম প্রধান তীর্থস্থান বারাণসীতে তাঁহার জন্ম হয়। শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া কিছুকাল বিজয়নগরের সম্রাট্ কৃষ্ণদেব রায়ের সভায় তিনি রাজ-পন্ডিত হিসাবে কাটান। তিনি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের উপাসক। ইহা ভক্তিবাদেরই প্রকারভেদ মাত্র। বিজয়নগর সম্রাটের রাজসভা ত্যাগ করিয়া তিনি মথুরা, বৃন্দাবন ভ্রমণ করিয়া বারাণসী ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ ছিল তাঁহার ধর্মের মূলকথা।

বল্লভাচার্য

মহারাষ্ট্রে নামদেব নামে জনৈক ভক্তিবাদের প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে তিনি ভক্তিবাদ প্রচার করেন। তিনি ছিলেন জাতিতে দরজী। ঘটা করিয়া পূজাপার্বণ বা মূর্তি পূজার তিনি সমর্থন করিতেন না। ভক্তির মাধ্যমে ভগবানকে পাওয়াই ছিল তাঁহার ধর্মপথের নির্দেশ। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে তিনি হিন্দু, মুসলমান সকলকেই তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নামদেব


কবীর

কবীরের জন্মপরিচয় সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। কেহ কেহ তাঁহাকে আসলে ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। যাহা হউক পরে তিনি ইস্‌লাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হন। বৃত্তিতে তিনি ছিলেন একজন তন্তুবায়। প্রাপ্ত বয়সে তিনি রামানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তিনি অতি সহজ ও সরল ভাষায় তাঁহার ধর্মমত প্রচার করিতেন। তিনি বলিতেন যে, হিন্দুদের রাম আর মুসলমানদের আল্লাহ্ বা রহিম এক এবং অভিন্ন। হিন্দু বা মুসলমান ধর্ম ঈশ্বরের উপাসনার ভিন্ন দুইটি পথ মাত্র।

কবীর

১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের তালবন্দী গ্রামে নানকের জন্ম হয়। তিনি ছিলেন একজন সামান্য ব্যবসায়ীর পুত্র। প্রথম জীবন হইতেই ধর্মকর্মে তাঁহার গভীর অনুরাগের সৃষ্টি হয়। প্রথমে কিছুকাল ব্যবসায়ে কাটাইবার পর তিনি ধর্মকর্মে মনোযোগী হন। ব্যবসায় করিতে গিয়া বহুবার তিনি নিজের অর্থ

গরীব-দুঃখী, সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন। ধর্ম সাধনা শুরু করিয়া তিনি নানা তীর্থে ভ্রমণ করেন। তিনি একবার মক্কায় গিয়াছিলেন। নানক কোন জাতিভেদ মানিতেন না। সকল ধর্মের সমন্বয়-সাধন ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

নানক

তিনি যে ধর্মের প্রচার করেন উহা 'শিখ' ধর্ম নামে পরিচিত। 'শিখ' কথাটির অর্থ হইল 'শিষ্য'। নানক জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকেই তাঁহার শিষ্যত্বে গ্রহণ করিতেন।



নানক

নানকের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন নবদ্বীপের শ্রীচৈতন্যদেব। ১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জগন্নাথ মিশ্র নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের মাতার নাম ছিল শচীদেবী। শ্রীচৈতন্যের আসল নাম ছিল বিশ্বম্ভর। আদর করিয়া তাঁহাকে গৌরাঙ্গ, নিমাই প্রভৃতি নামেও ডাকা হইত।

শ্রীচৈতন্য

চব্বিশ বৎসর বয়সে নিমাই সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন। কাটোয়া নিবাসী কেশব ভারতী তাঁহাকে দীক্ষিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম দিয়াছিলেন। তিনি বাংলাদেশ, উড়িষ্যা, বৃন্দাবন, দক্ষিণ ভারত পর্যটন করিয়া তাঁহার উদার ধর্মমত প্রচার করেন। ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা, জীবের প্রতি দয়া, সকল মানুষকে সমানভাবে দেখা

শ্রীচৈতন্যের বাণী

প্রভৃতি ছিল শ্রীচৈতন্যের বাণী। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। মুসলমানদের মধ্য হইতেও তিনি তাঁহার শিষ্য গ্রহণ করিতেন। ৪৮ বৎসর বয়সে পুরীর নীলাচলে তিনি দেহরক্ষা করেন।



শ্রীচৈতন্য

রাঠোর-দুহিতা কৃষ্ণ-ভক্তিপরায়ণা মীরাবাঈ ভালবাসার মধ্য দিয়া ভগবান প্রাপ্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন মেবারের রাণা কুম্ভের সহধর্মিণী। ব্রজভাষায় গানের মাধ্যমে তিনি রাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতেন।

মীরাবাঈ

তাঁহার অসংখ্য কৃষ্ণপ্রেম গান কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার ব্যাপক প্রচার করিয়াছিল এমন নহে, হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষসাধন এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতিরও সৃষ্টি করিয়াছিল।

নামদেব, রামানন্দ, কবীর, নানক, শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ সেই যুগে হিন্দু ও মুসলমান সমাজ ও ধর্মের মধ্যে যে বিভেদের প্রাচীর ছিল তাহা ভাঙিয়া দিয়া সর্বধর্ম সমন্বয়ের পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

সর্বধর্ম সমন্বয়

সাহিত্য ও শিল্প (Literature and Art): সুলতানি আমলে আরবী, ফারসী এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন ইতিহাস-গ্রন্থ, জীবন-স্মৃতি প্রভৃতিও রচিত হইয়াছিল।

ফারসী ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন আমীর খস্‌রু। জিয়া-উদ্দিন বর্‌ণী ছিলেন সে-যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি ভারতবর্ষ সম্পর্কে একটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পদাংক পরবর্তী কালে সুলতানি আমলে অনুসৃত হইয়াছিল। মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজও সে-যুগের ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। বিদেশী পর্যটক ইবন্‌-বতুতার বর্ণনায় সে-যুগের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

আরবী ও ফারসী সাহিত্য

হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে চাঁদ বর্‌দৈ, রামানন্দ, কবীর, জগনায়ক, গোরখনাথ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। রাধাকৃষ্ণের ভক্তি ও প্রেম সম্পর্কে ব্রজভাষায় বহু গীত সেই যুগে রচিত হইয়াছিল। ফারসী ও হিন্দী ভাষা ভিন্ন হিন্দী ও ফারসীর সংমিশ্রণে উর্দু ভাষারও উদ্ভব সে-যুগেই ঘটিয়াছিল।

হিন্দী সাহিত্য

সুলতানি আমলে প্রাদেশিক ভাষাগুলির মধ্যে বাংলা ভাষার সর্বাধিক উন্নতি ঘটিয়াছিল। হুসেন শাহ্‌ ও তাঁহার পুত্র নুসরৎ শাহ্‌ এবং তাঁহাদের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ—পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতির পৃষ্ঠপোষকতা এ-বিষয়ে খুবই সহায়ক হইয়াছিল। বিদ্যাপতি, চন্ডীদাস, মালাধর বসু, পরমেশ্বর কবীন্দ্র প্রভৃতি তখন তাঁহাদের সাহিত্য-সাধনা দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন। বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল, মালিক জয়সীর পদ্মাবত কাব্য প্রভৃতিও ঐ যুগে রচিত হইয়াছিল। শ্রীকর নন্দী মহাভারতের কতকাংশ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। হুসেন শাহ্‌, নুসরৎ শাহ্‌, পরাগল খাঁ, ছুটি খাঁ প্রভৃতি সুলতান ওপদস্থ রাজকর্মচারীদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। রূপ গোস্বামী ছিলেন হুসেন শাহের মন্ত্রী। তিনি ও তাঁহার ভ্রাতা সনাতন গোস্বামী সংস্কৃত গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সে-যুগের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

বৈষ্ণব পদাবলী, মহাকাব্য প্রভৃতি

পাঞ্জাবী ভাষা, মারাঠী সাহিত্য প্রভৃতিরও সে-যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। কাশ্মীরের সুলতান জৈনুল আবিদিনের পৃষ্ঠপোষকতায় তথাকার আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতি ঘটিয়াছিল। তাঁহার আদেশে আরবী ও ফারসী গ্রন্থাদির হিন্দী অনুবাদ এবং হিন্দী ও কাশ্মীরী গ্রন্থাদির আরবী ও ফারসী অনুবাদ করা হইয়াছিল।

পাঞ্জাবী, মারাঠী, কাশ্মীরী ভাষা ও সাহিত্য

শিল্পের ক্ষেত্রে সুলতানি যুগের উল্লেখযোগ্য অবদান রহিয়াছে। সমাজ ও সংস্কৃতিতে হিন্দু এবং মুসলমান সমাজের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও প্রীতির সুফল সে-যুগের স্থাপত্য

শিল্পেও প্রকাশলাভ করিয়াছিল। হিন্দু ও ইস্‌লামীয় স্থাপত্য শিল্পের এক অভূতপূর্ব সংমিশ্রণ সে-যুগে দেখা গিয়াছিল। 'কুতবমিনার', 'আলাই দরওয়াজা', 'জমা-অতখানা মসজিদ', 'ফিরোজ শাহের সমাধি-সৌধ' প্রভৃতি দিল্লীর স্থাপত্য নিদর্শনগুলি সে-যুগের স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের চমৎকার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। দিল্লী ভিন্ন জৌনপুর, গুজরাট, বাংলাদেশ প্রভৃতি অঞ্চলেও স্থানীয় বৈশিষ্ট্য-সমন্বিত স্থাপত্য কৌশল প্রকাশলাভ করিয়াছিল। জৌনপুরের প্রাসাদ, মসজিদ প্রভৃতিতে হিন্দু-স্থাপত্য রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট রহিয়াছে। জৌনপুরের অতাল মসজিদ, গুজরাটের মাফিজ মসজিদ প্রভৃতি সে-যুগের স্থাপত্য শিল্পের চমৎকার নিদর্শন। বহু স্থানে প্রাচীন হিন্দু মঠ, মন্দির প্রভৃতির সামান্য পরিবর্তনসাধন করিয়া মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছিল। স্বভাবতই এগুলিতে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য কৌশলের সংমিশ্রণ দেখা যায়। বাংলাদেশের গৌড় ও পাণ্ডুয়ার স্থাপত্য নিদর্শনগুলি আজিও দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করিয়া থাকে। বাংলাদেশের স্থাপত্য শিল্পে ইটের ব্যবহার দেখা যায়। অন্যান্য স্থানে ইট অপেক্ষা পাথরেরই প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। গৌড়ের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ, গৌড়ের দাখিল দরওয়াজা, কদম রসুল, তাঁতিপাড়া মসজিদ প্রভৃতি এখনও সে-যুগের শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবে টিকিয়া আছে।

শিল্প: হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্য রীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ (Indo-Saracenic art)

দিল্লী

জৌনপুর, গুজরাট, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের গৌড় ও পাণ্ডুয়া

সমাজ ও অর্থনীতি (Society and Economy): সুলতানি আমলে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে জিয়া-উদ্দিন বর্‌ণী, মিন্‌হাজ-উস্‌-সিরাজ, 'হিন্দুস্তানের তোতাপাখী' আমীর খসরু প্রভৃতি রচয়িতার রচনা হইতে নানাবিধ তথ্য পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন, বিদেশী ভ্রমণকারী—যথা, ইবন্‌-বতুতা, মাহুয়ান, নিকোলো কণ্টি, এথেনিসিয়াস নিকিতিন, পায়েজ, নুনিজ প্রভৃতির বিবরণে সে-যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা পাওয়া যায়।

বিদেশী পর্যটক ও লেখকদের বর্ণনা

সুলতানি আমলে সমাজের সর্বোচ্চে ছিলেন সুলতান স্বয়ং। তারপর স্থান ছিল অভিজাত শ্রেণীভুক্ত মালিক ও আমীর-ওম্‌রাহ্‌দের। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বলিতে সাধারণ রাজকর্মচারী এবং ব্যবসায়ী ও বণিকদের বুঝাইত। ইহাদের নিম্ন স্তরে ছিল কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়। মালিক এবং আমীর-ওম্‌রাহ্‌গণ সামাজিক সম্মান ও প্রতিপত্তির অধিকারী ছিলেন। দেশের সর্বাধিক পরিমাণ ভূ-সম্পত্তি ও ধনদৌলত তাঁহাদের হস্তে ছিল। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে খুব অল্প সংখ্যকেরই অভিজাত শ্রেণীর মত অর্থ ও ধনসম্পদ ছিল। ধনদৌলত ভোগের সঙ্গে সঙ্গে নানাপ্রকার কু-অভ্যাস, মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতি অভিজাত সম্প্রদায়ে এবং অভিজাত সম্প্রদায়ের সমকক্ষ কয়েকটি বণিক পরিবারেও দেখা দিয়াছিল। কিন্তু মধ্যবিত্ত, কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায় এই সকল দোষত্রুটি

সুলতান, অভিজাত শ্রেণী, মধ্যবিত্ত শ্রেণী, কৃষক ও শ্রমজীবী

হইতে মুক্ত ছিল। মুসলমান রাজত্ব শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নারী জাতির অধিকার নানাভাবে সঙ্কুচিত হইয়াছিল। পর্দাপ্রথার প্রবর্তন, পরিবারের বাহিরে শিক্ষা বা সাংস্কৃতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ না করা প্রভৃতি তখনকার হিন্দু সমাজেও চালু হইয়াছিল। সেই যুগে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই নানাপ্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল।

নারী জাতির অধিকার সঙ্কুচিত

কৃষি ও শ্রম শিল্প ছিল সে-যুগের প্রধান উপজীবিকা। ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমেও বহু লোক জীবিকার্জন করিত। গ্রাম ছিল তখনকার অর্থনৈতিক কাঠামোর মূল ভিত্তি। কৃষি ও শিল্পের উন্নতির ফলেই তখন পর্যাপ্ত পরিমাণে ধনদৌলত দেশে সঞ্চিত হইয়াছিল। অবশ্য এই ধনদৌলতের অতি সামান্য অংশই যাহারা প্রকৃত উৎপাদনকারী তাহাদের হাতে থাকিত। অত্যধিক করভার, উচ্চহারে রাজস্ব, নানাপ্রকার অবৈধ কর প্রভৃতির চাপে জনসাধারণের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। আমীর খস্‌রু বলিয়াছেন যে, দরিদ্র কৃষকদের রক্ত-বিগলিত অশ্রু যেন জমাট বাঁধিয়া সুলতানের মুকুটের মণিমুক্তায় পরিণত হইয়াছে—অর্থাৎ গরীবদের শোষণ করিয়াই সুলতান এবং অভিজাত শ্রেণীর অর্থ ও ঐশ্বর্য সঞ্চিত হইয়াছিল।

কৃষি

শিল্পের মধ্যে কাগজ, কাপড়, মদ, চিনি, জুতা, গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত। রেশম ও পশম বস্ত্রাদির উৎপাদনও যথেষ্ট ছিল। বাংলাদেশ ও গুজরাট সূক্ষ্ম কার্পাস বস্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। বিদেশী পর্যটকগণ বাংলাদেশের সমৃদ্ধির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কৃষিজাত দ্রব্যাদি, নানাপ্রকার বস্ত্র, নীল, আফিং প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানি করা হইত। বিদেশ হইতে ঘোড়া, ক্রীতদাস, খচ্চর এবং নানাপ্রকার বিলাস-সামগ্রী আমদানি করা হইত। সেই সময়ে জিনিসপত্রের দাম অত্যন্ত কম ছিল। মরক্কোর পর্যটক ইবন্‌-বতুতা বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর অপর কোন স্থানেই এত সস্তায় জিনিসপত্র তিনি দেখিতে পান নাই।

শিল্প

হিন্দু প্রজাদের উপর সে-যুগে নানাপ্রকার অবিচার করা হইত। তাহাদিগকে জিজিয়া কর, তীর্থ কর প্রভৃতি দিতে হইত। উৎপন্ন ফসলের অর্ধেক তাহাদিগকে রাজস্ব হিসাবে দিতে হইত। আলা-উদ্দিনের আমলে হিন্দুদের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগর সাম্রাজ্যে জনসাধারণের অবস্থা খুবই উন্নত ছিল; সেই কথা আব্দুর্‌রজাক, নিকোলো কণ্টি, পায়েজ, নুনিজ প্রভৃতি বিদেশী পর্যটকের বর্ণনা হইতে জানিতে পারা যায়।

হিন্দুদের অবস্থা

মোগল আমলে (Under the Mughals)

সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন (Social and Religious Life): মোগল যুগের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে তথ্যাদি সেই যুগের ইতিহাস-গ্রন্থাদি ও বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়।

মোগল যুগে ইওরোপীয় পর্যটকদের মধ্যে র‍্যাল্‌ফ ফিচ্‌, হকিন্‌স্‌, টমাস রো, টেরি, পেলসার্ট, তেভার্নিয়ে, বার্ণিয়ে, মানুচি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল বিদেশী পর্যটকের বিবরণ হইতে মোগল যুগের সমাজ, অর্থনীতি, শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়ের তথ্যাদি সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। বার্ণিয়ের বর্ণনায় বাংলাদেশের ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের কথা পাওয়া যায়। তেভার্নিয়ের বর্ণনা হইতে মোগল যুগের অর্থনৈতিক অবস্থা—ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি সম্পর্কে অনেক তথ্য জানিতে পারা যায়।

ইওরোপীয় পর্যটক

সুলতানি আমলের ন্যায়ই মোগল যুগের সমাজ প্রধানত তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। বাদশাহ্‌ ও অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন প্রথম শ্রেণীভুক্ত। বাদশাহ্‌ ও অভিজাত সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার, মদ্যপান প্রভৃতিই ছিল প্রধান বৈশিষ্ট্য। কোন কোন বাদশাহ্‌ অবশ্য এইসব উচ্ছৃঙ্খলতার ঊর্ধ্বে ছিলেন। বাদশাহ্‌ ও অভিজাত শ্রেণীর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল নানা ধরনের এবং বহুসংখ্যক। সম্রাট্‌ আকবরের জন্য বৎসরে এক হাজার পোশাক প্রস্তুত করা হইত। বণিক সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন অত্যধিক অর্থশালী ব্যক্তির জীবনে অভিজাত শ্রেণী-সুলভ বিলাস-ব্যসন, ব্যভিচার প্রভৃতি পরিলক্ষিত হইত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ছিল দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ব্যবসায়-বাণিজ্য প্রভৃতি ছিল তাহাদের উপজীবিকা। তাহাদের জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও নিষ্কলুষ। তাহাদের উপর সরকার হইতে অত্যধিক করভার চাপানো হইত। এজন্য তাহাদের মধ্যে অনেকেই অতি সাদাসিধা ধরনের জীবন যাপন করিয়া দারিদ্র্যের ভান করিত। সমাজের অধস্তন শ্রেণী ছিল কৃষক, শ্রমিক এবং মুদি প্রভৃতি সাধারণ দোকানদার সম্প্রদায় লইয়া গঠিত। ইহাদের খাওয়াপরার কোন অভাব না থাকিলেও অর্থনৈতিক অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না।

বাদশাহ্‌ ও অভিজাত সম্প্রদায়

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

সাধারণ শ্রেণী

মোগল আমলেও হিন্দু-মুসলমানদের পারস্পরিক ঐক্য ও নীতির সম্পর্ক অটুট ছিল। সম্রাট্‌ আকবরের পরধর্ম-সহিষ্ণুতার নীতির ফলে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এক গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার সৃষ্টি হইয়াছিল। এই প্রীতির নিদর্শন তৎকালীন সাহিত্যে প্রকাশলাভ করিয়াছিল। হিন্দুদের মধ্যে আরবী ও ফারসী ভাষা শিক্ষার রীতি সুলতানি আমল হইতেই প্রচলিত হইয়াছিল। উহা মোগল যুগেও অপরিবর্তিত ছিল। মুসলমান কবি আলাওল 'পদ্মাবতে'র বাংলা অনুবাদ করিয়াছিলেন। ধর্মানুষ্ঠানেও পরস্পর সৌহার্দ্য ও মিলনের পরিচয় পাওয়া যায়। মোগল সম্রাট্‌ আকবর তাঁহার হিন্দু পত্নীদিগকে হিন্দু দেব-দেবীর অর্চনা করিতে দিতেন। হিন্দুগণ মুসলমানদের মহরম ও অপরাপর অনুষ্ঠানে যোগদান করিতেন। অনুরূপ মুসলমানগণও হিন্দুদের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতেন। হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিও কোন কোন মুসলমান ধর্মাবলম্বী শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন। সেরূপ হিন্দুগণও মুসলমান পীর-পয়গম্বরদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি
পরধর্ম-সহিষ্ণুতা

মোগল যুগে হিন্দু সমাজে বাল্যবিবাহ, কৌলিন্য ও সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সম্রাট্‌ আকবর বাল্যবিবাহ ও সতীদাহ প্রথা উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজেই নানাপ্রকার কুসংস্কার বিদ্যমান ছিল। নানাপ্রকার মন্ত্রতন্ত্র এবং রহস্যজনক ক্রিয়াকলাপে উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই বিশ্বাস করিত।

কুসংস্কার

অর্থনৈতিক অবস্থা (Economic Condition): ভারতবর্ষ চিরকালই কৃষিপ্রধান দেশ। মোগল যুগে কৃষিই ছিল প্রধান উপজীবিকা। খাদ্যশস্য ভিন্ন কার্পাস, নীল, আখ, তুঁতে, তামাক প্রভৃতির চাষ হইত। বারিপাতের উপর অত্যধিক নির্ভরশীলতা হেতু অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির ফলে সময় সময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। কৃষি ভিন্ন নানাপ্রকার শিল্প হইতেও এক বিরাট সংখ্যক লোকের জীবিকা অর্জিত হইত। শিল্পজাত দ্রব্যাদির মধ্যে সুতী বস্ত্র, রেশম বস্ত্র, মসলিন, শাল, গালিচা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পোশাকী কাপড়, রঙিন কাপড় প্রভৃতিও প্রস্তুত হইত। এই সকল সামগ্রী ভারতের সর্বত্র এবং পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে প্রেরিত হইত। বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় বাংলাদেশের সুতী বস্ত্র, ঢাকার মসলিন প্রভৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা রহিয়াছে। কৃষিজাত দ্রব্যাদি ও শিল্পজাত সামগ্রীর বিক্রয়মূল্য ছিল খুবই অল্প। আবুল ফজ্‌লের বর্ণনা হইতে জিনিসপত্র কিরূপ সস্তা ছিল সেই ধারণা পাওয়া যায়। একটি গরুর দাম তখন ছিল মাত্র দশ টাকা। একটি ছাগল তখন এক টাকায় পাওয়া যাইত। জিনিসপত্রের দাম এরূপ সস্তা ছিল বলিয়া বিদেশে ভারতীয় জিনিসপত্রের খুবই চাহিদা ছিল। প্রধানত সুতী বস্ত্র, মসলিন, সোরা, নীল প্রভৃতিই বিদেশে চালান হইত। সোনার মুদ্রা বা মোহর, রূপার টাকা, জিতল, জালালী প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের ও বিভিন্ন মূল্যের মুদ্রা তখন চালু ছিল।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য

মুদ্রা

মোগল যুগে একাধিকবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। সরকার দুর্ভিক্ষের সময় খাজনা মকুফ করিয়া দিতেন। কিন্তু তখনকার সরকারের দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের কোন নির্দিষ্ট নীতি ছিল না। সেজন্য এবং যানবাহনের অভাব হেতু খাদ্যশস্য এক স্থান ,হইতে অন্যত্র চালান দিবার অসুবিধা হইত বলিয়া দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বহু লোকের মৃত্যু ঘটিত।

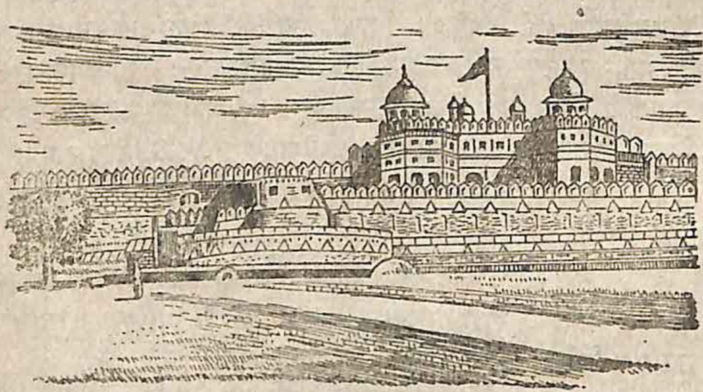
দুর্ভিক্ষের প্রকোপ

মোগল যুগে জনসাধারণের সাধারণভাবে খাওয়াপরার অভাব ছিল না বটে, কিন্তু তাহাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিল। কিন্তু অপরদিকে বাদশাহ্‌, আমীর-ওম্‌রাহ্‌দের ধনদৌলতের অভাব ছিল না। দেশের বিভিন্ন অংশে বহু শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। আগ্রা ও ফতেপুর শহর দুইটির সমৃদ্ধি ও জনবহুলতার কথা ইংরেজ পর্যটক র‍্যাল্‌ফ ফিচের বিবরণে পাওয়া যায়। বুরহান্‌পুর, বারাণসী, আহ্‌ম্মদাবাদ, রাজমহল, বর্দ্ধমান, ঢাকা, হুগলী, পাটনা প্রভৃতি শহর সমৃদ্ধ ও জনবহুল ছিল বলিয়া মন্‌সেরেট নামে জনৈক ইওরোপীয় পর্যটক বর্ণনা করিয়াছেন।

অর্থ ও ধনদৌলতের বৈষম্য

স্থাপত্য ও শিল্পকলা (Architecture and Art) : দিল্লীর সুলতানি আমলের শিল্পরীতিতে ভারতীয় ও ইস্‌লামীয় শিল্পের সমন্বয় ও সংমিশ্রণ শুরু হইয়াছিল। উহাই মোগল যুগের শিল্প ও স্থাপত্যে চরম অভিব্যক্তি লাভ করিয়াছিল। বাবর হইতে আরম্ভ করিয়া মোগল বাদশাহ্‌দের সকলেই শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। একমাত্র ঔরংজেবই ছিলেন এ-বিষয়ে ব্যতিক্রম। বাবর তাঁহার স্বল্পকাল রাজত্বের কর্মব্যস্ততার মধ্যেও বহু সৌধ ও মসজিদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। সেগুলির মধ্যে মাত্র কয়েকটি ভিন্ন সবই বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। হুমায়ুনের আমলেও কয়েকটি মসজিদ, সৌধ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। আগ্রা ও হিসারের সৌধগুলির মধ্যে দুইটি এখনও টিকিয়া আছে। স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার ইতিহাসে মোগল যুগের অন্তর্বর্তী শের শাহের রাজত্বকালও উল্লেখযোগ্য। সাসারামে তাঁহার নিজের সমাধি-সৌধটির পরিকল্পনা শের শাহ্‌ তাঁহার জীবদ্দশাতেই করিয়া গিয়াছিলেন। দিল্লীর পুরাতন

স্থাপত্য শিল্প



আগ্রার দুর্গ

কেল্লাও তাঁহারই স্থাপত্য অনুরাগের নিদর্শন। শের শাহের স্থাপত্য শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য রীতির সংমিশ্রণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

মোগল বাদশাহ্‌ আকবরের রাজত্বকালে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় প্রাসাদ, সমাধি-সৌধ ও স্মৃতি-সৌধ এবং বহুসংখ্যক দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। আগ্রার দুর্গ ও দিল্লীর লালকেল্লা এগুলির অন্যতম। ইহা ভিন্ন মিনার, প্রমোদোদ্যান প্রভৃতিও তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হইয়াছিল। স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে আকবরের গভীর জ্ঞান ছিল। তাঁহার আমলে নির্মিত বহু স্থাপত্য নিদর্শনের প্রায় সব কয়টিরই পরিকল্পনা আকবর স্বয়ং প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহার গভীর শিল্পানুরাগ ও শিল্পজ্ঞান ফতেপুর সিক্রির নির্মাণ-কৌশল ও সৌন্দর্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল। ফতেপুর সিক্রির 'বুলন্দ্‌-দরওয়াজা',

মোগল বাদশাহ্‌দের শিল্পানুরাগ

সেলিম চিস্‌তির 'সমাধি-সৌধ', 'পাঁচ মহল' প্রভৃতি স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচায়ক। আকবরের পুত্র সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরেরও শিল্পানুরাগ নেহাত কম ছিল না। সেকেন্দ্রায় আকবরের 'সমাধি-সৌধ', আগ্রায় ইতিমাদ্‌-উদ্‌-দৌলার 'সমাধি-সৌধ'



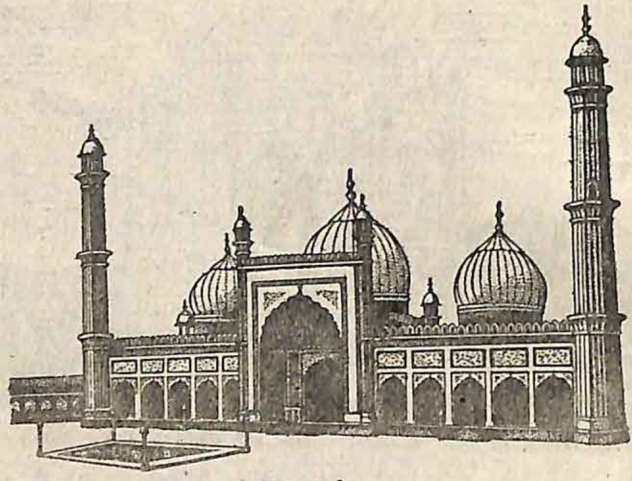
বুলন্দ্‌-দরওয়াজা

জাহাঙ্গীরের আমলে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষের পরিচয় বহন করিতেছে। মোগল বাদশাহ্‌দের মধ্যে শাহ্‌জাহানের শিল্পানুরাগ ছিল সর্বাধিক গভীর। তাঁহার আমলের শিল্প-নিদর্শনগুলির মধ্যে 'দেওয়ান-ই-আম্‌', 'দেওয়ান-ই-খাস', 'মোতি মসজিদ', 'জুম্মা মসজিদ' উল্লেখযোগ্য। কিন্তু তাঁহার পত্নীপ্রেমের সাক্ষ্যস্বরূপ মমতাজের দেহাবশেষের উপর নির্মিত 'তাজমহল' পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তির অন্যতম হিসাবে আজিও টিকিয়া আছে। পৃথিবীর সপ্তমাশ্চর্যের মধ্যে তাজমহল অন্যতম। বহু দেশী ও বিদেশী স্থপতি তাজমহলের পরিকল্পনা প্রস্তুত এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী উহার নির্মাণকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। পারস্যের সিরাজ নামক শহরের শ্রেষ্ঠ স্থপতি মির্জা ঈশা, বাঙালী শিল্পী বলদেব দাশ উহার নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহানের আদেশে নির্মিত ময়ূর সিংহাসনটিও ছিল একটি অপূর্ব শিল্পকীর্তি। নাদির শাহ্‌ যখন দিল্লী লুণ্ঠন করেন, তখন তিনি এই বহুমূল্য শিল্পকীর্তিটি লইয়া গিয়াছিলেন। শাহ্‌জাহানের পরবর্তী কালে ঔরংজেবের উৎকট ধর্মান্ধতার ফলে শিল্পানুশীলন একেবারে নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে মোগল স্থাপত্য তথা শিল্পকলার অবনতি দেখা দিয়াছিল।

মোগল যুগে চিত্র শিল্পেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। গ্রীক, ইরাণী ও চৈনিক চিত্র-শিল্পরীতির সংমিশ্রণে মোগল যুগে এক অভূতপূর্ব চিত্র-শিল্পরীতি

গড়িয়া উঠিয়াছিল। আকবরের দরবারে বহু চিত্রশিল্পী ছিলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। আকবরের রাজত্বকালে চিত্র শিল্পের যে উৎকর্ষের সূত্রপাত হইয়াছিল, জাহাঙ্গীরের আমলে উহার চরম অভিব্যক্তি ঘটিয়াছিল। কিন্তু শাহ্‌জাহানের আমল হইতেই চিত্র শিল্পের প্রতি আর সেরূপ অনুরাগ ছিল না বলা যাইতে পারে এবং ঔরংজেবের আমলে উহা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ হইয়া পড়ে।

চিত্র শিল্প



জুম্মা মসজিদ

মোগল আমলে রাজপুতদের মধ্যে সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের এক চিত্র শিল্প গড়িয়া উঠে। এগুলি 'রাজপুত চিত্র' হিসাবে পরিচিত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন সুর ও সামাজিক জীবনের নানা বিষয়ের উপর নানাপ্রকার রাজপুত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল। রাজপুতানা, পাঞ্জাব ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রাজপুত চিত্রাঙ্কনরীতি ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। পাঞ্জাবের পার্শ্ববর্তী পাহাড়ী অঞ্চল এবং হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলে বিশেষভাবে কাংড়ায় পাহাড়ী চিত্রকলার উৎকর্ষ পরিলক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের চিত্রকলার বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের জীবন, রামায়ণের কাহিনী, পুরাণের কাহিনী, সমাজ-জীবন প্রভৃতি হইতে গ্রহণ করা হইয়াছিল।

পাহাড়ী-শিল্পরীতি : কাংড়ার শিল্পোৎকর্ষ

সঙ্গীত শিল্পেও মোগল যুগে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তানসেন ছিলেন আকবরের অন্যতম সভাসদ্। তাঁহার দরবারে দেশী ও বিদেশী বহু সঙ্গীতজ্ঞ উপস্থিত থাকিতেন। আকবরের পিতা হুমায়ুনের সঙ্গীতানুরাগ ছিল খুবই গভীর। কিন্তু আকবরের মধ্যে উহা অধিকতর প্রকাশ পাইয়াছিল। বাদ্যযন্ত্রাদির মধ্যে শিঙ্গা, বাঁশী, ঢাক প্রভৃতি সে-যুগে ব্যবহৃত হইত। জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মোগল যুগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছিল। ঔরংজেব অবশ্য তাঁহার ধর্মান্ধতাবশত রাজসভা হইতে সঙ্গীতজ্ঞ, কবি প্রভৃতি সকলকেই বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কিন্তু মোগল যুগের সঙ্গীত

সঙ্গীত শিল্প

শিল্প জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া সেগুলি এযাবৎ আংশিকভাবে টিকিয়া আছে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রেও মোগল যুগের উৎকর্ষ নেহাত কম ছিল না। ইতিহাস, সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য, কাব্য—এই তিন প্রকার সাহিত্য-সৃষ্টিই মোগল যুগে সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। বাবরের জীবনস্মৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া আবুল ফজ্‌ল, ফৈজী, বদাউনী, আব্দুল হামিদ লাহোরী, খাফি খাঁ প্রভৃতি সকলে ঐ যুগের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন। আবুল ফজ্‌লের 'আকবরনামা' ও



পাহাড়ী চিত্র (কাংড়া)

'আইন-ই-আকবরী', বদাউনীর 'মন্তাখাব-উল্‌-তোয়ারিখ', ফৈজীর 'লীলাবতী' প্রভৃতি আকবরের আমলের অপূর্ব সাহিত্য-সৃষ্টি। ঘিজ্‌লী ছিলেন আকবরের সভার শ্রেষ্ঠ কবি। জাহাঙ্গীরের আত্মকাহিনী, তাঁহার আমলে আব্দুল হামিদ লাহোরীর 'পাদ্‌শাহ্‌নামা', শাহ্‌জাহানের পুত্র দারাশিকো কর্তৃক উপনিষদ্‌ ও অথর্ব বেদের পারসীক অনুবাদ মোগল যুগের সাহিত্য-ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। পারসীক ভাষা ভিন্ন সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ রচিত ও অনূদিত হইয়াছিল। হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও অনুরূপ উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। বীরবল (মহেশ দাশ), ভগবান দাশ, মানসিংহ, তোডরমল প্রভৃতি হিন্দী কবিতা রচনা করিয়া হিন্দী ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। রাজা বীরবল হাস্য-রসাত্মক কবিতা রচনা করিয়া আকবরের নিকট হইতে 'কবিরায়' উপাধি লাভ করিয়া-

সাহিত্য

ছিলেন। আব্দুল রহিম খান হিন্দী ভাষায় বহু দোঁহা রচনা করিয়াছিলেন। সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিও সে-যুগেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত, মঙ্গলকাব্যগ্রন্থ, কাশীরাম দাশের মহাভারত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর চণ্ডীকাব্য সে-যুগের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন মারাঠী সাহিত্যেরও যথেষ্ট উন্নতি সে-যুগে ঘটিয়াছিল। মোগল যুগে হিন্দুগণ ফারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া বাদশাহের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিতেন। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে আবার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন।

বাংলা সাহিত্য

একাদশ অধ্যায়

মারাঠা ও শিখ শক্তি

(The Marathas and the Sikhs)

(ক) মারাঠাগণ (The Marathas)

মারাঠা অভ্যুত্থান (Rise of the Marathas): পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে হায়দরাবাদ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্য উপকূল ধরিয়া মহারাষ্ট্র দেশ বিস্তৃত। সহায়দ্রী, বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বত মহারাষ্ট্র দেশকে পর্বতসঙ্কুল ও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। প্রকৃতির কৃপণতা হেতু এই অঞ্চলের জনসাধারণকে জীবনধারণের জন্য অসাধারণ শ্রম করিতে হয়। প্রকৃতির কঠোরতার ফলে তাহারা স্বভাবতই কষ্টসহিষ্ণু ও দুর্ধর্ষ। এইরূপ শক্তিশালী জনসমাজ ঐক্যবদ্ধ হইলে এক দুর্জয় শক্তিতে পরিণত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই।

পর্বতসঙ্কুল মহারাষ্ট্র দেশ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে মারাঠা জাতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত ছিল। কিন্তু যোদ্ধা হিসাবে তাহারা যে অতিশয় দুর্ধর্ষ ছিল সে-পরিচয় দাক্ষিণাত্যের সুলতানি রাজ্যগুলি জানিত। এজন্য সেই সকল সুলতানি রাজ্যে মারাঠাগণ সামরিক পদে নিযুক্ত হইত। মারাঠা জাতির সমরকুশলতা ভিন্ন ধর্মপ্রবণতাও উল্লেখযোগ্য। একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি ধর্মপ্রচারক মারাঠা জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রচারের ফলে মারাঠা জাতি এক গভীর জাতীয়তাবোধে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু সেই ঐক্যবোধকে কার্যকরী করিয়া তুলিবার জন্য প্রয়োজন ছিল একজন ক্ষমতাবান নেতার। শিবাজী সেই নেতার পদ গ্রহণ করিয়া মারাঠা জাতিকে ঐক্যবদ্ধ এক দুর্ধর্ষ সামরিক ও ধর্মপ্রাণ জাতিতে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

মারাঠা জাতির অনৈক্য

একনাথ, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতির দান

শিবাজী (Shivaji): শিবাজীর পিতা শাহজী ভোঁসলে প্রথম জীবনে আহম্মদনগরের সুলতানের অধীনে কাজ করিতেন। সেই সূত্রে তিনি ক্রমে সম্মান-

প্রতিপত্তি এবং প্রচুর সম্পত্তি লাভ করেন। পুনা অঞ্চলে তাঁহাকে জায়গির দেওয়া হয়। পুনায় অবস্থানকালে শিবনের গিরিদুর্গে তাঁহার পুত্র শিবাজীর জন্ম হয় (১৬২৭ খ্রীঃ, মতান্তরে ১৬৩০ খ্রীঃ)। ইহার অল্পকালের মধ্যেই শাহজী বিজাপুর সুলতানের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিয়া তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী তুকাবাঈ-সহ সেখানে চলিয়া যান। শিশুপুত্র শিবাজী এবং তাঁহার মাতা জীজাবাঈ দাদাজী কোণ্ডদেব নামক জনৈক ধর্মভাবাপন্ন অথচ যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ব্রাহ্মণের অভিভাবকত্বাধীনে পুনায় বাস করিতে থাকেন। শিবাজী বাল্যকাল হইতেই মাতা জীজাবাঈ-এর মুখে তাঁহার পূর্বপুরুষদের বীরত্বের কাহিনী ও দাদাজী কোণ্ডদেবের নিকট রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী শুনিয়া এক মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠেন। ধর্মের ভিত্তিতে এবং বীরত্বের দ্বারা এক বিশাল হিন্দু রাজ্য স্থাপনের আদর্শ তাঁহার অন্তরে গড়িয়া উঠে। তিনি ছেলেবেলায় বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন কি না সে-বিষয়ে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না, তবে দাদাজীর নিকট যুদ্ধকৌশল শিক্ষা এবং তাঁহার ও মাতা জীজাবাঈ-এর মুখে হিন্দু বীরদের কাহিনী শ্রবণের ফলে অন্তরের বলিষ্ঠতা, আদর্শের প্রতি একনিষ্ঠতা, সমরকুশলতা, আত্মমর্যাদা প্রভৃতি গুণ শিবাজীর চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। নিজ আদর্শসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বাল্যবয়স হইতেই তিনি মাওয়ালী জাতির সহিত ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করেন। পরে তাহাদিগকে লইয়া তিনি একটি সেনা-বাহিনী গড়িয়া তোলেন।

জন্ম

বাল্যকাল



শিবাজী

এদিকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন সুলতানি রাজ্যগুলি ক্রমেই দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। সেই সুযোগ গ্রহণে শিবাজী ত্রুটি করিলেন না। তিনি তাঁহার মাওয়ালী সেনাবাহিনীর সাহায্যে বিজাপুর রাজ্যের তোরণা দুর্গটি অধিকার (১৬৪৬ খ্রীঃ) করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন তোরণার অনতিদূরে তিনি রায়গড় নামক অপর একটি দুর্গও আক্রমণ করিলেন। দাদাজী কোণ্ডদেব শিবাজীর এই যুদ্ধ-নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। সুতরাং তাঁহার জীবদ্দশায় শিবাজী বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। কিন্তু দাদাজী কোণ্ডদেবের মৃত্যু (১৬৪৭ খ্রীঃ) হইলে শিবাজীকে বাধা দেওয়ার কেহ রহিল না। শিবাজী চকন দুর্গ এবং আরও কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি দখল করিয়া পুনার সামরিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিলেন। বিজাপুর সুলতান শিবাজীর এই সকল

বিজাপুরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

কার্যকলাপে প্রথমদিকে ততটা বিচলিত হন নাই। কিন্তু ক্রমেই যখন শিবাজী নিজ ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া এবং এক একটি করিয়া বিজাপুর রাজ্যের দুর্গ দখল করিতে লাগিলেন, তখন শিবাজীর কার্যকলাপ বন্ধ করিবার সহজ উপায়-স্বরূপ বিজাপুর সুলতান তাঁহার পিতা শাহজীকে বন্দী করিলেন। ফলে শিবাজী কিছুকাল বিজাপুর রাজ্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ-নীতি ত্যাগ করিলেন। কয়েক বৎসর পরে পিতার মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে শিবাজী পুনরায় নিজরূপ ধারণ করিলেন। তিনি জাওলীর মারাঠা রাজাকে হত্যা করাইয়া সেই রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইলেন। পর বৎসর শিবাজী মোগল বাহিনীর সহিত দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হইলেন। ঔরংজেব সেই সময়ে ছিলেন দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা। তিনি বিজাপুর রাজ্যের সহিত যখন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন সেই সুযোগে শিবাজী মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত জুন্নার ও আহ্‌মদনগর লুণ্ঠন করিলে ঔরংজেবের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। এই যুদ্ধে ঔরংজেবের হস্তে শিবাজীর পরাজয় ঘটিলে শিবাজী মোগল সম্রাটের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু সম্রাট্ শাহ্‌জাহানের অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া ঔরংজেব দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিয়া দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শিবাজী পুনরায় তাঁহার যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি ক্রমে বহু স্থান অধিকার করিয়া ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোঙ্কণের উত্তরাংশ নিজ রাজ্যভুক্ত করিলেন।

একে একে বহু দুর্গ জয়

মারাঠা-মোগল সংঘর্ষ

শিবাজীর ক্ষমতা বৃদ্ধি বিজাপুর সুলতানের নিরাপত্তার দিক্ দিয়াও কাম্য ছিল না। তিনি শিবাজীকে ধরিয়া আনিবার জন্য তাঁহার সেনাপতি আফজল খাঁকে প্রেরণ করিলেন (১৬৫৯ খ্রীঃ)। আফজল খাঁ সসৈন্যে অগ্রসর হইলে শিবাজী তাঁহার প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় লইলেন। তিনি আফজল খাঁর সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন না। প্রতাপগড় দুর্গ জয় করা সহজ হইবে না দেখিয়া আফজল খাঁ কৌশলে শিবাজীকে নিজ শিবিরে আনিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টা শুরু করিলেন। তিনি শিবাজীর নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া দূত পাঠাইলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে নিজ শিবিরে শিবাজীকে আমন্ত্রণ করিলেন। আফজল খাঁর দুরভিসন্ধির সংবাদ পাইতে শিবাজীর বিলম্ব হইল না। তিনি আফজল খাঁর শিবিরে প্রস্তুত হইয়াই আসিলেন। শিবাজী প্রবেশ করিলে আফজল খাঁ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিবার ভান করিয়া তাঁহার গলা টিপিয়া ধরিলেন এবং বক্ষে ছুরিকাঘাত করিতে উদ্যত হইলেন। শিবাজী 'বাঘনখ' নামক ধারাল অস্ত্রের সাহায্যে আফজল খাঁর বক্ষ চিরিয়া তাঁহাকে হত্যা করিলেন। আফজল খাঁর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া তাঁহার সেনাবাহিনী বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে শিবাজীর অনুচরগণ তাহাদিগকে সহজেই পরাজিত করিতে সমর্থ হইল। শিবাজী দক্ষিণ-কোঙ্কণ এবং কোলহাপুর জেলা অধিকার করিয়া নিজ রাজ্য আরও বিস্তার করিলেন। অবশ্য পর বৎসর (১৬৬০ খ্রীঃ) বিজাপুর বাহিনী পান্‌হালা দুর্গটি তাঁহার নিকট হইতে জয় করিয়া লইল।

আফজল খাঁ ও শিবাজী

এদিকে ঔরংজেব পিতা সম্রাট্ শাহ্জাহানকে বন্দী ও কারারুদ্ধ করিয়া দিল্লীর সম্রাট্ হইয়াছিলেন। শিবাজীকে দমন করিবার প্রয়োজনীয়তা তাঁহার অবিদিত ছিল না। তিনি নিজ মাতুল শায়েস্তা খাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার উপর শিবাজীকে দমন করিবার দায়িত্ব দেওয়া হইল। শায়েস্তা খাঁ প্রথমে শিবাজীকে পরাজিত করিয়া চকন ও পুনা অধিকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন কল্যাণ জেলা হইতে মারাঠা প্রভুত্বের অবসান ঘটাইয়া শিবাজীকে সাময়িকভাবে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এমতাবস্থায় বাধ্য হইয়া শিবাজী বিজাপুর সুলতানের সহিত বিবাদ মিটাইয়া ফেলিয়া মোগলদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োজিত করিলেন। দুই বৎসর ধরিয়া তিনি শায়েস্তা খাঁর সহিত যুঝিয়া চলিলেন। তারপর এক রাত্রিতে শায়েস্তা খাঁ যখন নিজের শিবিরে অবস্থান করিতেছিলেন তখন শিবাজী অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন। শায়েস্তা খাঁর পুত্র আবুল ফতাকে হত্যা করিয়া শিবাজী শায়েস্তা খাঁর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শায়েস্তা খাঁ প্রাণ লইয়া পলাইয়া গেলেন কিন্তু শিবাজীর তরবারির আঘাতে তিনি হাতের একটি আঙুল হারাইলেন। ইহার পর (১৬৬৪ খ্রীঃ) শিবাজী সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিলেন। মাতুল শায়েস্তা খাঁর অকৃতকার্যতায় ঔরংজেব অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ন হইয়া এবার অম্বররাজ জয়সিংহ এবং সেনাপতি দিলীর খাঁকে শিবাজীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। জয়সিংহের কূটকৌশল ও মোগল বাহিনীর সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে শিবাজী পরাজয় স্বীকার করিয়া পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫ খ্রীঃ) স্থাপনে বাধ্য হইলেন। এই সন্ধির শর্ত অনুসারে শিবাজী মোগলদিগকে কয়েকটি জেলা ও মোট ২৩টি দুর্গ ছাড়িয়া দিতে এবং প্রয়োজনবোধে মোগল বাহিনীকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিবার কালে পুরন্দরের সন্ধির শর্ত অনুসারে তিনি মোগল সৈন্যকে সামরিক সাহায্য করিলেন। ইহাতে ঔরংজেব অত্যন্ত প্রীত হইয়া শিবাজীকে মোগল দরবারে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। প্রথমে স্বীকৃত না হইলেও শেষ পর্যন্ত জয়সিংহের বিশেষ অনুরোধে শিবাজী ঔরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইতে রাজী হইলেন এবং মাতা জীজাবাঈ-এর হস্তে শাসনকার্য পরিচালনার ভার সাময়িকভাবে অর্পণ করিয়া শিশুপুত্র শম্ভুজী-সহ আগ্রায় ঔরংজেবের দরবারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু ঔরংজেব শিবাজীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন না। ইহাতে শিবাজীর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগিল। তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইলেন এবং ক্রোধবশত ইহার প্রতিবাদ করিতে গিয়া সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িলেন। সেই সুযোগে ঔরংজেবের আদেশে তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র শম্ভুজীকে নজরবন্দী করিয়া রাখা হইল। সুচতুর শিবাজী অসুস্থতার ভান করিয়া দেবমন্দিরে পূজার জন্য ঝুড়ি ঝুড়ি ফল, মিষ্টি প্রভৃতি প্রেরণ করিতে লাগিলেন। প্রথম কয়েকদিন দ্বাররক্ষিগণ পরীক্ষা করিয়া যখন ঝুড়িতে সন্দেহজনক কিছুই দেখিতে পাইল না

শায়েস্তা খাঁ ও শিবাজী

শায়েস্তা খাঁর পলায়ন

জয়সিংহ ও দিলীর খাঁর সহিত শিবাজীর যুদ্ধ—পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫ খ্রীঃ)

মোগল দরবারে শিবাজীর উপস্থিতি

তখন তাহারা ঝুড়ি পরীক্ষা করিয়া দেখা ছাড়িয়া দিল। সেই সুযোগে একদিন শিবাজী ও তাঁহার পুত্র ঝুড়িতে করিয়া কারাগার হইতে পলাইয়া গেলেন (১৬৬৬ খ্রীঃ)। তারপর নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া স্বদেশে ফিরিলেন।

শিবাজীর পলায়ন

মোগলদের সকল কৌশল ব্যর্থ করিয়া এবং মোগল রক্ষীদের চক্ষে ধূলি দিয়া শিবাজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া নিজ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার উন্নয়নের দিকে মনোযোগ দিলেন। ঔরংজেব শিবাজীকে পরাভূত করা অসম্ভব দেখিয়া তাঁহাকে 'রাজা' বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ইহা ভিন্ন বেরার প্রদেশের কতক স্থান তাঁহাকে জায়গির হিসাবেও দান করিলেন। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যেই শিবাজী পুনরায় মোগলদের সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন এবং একে একে তাঁহার হৃত রাজ্যের প্রায় সকল স্থান ও দুর্গ পুনরধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। ইহার পর ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত পরিমাণ অর্থলাভ করিলেন। ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সুরাট হইতে চৌথ দাবি করিলেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন : ঔরংজেব কর্তৃক 'রাজা উপাধি দান

ইহার দুই বৎসর পর ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী রায়গড়ে মহাসমারোহে নিজ অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করেন। তিনি 'ছত্রপতি', 'গো-ব্রাহ্মণ-প্রজাপালক' প্রভৃতি উপাধি গ্রহণ করেন। পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি জিঞ্জি, ভেলোর এবং উহার নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করিয়া এক বিরাট মারাঠা রাজ্য গড়িয়া তোলেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে অকস্মাৎ তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন।

রাজ্যাভিষেক : 'ছত্রপতি', 'গো-ব্রাহ্মণ-প্রজাপালক' উপাধি গ্রহণ

শিবাজী কেবল সমরকুশল সেনাপতি, দুর্ধর্ষ বীর ও অনন্যসাধারণ সংগঠকই ছিলেন না, তাঁহার চরিত্রবল, মহান্ আদর্শ, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা এবং সর্বোপরি তাঁহার সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা তাঁহাকে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অমরত্ব দান করিয়াছে। হিন্দু জাতি ও হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন এবং হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনই ছিল তাঁহার জীবনের আদর্শ। একনিষ্ঠ দেশপ্রেম, আদর্শের প্রতি অকাতর অধ্যবসায় প্রভৃতি গুণ তাঁহার চরিত্রকে মহিমমণ্ডিত করিয়াছে। শিবাজী হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন সত্য, কিন্তু মুসলমান বা খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের প্রতি তিনি কোনদিন কোনপ্রকার অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করেন নাই। হিন্দু ধর্মের প্রকৃত উদার আদর্শ তিনি অনুসরণ করিয়া চলিতেন। কোন স্থান অধিকার বা লুণ্ঠন করিবার কালে মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরান তাঁহার হস্তে আসিলে তাহা তিনি কোন মুসলমানকে ডাকিয়া দিয়া দিতেন। অপরাপর ধর্মাবলম্বীর ধর্মস্থান তাঁহার সেনাবাহিনী যাহাতে কলুষিত না করে সেদিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। শিবাজী নারীজাতির প্রতি অত্যধিক শ্রদ্ধাবান ছিলেন। বৃদ্ধ, শিশু, নারী কেহই যাহাতে তাঁহার সেনাবাহিনীর আক্রমণকালে কোনভাবে অত্যাচারিত না হয় সেই বিষয়ে তাঁহার কঠোর নির্দেশ ছিল।

শিবাজীর চরিত্র

শিবাজীর কর্মজীবনের প্রায় সকল সময়ই যুদ্ধ-বিগ্রহে অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার মধ্যেও তিনি নিজ রাজ্যের সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে ছিলেন তিনি স্বয়ং। কিন্তু তিনি যথেচ্ছভাবে শাসনকার্য চালাইতেন না। তাঁহাকে সাহায্য করিবার ও পরামর্শদানের জন্য আটজন মন্ত্রী ছিলেন। ইঁহারা 'অষ্টপ্রধান' নামে অভিহিত হইতেন। এই আটজন মন্ত্রী আটটি পৃথক পৃথক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন।

শিবাজীর সুদক্ষ শাসনব্যবস্থা

শাসনকার্যের সুবিধার জন্য সমগ্র রাজ্যকে কয়েকটি প্রান্ত বা প্রদেশে ভাগ করা হইয়াছিল। প্রত্যেকটি প্রান্ত আবার পরগণা এবং তরফে বিভক্ত ছিল। শাসনব্যবস্থার সর্বনিম্ন বিভাগ ছিল গ্রাম। রাজ্যের বিভিন্নাংশের রাজকর্মচারিগণ কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পূর্ণ ক্ষমতাধীনে ছিলেন।

প্রদেশ, পরগণা, গ্রাম প্রভৃতির শাসনব্যবস্থা

শিবাজী প্রজাবর্গের জমি জরিপ করাইয়া তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন শস্যের দশভাগের চারিভাগ রাজস্ব হিসাবে গ্রহণ করিতেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির প্রজাদের উপর মারাঠা সৈন্য আক্রমণ চালাইবে না, এই শর্তে শিবাজী তাহাদের নিকট হইতে 'চৌথ'—অর্থাৎ রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 'সরদেশমুখী'—অর্থাৎ রাজস্বের এক-দশমাংশ অতিরিক্ত কর হিসাবে গ্রহণ করিতেন।

রাজস্ব : চৌথ ও সরদেশমুখী

শিবাজীর সেনাবাহিনী ছিল অশ্বারোহী ও পদাতিক এই দুই ভাগে বিভক্ত। অশ্বারোহী সৈন্যগণ আবার 'বর্গির' ও 'শিলাদার' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। শিবাজীর সেনাবাহিনী পর্বতসঙ্কুল দেশে অতিশয় দক্ষতার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিল। শিবাজীর সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল অসাধারণ। কোন স্ত্রীলোক তাঁহার সৈন্য-শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিতেন না। কোন স্থান আক্রমণ বা লুণ্ঠনের সময় কোন স্ত্রীলোক, বৃদ্ধ বা শিশুর উপর অথবা কোন ধর্মস্থানের উপর কোনরূপ অত্যাচার বা আক্রমণ করা নিষিদ্ধ ছিল।

সেনাবাহিনী : অশ্বারোহী—বর্গির ও শিলাদার এবং পদাতিক

শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা

শিবাজীর কতকগুলি সুরক্ষিত দুর্গও ছিল। এই সকল পার্বত্য দুর্গ শত্রুর পক্ষে ছিল দুর্ভেদ্য। শিবাজীর মৃত্যুকালে তাঁহার রাজ্যের দুর্গসংখ্যা ছিল মোট ২৪০টি।

দুর্গ

শিবাজী ছিলেন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সামরিক সংগঠক। তিনি নৌবাহিনীর প্রয়োজন উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। সেজন্য তিনি মোট ২০০টি বিভিন্ন আকারের রণতরীর এক বিরাট নৌ-বহর গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

নৌ-বহর

শিবাজীর শাসনব্যবস্থা সমসাময়িক ঐতিহাসিক মাত্রেরই প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক খাফি খাঁ শিবাজীর প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন। কিন্তু তিনিও তাঁহার শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

খাফি খাঁর মন্তব্য

শিবাজীর অক্লান্ত কর্মপ্রচেষ্টার ফলে মারাঠাগণ এক সংঘবদ্ধ জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ দুর্ধর্ষ জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল। পরস্পর বিচ্ছিন্ন মারাঠা জাতিকে এইভাবে গভীর জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া শিবাজী ভারত-ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন।

জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ মারাঠাগণ



শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র প্রথম শম্ভুজী সিংহাসনে আরোহণ করেন (১৬৮০ খ্রীঃ)। তিনি পিতার ন্যায় প্রতিভাবান ছিলেন না, কিন্তু মোগলদের সহিত যুঝিবার মত তাঁহার সাহসের অভাব ছিল না। ঔরংজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবরকে আশ্রয়দানে তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। প্রথম শম্ভুজী মোগলদের সহিত যুঝিবার

শিবাজীর উত্তরাধিকারিগণ : প্রথম শম্ভুজী (১৬৮০-৮৯ খ্রীঃ)

কালে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের হস্তে বন্দী হন এবং বহু লাঞ্ছনার পর তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ইহার পর মোগল বাহিনী একে একে বহু মারাঠা দুর্গ, এমন কি মারাঠা রাজ্যের রাজধানী রায়গড়ও দখল করিয়া লয়। রায়গড় দখল করিবার কালে প্রথম শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) ও পরিবার-পরিজন মোগলদের হস্তে বন্দী হইলেন। কিন্তু প্রথম শম্ভুজীর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজারাম রায়গড় হইতে পলাইয়া গিয়া কর্ণাটকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখান হইতে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে মারাঠাগণ মোগল বাহিনীকে অতর্কিতে আক্রমণ করিতে লাগিল। শান্তাজী ঘোড়পাড়ে, ধনাজী যাদব প্রভৃতি মারাঠা সেনাপতির আক্রমণে মোগল বাহিনী ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। মারাঠাগণ কোন কোন স্থানে মোগলদের নিকট হইতেও 'চৌথ' আদায় করিতে ছাড়িল না। এইভাবে কিছুকাল কাটিল, তারপর মোগল সেনাবাহিনী রাজারামের কর্মকেন্দ্র জিঞ্জি অবরোধ করিলে মারাঠাগণ প্রায় আট বৎসর সেই অবরোধ প্রতিহত করিয়া টিকিয়া রহিল। অবশেষে জিঞ্জি মোগল সেনার হস্তগত হইলে (১৬৯৮ খ্রীঃ) রাজারাম সাতারাতে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাতারাও মোগল সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হইল (১৭০০ খ্রীঃ)। এইভাবে ঔরংজেব মারাঠা প্রতিরোধ কতক পরিমাণে শিথিল করিয়া তাহাদের দুর্গগুলি অধিকার করিতে লাগিলেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই অধিকৃত দুর্গগুলি পুনরায় মারাঠাগণ জয় করিয়া লইতে লাগিল। ঔরংজেব কোনরূপেই মারাঠাদিগকে দমন করিতে সমর্থ হইলেন না।

মোগল হস্তে প্রথম শম্ভুজীর পরিবার-পরিজন ও শিশুপুত্র শাহু বন্দী

রাজারাম (১৬৯০-১৭০০ খ্রীঃ)

রাজারাম দীর্ঘকাল মোগলদের সহিত সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার দুই বিধবা পত্নী তারাবাঈ ও রাজসবাঈ নিজ নিজ পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্যস্ত হইলেন। প্রথমা পত্নী তারাবাঈ মারাঠা সৈন্যের সাহায্যে তাঁহার শিশুপুত্র তৃতীয় শিবাজীকে সিংহাসনে স্থাপন (১৭০০ খ্রীঃ) করিয়া মোগলদের সহিত চিরাচরিত যুদ্ধ-নীতি অনুসরণ করিয়া চলিলেন। মারাঠাগণ মালব, গুজরাট, বরোদা এমন কি আহম্মদনগরে ঔরংজেবের যুদ্ধশিবিরও আক্রমণ করিল। ঔরংজেব জীবনের দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্য দমনে কাটাইয়া শেষ পর্যন্ত মারাঠাগণ কর্তৃক প্রতিহত হইলেন। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরংজেবের মৃত্যুকালে মারাঠাদিগকে দমন করা দূরের কথা তাহাদিগকে তিনি যথেষ্ট শক্তিশালীই রাখিয়া গেলেন।

তারাবাঈ—তৃতীয় শিবাজী (১৭০০-১২ খ্রীঃ)

ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র মোয়াজ্জেম জুলফিকার খাঁর কুটিল পরামর্শে* মারাঠাদিগের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে ঔরংজেব কর্তৃক বন্দীকৃত শাহুকে মুক্তিদান করেন। সেই সময়ে তারাবাঈ নিজপুত্র তৃতীয় শিবাজীর পক্ষে মারাঠা রাজ্যের শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিলেন। শাহু মুক্তিলাভ করিয়া মারাঠা সিংহাসন দাবি করিলেন। আইনত

শাহুর মুক্তিলাভ (১৭০৭ খ্রীঃ)

* V. A. Smith : *The Oxford History of India*, p. 430, (3rd Edn.).

তাঁহার দাবিই অধিকতর বলবৎ ছিল। তারাবাঈ শাহুর দাবি অস্বীকার করিলে মারাঠাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব শুরু হইল। ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দে শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) মারাঠাদের রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলে সাতারা দুর্গে তাঁহার অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হইল। তারাবাঈ পান্হালা দুর্গে তাঁহার রাজধানী অপসারিত করিলেন। চারি বৎসর ধরিয়া মারাঠা রাজ্য শাহু ও তারাবাঈ-এর মধ্যে বিভক্তভাবেই শাসিত হইল। ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে তারাবাঈ-এর মৃত্যু ঘটিলে রাজারামের অন্যতমা পত্নী রাজস্‌বাঈ নিজপুত্র দ্বিতীয় শম্ভুজীর নামে কোলহাপুরে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। এইভাবে মারাঠাদের গৃহযুদ্ধ তখনও লাগিয়া রহিল। কিন্তু শাহু বালাজী বিশ্বনাথ নামে কোঙ্কণের জনৈক চিৎপাবন ব্রাহ্মণের সাহায্যে এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ জয়লাভ করিলেন। ১৭১৩ খ্রীষ্টাব্দে বালাজী বিশ্বনাথ হইলেন শাহুর 'পেশওয়া' বা প্রধান মন্ত্রী। পরে ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে বার্ণার সন্ধি (Treaty of Warna) দ্বারা দ্বিতীয় শম্ভুজী ও শাহুর রাজ্যের সীমানা নির্দিষ্ট হইল। কোলহাপুরের মারাঠা শাসনকর্তা শম্ভুজী শাহুর সহিত অধীনতামূলক মিত্রতা স্থাপন করিলেন। মহারাষ্ট্রেও শাহুর অধিনায়কত্ব স্বীকৃত হইল এবং রাজবংশের মধ্যে গৃহবিবাদের সমাপ্তি ঘটিল।

শাহু (১৭০৮-৪৯ খ্রীঃ)

রাজস্‌বাঈ—দ্বিতীয় শম্ভুজী (১৭১২-৬০ খ্রীঃ)

বার্ণার সন্ধি (১৭৩১ খ্রীঃ)

পেশওয়াতন্ত্র: শাহু রাজ্য শাসনের যাবতীয় ক্ষমতা বালাজী বিশ্বনাথকে প্রদান করিয়া তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী বা 'পেশওয়া' নিযুক্ত করিলেন (১৭১৩ খ্রীঃ)। বালাজী বিশ্বনাথ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি। তাঁহার কর্মকুশলতা, দূরদর্শিতা ও সংগঠনী শক্তি মারাঠা রাজ্যে এক নবজীবনের সূচনা করিল। তিনি ক্রমেই রাজ্যের প্রকৃত শাসক হইয়া দাঁড়াইলেন। বালাজী বিশ্বনাথ শাহুর জীবদ্দশায় পেশওয়া পদকে বংশানুক্রমিক করিয়া মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বময় শাসন-কর্তৃত্ব কায়েম করিয়া লইলেন।

পেশওয়াতন্ত্রের উৎপত্তি

বালাজী বিশ্বনাথ মারাঠা রাজ্যকে এমনভাবে পুনর্গঠন করিলেন যে মারাঠা সর্দারগণ স্ব স্ব প্রধান হওয়া দূরের কথা, রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় সহযোগিতাদানে বাধ্য হইলেন। এই রাষ্ট্রব্যবস্থা অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর রচিত হইয়াছিল। সেই সময়ে মারাঠাগণ মোগল বাদশাহের নিকট হইতে দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবার উপর চৌথ ও সর্‌দেশমুখী আদায়ের অধিকারও লাভ করিয়াছিল। সর্‌দেশমুখী হইতে প্রাপ্ত সকল অর্থই ছিল রাজার প্রাপ্য। চৌথের এক-চতুর্থাংশ পাইতেন রাজা স্বয়ং। অবশিষ্ট অর্থ মারাঠা দলপতিগণ পাইতেন। বালাজী বিশ্বনাথ রাজ্যকে সুসংগঠিত করিয়া এবং মারাঠা শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

পেশওয়া বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০ খ্রীঃ)

বালাজী বিশ্বনাথের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম বাজী রাও পেশওয়া-পদ গ্রহণ করেন। প্রথম বাজী রাও ছিলেন যেমন সাহসী ও কর্মকুশল তেমনি বুদ্ধিমান্ ও

দূরদর্শী। তিনি পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের স্থলে একটি বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য গঠন করিবার স্বপ্ন দেখিতেন। প্রথম বাজী রাও ইহার নাম দিয়াছিলেন 'হিন্দু-পাদ্-পাদ্শাহী'। এজন্য তিনি মারাঠা ভিন্ন অপরাপর হিন্দু দলপতি, অভিজাতবর্গ ও রাজগণকে সংঘবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। যেখানেই হিন্দু রাজা বা জমিদারকে সামরিক সাহায্যদানের প্রয়োজন হইত সেখানেই প্রথম বাজী রাও প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রেরণ করিতেন। উত্তর ভারতেও মারাঠা রাজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথম বাজী রাও জয়পুরের রাজা দ্বিতীয় জয়সিংহ এবং বুন্দেলরাজ ছত্রশালের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। প্রথম বাজী রাও গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চল আক্রমণ করিয়া ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলে নিজাম-উল্-মুলক বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের সৈন্য-সহ তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন। প্রথম বাজী রাও ভূপালের অনতিদূরে নিজাম-উল্-মুল্ককে পরাজিত করিয়া (১৭৩৮ খ্রীঃ) সমগ্র মালব এবং নর্মদা ও চম্বল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। অপরদিকে প্রথম বাজী রাও-এর ভ্রাতা চিমন্জী আপ্পা পোর্তুগীজদিগকে পরাজিত করিয়া সলসেট্ ও ব্যাসিন দখল করেন। প্রথম বাজী রাও-এর আমলে রাজধানী রায়গড় হইতে পুনায় স্থানান্তরিত হইয়াছিল।

প্রথম বাজী রাও
(১৭২০-৪০ খ্রীঃ)

প্রথম বাজী রাও-এর বিজয়লাভ

প্রথম বাজী রাও কেবল মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের জন্যই খ্যাতি অর্জন করেন নাই। তিনি একজন দেশপ্রেমিকও ছিলেন। শাহু ও পেশওয়া চৌথ আদায়ের নিশ্চয়তা ও সাম্রাজ্যের ক্রমবিস্তৃতির মাধ্যমে ক্ষমতা সুদৃঢ় রাখিবার জন্য মারাঠা গেরিলা সামন্তদিগের মধ্যে 'সারণজমি' (*Saranjami*) প্রথা* চালু করিয়াছিলেন। নাদির শাহের সহিত আহ্মদ শাহ্ আবদালী বা দুর্রানী ভারত আক্রমণ করিলে তিনি মুসলমান রাজ্যগুলির সহিত মিলিত হইয়া বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যু হয় (১৭৪০ খ্রীঃ)।

বহিরাগত আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা

প্রথম বাজী রাও মারাঠাদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছিলেন। রাজারাম যখন মারাঠা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন জায়গির-প্রথা পুনঃ-প্রবর্তিত হইয়াছিল। ফলে গোয়ালিওরের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার, বরোদার গাইকোয়াড়, নাগপুরের ভোঁসলে এবং ধারের পোবার—এই কয়েকটি সামন্ত রাজ্যে মারাঠা রাজ্য বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইহারা সকলেই অবশ্য পুনার পেশওয়ার আদেশাধীন ছিল। পেশওয়া এই বিচ্ছিন্ন ও স্বাধীন সামন্ত রাজ্যগুলিকে সংঘবদ্ধ করিয়া এক 'মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করিলেন। এইভাবে এক বিশাল সাম্রাজ্যের পত্তন হইল। মারাঠাগণ

প্রথম বাজী রাও-এর কৃতিত্ব

* Vide *The New Cambridge Modern History*, vol. VII, p. 549.

যখন পেশওয়ার নেতৃত্বে মধ্য ভারতে ও দক্ষিণ ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিল; তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বিদেশী আক্রমণকারী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই আক্রমণকারী ছিলেন নাদির শাহ্‌।

মারাঠা যুক্তরাষ্ট্র



প্রথম বাজী রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র (দ্বিতীয়) বালাজী বাজী রাও পেশওয়া-পদ লাভ করিলেন। তিনি নানাসাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। নানাসাহেব তাঁহার পিতার হিন্দু-পাদ্-পাদ্‌শাহীর আদর্শ ত্যাগ করিয়া হিন্দু, মুসলমান সকলের উপরই উৎপীড়ন চালাইতে লাগিলে হিন্দু রাজগণও তাঁহার বিরোধিতা শুরু করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি মারাঠা বাহিনীতে মুসলমান সৈন্য এবং ইব্রাহিম খাঁ নামক ব্যক্তিকে অন্যতম সেনাপতি

দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও (১৭৪০-৬১ খ্রীঃ)

পদে নিয়োগ করিয়া মারাঠা বাহিনীর পূর্বেকার ঐক্য ও আদর্শ নাশ করিয়াছিলেন।

বালাজী বাজী রাও কর্তৃক হিন্দু-পাদ্-পাদ্‌শাহীর আদর্শ পরিত্যক্ত

১৭৪৯ খ্রীষ্টাব্দে শাহুর মৃত্যু হইলে বালাজী বাজী রাও সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তা হইয়া বসিলেন। তাঁহার আমলেই অবশ্য মারাঠা সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এই সময়ে মারাঠা সাম্রাজ্য হিমালয় হইতে সিন্ধু নদ এবং দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। বালাজী বাজী রাও-এর আমলে নাগপুরের ভোঁসলে বাংলার নবাব আলিবর্দী খাঁর নিকট হইতে চৌথ আদায় করিয়া উড়িষ্যায় প্রাধান্য বিস্তার করেন। বালাজী বাজী রাও-এর ভ্রাতা রঘুনাথ রাও আহম্মদ শাহ্ আবদালীর পুত্র তৈমুরকে বিতাড়িত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন (১৭৫৮ খ্রীঃ)। হায়দরাবাদের নিজাম উদ্‌গীরের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া (১৭৬০ খ্রীঃ) মারাঠাগণকে প্রচুর ধনদৌলত, দৌলতাবাদের দুর্গ, ঔরঙ্গাবাদ, বিজাপুর ও বিদরের কিয়দংশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলেও মারাঠাদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল। এমন কি, দিল্লীর রাজনীতি-ক্ষেত্রেও তাহারা যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

পাঞ্জাব হইতে তৈমুরকে বিতাড়িত করিবার ফলে আহম্মদ শাহ্ আবদালী ভারত আক্রমণ করিয়া (১৭৬১ খ্রীঃ) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তিকে চরম আঘাত হানিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে মারাঠা শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িলে ভারতে মারাঠা সাম্রাজ্য গঠনের স্বপ্ন চিরতরে বিলীন হইয়া গেল। তাঁহাদের দুর্বলতার সুযোগে ইংরেজগণ মোগলদের হাত হইতে ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। এইভাবে মারাঠা শক্তি-সঙ্ঘকে দুর্বল রাখিয়া ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও-এর পর তাঁহার পুত্র প্রথম মাধব রাও পেশওয়া হন (১৭৬১ খ্রীঃ)। তাঁহার সুদক্ষ শাসনে ও সামরিক দক্ষতায় মারাঠা শক্তির পুনরুজ্জীবন শুরু হয়। মাধব রাও-এর সহায়তায় মোগল সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলম দিল্লী পুনরুদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি হায়দর আলিকে পরাভূত করিয়া মহীশূরের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম মাধব রাও হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে মারাঠা শক্তির বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল।

প্রথম মাধব রাও (১৭৬১-৭২ খ্রীঃ)

প্রথম মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা নারায়ণ রাও পেশওয়া হইলেন (১৭৭২-৭৩ খ্রীঃ)। নারায়ণ রাও পেশওয়া-পদ লাভ করার এক বৎসরের মধ্যে পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা কর্তৃক নিহত হইলেন। কিন্তু গৃহবিবাদের ফলে এক বৎসরের মধ্যে রাঘোবা পেশওয়া-পদ হারাইয়া ইংরেজদের নিকট সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। নারায়ণ রাও-এর পুত্র (দ্বিতীয়) মাধব রাও নারায়ণ পেশওয়া হইলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মাধব রাও নাবালক ছিলেন বলিয়া নানা ফড়নবীশ নামে জনৈক বিচক্ষণ রাজনীতিক ব্রাহ্মণকে

রাজ্যের যাবতীয় শাসনকার্যের ভার প্রদান করা হয়। দ্বিতীয় মাধব রাও-এর শাসনকালে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসানে রাঘোবাকে ভাতা দানের ব্যবস্থা করা হয় এবং ইঙ্গ-মারাঠাদের মধ্যে সল্‌বইয়ের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। অপরদিকে মহীশূরের হায়দর আলির পুত্র টিপু সুলতানের সহিত মারাঠাদের যুদ্ধ চলিতে থাকে। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে মারাঠাগণ মহীশূর রাজ্যের কিয়দংশ লাভ করে এবং নিজাম-উল্‌-মুল্‌ককে খর্‌দার যুদ্ধে (১৭৯৫ খ্রীঃ) পরাজিত করিয়া হায়দরাবাদের কিছু অংশ দখল করে।

(দ্বিতীয়) মাধব রাও নারায়ণ (১৭৭৪-৯৬ খ্রীঃ)

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে (দ্বিতীয়) মাধব রাও-এর মৃত্যু হইলে রঘুনাথ রাও-এর পুত্র দ্বিতীয় বাজী রাও পেশওয়া-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। সেই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে নানাপ্রকার গোলযোগ শুরু হয়। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফড়নবীশের ন্যায় সুদক্ষ শাসকের মৃত্যু হইলে মারাঠা ঐক্য বিনাশপ্রাপ্ত হয়। নিজাম সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার হৃত রাজ্যের কিয়দংশ মারাঠাদের দখল হইতে পুনরুদ্ধার করিয়া লইলেন। নিজেদের মধ্যে গৃহবিবাদ ও ইংরেজদের সহিত যুদ্ধে মারাঠাগণ ক্রমশ দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠাগণ পরাজিত হইলে পেশওয়াতন্ত্রের মর্যাদা ধূলায় লুণ্ঠিত হইল। ইহার পর হইতে পেশওয়া প্রকৃতপক্ষে ইংরেজদের বৃত্তিভোগী হইয়া পড়েন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজী রাও-এর মৃত্যু ঘটিলে পেশওয়াতন্ত্রের পতন ঘটে।

দ্বিতীয় বাজী রাও (১৭৯৬-১৮১৮ খ্রীঃ)

(ঘ) শিখদের অভ্যুত্থান (Rise of the Sikhs): পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ভারতে যে ধর্ম-সংস্কারের প্রবণতা দেখা দিয়াছিল সেই সময়ে গুরু নানক শিখ ধর্মের প্রবর্তন করিয়াছিলেন, একথা পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম শিখ ধর্ম নামে পরিচিত। তিনি যে ধর্ম সম্প্রদায়—অর্থাৎ শিখ সম্প্রদায়ের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন সেই শিখ সম্প্রদায় পরবর্তী ভারত-ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক

গুরু নানক অঙ্গদ নামে তাঁহারই এক শিষ্যকে পরবর্তী শিখগুরু হিসাবে মনোনীত করিয়া ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। গুরু অঙ্গদের পরবর্তী শিখগুরু ছিলেন অমরদাস। ইঁহারা তাঁহাদের চরিত্রের পবিত্রতা ও মাধুর্যে শিখদের গভীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। পরবর্তী—অর্থাৎ চতুর্থ শিখগুরু ছিলেন রামদাস। গুরু রামদাসের ধর্ম-প্রবণতা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণ সম্রাট্‌ আকবরের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিল। তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধার দান হিসাবে সম্রাট্‌ আকবর গুরু রামদাসকে অমৃতসরে একটি সরোবর-সহ একখণ্ড জমি দান করেন। এই জমির উপরই অমৃতসরের প্রসিদ্ধ শিখমন্দির বা গুরুদ্বার নির্মিত হয়। গুরু রামদাসের সময় হইতেই শিখগুরুর পদ বংশ-পরম্পরায় মনোনীত হইতে থাকে। পরবর্তী গুরু—অর্থাৎ শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুনমল ছিলেন এক অসাধারণ সংগঠন-ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁহার চেষ্টায় শিখ ধর্ম পাঞ্জাবের সর্বত্র বিস্তারলাভ করে এবং

দ্বিতীয় গুরু অঙ্গদ

তৃতীয় গুরু অমরদাস

চতুর্থ গুরু রামদাস

শিখদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। গুরু অর্জুনমল হিন্দু ও মুসলমান সাধুসন্তদের বাণী হইতে এবং বিশেষভাবে পূর্ববর্তী শিখগুরুদের বাণী হইতে শ্রেষ্ঠ অংশগুলি একত্র করিয়া 'আদিগ্রন্থ' নামে শিখদের মূল ধর্মগ্রন্থ সংকলন করেন। গুরু অর্জুনের সংগঠনী ক্ষমতা এবং ধর্মপরায়ণতার সুফল হিসাবে একদিকে যেমন শিখগুরুদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তেমনি শিখ ধর্মাধিষ্ঠানে স্বতঃপ্রবৃত্ত দানের ফলে ধর্মাধিষ্ঠানের সম্পত্তি ও ধনদৌলত প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গুরু অর্জুনের আমল হইতেই শিখ সম্প্রদায় নিছক ধর্ম-সম্প্রদায় না থাকিয়া রাজনীতি-ক্ষেত্রেও প্রবেশ করিতে শুরু করে। সম্রাট্ আকবর গুরু অর্জুনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন বটে, কিন্তু সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শাহজাদা খসরুকে প্রশ্রয় দিবার কারণে অর্জুন জাহাঙ্গীরের কোপানলে পতিত হন। জাহাঙ্গীর রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তাঁহাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেন। তদুপরি তাঁহার উপর এক বিরাট পরিমাণ অর্থদণ্ডও চাপানো হয়। এযাবৎ শিখ সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করে নাই। কিন্তু জাহাঙ্গীর কর্তৃক পঞ্চম গুরুর নৃশংস হত্যার পর শিখ সম্প্রদায় প্রকাশ্যভাবে মোগল সম্রাট্ ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল।

পঞ্চম গুরু অর্জুনমল

জাহাঙ্গীর কর্তৃক গুরু অর্জুনের হত্যা

শিখ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিতে প্রবেশ

গুরু অর্জুনের পুত্র গুরু হরগোবিন্দ ছিলেন দৃঢ়চেতা পুরুষ। তাঁহার সংগঠনী শক্তি, সামরিক দক্ষতা ও দুর্ধর্ষ নেতৃত্ব অল্পকালের মধ্যেই শিখ সম্প্রদায়কে এক সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করিল। পিতার উপর আরোপিত অর্থদণ্ড গুরু হরগোবিন্দ দিতে অস্বীকার করিলে কিছুকাল তাঁহাকে গোয়ালিওর দুর্গে বন্দিদশায় কাটাইতে হয়। ইহার পর হরগোবিন্দ সম্রাট্ শাহ্জাহানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া অমৃতসরের নিকট সংগ্রাম নামক স্থানে মোগল সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেন (১৬২৮ খ্রীঃ)। ইহার কিছুকাল পর তিনি কাশ্মীরের কিরাতপুর নামক স্থানে তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করেন। ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্বে তিনি পৌত্র হররায়কে গুরুপদে মনোনীত করিয়া যান। হররায় ও তাঁহার পুত্র হরকিশন—এই দুই গুরুর আমলে উল্লেখযোগ্য কোন কিছু ঘটে নাই। গুরু হরকিশনের মৃত্যুর পর কে গুরু হইবেন তাহা লইয়া এক বিবাদের সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত হরগোবিন্দের দ্বিতীয় পুত্র তেগ বাহাদুরকে শিখ সম্প্রদায় গুরু হিসাবে স্বীকার করিলে কিরাতপুরের অনতিদূরে আনন্দপুর নামক স্থানে তিনি তাঁহার কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন।

ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫ খ্রীঃ)

সপ্তম গুরু হররায় (১৬৪৫-৬১ খ্রীঃ)

অষ্টম গুরু হরকিশন (১৬৬১-৬৪ খ্রীঃ)

গুরু তেগ বাহাদুর: তেগ বাহাদুর ছিলেন বীর যোদ্ধা। তিনি কয়েক মাস পাটনায় ছিলেন। রাজা রাম সিংহ যখন আসাম আক্রমণ করেন (১৬৬৮ খ্রীঃ) সেই সময় তেগ বাহাদুর তাঁহার পক্ষে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন। তেগ বাহাদুর মোগল সম্রাট্ ঔরংজেবের অ-মুসলমান বিদ্বেষ, জিজিয়া কর স্থাপন এবং

কঠোর সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইলেন, এবং কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণকে এই সকল আদেশের বিরোধিতা করিতে উৎসাহিত করিলেন। ঔরংজেবের ন্যায় ঘোর সাম্রাজ্যবাদী এবং ধর্মান্ধ ব্যক্তির পক্ষে এই বিরোধিতা বরদাস্ত করিবার মনোবৃত্তি স্বভাবতই ছিল না। তিনি তেগ বাহাদুরকে গ্রেপ্তার করাইয়া দিল্লীতে আনাইলেন। দরবারে উপস্থিত সকলের সম্মুখে তেগ বাহাদুরকে হয় ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করিতে নতুবা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ করা হইল। তেগ বাহাদুর নিজ ধর্ম ত্যাগ করিয়া প্রাণ রক্ষা করিতেও চাহিলেন না, তিনি মৃত্যু বরণ করিয়াও স্বধর্ম রক্ষা করিবেন জানাইলেন। পাঁচ দিন পর তেগ বাহাদুরকে হত্যা করা হইল। মৃত্যুর পূর্বে তেগ বাহাদুর বলিয়াছিলেন 'শির দিয়া, সার না দিয়া'—অর্থাৎ মস্তক দিচ্ছি, কিন্তু ধর্ম দেই নাই। তেগ বাহাদুরের নির্ভীকতা ও ধর্মের জন্য জীবনাহুতি শিখ সম্প্রদায় তথা যাবতীয় অ-মুসলমানদের মনে তাঁহার প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, শিখদের মধ্যে মোগল সম্রাট্ ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে এক গভীর বিদ্বেষ ও প্রতিশোধ পরায়ণতার সৃষ্টি হয়। ফলে মোগলদের সহিত শিখ সম্প্রদায়ের প্রকাশ্য যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে।

নবম গুরু তেগ বাহাদুর

গুরু গোবিন্দ সিংহ: তেগ বাহাদুরের পুত্র গুরু গোবিন্দ ছিলেন শিখদের দশম এবং সর্বশেষ গুরু। তিনি অতি কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলায় আবদ্ধ করিয়া শিখ সম্প্রদায়কে এক অতিশয় সংগঠিত ও সুসংহত শক্তিতে পরিণত করেন। তিনি শিখদের মধ্যে 'পাহুল' (Pahul) প্রথার—অর্থাৎ 'অভিসিঞ্চন' (baptism) প্রথার প্রচলন করেন। যে-সকল শিখ এইভাবে অভিসিঞ্চিত হইলেন তাঁহাদের নাম হইল 'খাল্‌সা'—অর্থাৎ পবিত্র। এই সকল 'পবিত্র' শিখদের পদবী সেই সময় হইতে দেওয়া হইল সিং (সিংহ)। ইহা ভিন্ন, এই সকল অভিসিঞ্চিত শিখকে পঞ্চ 'ক'—অর্থাৎ কেশ (লম্বা চুল), কৃপাণ (তরবারি), কচ্ছ (ছোট জাঙ্গিয়া), কঙ্গা (চিরুণী), কড়া (ইস্পাতের বালা)—এই পাঁচটি সর্বদা ধারণ করিতে হইত। গুরু গোবিন্দ সিংহ শিখ সম্প্রদায়কে এক সামরিক সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত করেন। যুদ্ধের জন্য তাহাদিগকে প্রস্তুত করিবার পশ্চাতে মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণ করাই ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। গুরু গোবিন্দ যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন—অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করা শিখদের জন্য নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। গুরু গোবিন্দ সিংহ কাশ্মীরের পাহাড়ী অঞ্চলের রাজগণ ও মোগল বাহিনীর সহিত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। ঔরংজেব এই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও দুর্ধর্ষ শিখ নেতাকে তথা শিখদিগকে দমন করিতে সমর্থ হন নাই। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইয়া বিরোধ দেখা দিলে গুরু গোবিন্দ সিংহ বাহাদুর শাহ্‌কে সমর্থন করিয়াছিলেন। বাহাদুর শাহের সহিত দাক্ষিণাত্যে তিনি গিয়াছিলেন, সেই সময়ে গোদাবরী নদীর তীরে জনৈক আফগান আততায়ীর হস্তে তিনি প্রাণ হারান (১৭০৮ খ্রীঃ)।

দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ

গুরু গোবিন্দ সিংহের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। ফলে তাঁহার মৃত্যুর পরই শিখ গুরুদের ক্রমিক ধারার অবসান ঘটে। শিখদের ধর্মনৈতিক সর্বোচ্চ অধিকার গুরুর স্থলে 'গ্রন্থসাহেব'—অর্থাৎ শিখদের ধর্মগ্রন্থে ন্যস্ত হয়। কিন্তু গুরু গোবিন্দ সিংহের অনুচর বান্দা শিখদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ইনি দেখিতে অনেকটা গুরু গোবিন্দ সিংহের ন্যায়ই ছিলেন। বান্দা চল্লিশ হাজার শিখ সৈন্যের এক বাহিনী সংগঠন করিয়া শিরহিন্দ নামক স্থানের ফৌজদার ওয়াজির খাঁকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া সেই শহর দখল করেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ওয়াজির খাঁ-ই গুরু গোবিন্দের সন্তানগণকে হত্যা করিয়াছিলেন। ইহার পর যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল বান্দা নিজ অধিকারে আনেন এবং নাহন ও শধরা নামক স্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চলে লোহগড় নামে একটি সুরক্ষিত দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি স্বাধীন রাজার মর্যাদা সহকারে নিজ নামে মুদ্রা চালু করেন। সম্রাট্ বাহাদুর শাহ্ লোহগড় আক্রমণ করিলে বান্দা পলাইয়া গিয়া লাহোরের নিকট পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এবং ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বাহাদুর শাহের মৃত্যু হইলে তিনি শধরা, লোহগড় দখল করেন এবং শিরহিন্দ লুণ্ঠন করেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর দুর্গে তাঁহাকে অবরোধ করা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি ও তাঁহার কয়েকজন অনুচর মোগল সেনার হস্তে বন্দী হন। তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে দিল্লীতে সম্রাট্ ফারুকশিয়ারের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে সম্রাটের আদেশে বান্দার পুত্রকে বান্দার সম্মুখে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয় এবং বান্দাকে হাতীর পায়ের নিচে ফেলিয়া হত্যা করা হয়। এই সময় শিখদের শক্তি অত্যধিক হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু গুরু নানক ও গুরু গোবিন্দের আদর্শে সংগঠিত শিখ শক্তি নিঃশেষ হইবার ছিল না। কাপুর সিংহ নামক অপর এক নেতার অধীনে শিখজাতি পুনরায় সংগঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ কালে পাঞ্জাবে যে রাজনৈতিক অব্যবস্থা দেখা দিয়াছিল, সেই সুযোগে শিখগণ সামরিক ও আর্থিক শক্তি সঞ্চয় করিল। দালেওয়াল নামক স্থানে তাহারা একটি দুর্গ নির্মাণ করে। এই দুর্গ হইতে তাহারা লাহোরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুঠতরাজ করিতে থাকে। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর রাজনৈতিক অব্যবস্থা শিখদের সুযোগ আরও বৃদ্ধি করে এবং আহম্মদ শাহ্ আবদালী যখন ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে থাকেন (১৭৬৭ খ্রীঃ) সেই সময়ে তাহারা তাঁহাকে নানাভাবে আক্রমণ করে।



গুরু গোবিন্দ সিংহ

বান্দা

বান্দার নৃশংস হত্যা : শিখ শক্তি হ্রাস

শিখ শক্তি পুনর্গঠিত

পাঞ্জাব ও নিকটবর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল শিখ অধিকারভুক্ত

ক্রমে পাঞ্জাবে আহ্‌মদ শাহ্‌ আবদালী অধিকৃত যাবতীয় স্থান অধিকার করিয়া লয়। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিখগণ পূর্বে শাহরাণপুর হইতে পশ্চিমে এটক এবং দক্ষিণে মুলতান হইতে উত্তরে কাংড়া ও যমুনা পর্যন্ত নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লয়।

এইভাবে শিখগণ এক স্বাধীন রাজ্যাংশ নিজেদের মধ্যে বারটি ভাগে ভাগ করিয়া এক ধর্মাশ্রয়ী সামন্ত রাজ্যসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করে। এই এক-একটি ভাগ 'মিস্‌ল' (Misl) নামে অভিহিত হইত। প্রথমে মোগল শত্রুর বিরুদ্ধে যুঝিবার প্রয়োজনে এই বারটি মিস্‌লের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য ছিল, কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার হেতু মোগল শক্তির পতনের ফলে শিখ মিস্‌লগুলি বহিরাগত শত্রুর ভয় হইতে রক্ষা পাইয়াছে মনে করিয়া নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক কলহে প্রবৃত্ত হইল। এই সকল মিস্‌ল একে অপরের অংশ অধিকার করিতে শুরু করিলে ক্রমে শিখগণের অধিকাংশ এক ঐক্যবদ্ধ রাজ্যে সংগঠিত হইল। এই রাজনৈতিক ঐক্যসাধন করিয়াছিলেন রঞ্জিৎ সিংহ।

ধর্মাশ্রয়ী সামন্ত রাজ্যসঙ্ঘ

রঞ্জিৎ সিংহ, ১৭৮০-১৮৩৯ খ্রীঃ (Ranjit Singh): রঞ্জিৎ সিংহ ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের সুকারচুকিয়া নামক মিস্‌ল—অর্থাৎ একটি ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল মহা সিংহ। দশ বৎসর বয়সে পিতার মৃত্যু ঘটিলে (১৭৯০ খ্রীঃ) তিনি সুকারচুকিয়া মিস্‌লের নেতা হন। এত অল্প বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া অসাধারণ কৃতিত্ব সহকারে শাসনকার্য পরিচালনা করা এবং বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত শিখ সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করা একমাত্র অনন্যসাধারণ দূরদর্শিতাসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব ছিল। এ-বিষয়ে ভারত-ইতিহাসে সম্রাট্‌ আকবরের সহিত রঞ্জিৎ সিংহের তুলনা করা যাইতে পারে। কাবুলের অধিপতি জামান শাহ্‌ যখন ভারত আক্রমণ করেন সেই সময়ে রঞ্জিৎ সিংহ তাঁহার সেনা-বাহিনীকে বার বার আক্রমণ করিয়া এমন ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন যে জামান শাহ্‌ রঞ্জিৎ সিংহকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহার সহিত এক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ইহার পর রঞ্জিৎ সিংহ জামান শাহ্‌কে নানাভাবে সাহায্য দান করিলে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে জামান শাহ্‌ যখন ভারত ত্যাগ করিয়া যান তখন তিনি রঞ্জিৎ সিংহকে লাহোরের শাসনকর্তা পদে নিয়োগ করিয়া তাঁহাকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই সময় হইতেই রঞ্জিৎ সিংহ সামরিক নেতা এবং দূরদর্শী রাজনীতিক হিসাবে অসাধারণ সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। তিনি পাঞ্জাবে আফগান আধিপত্যের অবসান ঘটাইয়া শিখ জাতীয়

প্রথম জীবন



রঞ্জিৎ সিংহ

রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অব্যবস্থাই রঞ্জিৎ সিংহের সাফল্যের সুযোগ দান করিয়াছিল।

নিজ শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির পর মীরওয়াল ও নারওয়াল নামক স্থান দুইটি অধিকার করিয়া রঞ্জিৎ সিংহ জম্মুর দিকে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। জম্মুর রাজা রঞ্জিৎ সিংহের বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দান করিলেন। ইহার পর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসর দখল করিয়া রঞ্জিৎ সিংহ নিজ ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি করিলেন। ঐ বৎসরই হোলকার ইংরেজ সেনাপতি লর্ড লেক্ (Lord Lake) কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু দূরদর্শী রঞ্জিৎ সিংহ হোলকারকে সাহায্য করা দূরে থাকুক ইংরেজদের সহিত মিত্রতা বজায় রাখিয়া ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের চুক্তি দ্বারা হোলকারকে পাঞ্জাব হইতে বিতাড়িত করিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ সমগ্র শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করিবার আশা পোষণ করিতেন। সেই উদ্দেশ্যে শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরের যাবতীয় শিখ মিস্‌ল দখল করিয়া উহার পূর্ব-তীরস্থ মিস্‌ল দখল করিবার জন্য তিনি অগ্রসর হইলে সেই অঞ্চলের কয়েকটি মিস্‌লের নেতা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার ব্যাপারে রঞ্জিৎ সিংহের সাহায্য প্রয়োজন হইবে, একথা বিবেচনা করিয়া ইংরেজগণ তাঁহার সহিত মিত্রতা বজায় রাখিবার নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিল। লর্ড মিণ্টো চার্লস্ মেট্‌কাফকে রঞ্জিৎ সিংহের সহিত আপোস-মীমাংসার জন্য প্রেরণ করিলেন। ফলে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরের সন্ধি দ্বারা রঞ্জিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরস্থ শিখ মিস্‌লগুলি আক্রমণ করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

অমৃতসর দখল

অমৃতসরের সন্ধি

অতঃপর কাশ্মীর, মুলতান, কোহাট, বান্নু, দেরা ইস্‌মাইল খাঁ, পেশোয়ার প্রভৃতি স্থান জয় করিয়া খাইবার গিরিপথ ও সিন্ধুদেশ পর্যন্ত রঞ্জিৎ সিংহ তাঁহার রাজ্যের সীমা বিস্তার করিলেন।

রাজ্যবিস্তার

রঞ্জিৎ সিংহ কেবল রণনিপুণ সেনাপতিই ছিলেন না, শাসনকার্যে তিনি অত্যধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সংগঠনী শক্তিও ছিল অপরিসীম। তিনি আধুনিক যুদ্ধপদ্ধতিতে নিজ সেনাবাহিনীকে শিক্ষিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। নিজ বাহিনীর সামরিক শিক্ষার সুবিধার জন্য নেপোলিয়নের সেনাবাহিনীতে কাজ করিয়াছিলেন এইরূপ দুইজন অভিজ্ঞ সামরিক কর্মচারীকে তিনি নিযুক্ত করেন। রঞ্জিৎ সিংহ স্বৈরাচারী শাসনপদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। প্রচলিত রীতিনীতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন।

সংগঠনমূলক কার্যাদি

ইংরেজদের সহিত রঞ্জিৎ সিংহ সৌহার্দ্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলেন। শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরে এবং সিন্ধুদেশে রাজ্যবিস্তার করিতে গেলে ইংরেজগণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি মিত্রতা তাহারা সর্বদাই রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। দোস্ত মহম্মদের সহিত মিত্রতা স্থাপনের 'বিনিময়েও ইংরেজগণ রঞ্জিৎ সিংহকে

কোনভাবে বিরক্ত করিতে চাহে নাই। পারস্য ও রাশিয়ার যুগ্ম অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য আফগানিস্তানের সহিত ইংরেজদের মিত্রতা স্থাপন করা প্রয়োজন ছিল। দোস্ত মহম্মদও এইরূপ মিত্রতা চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এই মিত্রতার শর্ত হিসাবে রঞ্জিৎ সিংহ-অধিকৃত পেশোয়ার দাবি করিলে, ইংরেজ সরকার সেই শর্ত মানিয়া লইতে রাজী হয় নাই।

ইংরেজদের সহিত মিত্রতা

রঞ্জিৎ সিংহ বীর যোদ্ধা, দূরদর্শী রাজনীতিক এবং গভীর দেশপ্রেমিক ছিলেন। শিখ জাতিকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া এক বৃহৎ শক্তিশালী জাতি হিসাবে গঠন করিয়া তোলাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। শতদ্রু নদীর পূর্ব-তীরের শিখগণকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করিতে না পারিলেও পশ্চিম-তীরস্থ যাবতীয় শিখ মিস্‌লকে এক ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। অতি অল্পবয়সে সুকারচুকিয়া মিস্‌লের শাসনভার গ্রহণ করিয়া একমাত্র নিজ প্রতিভাবলে এবং সামরিক কৌশল ও জাতীয়তাবোধ দ্বারা তিনি নিজেকে এক বিশাল ও শক্তিশালী রাজ্যের নেতৃত্বে স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শাসক হিসাবেও তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। চার্লস্ মেট্‌কাফ প্রমুখ ইংরেজ এবং বহু বিদেশী পর্যটক রঞ্জিৎ সিংহের শাসনব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। ফরাসী পর্যটক জ্যাকেমো তাঁহাকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' আখ্যা দিয়াছিলেন। রঞ্জিৎ সিংহ লেখাপড়া জানিতেন না বটে কিন্তু তাঁহার স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। শাসনকার্যে দয়া, ন্যায় ও সততার নীতি অনুসরণ করিয়া এবং ধর্ম বিষয়ে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করিয়া তিনি তাঁহার মানসিক উৎকর্ষের পরিচয় দান করিয়াছিলেন।

রঞ্জিৎ সিংহের কৃতিত্ব

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র খড়ক সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি পিতার ন্যায় ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন না। যাহা হউক, সিংহাসনলাভের এক বৎসর পরেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে শিখ রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। এদিকে তাঁহার মৃত্যুর পরদিনই তাঁহার পুত্র নৌনিহাল সিংহ এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলে খড়ক সিংহের অপর পুত্র শের সিংহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনিও আততায়ীর আক্রমণে প্রাণ হারাইলে (১৮৪৩ খ্রীঃ) শিখ রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমেই দুর্বল হইতে দুর্বলতর হইয়া পড়িল। এমতাবস্থায় শিখ সেনাবাহিনী 'খাল্‌সা' শাসনক্ষমতা হস্তগত করিল। রঞ্জিৎ সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া এবং রাণীমাতা ঝিন্দনকে নামমাত্র অভিভাবিকা নিযুক্ত করিয়া লাল সিংহ ও তেজ সিংহ নামক দুইজন সামরিক নেতা দেশের শাসনকার্য চালাইতে লাগিলেন।

খড়ক সিংহ

পরবর্তী রাজগণ

খাল্‌সার প্রাধান্য—দলীপ সিংহ

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুকালে শিখ শক্তি উন্নতির চরমে পৌঁছিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তী কালে শিখ শক্তির পতন যেমন ছিল আকস্মিক তেমনি ছিল দ্রুত। জেনারেল গর্ডনের ভাষায়—রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর শিখ শক্তি যেন এক বিস্ফোরণের পর যেরূপ অগ্নিশিখা লেলিহান রূপ

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু—শিখ শক্তির দ্রুত পতন

ধারণ করে এবং অল্পকালের মধ্যে স্তিমিত হইয়া পড়ে সেরূপ স্তিমিত এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাপিত হইয়া গিয়াছিল।

শিখ রাজ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তি

রঞ্জিৎ সিংহের পরবর্তী কালে শিখ শক্তি : রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যু শিখ রাজ্যে বিভেদ ও বিভ্রান্তির সূচনা করিয়াছিল। দীর্ঘকাল এরূপ পরিস্থিতি চালু থাকিবার ফলে স্বভাবতই শিখ শক্তির চরম দুর্বলতা দেখা দিল এবং অবশেষে ইংরেজদের অধীনতাপাশে শিখ জাতিকে আবন্ধ হইতে হইল।

নাবালক দলীপ সিংহের সিংহাসন লাভ—রাণীমাতা ঝিন্দনের অভিভাবকত্ব

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর পর একের পর এক করিয়া বহু উত্তরাধিকারী সাময়িকভাবে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং পদচ্যুত হইলেন। অবশেষে, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রঞ্জিৎ সিংহের নাবালক পুত্র দলীপ সিংহকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়া রাণীমাতা ঝিন্দনকে অভিভাবিকা নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু প্রকৃত শাসনক্ষমতা রহিল তেজ সিংহ ও লাল সিংহ নামক দুইজন সামরিক নেতার উপর।

খাল্‌সার শাসনক্ষমতা অধিকার

আভ্যন্তরীণ শাসনের দুর্বলতার সুযোগ লইয়াই 'খাল্‌সা'—অর্থাৎ শিখ সেনাবাহিনী ক্ষমতা হস্তগত করিয়া লইয়াছিল। রাণীমাতা ঝিন্দনের পক্ষে সেনাশক্তিকে স্ববশে রাখা সম্ভব হয় নাই। ফলে সামরিক বাহিনীর অধিকর্তাগণই দেশের শাসনব্যবস্থায় এক স্বৈরশক্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন।

রাণী ঝিন্দনের কূটচাল

ব্রিটিশ আগ্রাসী নীতি

রাণীমাতা ঝিন্দন সামরিক বাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তিকে পরোক্ষভাবে দমন করিতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি তাহাদিগকে ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত করিয়া ব্রিটিশ শক্তির হস্তে পরাজিত হইলে বা অন্তত ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুঝিবার ফলে দুর্বল হইলে তাহাদের উপর নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের কথা ভাবিলেন। এইভাবে সুদক্ষ শিখ সৈনিকগণ কোন নির্দিষ্ট বা উচ্চ আশা দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইয়া কেবল রাণীমাতা ঝিন্দনের কূটচালের ফলে ব্রিটিশ বাহিনীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। ব্রিটিশ শক্তির প্রসার-নীতিও শিখদের যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, যদিও রাণীমাতা ঝিন্দনের গোপন উদ্দেশ্য ছিল শিখ সামরিক শক্তিকে দুর্বল করা। মুদ্‌কী, ফিরোজশাহ্‌, আলীওয়াল্‌ এবং সর্বশেষে সোব্রাঁওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ব্রিটিশ ও শিখ শক্তির দ্বন্দ্বে শিখ শক্তির পতন ঘটিল। ব্রিটিশ শক্তির সর্বাপেক্ষা বিরোধী শক্তির পতনে ভারতে ব্রিটিশ অধিকার নিরংকুশ হইয়া উঠিল।

ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ

শিখ শক্তির পরাজয়

পাঞ্জাবে ব্রিটিশ প্রাধান্য

ব্রিটিশরা দলীপ সিংহকে পাঞ্জাবের মহারাজা এবং রাণীমাতা ঝিন্দনকে তাঁহার অভিভাবিকা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইল এবং লাহোরে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন ও একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিয়োগ করিল। লাহোরকে ক্ষুদ্রায়তন করিবার উদ্দেশ্যে কাশ্মীর রাজ্যটি গোলাব সিংহের নিকট

বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইল। গোলাব সিংহ ছিলেন লাহোর দরবারের অধীনে জনৈক সর্দার।

শিখদের অন্তরে স্বাধীনতা-স্পৃহা তখনও নির্বাপিত হয় নাই। ব্রিটিশদের সহিত যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় প্রধানত সেনাবাহিনীর নেতৃবর্গের জন্যই ঘটিয়াছিল, একথা তাহাদের অন্তরে পীড়ার কারণ হইয়া দাঁড়াইল। সেই সময়ে রাণীমাতা ঝিন্দনকে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে লাহোর হইতে অপসরণে বাধ্য করায় শিখদের মধ্যে ব্রিটিশ বিদ্বেষ আরও বৃদ্ধি পাইল। পাঞ্জাবে এক শিখ বিদ্রোহ প্রায় ঘটিতে চলিল।

শিখদের স্বাধীনতা-স্পৃহা

ঠিক সেই সময়ে মুলতানের গভর্ণর দেওয়ান মুলরাজকে রাজস্ব আদায়ের হিসাব দিতে বলা হইলে তিনি অপমানজনক বিবেচনা করিয়া পদত্যাগ করিলেন। তাঁহার স্থলে সর্দার খাঁ সিংহকে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারী তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া মুলতানে উপস্থিত হইলে উভয় ব্রিটিশ কর্মচারীকেই হত্যা করা হইল। মুলরাজকে এজন্য দায়ী করা হইলে মুলতানে এক ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিল। ক্রমে এই বিদ্রোহ এক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে রূপান্তরিত হইলে ব্রিটিশ সরকার (লর্ড ডালহৌসী) শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে বহুসংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্যের বিনিময়েও জয়-পরাজয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মুলতানের যুদ্ধে অবশ্য ব্রিটিশ পক্ষ জয়ী হইল। অনুরূপ গুজরাটের যুদ্ধে পুনরায় ব্রিটিশ সৈন্য জয়লাভ করিল। চরম বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করিয়াও শিখগণ ব্রিটিশ শক্তির সহিত যুঝিতে সমর্থ হইল না। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে মার্চ লর্ড ডালহৌসী এক ঘোষণা দ্বারা পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করিলেন। এইভাবে স্বাধীন শিখ শক্তির পরাজয় ও পতন ঘটিল।

মুলরাজের সহিত বিরোধ

মুলতানের বিদ্রোহ—জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তর

চিলিয়ানওয়ালা, মুলতান ও গুজরাটের যুদ্ধ

পাঞ্জাব ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত

দ্বাদশ অধ্যায়

ইওরোপীয়দের ভারতে আগমন

(Advent of the Europeans)

পোর্তুগীজগণ (The Portuguese) : ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো-ডা-গামা নামে একজন পোর্তুগীজ দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছিলে অল্পকালের মধ্যেই পোর্তুগীজ বণিকগণ ভারতে বাণিজ্য করিবার উদ্দেশ্যে কালিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা কোচিন ও ক্যানানোর—এই দুই স্থানে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে। ইহার পর আল্‌-ফোন্‌সো আল্‌বুকার্ক পোর্তুগীজ বাণিজ্য-কুঠিগুলির গভর্ণর হইয়া আসিলে পোর্তুগীজগণ ভারতে অধিকার বিস্তারে মনোনিবেশ করিল। ক্রমে তাহারা গোয়া, দমন, দিউ, সল্‌সেট্‌, ব্যাসিন, বোম্বাই, চৌহ্‌ল, সান্‌ টোম্‌ ও বাংলাদেশের হুগলীতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করিতে সমর্থ হইল। পরবর্তী কালে তাহাদের ঔদ্ধত্য ও অত্যাচারের উপযুক্ত শাস্তি হিসাবে হুগলী হইতে তাহাদিগকে সম্রাট্‌ শাহ্‌জাহানের আদেশে বিতাড়িত করা হইয়াছিল। পরে সেখানে ফিরিয়া আসিবার অনুমতি তাহারা পাইয়াছিল বটে, কিন্তু তখন হুগলীতে পোর্তুগীজদের বাণিজ্যের সুযোগ লোপ পাইয়াছিল। স্থানীয় অধিবাসীদিগকে বলপূর্বক খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা এবং বাণিজ্যের নামে ক্রীতদাস বিক্রয় প্রভৃতি নানাপ্রকার দুর্নীতিমূলক কার্যের ফলে ভারতে পোর্তুগীজ প্রাধান্য বিস্তারের কোন সুযোগ ঘটে নাই। তাহারা সামান্য কয়েকটি স্থানে বাণিজ্য চালাইতে থাকে।

ভাস্কো-ডা-গামা

দক্ষিণ-ভারতে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন

পোর্তুগীজদের দুর্নীতিমূলক কার্যাদি



ভাস্কো-ডা-গামা

ওলন্দাজগণ (The Dutch) : পোর্তুগীজদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া হল্যাণ্ডের—অর্থাৎ ওলন্দাজ বণিকগণ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমেই পোর্তুগীজদের সহিত বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ শুরু করিল। গুজরাট, করমণ্ডল উপকূল, বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা অঞ্চলে বাণিজ্যকুঠি তাহারা স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেও শেষ পর্যন্ত যবদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি অঞ্চলেই নিজেদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক কেন্দ্র গড়িয়া তোলে। ভারতবর্ষে অন্যান্য ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় তাহারা টিকিতে পারে নাই।

অসাফল্য

ফরাসী বণিকগণ (The French Traders): ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ফরাসী বণিকগণ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের প্রাথমিক চেষ্টা কিছুকাল পরেই স্থগিত থাকে। তারপর ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই-এর অর্থ মন্ত্রী কলবেয়ার (Colbert) ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া ভারতের সহিত বাণিজ্য শুরু করিবার ব্যবস্থা করেন। সুরাটে সর্বপ্রথম ফরাসী বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হয়। ক্রমে মসুলিপত্তম্, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর, কারিকল, মাহে প্রভৃতি অঞ্চলে ফরাসী বাণিজ্যকুঠি গড়িয়া উঠে।

ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

ইংরেজ বণিকগণ (The English Traders): ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায়ও ভারতে কুঠি স্থাপনে পশ্চাৎপদ ছিল না। পোর্তুগীজ বণিকদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হইয়া ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী (প্রথম) এলিজাবেথের সনন্দ লাভ করিয়া ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন হকিন্স ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র লইয়া মোগল সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের দরবারে ইংরেজদের স্বার্থে বাণিজ্য-সুযোগ প্রার্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন। কিন্তু সেই দৌত্য সাফল্যলাভ করিল না। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্যার্ টমাস্ রো প্রথম জেমসের সুপারিশপত্র-সহ আসিলে পর ইংরেজ বণিকসম্প্রদায় কতক কতক বাণিজ্য-সুযোগ লাভে সমর্থ হইল। সুরাট, আগ্রা, ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (অধুনা মাদ্রাজ), হরিহরপুর, হুগলী, পাটনা, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে একে একে বহু বাণিজ্যকুঠি স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লস্ বিবাহসূত্রে পোর্তুগাল হইতে বোম্বাই শহরটি লাভ করিয়াছিলেন। পরে তিনি ইহা ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। ফলে বোম্বাই শহরেও ইংরেজ বণিকদের কার্যকলাপ প্রসারিত হয়। এইভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশে ইংরেজের অনেক বাণিজ্য-কুঠি স্থাপিত হয়। ঔরংজেবের রাজত্বকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বলপ্রয়োগ দ্বারা ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টা করিলে ঔরংজেবের সহিত ইংরেজ বণিকদের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। পরে ইংরেজগণ ঔরংজেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে তাহারা পুনরায় বাণিজ্য করিবার সুযোগ লাভ করে। বাংলাদেশে ইংরেজ বণিকগণ বাণিজ্য-শুল্ক ও জিজিয়া কর দিয়া বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইয়াছিল। কিন্তু স্থানীয় মোগল কর্মচারিগণ বণিকদের নিকট হইতে আরও নানাপ্রকার কর ও শুল্ক আদায় করিত। ইংরেজগণ ইহার বিরোধিতা করিলে বাংলাদেশেও ইংরেজ ও মোগলদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ফলে ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশ হইতে ইংরেজগণ চলিয়া যাইতে বাধ্য হইল। কিন্তু জব্ চার্ণক নামে জনৈক ইংরেজ বণিক মোগল সম্রাটের বিশেষ অনুমতি লইয়া বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সুতানুটি গ্রামে (বর্তমান শোভাবাজার এলাকায়) আসিয়া তাঁহার জাহাজ ভিড়াইলেন। কিন্তু ইহার

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

ইংরেজগণ কর্তৃক বাণিজ্য-সুযোগ লাভ ও কুঠি স্থাপন

ইঙ্গ-মোগল সংঘর্ষ

অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজগণ চট্টগ্রাম আক্রমণ করিলে ঔরংজেবের সহিত তাহাদের যুদ্ধ বাধে। সেই সময়ে জব্ চার্ণক বাধ্য হইয়া বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া গেলেন। কিন্তু ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত ঔরংজেবের বিবাদ মিটিয়া গেলে তিনি পুনরায় বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। ঐ বৎসরই তিনি কলিকাতা মহানগরীর পত্তন করেন (১৬৯০ খ্রীঃ)। সেই সময়ে মোগল সম্রাটের আদেশে বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁ ইংরেজ-বণিকদিগকে বৎসরে তিন হাজার টাকার পরিবর্তে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার সুযোগ দিয়াছিলেন (১৬৯১ খ্রীঃ)। পরে ইংরেজগণ সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কালীঘাট এই তিনটি গ্রামের জমিদারি গ্রহণ করিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাইতে থাকে।

জব্ চার্ণক

কলিকাতা মহানগরীর পত্তন (১৬৯০ খ্রীঃ)

১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে এক স্থানীয় বিদ্রোহ দেখা দিলে ইংরেজগণ তাহাদের কলিকাতা কুঠির নিরাপত্তার জন্য একটি দুর্গ নির্মাণের অনুমতি পাইয়াছিল। ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গটি সেই সময়ে (১৭০০ খ্রীঃ) নির্মিত হয়। ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়ামের নামানুকরণে এই দুর্গের নাম রাখা হইয়াছিল 'ফোর্ট উইলিয়াম'। দুর্গটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিতে দীর্ঘকাল লাগিয়াছিল। ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে উহা সম্পূর্ণ হয়। পর বৎসর, ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক 'ফরমান' দ্বারা সম্রাট্ ফারুকশিয়ার কোম্পানিকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিবার এবং বাংলা সুবায় জমি ক্রয় করিবার অধিকার দিয়াছিলেন। এজন্য কোম্পানি বৎসরে ১০ হাজার পাউণ্ড সম্রাট্‌কে দিতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

ফোর্ট উইলিয়ামের পত্তন

ফারুকশিয়ারের ফরমান (১৭১৭ খ্রীঃ)

পোর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি বণিক ভিন্ন দিনেমার, অস্ট্রিয়ান (অস্ট্রিয়ার), সুইডিস্ (অর্থাৎ, সুইডেন দেশের) বণিকগণও এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। কিন্তু তাহারা এদেশে বাণিজ্যে সাফল্যলাভ করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত এদেশ ত্যাগ করিয়া যায়।

অপরাপর ইওরোপীয় বণিকসম্প্রদায়

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব (Anglo-French Rivalry): অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে প্রকাশ্য যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধ কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ নামে পরিচিত। ইওরোপীয়গণ করমণ্ডল উপকূলের নামকরণ করিয়াছিল কর্ণাট। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত যুদ্ধের সূত্রে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স পরস্পর-বিরোধী হিসাবে এই যুদ্ধে যোগদান করে। ইওরোপের এই যুদ্ধের জের টানিয়া ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের মধ্যে যুদ্ধের সৃষ্টি হয়। দাক্ষিণাত্যে সেই সময়ে ফোর্ট সেণ্ট জর্জ (অধুনা মাদ্রাজ) ছিল ইংরেজ বণিকদের প্রধান এবং সামরিকভাবে সুরক্ষিত বাণিজ্য-কেন্দ্র। আর ফরাসীদের ছিল পণ্ডিচেরী। ইওরোপে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের প্রশ্ন ছাড়া সেই সময়কার দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় রাজগণের দুর্বলতাও ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দক্ষিণ-ভারতীয় রাজনীতিতে ইংরেজ ও ফরাসী বণিকদের অংশগ্রহণ

দাক্ষিণাত্যের স্থানীয় রাজাগণ তাঁহাদের পারস্পারিক বিবাদে ইংরেজ ও ফরাসীদের সামরিক সাহায্য গ্রহণে উদ্‌গ্রীব ছিলেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করিয়া ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ বিবদমান দক্ষিণ-ভারতীয় রাজগণকে সাহায্য-সহায়তা দান করিতে লাগিল। এইভাবে ক্রমে তথাকার রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে ইঙ্গ-ফরাসী বণিকদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটের নবাব দোস্ত আলি মারাঠাদের হস্তে নিহত হইলে কর্ণাটের সিংহাসন লইয়া এক জটিল দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। কর্ণাট ছিল হায়দরাবাদের নিজামের অধীন। নিজাম আনোয়ার-উদ্দিনকে নূতন নবাব নিযুক্ত করিয়াছিলেন, কিন্তু দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব কর্ণাটের নবাব-পদ দাবি করিলেন। এই সূত্রে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল তাহাতে ইংরেজ ও ফরাসীগণ বিবদমান দুই পক্ষের সাহায্যে আসিয়া দাঁড়াইল। ফলে কর্ণাটের উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বে রূপান্তরিত হইল। এই যুদ্ধ কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ (১৭৪৬-৪৮ খ্রীঃ) নামে পরিচিত। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে এই-লা-স্যাপ্‌লের সন্ধিতে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিলে ভারতেও দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইল। পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল।

কর্ণাটের প্রথম যুদ্ধ (১৭৪৬-৪৮ খ্রীঃ)

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে হায়দরাবাদের নিজাম আসফ্‌জা নিজাম-উল্‌-মুল্‌কের মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র নাসির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজফ্‌ফর জঙ্গ নিজাম-পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করিলেন। সেই সঙ্গে দোস্ত আলির জামাতা চাঁদা সাহেব আনোয়ার-উদ্দিনকে বিতাড়িত করিয়া কর্ণাটের নবাব-পদ লাভের চেষ্টা শুরু করিলেন। নাসির জঙ্গ ও আনোয়ার-উদ্দিন রহিলেন একপক্ষে, অপরপক্ষে রহিলেন চাঁদা সাহেব ও মুজফ্‌ফর জঙ্গ। দুপ্লে এই অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ফরাসী শক্তি ও সাম্রাজ্য-সীমা বাড়াইতে সচেষ্ট হইলেন। তিনি চাঁদা সাহেব ও মুজফ্‌ফর জঙ্গের পক্ষে যোগদান করিলেন। আর ইংরেজগণ যোগ দিল আনোয়ার-উদ্দিন ও নাসির জঙ্গের পক্ষে। কর্ণাটের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে ইংরেজ ও ফরাসীগণ সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ইংরেজ সেনাপতি মেজর ল্যরেন্সের তৎপরতায় মুজফ্‌ফর জঙ্গ নাসির জঙ্গের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন, আর চাঁদা সাহেব পরাজিত হইয়া ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র পণ্ডি-চেরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

হায়দরাবাদ ও কর্ণাটের উত্তরাধিকারসংক্রান্ত দ্বন্দ্ব : কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৭৫১-৫৪ খ্রীঃ)



যোসেফ দুপ্লে

ফরাসী প্রাধান্য

দুপ্লের সাহস, সমরকুশলতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ফলে পুনরায় মুজফ্‌ফর জঙ্গ ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ জয়যুক্ত হইল। চাঁদা সাহেব কর্ণাটের রাজধানী আর্কটে

নবাবপদে স্থাপিত হইলেন। স্বভাবতই এই অঞ্চলে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তি অপ্রতিহত হইয়া উঠিল। ইতিমধ্যে দুপ্লের ইঙ্গিতে নাসির জঙ্গ জনৈক আততায়ী কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ফলে মুজফ্‌ফর জঙ্গ বন্দিদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া হায়দরাবাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

মহম্মদ আলি কর্তৃক সন্ধির প্রস্তাব

আনোয়ার-উদ্দিনের পুত্র মহম্মদ আলি তখনও ত্রিচিনপল্লীতে রহিয়াছেন। তিনি চাঁদা সাহেবের নিকট প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন যে, তাঁহার পিতা আনোয়ার-উদ্দিনের ব্যক্তিগত সম্পত্তি এবং দাক্ষিণাত্যের এক ক্ষুদ্র অংশ তাঁহাকে দেওয়া হইলে তিনি চাঁদা সাহেবকে কর্ণাটের নবাব বলিয়া মানিয়া লইবেন। কিন্তু ফরাসী সাহায্য-পুষ্ট চাঁদা সাহেব তখন এই শর্তে সন্ধি করিতে রাজী হইলেন না। ফলে যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটিল না।

রবার্ট ক্লাইভ—ইংরেজ পক্ষের জয়লাভ

ত্রিচিনপল্লী ছিল সামরিক ও বাণিজ্যিক দিক্ হইতে অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। ফরাসী সৈন্য এই স্থানটি অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে ইংরেজ গভর্ণর সণ্ডার্স মহম্মদ আলিকে সামরিক সাহায্যদানে ত্রুটি করিলেন না। সণ্ডার্স মারাঠাগণকে এবং তাঞ্জোর ও মহীশূরের রাজাকে নিজ পক্ষে টানিলেন। সেই সময়ে রবার্ট ক্লাইভ নামে জনৈক ইংরেজ সৈনিকের সমরকৌশল অনুসরণ করিয়া ইংরেজ পক্ষ আর্কট জয় করিতে সমর্থ হইল। ক্লাইভের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও তৎপরতায় কর্ণাটের দ্বিতীয় যুদ্ধ ইংরেজদের অনুকূলে চলিতে লাগিল।

দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রভাব-প্রতিপত্তির অবসান

অরণি ও কাবেরীপাক নামক অপর দুই যুদ্ধে ক্লাইভ জয়লাভ করিলে দাক্ষিণাত্যে ইংরেজ প্রাধান্য স্থাপিত হইল। ক্লাইভের সমরকুশলতায় এবং মারাঠা, মহীশূর ও তাঞ্জোরের সাহায্যে বলীয়ান ইংরেজ বাহিনীকে দুপ্লে কোনভাবেই পরাভূত করিতে সমর্থ হইলেন না। রবার্ট ক্লাইভ দুপ্লে ও চাঁদা সাহেবের যুগ্ম বাহিনীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়া ত্রিচিনপল্লী অধিকার করিলেন এবং মহম্মদ আলিকে আর্কটের সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। এইভাবে দাক্ষিণাত্যে ফরাসী প্রভাব ও প্রতিপত্তির স্থলে ইংরেজ প্রভাব-প্রতিপত্তি স্থাপিত হইল। অবশেষে ফরাসী কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দুপ্লে ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। পর বৎসর (১৭৫৫ খ্রীঃ) ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়।

মুর্শিদকুলি খাঁ

বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব: বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত (Anglo-French Conflict in Bengal: From Trade to Political Domination): মোগল সম্রাট্ ঔরংজেব মুর্শিদকুলি খাঁকে বাংলাদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে বাংলাদেশের নবাবি একপ্রকার স্বাধীন হইয়া উঠে। সম্রাট্ আকবরের আমল হইতে আরম্ভ করিয়া ঔরংজেবের মৃত্যু পর্যন্ত (১৭০৭ খ্রীঃ) বাংলাদেশ মোগল প্রাধান্য ও আনুগত্য স্বীকার করিয়াই চলিত। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর পর বাংলাদেশ কেবল নামেমাত্রই মোগল সম্রাটের অধীন ছিল। কার্যত উহা স্বাধীনই

ছিল। এমন কি, ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে মোগল সম্রাট্ ফারুকশিয়ার ইংরেজগণকে বিনা শুল্কে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার 'ফরমান' দান করিলে মুর্শিদকুলি খাঁ উহা অগ্রাহ্য করিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। পরবর্তী নবাবগণ—সুজা-উদ্দিন খাঁ, সর্ফরাজ খাঁ, আলিবর্দী খাঁ প্রভৃতির আমলেও এই স্বাধীনতা অটুট ছিল।

সুজা-উদ্দিন, সর্ফরাজ খাঁ

আলিবর্দী ছিলেন বিচক্ষণ, দূরদর্শী নবাব। তিনি একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ইংরেজ বণিকগণকে নিছক বণিক হিসাবে বাংলাদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার ভিন্ন অপর কোনপ্রকার সুযোগ-সুবিধা দান করা নিরাপদ নহে। কারণ, ইংরেজ বণিকদের অভিসন্ধি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন না। ইংরেজ বণিকদের নৌ-বলের কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং তাহাদিগকে দেশ হইতে বিতাড়িত করিবার ইচ্ছা তাঁহার থাকিলেও সেই ইচ্ছা কার্যকরী করা সম্ভব হইবে না, একথা উপলব্ধি করিয়া তিনি ইংরেজদের প্রতি মিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিবার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাহাদিগকে কোনপ্রকার রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয়ের সুযোগদানে তিনি মোটেই রাজী ছিলেন না।

আলিবর্দী খাঁর শাসনদক্ষতা

তাঁহার দূরদর্শিতা

সিরাজ-উদ্-দৌলা, ১৭৫৬-৫৭ খ্রীঃ (Siraj-ud-dowla): আলিবর্দী খাঁ ছিলেন অপুত্রক। মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার তিন কন্যার মধ্যে সর্ব-কনিষ্ঠার পুত্র সিরাজ-উদ্-দৌলাকে বাংলার নবাব-পদ দান করিয়া যান। তাঁহার অপর দুই কন্যার মধ্যে একজন ছিলেন ঘসেটি বেগম। ইনি ছিলেন ঢাকার ভূতপূর্ব শাসনকর্তার বিধবা পত্নী। অপর কন্যা ছিলেন পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার বিধবা স্ত্রী। এই সকল নিকট-আত্মীয়ের পরিবারস্থ সকলেই বাংলার মস্নদ লাভের আশা পোষণ করিতেন। এমতাবস্থায় মৃত্যু-কালে আলিবর্দী খাঁ মির্জা মহম্মদকে, সাধারণ্যে পরিচিত সিরাজ-উদ্-দৌলাকে, বাংলার নবাব মনোনীত করিয়া গেলে তাঁহাদের আশা ভঙ্গ হইল। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তার পুত্র সৌকৎ জঙ্গ এবং ঢাকার শাসনকর্তার বিধবা পত্নী ঘসেটি বেগম সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। ঘসেটি বেগমের দেওয়ান রাজবল্লভও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন। সেই সময়ে বাংলার ইংরেজ বণিকদের সহিত সিরাজ-উদ্-দৌলার বিবাদ বাধিলে পরিস্থিতি অধিকতর জটিল হইয়া উঠিল।

সিরাজের মসনদ লাভ

তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

সিরাজ-উদ্-দৌলা বাংলার মস্নদে আরোহণ করিবার সময় হইতেই ইংরেজগণ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে শুরু করে। তাহারা চিরাচরিত প্রথা অমান্য করিয়া সিরাজ-উদ্-দৌলার মস্নদ লাভের কালে কোনপ্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করে নাই। তদুপরি নবাবের শত্রু রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস প্রভূত ধনরত্ন লইয়া ঢাকা হইতে পলাইয়া আসিলে ইংরেজগণ তাহাকে আশ্রয় দান করে। নবাবের অনুরোধ সত্ত্বেও তাহারা কৃষ্ণদাসকে সমর্পণ করিতে অস্বীকৃত হয়। এমন সময় ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হইলে

সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রতি ইংরেজদের বিদ্বেষভাব

(১৭৫৬ খ্রীঃ) সেই সূত্রে বাংলাদেশের ইংরেজ ও ফরাসী বণিকগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। তাহারা নিজ নিজ বাণিজ্যকুঠির নিরাপত্তার জন্য পরিখা খনন, দুর্গ নির্মাণ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করে। সিরাজ তাহাদিগকে নিরস্ত হইতে আদেশ করিলে ফরাসী বণিকগণ সেই আদেশ মানিল বটে, কিন্তু ইংরেজ বণিকগণ তাহা অমান্য করিয়া নবাবের দূতকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল।

ইংরেজ বণিকদের ঔদ্ধত্য

ঘসেটি বেগম, রাজবল্লভ ও ইংরেজগণ যে যুগ্মভাবে এক হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে একথা সিরাজের বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্তা ঘসেটি বেগমকে নিজ তত্ত্বাবধানে লইয়া আসিলেন। ইহাতে ইংরেজ বণিকদের টনক নড়িল। তাহারা সিরাজ-উদ্-দৌলার নিকট কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিল। কিন্তু তাহারা দুর্গ নির্মাণ বন্ধ করিল না। বাধ্য হইয়া সিরাজ তাহাদের কলিকাতাস্থ দুর্গ ফোর্ট উইলিয়াম আক্রমণ করিলেন। ইংরেজগণ প্রাণভয়ে ফল্‌তা নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সিরাজ ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিলেন।

ঘসেটি বেগমকে নিজ তত্ত্বাবধানে আনয়ন—ইংরেজদের অনুশোচনা

সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা অধিকার (১৭৫৬ খ্রীঃ)

সিরাজ কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়াম—অর্থাৎ কলিকাতা অধিকৃত হইয়াছে এই সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে সেখান হইতে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সনের অধিনায়কত্বে একদল সৈন্য ও একটি নৌ-বহর কলিকাতা পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরিত হইল। ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন সহজেই কলিকাতা পুনর্দখল করিলেন। সিরাজ পুনরায় কলিকাতার ইংরেজদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া আসিয়া কলিকাতার নিকটে কাশীপুর নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন। রবার্ট ক্লাইভ তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর হইলে উভয় পক্ষে আলিনগরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। সিরাজ ইংরেজ কোম্পানিকে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা দানে স্বীকৃত হইলেন।

ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন কর্তৃক কলিকাতা পুনর্দখল

আলিনগরের সন্ধি


সিরাজ-উদ্-দৌলা

আলিনগরের সন্ধি দ্বারা সিরাজ ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধের অবসান ঘটিল বটে কিন্তু মিত্রতা স্থাপিত হইল না। ক্লাইভ সেই সময় হইতেই সিরাজের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইলেন। মুর্শিদাবাদে নবাবের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র চলিতেছিল। আলিবর্দী খাঁর ভগিনীপতি মিরজাফর সিরাজ-উদ্-দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং বাংলার নবাব হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। মিরজাফর ছিলেন

সিরাজ-উদ্-দৌলার প্রধান সেনাপতি। তিনি মুর্শিদাবাদের অর্থলোভী শেঠ সম্প্রদায়, জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায়দুর্লভ প্রভৃতিকে নিজ দলে টানিয়া সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। রবার্ট ক্লাইভও এই ষড়যন্ত্রে যোগদান করিলেন।

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজ-উদ্-দৌলার বাধাদান সত্ত্বেও ইওরোপের সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের সূত্র ধরিয়া বাংলাদেশে ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র চন্দননগর অধিকার করিয়া লইলেন। ফরাসীদের সাহায্য লইয়া ইংরেজদের সহিত সিরাজ-উদ্-দৌলার ভবিষ্যতে যুঝিবার সুযোগ ইহাতে বিনাশপ্রাপ্ত হইল।

ক্লাইভ কর্তৃক চন্দননগর অধিকার

তারপর সামান্য অজুহাতে রবার্ট ক্লাইভ সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে সিরাজ ও রবার্ট ক্লাইভের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হইল। মিরজাফর ও রায়দুর্লভ ষড়যন্ত্রের শর্ত অনুসারে নবাবের এক বিরাট সংখ্যক সৈন্যকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া নিজ দেশ ও নবাবের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেন। মিরমদন ও মোহনলাল অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ রবার্ট ক্লাইভের সেনাবাহিনীর সহিত যুঝিতে লাগিলেন। তাঁহাদের সমরকুশলতায় ক্লাইভ যুদ্ধে জয়লাভ সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া উঠিলেন। তিনি নিকটবর্তী আম্রকাননে নিজ সৈন্যদলকে অপসারিত করিলেন। সেই সময়ে মিরমদনের আকস্মিক মৃত্যু ঘটিলে নবাব পক্ষের যাবতীয় দায়িত্ব পড়িল মোহনলালের উপর। মোহনলাল বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া চলিলেন। মিরমদনের মৃত্যুতে সিরাজ-উদ্-দৌলা বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি মিরজাফরকে দেশরক্ষার জন্য সাহায্য করিতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মিরজাফর মুখে নবাবের প্রতি আনুগত্যের ভান করিয়া তাঁহাকে যুদ্ধ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিলেন। সিরাজ তখন মানসিক স্থৈর্য হারাইয়া ফেলিয়াছেন। তিনি মিরজাফরের পরামর্শ অনুযায়ী মোহনলালকে যুদ্ধ-ত্যাগের আদেশ দিলেন। মোহনলাল প্রথমে সেই আদেশ পালনে রাজী হইলেন না, কারণ যুদ্ধ তখন নবাবী সৈন্যদের অনুকূলেই চলিতেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নবাবের আদেশ তাঁহাকে মানিতেই হইল। এইভাবে যুদ্ধে যখন পরাজয় নিশ্চিত তখন মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় ক্লাইভ জয়লাভ করিলেন। সিরাজ-উদ্-দৌলা

পলাশীর যুদ্ধ (২৩শে জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ)

মিরমদন ও মোহনলালের বীরত্ব

মিরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতা



মিরজাফর

ভাগলপুরের ফরাসী কুঠির অধ্যক্ষ মঁসিয়ে ল'-এর সাহায্য লইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে বিহারের দিকে গোপনে পলায়ন করিলেন। পথে তিনি ধরা পড়িলেন। মিরজাফরের আদেশে তাঁহার পুত্র মিরণ সিরাজকে হত্যা করাইলেন।

সিরাজের পলায়ন

পলাশীর যুদ্ধের ফলে মিরজাফর বাংলার মস্‌নদে অধিষ্ঠিত হইলেন। রবার্ট ক্লাইভের সহায়তার বিনিময়ে তিনি এত বেশী পরিমাণ অর্থ পুরস্কারস্বরূপ দিতে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, সেই পরিমাণ অর্থ তখন নবাবী খাজাঞ্চিখানায় ছিল না। তদুপরি ঢাকা ও পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিলে মিরজাফর ইংরেজদের নিকট হইতে সৈন্য সাহায্য লইয়াছিলেন। এই সকল কারণে ইংরেজদের নিকট তাঁহার দেনা অত্যধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। মিরজাফর এই সকল দেনা ও ইংরেজদের সাহায্যের পুরস্কার মিটাইবার জন্য ইংরেজ কোম্পানিকে প্রচুর অর্থ ও চব্বিশ-পরগণার জমিদারি দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার ঋণ শোধ হইল না। এমন কি, নবাবী আসবাবপত্র বিক্রয় করিয়াও মিরজাফর ইংরেজদের ঋণ সম্পূর্ণভাবে মিটাইতে পারিলেন না। যাহা হউক, রবার্ট ক্লাইভ ও তাঁহার কর্মসচিবগণ প্রচুর পুরস্কার পাইলেন। এইভাবে প্রথম হইতে মিরজাফরের শাসনকে আর্থিক ক্ষেত্রে দুর্বল এবং সামরিক ক্ষেত্রে ইংরেজদের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল করিয়া ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলার রাজনীতিতে এক শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল। বাংলার নবাবের শক্তি ও প্রভুত্ব সেই সময় হইতে ইংরেজগণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইতে লাগিল।

মিরজাফরের মস্‌নদ লাভ

বাংলার ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রভাব

পলাশীর যুদ্ধের ফলে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হইয়াছিল, সাধারণ্যে এই কথাই প্রচলিত। কিন্তু একথা বলা ভুল হইবে, কারণ পরবর্তী কালে মিরকাশিম নিজ ইচ্ছামত মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে নিজ রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন এবং গুর্গিন খাঁ, মার্কার ও সামরুর সাহায্যে ইওরোপীয় সামরিক পদ্ধতিতে নিজ সৈন্যবাহিনীকে শিখাইয়া তুলিয়াছিলেন। এই সকল কাজ মিরকাশিমের স্বাধীনতার পরিচায়ক। সুতরাং পলাশীর যুদ্ধের পরও বাংলাদেশের নবাবের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল একথা স্বীকার করিতে হইবে। মিরজাফরের ন্যায় হীনচেতা লোকের পক্ষে অবশ্য সেই স্বাধীনতা ভোগ করা সম্ভব ছিল না। তিনি ছিলেন ইংরেজদের তাঁবেদার। কিন্তু মিরকাশিম বক্সারের যুদ্ধে (১৭৬৪ খ্রীঃ) পরাজিত হইলে এবং ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণেল ক্লাইভ কর্তৃক বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভের পর ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার প্রকৃত প্রভুত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অবশ্য পলাশীর যুদ্ধের ফলে ইংরেজগণ বাংলার রাজনীতি-ক্ষেত্রে পরোক্ষ নিয়ন্তাস্বরূপ হইয়াছিল, একথা স্বীকার করিতে হইবে। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হইবার পথে আর কোন বাধা ছিল না।

পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে আধুনিক মতবাদ

ইওরোপে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৭৫৬-৬৩ খ্রীঃ) সূত্রে যখন বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব চলিতেছিল সেই সময়ে কর্ণাট অঞ্চলেও পুনরায় ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে পণ্ডিচেরী, মাহে, জিঞ্জি প্রভৃতি ফরাসী অধিকৃত স্থানের পতন ঘটে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের সন্ধিতে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবসান ঘটিলে ফরাসীগণ তাহাদের বাণিজ্য-কেন্দ্রগুলি ফিরিয়া পায় বটে, কিন্তু কেবল বাণিজ্য-কেন্দ্র হিসাবেই এগুলি ব্যবহার করা চলিবে এই প্রতিশ্রুতি ফরাসী সরকারকে দিতে হয়। এইভাবে ভারতে ফরাসী প্রাধান্য স্থাপনের আশা চিরতরে বিলুপ্ত হয়।

দাক্ষিণাত্যে ব্রিটিশ প্রাধান্য

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্রিটিশ শক্তির প্রসার

(Expansion of British Power)

রবার্ট ক্লাইভ (১৭৫৮-৬০ খ্রীঃ) : সিরাজ-উদ্-দৌলাকে মসনদচ্যুত করিয়া রবার্ট ক্লাইভ মিরজাফরকে নবাব-পদে বসাইয়াছিলেন। এ-বিষয়ে আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার মত হীনচেতা ব্যক্তির পক্ষেও অধিককাল ইংরেজদের তাঁবেদারি করা সম্ভব হইল না। তিনি ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরেজদের বিতাড়িত করিতে চাহিলেন। কিন্তু ক্লাইভ বিদারার যুদ্ধে ওলন্দাজদের পরাজিত করিয়া সেই চেষ্টা ব্যর্থ করিলেন। এইবার মিরজাফরকে মসনদ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার জামাতা মিরকাশিমকে নবাব-পদে স্থাপন করা হইল। এজন্য ইংরেজগণ বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারি পাইল। নবাব পরিবর্তন করা ইংরেজদের এক অতিশয় লাভজনক ব্যবসায় হইয়া দাঁড়াইল। ক্লাইভ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে ফিরিয়া গেলেন।

ক্লাইভ ও মিরজাফর

মিরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা দূরদর্শী রাজনীতিক। ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করিয়া তিনি মুর্শিদাবাদ হইতে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিলেন এবং নিজ সেনাবাহিনীর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। ইংরেজ কর্মচারিগণ তাহাদের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যের পণ্যদ্রব্য বিনা শুল্কে চালান দিতে পারিত। এজন্য 'দস্তক' নামে একপ্রকার ছাড়পত্র দেখাইলেই চলিত। কিন্তু ইংরেজ কর্মচারিগণ এই সকল ছাড়পত্র দেখাইয়া আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্য মালপত্র এক স্থান হইতে অন্যত্র বিনা শুল্কে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত এবং অবৈধভাবে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য হইতে প্রচুর লাভ করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে দেশীয় বণিকগণ ঘাটে ঘাটে শুল্ক দিয়া ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল। মিরকাশিম ইংরেজ গভর্ণরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও যখন কোন প্রতিকার পাইলেন না তখন নিজে ক্ষতি স্বীকার করিয়া দেশীয় বণিকদের মাল চলাচলের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিলেন।

মিরকাশিম ও ইংরেজগণ

ইহাতে রুষ্ট হইয়া পাটনার ইংরেজ কুঠির এলিস সাহেব পাটনা দখল করিলে মিরকাশিম বাধ্য হইয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। তিনি পাটনা শহরটি পুনর্দখল করিলেন এবং ইংরেজ বাণিজ্য কুঠি ভাঙিয়া দিলেন। এই সূত্রে ইংরেজদের সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিল। কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালা—এই তিনটি যুদ্ধে পর পর পরাজিত হইয়া মিরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজা-উদ্-দৌলা ও সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলমের সাহায্য লইয়া বক্সারে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। এবারও তাঁহার পরাজয় ঘটিল। সুজা-উদ্-দৌলা ও শাহ্ আলম ইংরেজদের উপর নির্ভরশীল হইয়া পড়িলেন।

বক্সারের যুদ্ধ

ইংরেজগণ মিরকাশিমের ন্যায় স্বাধীনচেতা ব্যক্তিকে মসনদে বসাইবার ভুল বুঝিতে পারিয়া মিরজাফরকেই পুনরায় মসনদে বসাইল (১৭৬৪ খ্রীঃ)। এক বৎসর পর তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার পুত্র নজম-উদ্-দৌলাকে নবাব-পদে স্থাপন করিয়া ইংরেজগণ প্রচুর অর্থ গ্রহণ করিল। এই সময় হইতে বাংলার নবাব কেবল নামেমাত্রই নবাব রহিলেন, প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হস্তগত হইল। এইভাবে ইংরেজদের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইলে তাহারা বেপরোয়া হইয়া উঠিল। তাহারা নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, কোম্পানির শাসনে দারুণ অব্যবস্থা দেখা দিল, কোম্পানির স্বার্থও বিনাশপ্রাপ্ত হইতে চলিল। এমতাবস্থায় ইংলণ্ডস্থ ডাইরেক্টর সভা ক্লাইভকে দ্বিতীয়বার বাংলার গভর্ণর করিয়া পাঠাইল। ইতিমধ্যে রবার্ট ক্লাইভ লর্ড উপাধিতে ভূষিত হইয়া লর্ড ক্লাইভ হইয়াছিলেন।

বাংলার নবাব নামেমাত্র নবাব

বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিয়া লর্ড ক্লাইভ ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য ও দুর্নীতি বন্ধ করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেন এবং অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে কারা ও এলাহাবাদ এবং প্রচুর পরিমাণ অর্থ আদায় করিলেন। সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলম তখনও দিল্লীতে প্রবেশ করিবার সাহস পাইতেছিলেন না। তাঁহার পিতার হত্যার পর তিনি একপ্রকার রাজ্যহীন অবস্থায়ই ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন। ক্লাইভ তাঁহাকে কারা ও এলাহাবাদ প্রদেশ দুইটি দিয়া দিলেন এবং বৎসরে ২৬ লক্ষ টাকা দিবার শর্তে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানীর অধিকার আদায় করিলেন (১৭৬৫ খ্রীঃ)। ইহার অর্থ ছিল এই যে, রাজস্ব আদায়ের যাবতীয় দায়িত্ব ইংরেজ কোম্পানির উপর বর্তাইয়াছিল। দেওয়ানী লাভের ফলে ইংরেজ কোম্পানি আইনত এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা পাইল। ভারতে

কোম্পানির দেওয়ানী লাভ (১৭৬৫ খ্রীঃ) ইংরেজদের অধিকার আইনত স্বীকৃত



রবার্ট ক্লাইভ

সাম্রাজ্য বিস্তারের পক্ষে দেওয়ানী লাভ এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল। ক্লাইভ বাংলার নবাবকে বৎসরে ৫৩ লক্ষ টাকা দিবার বিনিময়ে রাজস্বের উপর তাঁহার সকল অধিকার কাড়িয়া লইলেন। ফলে বাংলার নবাব ইংরেজ কোম্পানির ভাতাভোগী হইয়া পড়িলেন। ক্লাইভ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব নবাবের উপরই পূর্ববৎ রাখিয়া দিলেন, অথচ রাজস্বের উপর অধিকার নিজের হাতে রাখিলেন। এই ব্যবস্থা 'দ্বৈত শাসন' (Double Government) নামে পরিচিত। ইহার ফলে নবাবের উপর ক্ষমতাহীন দায়িত্ব, আর ইংরেজদের হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা রহিল।

ক্লাইভের 'দ্বৈত শাসন' ব্যবস্থা

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ) ও কর্ণওয়ালিসের (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ) আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার : ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বাংলার গভর্ণর হইয়া আসিয়া প্রথমেই উপলব্ধি করিলেন যে, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি একটি বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান হইতে একটি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই শক্তিকে সুদৃঢ় করিবার এবং ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে স্থায়িত্বদানের জন্য ইংরেজ শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত ও সংগঠিত করা প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বেই ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের ইংরেজগণ মহীশূরের সুলতান হায়দর আলির বিরুদ্ধে হায়দরাবাদের নিজামকে সামরিক সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। এজন্য অবশ্য তাহারা উত্তর-সরকার নিজামের নিকট হইতে পাইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ যখন শুরু হইল তখন ব্রিটিশ সেনাবাহিনী হায়দর আলির রাজ্য আক্রমণ করিলে তাহাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটিল, উপরন্তু হায়দর আলি মাদ্রাজ আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন। মাদ্রাজের ইংরেজ কাউন্সিল হায়দর আলির সহিত শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হইল (১৭৬৯ খ্রীঃ)। পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল এবং কোন পক্ষকে অপর কোন শক্তি আক্রমণ করিলে উভয়ে মিলিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে স্থির হইল। এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান ঘটিল। কিন্তু দুই বৎসর পর ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাগণ মহীশূর আক্রমণ করিলে ইংরেজগণ তাহাদের ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের চুক্তির শর্ত উপেক্ষা করিয়া হায়দর আলির সাহায্যে অগ্রসর হইল না। ফলে হায়দর আলি ইংরেজদের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইলেন।

প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ



ওয়ারেন হেস্টিংস্

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত মারাঠাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। নানা ফড়নবিশ নিহত পেশওয়া নারায়ণ রাওয়ের শিশুপুত্র দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশওয়া বলিয়া ঘোষণা করিলে নারায়ণ রাওয়ের পিতৃব্য রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা

করিলেন। পেশওয়া-পদ লাভের জন্য তিনিই নারায়ণ রাওকে হত্যা করাইয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের ইংরেজগণ রঘুনাথের পক্ষ গ্রহণ করিল। এই অন্তর্দ্বন্দ্বে যোগদান করিয়া শক্তিবৃদ্ধি করাই ছিল ইংরেজদের উদ্দেশ্য। যুদ্ধের প্রথম দিকে তেলেগাঁওয়ের যুদ্ধে মারাঠা শক্তির হস্তে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী পরাজিত হইল। তাহারা ওয়াড়গাঁওয়ের সন্ধি দ্বারা যাবতীয় বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিতে এবং রঘুনাথ রাওয়ের পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। এই চুক্তি ইংরেজদের মর্যাদায় দারুণ আঘাত হানিল। ওয়ারেন হেস্টিংস্ এই চুক্তির শর্ত মানিতে রাজী হইলেন না। ফলে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। মারাঠা নেতৃবৃন্দ এই যুদ্ধে পেশওয়া ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী নানা ফড়নবিশের সমর্থনে দাঁড়াইলেন। এমন সময় হায়দরাবাদের নিজাম এবং মহীশূরের হায়দর আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মারাঠা, মহীশূর ও নিজাম এই তিনের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে ইংরেজগণকে আত্মরক্ষা করিতে হইল। গভর্ণর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস্ তাঁহার অসাধারণ কর্ম-কুশলতা, অধ্যবসায় ও দূরদর্শিতা দ্বারা এই সংকট হইতে ব্রিটিশ শক্তিকে শেষ পর্যন্ত রক্ষা করিতে সমর্থ হইলেন। মারাঠাদের সহিত যুদ্ধে ইংরেজগণ তেমন সুবিধা করিয়া উঠিতে পারিল না। কোন পক্ষই জয়লাভে সমর্থ না হইলে মাহাদ্জী সিন্ধিয়ার মধ্যস্থতায় সল্‌বইয়ের সন্ধি (১৭৮২ খ্রীঃ) দ্বারা এই যুদ্ধের অবসান ঘটিল। ইংরেজগণ দ্বিতীয় মাধব রাওকে পেশওয়া বলিয়া স্বীকার করিল। রঘুনাথ রাওকে বাৎসরিক ভাতা দিবার ব্যবস্থা করা হইল। ইংরেজগণ অবশ্য সল্‌সেট্ নিজ অধিকারেই রাখিতে পাইল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

সল্‌বইয়ের সন্ধি (১৭৮২ খ্রীঃ)

এইভাবে প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটিল। সল্‌বইয়ের সন্ধি মহীশূর রাজ্যের বিরুদ্ধে ইংরেজদের যুদ্ধের শক্তি ও সুযোগ বাড়াইয়া দিল। মারাঠাগণ হায়দর আলি কর্তৃক ইংরেজদের নিকট হইতে বিজিত স্থানসমূহ পুনরুদ্ধারে সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল। এইভাবে কূটকৌশলে ইংরেজগণ ভারতীয় শক্তিগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ শক্তি বৃদ্ধি করিল।


হায়দর আলি

এদিকে মহীশূর রাজ্যের অন্তর্গত ফরাসী বাণিজ্য-কেন্দ্র ও বন্দর মাহে ইংরেজগণ দখল করিলে হায়দর আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (১৭৮০ খ্রীঃ)। তিনি কর্ণাট আক্রমণ করিলেন এবং উহা দখল করিলেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংস্ কূটকৌশলে নিজাম ও সিন্ধিয়াকে হায়দরের পক্ষ ত্যাগ করিতে সম্মত করাইলেন। কিন্তু হায়দর আলি ইহাতেও দমিবার পাত্র ছিলেন না। কিন্তু ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে

পোর্টোনভোর যুদ্ধে স্যার্ আয়ার কুটের হস্তে তিনি পরাজিত হইলেন। নেগাপত্তম, ত্রিংকোমালি প্রভৃতি স্থানও ইংরেজগণ অধিকার করিয়া লইল। কিন্তু হায়দরের পুত্র টিপু ব্রিটিশ বাহিনীকে তাঞ্জোরের নিকট পরাজিত করিলেন। হায়দর আলি ফরাসী সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন এবং এক ফরাসী নৌ-বহর দক্ষিণ ভারতের দিকে অগ্রসর হইলে হায়দরের আশা ও উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু ফরাসী সাহায্যলাভের পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিল (১৭৮২ খ্রীঃ)।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (১৭৮৪ খ্রীঃ)

হায়দরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান ইংরেজদের সহিত যুঝিয়া চলিলেন। তিন বৎসর পর্যন্ত কোন পক্ষই সম্পূর্ণ জয়লাভ করিতে সমর্থ না হইলে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে উভয়ের মধ্যে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল। উভয় পক্ষ পরস্পর পরস্পরের বিজিত স্থান ফিরাইয়া দিল। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি মহীশূর রাজ্য ও ইংরেজদের মধ্যে যুদ্ধ-বিরতি ঘটাইলেও ইহাতে দুই পক্ষের মধ্যে স্থায়ী শান্তি স্থাপিত হইল না। ইংরেজগণ টিপুর দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রু ছিল। মহীশূর রাজ্য সেই সময়ে দক্ষিণ ভারতের শ্রেষ্ঠ শক্তি ছিল। দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ প্রাধান্য স্থাপনের জন্য মহীশূর রাজ্যের পতন ইংরেজদের একান্ত প্রয়োজন ছিল। পক্ষান্তরে টিপু সুলতান ইংরেজদের ভারত হইতে বিতাড়িত করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়াছিলেন।


টিপু সুলতান

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে টিপুর সহিত ইংরেজদের পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। টিপু অসাধারণ সাহস ও অনমনীয় দেশাত্মবোধ লইয়া ইংরেজদের সহিত জীবনমরণ সংগ্রামে লিপ্ত হইলেন। ইহা ছিল তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ। এদিকে ওয়ারেন হেস্টিংসের স্থলে লর্ড কর্ণওয়ালিস বাংলার গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিয়াছিলেন। তিনি মারাঠা, নিজাম, কুর্গ ও ত্রিবাঙ্কুরের রাজগণের সহিত মিত্রতাবদ্ধ হইয়া টিপুকে সম্পূর্ণ একক-ভাবে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিলেন। টিপু যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। দেশীয় রাজগণের দেশাত্মবোধের অভাব হেতু তাঁহারা বিদেশীদের পক্ষগ্রহণেও দ্বিধা-বোধ করিলেন না। সেরিঙ্গাপত্তমের সন্ধিতে টিপু নিজ রাজ্যের অধিকাংশ এবং তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে ব্রিটিশদের দিতে বাধ্য হইলেন (১৭৯২ খ্রীঃ)। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ ভারতে মহীশূর রাজ্যের প্রাধান্য বিনষ্ট হইল এবং সেই স্থলে ইংরেজদের প্রাধান্য স্থাপিত হইল।

তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ

দক্ষিণ ভারতে ইংরেজ প্রাধান্য

লর্ড ওয়েলেসলীর আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রীঃ): ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটিল লর্ড

ওয়েলেস্‌লীর আমলে। ওয়েলেস্‌লী যখন গভর্ণর-জেনারেল হইয়া আসিলেন সেই সময়ে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে ফরাসী বিপ্লবের সূত্র ধরিয়া প্রায় সকল মহাদেশেই এক জীবনমরণ সংগ্রাম চলিতেছিল। দাক্ষিণাত্যে টিপু সুলতান সেরিঙ্গাপত্তমের সন্ধি মানিয়া চলিতে স্বভাবতই রাজী ছিলেন না। তিনি সাহায্যলাভের জন্য বিপ্লবী ফ্রান্সের সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। ইহা ভিন্ন আফগানিস্তান, আরব ও তুরস্কের সহিত ব্রিটিশ-বিরোধী সঙ্ঘ স্থাপনের জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। কাবুলের জামান শাহের নিকট টিপু ব্রিটিশদের ভারত হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য আমন্ত্রণ পাঠাইলেন। ওয়েলেস্‌লীকে এই সকল সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। ইহা ভিন্ন, ফরাসীগণ যাহাতে ভারতে শক্তি সঞ্চয় করিতে না পারে সেজন্য ভারতের রাজগণের মধ্যে যাঁহারা ফরাসীদের সহিত কোন প্রকার যোগাযোগ স্থাপনের ইচ্ছা পোষণ করিতেন তাঁহাদিগকে দমন করাও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

টিপু সুলতান ও ইংরেজদের পারস্পরিক বিদ্বেষ

ওয়েলেস্‌লীর পূর্ববর্তী গভর্ণর-জেনারেলদের কার্যকাল পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল বিজিত রাজ্যের উপর নিজেদের শক্তি সুদৃঢ় করা এবং কোন প্রকার ঝুঁকি না লইয়া সাম্রাজ্য প্রসার সম্ভব হইলে তাহা করা। ভারতের রাজশক্তিগুলি যাহাতে বিরোধী না হইয়া উঠে সেদিকেও নজর রাখা ছিল ব্রিটিশ সরকারের নীতি। কিন্তু ওয়েলেস্‌লী আসিয়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন যে, ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারের সময় ও সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে এবং ভারতীয় রাজগণের মধ্যে যত জনকে সম্ভব ব্রিটিশ অধীনে আনিতে হইবে। ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে —অর্থাৎ ওয়েলেস্‌লীর ভারত আগমনের পূর্বেই মারাঠা ও মহীশূর রাজ্যের শক্তি প্রায় বিনাশপ্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি তখন ব্রিটিশ শক্তির প্রসারের খুবই অনুকূল হইয়া উঠিয়াছিল। ইংলণ্ডের বণিক সম্প্রদায় এবং শিল্পপতিগণও তাহাদের নিজ স্বার্থে ভারতে ব্রিটিশ শক্তি ও সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ চাহিয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারের অর্থই ছিল ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সুযোগবৃদ্ধি।

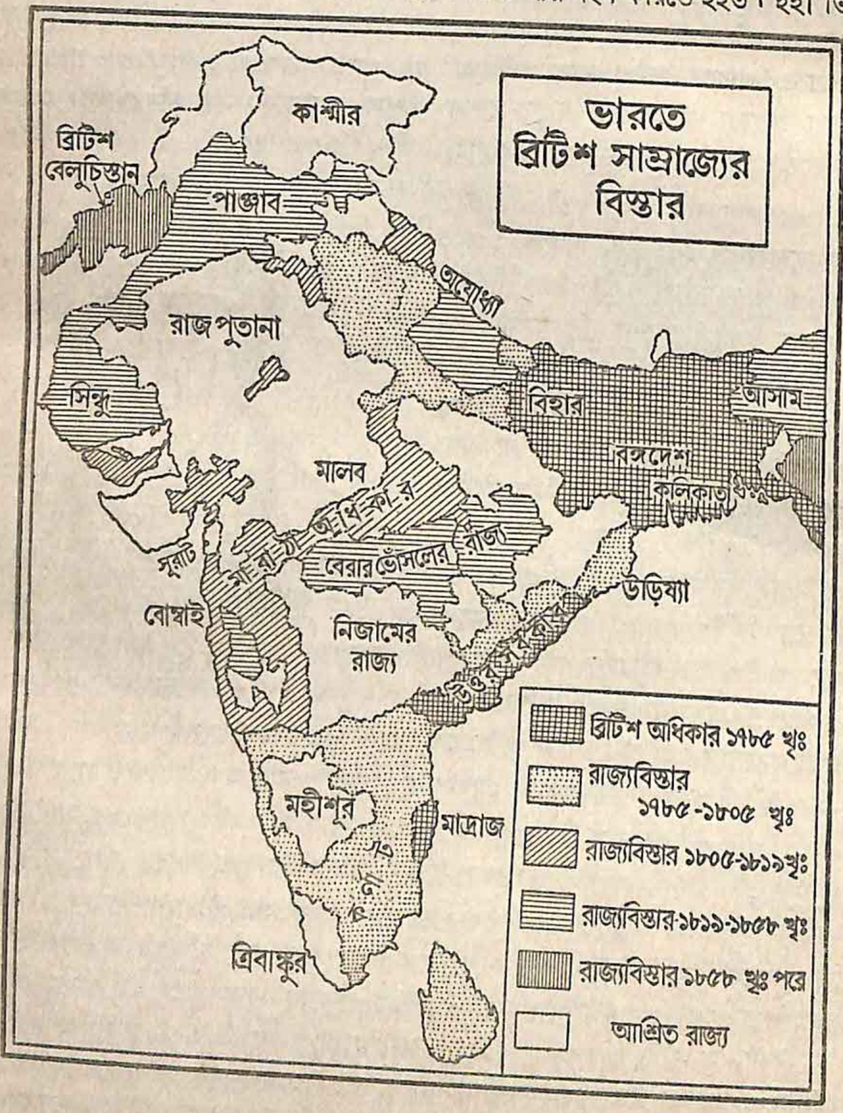

লর্ড ওয়েলেস্‌লী

ওয়েলেস্‌লীর রাজ্য-বিস্তার নীতি

উপরি-উক্ত নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে ওয়েলেস্‌লী 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র মাধ্যমে ও যুদ্ধের দ্বারা রাজ্য সম্প্রসারণ এবং পূর্বে যে-সকল রাজা বা নবাবের রাজ্য ব্রিটিশ প্রাধান্যাধীনে আসিয়াছিল সেগুলিকে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিতে মনোযোগী

হইলেন। সেই সময়ে পরস্পর পরস্পরের সহিত বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত ভারতীয় নৃপতিগণের প্রত্যেকেই ইংরেজদের সাহায্য গ্রহণের জন্য অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব ছিলেন। লর্ড ওয়েলেস্‌লী এই সুযোগ হারাইতে চাহিলেন না। তিনি তাঁহার অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি (Subsidiary Alliance) প্রচলন করিলেন। যে-সকল দেশীয় নৃপতি অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি ইংরেজ কোম্পানির সহিত স্বাক্ষর করিতেন বহিরাক্রমণ হইতে তাঁহাদিগকে রক্ষার ভার কোম্পানি গ্রহণ করিত। সেজন্য কোম্পানিকে তাঁহাদের রাজ্যের কতকাংশ ছাড়িয়া দিতে হইত অথবা সেজন্য ব্যয় বহন করিতে হইত। ইহা ভিন্ন

অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি



এই সকল নৃপতি ইংরেজদের বিনা অনুমতিতে অপর কোন শক্তির সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহ বা আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। এই সকল চুক্তিবদ্ধ নৃপতিগণ নিজেদের সেনাবাহিনী রাখিতে পারিতেন, কিন্তু উহার পরিচালনার ভার একজন ইংরেজ সেনাপতির উপর ন্যস্ত করিতে হইত। 'অধীনতামূলক মিত্রতা'র চুক্তির নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই মিত্রতা চুক্তি যে-সকল দেশীয় নৃপতি স্বাক্ষর করিতেন তাঁহারা ইংরেজদের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভরশীল হইয়া পড়িতেন। তাঁহাদের স্বাধীনতাও সঙ্গে সঙ্গে বিনাশপ্রাপ্ত হইত। ইহা ভিন্ন দেশরক্ষার ভার ইংরেজ কোম্পানির উপর ন্যস্ত হইলে উহার খরচ বাবদ চুক্তিবদ্ধ নৃপতিগণকে এত বেশী পরিমাণ অর্থ দিতে হইত যে, তাঁহাদের পক্ষে আর নিজেদের সেনাবাহিনী পোষণ করা সম্ভব হইত না। এই সকল কর্মচ্যুত সৈনিকের অনেকে পিণ্ডারী নামক দস্যু দলে যোগদান করিত। অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির ফলে ইংরেজ কোম্পানি দেশীয় নৃপতিদের অর্থে তাহাদের বিশাল সামরিক বাহিনীর ব্যয়-সঙ্কুলান করিত।

অধীনতামূলক মিত্রতার নীতির ফলে ইংরেজ প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগ

হায়দরাবাদের নিজাম সর্বপ্রথমে ইংরেজ কোম্পানির সহিত অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তিস্বাক্ষর করেন (১৭৯৮ খ্রীঃ)। মারাঠাদের আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতিতে তিনি কোম্পানির ছয় ব্যাটালিয়ন সৈনিকের খরচ বহন করিতে স্বীকৃত হইলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে এই সেনাবাহিনীর সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার নবাব অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন। এজন্য নবাবকে রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল—অর্থাৎ তাঁহার রাজ্যের অর্ধেকাংশ ইংরেজদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল। নানা ফড়নবিশ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন ততদিন ওয়েলেসলী মারাঠাদিগকে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণের বার বার অনুরোধ করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মারাঠা নেতৃবর্গের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দিল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও, যশোবন্ত রাও হোলকার, দৌলত রাও সিন্ধিয়া সকলেই মারাঠা সাম্রাজ্যের সর্বেসর্বা হইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যশোবন্ত রাও হোলকার ও দৌলত রাও সিন্ধিয়া যুগ্মভাবে পুনা আক্রমণ করিলে দ্বিতীয় বাজী রাও পলাইয়া গিয়া ইংরেজদের আশ্রয়প্রার্থী হইলেন এবং ব্যাসিনের চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া অধীনতামূলক মিত্রতায় আবদ্ধ হইলেন। ইংরেজ সাহায্য লইয়া দ্বিতীয় বাজী রাও পুনা পুনরধিকার করিয়া পেশওয়া-পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার ইংরেজদের পদলেহন সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের সহ্য হইল না। তাঁহারা ব্যাসিনের চুক্তি ভাঙিয়া দিয়া পেশওয়াতন্ত্রের পূর্ণ মর্যাদা ফিরাইয়া আনিতে সচেষ্ট হইলেন। বরোদার গাইকোয়াড় অবশ্য এই চেষ্টায় যোগদান করিলেন না। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সহিত সিন্ধিয়া ও ভোঁসলের যুগ্ম বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হইল। ইহা দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ নামে পরিচিত। অসইয়ের যুদ্ধে সিন্ধিয়া ও ভোঁসলে পরাজিত হইলেন। সিন্ধিয়া

নিজাম অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তিবদ্ধ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ

ইংরেজদের বিরুদ্ধে আর অস্ত্রধারণ করিলেন না। ভোঁসলে একাই যুদ্ধ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। অবশেষে ওয়াড়গাঁওয়ের যুদ্ধে পুনরায় পরাজিত হইয়া ভোঁসলে ইংরেজদের সহিত অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ হইলেন। সিন্ধিয়া ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ত্যাগ করিলেও তিনি তখনও অধীনতামূলক মিত্রতাবন্ধ হন না। ইংরেজ সেনাপতি তাঁহাকে পরাজিত করেন এবং সুরয-অর্জুনগাঁওয়ের চুক্তি দ্বারা অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি গ্রহণে বাধ্য করেন। এইভাবে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে ইংরেজদের শক্তি ও সাম্রাজ্য বৃদ্ধি পাইল এবং মারাঠা শক্তি চিরতরে দুর্বল হইয়া পড়িল।

মারাঠাদের অধীনতা-মূলক মিত্রতা গ্রহণ

কর্ণাটের নবাব নামেমাত্রই নবাব ছিলেন। প্রকৃত ক্ষমতা ইংরেজদের হস্তেই ছিল। ওয়েলেস্‌লী তাঁহাকে নবাব-পদ হইতে সরাইয়া দিয়া তাঁহার রাজ্যটি অধিকার করিয়া লইলেন এবং তাঁহাকে পেনশন বা ভাতা দানের ব্যবস্থা করিলেন। অনুরূপ তাঞ্জোর এবং সুরাটের রাজগণকে পেনশন দানের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাদের রাজ্য দখল করিয়া লইলেন।

কর্ণাট, তাঞ্জোর ও সুরাট অধিকার

টিপু সুলতান ওয়েলেস্‌লীর অধীনতামূলক মিত্রতার চুক্তি স্বাক্ষর করিতে স্বীকার করিবার পাত্র ছিলেন না। টিপু ফরাসী সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন এই অভিযোগে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েলেস্‌লী টিপুর সহিত যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। ইহা চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ নামে পরিচিত। টিপু ছিলেন প্রকৃত দেশপ্রেমিক, সাহসী বীরপুরুষ। ইংরেজদের পেনশনভোগী রাজা বা নবাবের ন্যায় বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি সৈনিকের ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করাকেই শ্রেয়ঃ মনে করিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী সেরিঙ্গাপত্তম—অর্থাৎ শ্রীরঙ্গপত্তম রক্ষা করিতে গিয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধে প্রাণ দিলেন (১৭৯৯ খ্রীঃ)। টিপুর রাজ্যের অধিকাংশ ইংরেজগণ দখল করিল, ইংরেজদের তাঁবেদার মিত্র নিজাম কতকাংশ পাইলেন। মারাঠাগণ মহীশূরের কোন অংশ গ্রহণে রাজী হইল না। অবশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশে হায়দর আলি যে হিন্দু রাজবংশকে উৎখাত করিয়া মহীশূর রাজ্য দখল করিয়াছিলেন সেই বংশের একজন উত্তরাধিকারীকে দেওয়া হইল। এইভাবে ইংরেজদের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী শত্রু মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটিল।

চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ : টিপুর পতন : দাক্ষিণাত্যে ইংরেজগণ নিরঙ্কুশ

ভরতপুরের রাজা ও হোলকারের যুগ্ম বাহিনী দিল্লী অধিকার করিতে অগ্রসর হইলে ইংরেজ বাহিনীর সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ বাধিল। ভরতপুরের রাজা ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়া ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ মিটাইয়া লইলেন। মিত্রহীন হোলকারের বিরুদ্ধে যখন ওয়েলেস্‌লী প্রস্তুত হইতেছিলেন সেই সময় তাঁহাকে দেশে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। ওয়েলেস্‌লীর চেষ্টায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতে সর্বাধিক শক্তিশালী রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল।

ভরতপুর অধিকার

লর্ড হেস্টিংস্ (১৮১৩-২৩ খ্রীঃ) ও ডালহৌসীর (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ) আমলে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার: লর্ড

হেস্টিংস্ ও লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালের অন্তর্বর্তী সময়ে যে-সকল গভর্ণর-জেনারেল ভারতে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন তাঁহারা প্রধানত শান্তি নীতি অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার তখন ঘটে নাই। কিন্তু লর্ড হেস্টিংস্ (লর্ড ময়রা) শাসনভার গ্রহণ করিলে পুনরায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়। অযোধ্যার নবাবের নিকট হইতে গোরক্ষপুর জেলাটি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের হাতে আসিলে কোম্পানির রাজ্যের উত্তর সীমা নেপালের দক্ষিণ সীমার সংলগ্ন হইয়া পড়ে। নেপালের গুর্খা বংশের রাজগণ সেই সময়ে দক্ষিণ দিকে রাজ্যবিস্তার শুরু করিলে ইংরেজদের সহিত তাঁহাদের সংঘর্ষ বাধে। শেষ পর্যন্ত ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ শুরু হয় (১৮১৪-১৬ খ্রীঃ)। ইহা গুর্খা যুদ্ধ নামে পরিচিত। এই যুদ্ধে পরাজিত হইলে সগৌলির সন্ধি (১৮১৬ খ্রীঃ) দ্বারা নেপালরাজ ইংরেজদিগকে আলমোড়া, নৈনিতাল, সিমলা, মুসৌরী প্রভৃতি স্থান ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন।

গুর্খা যুদ্ধ : নৈনিতাল, আলমোড়া, মুসৌরী, সিমলা অধিকার

এদিকে পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাও ইংরেজ রেসিডেণ্টের ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া ইংরেজ প্রাধান্য মুক্ত হইতে চাহিলেন। এজন্য তাঁহার মন্ত্রী ত্রিম্বকজী হোলকার-সিন্ধিয়া-ভোঁসলে-পেশওয়া মৈত্রী স্থাপনের গোপন আলোচনা শুরু করিলেন। অবশেষে এই মৈত্রী স্থাপিত হইলে পুনার ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট এলফিন্‌স্টোনের আবাসগৃহে আগুন লাগাইয়া দেওয়া হইল। তিনি কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হইল। এই যুদ্ধে পেশওয়া, ভোঁসলে এবং হোলকার পরাজিত হইলেন। পেশওয়ার রাজ্যের একাংশ, ভোঁসলের রাজ্যের একাংশ এবং হোলকারের রাজ্যের একাংশ ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হইল। এইভাবে মারাঠা শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া এবং ইংরেজ প্রাধান্যাধীনে আনিয়া লর্ড ময়রা ভারতে ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিহত করিয়া তুলিলেন।

তৃতীয় ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধ—মারাঠা শক্তি বিধ্বস্ত : ভারতে ব্রিটিশ শক্তি অপ্রতিহত

সেই সময়ে মারাঠাদের আক্রমণে রাজপুত রাজ্যগুলি দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। পিণ্ডারী দস্যুদের আক্রমণে সেগুলির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া উঠে। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেস্টিংস্ রাজপুত রাজ্যগুলির উপর মারাঠা প্রাধান্য খর্ব করিয়া রাজপুত রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীনে আনিলেন। এইভাবে মারাঠা ও রাজপুতদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করিয়া লর্ড ময়রা ভারতে ব্রিটিশ শক্তিকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করিয়া গেলেন।

রাজপুত রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ নিরাপত্তাধীনে আনয়ন

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পরবর্তী উল্লেখযোগ্য সময় ছিল লর্ড ডালহৌসীর শাসনকাল। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে (১৮৪৪-৪৮ খ্রীঃ) শিখ রাজমাতা ঝিন্দন দলীপ সিংহের অভিভাবিকা ছিলেন। শিখ সেনাবাহিনী খাল্‌সার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া তাহাঁদের শক্তিহ্রাসের উপায় হিসাবে তিনি তাহাদিগকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে

প্ররোচিত করিলেন। ইহা অমৃতসরের চুক্তিবিরোধী ছিল। ফলে প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ শুরু হইল। শিখগণ মুদ্‌কি, ফিরোজশাহ্‌, আলিওয়াল ও সোব্রাঁওয়ের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কাশ্মীর রাজ্যটি ইংরেজদের ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। লাহোরে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইলেন এবং তাঁহার নির্দেশক্রমে পাঞ্জাবের শাসনকার্য পরিচালিত হইতে লাগিল।

প্রথম ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৬ খ্রীঃ): পাঞ্জাবে ইংরেজ প্রভাব

ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের তাঁবেদার হিসাবে শাসন চালানো শিখদের পক্ষে দীর্ঘ দিন সহ্য হইল না। তাঁহার ঔদ্ধত্যে অতিষ্ঠ হইয়া শিখ বাহিনীও বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। লর্ড ডালহৌসী সঙ্গে সঙ্গে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। শিখগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলে লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাবের নাবালক রাজা দলীপ সিংহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পাঞ্জাব অধিকার করিলেন। ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আফগানিস্তানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত হইল।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধ (১৮৪৮-৪৯ খ্রীঃ): পাঞ্জাব দখল

ব্রহ্মদেশের সহিত ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ বাধিয়াছিল লর্ড আমহার্স্টের শাসনকালে (১৮২৩-২৮ খ্রীঃ)। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ বাহিনী জয়ী হইলে ব্রহ্মের রাজা পাগিদোয়া যান্দাবুর সন্ধি স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হইলেন (১৮২৬ খ্রীঃ)। ফলে টেনাসেরিম ও আরাকান অঞ্চল ইংরেজদের হস্তে ছাড়িয়া দিতে এবং এক বিরাট পরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে তিনি বাধ্য হন। ব্রহ্মদেশে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট নিয়োগ করা হয়। কিন্তু ডালহৌসীর শাসনকালে ব্রহ্মদেশের ব্রিটিশ রেসিডেণ্টের ঔদ্ধত্যে এক তীব্র বিদ্বেষ জাগিয়া উঠে, ফলে ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতে হয়। ইহার পর কয়েকজন ইংরেজ বণিক বর্মীদের হস্তে লাঞ্ছিত হইলে সেই সূত্রে দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত ব্রহ্মরাজ ইংরেজদের সহিত সন্ধি স্থাপনে বাধ্য হন। পেগু ব্রিটিশদের নিকট ছাড়িয়া দিতে হইল। ফলে চট্টগ্রাম হইতে সিঙ্গাপুর পর্যন্ত সমুদ্রোপকূল ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া আসে। ডালহৌসীর আমলে সিকিম রাজ্যের একাংশও ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়।

প্রথম-ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ

দ্বিতীয় ইঙ্গ-ব্রহ্ম যুদ্ধ: পেগু অধিকার



লর্ড ডালহৌসী

লর্ড ডালহৌসী তাঁহার স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ দ্বারাও ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসারসাধন করিয়াছিলেন। যুদ্ধ দ্বারা যে-পরিমাণ রাজ্য তিনি অধিকার করিয়াছিলেন সমপরিমাণ রাজ্য এই নীতির প্রয়োগের ফলে তাঁহার হস্তগত

হইয়াছিল। ব্রিটিশের অধীনে বা ব্রিটিশ শক্তির সাহায্যে গঠিত কোন রাজ্যের রাজার কোন উত্তরাধিকারী না থাকিলে সেই রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারে চলিয়া আসিবে, কোন দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়া সেই রাজ্যের উত্তরাধিকার দেওয়া চলিবে না, এই ছিল স্বত্ববিলোপ-নীতির মর্মার্থ। লর্ড ডালহৌসীর রাজত্বকালে ভাগ্যচক্রে ভারতের কয়েকটি রাজ্যেরই রাজা অপুত্রক অবস্থায় মারা গিয়াছিলেন। ইহাতে লর্ড ডালহৌসীর সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানি কর্তৃক গঠিত সাতারা রাজ্য, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি প্রভৃতি রাজ্য এই নীতির প্রয়োগে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ভগৎ, কারাউলি ও উদয়পুর রাজ্যগুলি প্রথমে অধিকার করিয়া পরে অবৈধতার কারণে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের পুত্র নানাসাহেবের ভাতা ডালহৌসী বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঞ্জোর ও কর্ণাট রাজ্যের রাজগণকে পেনশন দানের ব্যবস্থা করিয়া এই দুইটি রাজ্যও ডালহৌসী অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ ভিন্ন অরাজকতার অজুহাতে লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন (১৮৫৬ খ্রীঃ)। হায়দরাবাদের নিজাম ব্রিটিশ সৈন্যের ব্যয় বাবদ অর্থ দিতে না পারিলে তাঁহার নিকট হইতে বেরার প্রদেশটি তিনি আদায় করিয়া লইলেন। এইভাবে এক বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য লর্ড ডালহৌসী ভারতে গড়িয়া তুলিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখিয়া গিয়াছিলেন।

স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রসার

ভারতে বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান

চতুর্দশ অধ্যায়

(১) ওয়ারেন হেস্টিংস্, কর্ণওয়ালিস, বেণ্টিঙ্ক, ডালহৌসী ও রিপনের আমলে সংস্কার কার্যাদি

(Reforms under Warren Hastings, Cornwallis, Bentinck, Dalhousie and Ripon)

ওয়ারেন হেস্টিংস্ (১৭৭২-৮৫ খ্রীঃ): ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হইবার অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য কতক কতক সংস্কার চালু করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ইহা ভিন্ন ভারতে ইংরেজ কোম্পানির সর্বোচ্চ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারী যথা গভর্ণর এবং ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ হইবার পর গভর্ণর-জেনারেলের ব্যক্তিগত মানসিক উৎকর্ষ ও দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মদক্ষতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী কি ধরনের সংস্কারের প্রয়োজন তাহা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা—সবকিছু তাঁহাদের সংস্কার নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা

ওয়ারেন হেস্টিংস্ যখন বাংলাদেশের গভর্ণর হইয়া আসিলেন (১৭৭২ খ্রীঃ)* তখন বাংলাদেশে ইংরেজ শাসনের এক সংকটকাল। ১১৭৬ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর (১৭৭০ খ্রীঃ) বাংলাদেশের অর্থনীতিকে পর্যুদস্ত করিয়া দিয়া গিয়াছিল। ইহা ভিন্ন লর্ড ক্লাইভের দ্বৈত শাসনের কুফল কোম্পানির শাসনব্যবস্থায় প্রকটিত হইয়াছিল। এমতাবস্থায় ওয়ারেন হেস্টিংস্ কোম্পানির শাসনব্যবস্থার সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি দ্বৈত শাসন বাতিল করিয়া দিয়া রাজস্ব আদায়ের পূর্ণ দায়িত্ব কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিলেন। রাজস্ব আদায়ের ভার কালেক্টর নামে এক শ্রেণীর কর্মচারীর হস্তে অর্পণ করিলেন। ভ্রাম্যমাণ কমিটি (Committee of Circuit) নামে একটি কমিটি গঠন করিয়া তিনি উহার উপর জমি বন্দোবস্ত দিবার ভার দিলেন। রাজস্বসংক্রান্ত নীতি-নির্ধারণ এবং সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তিনি রেভিনিউ বোর্ড (Board of Revenue) বা রাজস্ব বোর্ড গঠন করিলেন। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব ব্যবস্থা তাঁহার নিজের এবং ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলাদেশের রাজস্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অভাব হেতু তেমন কার্যকরী হয় নাই। যে-সকল ব্যক্তি সর্বোচ্চ পরিমাণ রাজস্ব দিতে প্রস্তুত হইত তাহাদিগকেই জমি বন্দোবস্ত দিবার ফলে বহু অনভিজ্ঞ লোকও অত্যধিক পরিমাণ রাজস্ব দিবার শর্তে জমিদারি লইত এবং প্রজাবর্গের উপর চরম অত্যাচার করিয়া যথাসম্ভব অর্থ আদায় করিত। এই ব্যবস্থার ত্রুটি অল্পকালের মধ্যে প্রকাশ পাইল। হেস্টিংস্ ইহার পর রাজস্ব ব্যবস্থার নানাপ্রকার পরীক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করিলেন। এইভাবে রাজস্ব ব্যবস্থার উপর পরীক্ষা চলিতে লাগিল।

ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব-সংস্কার ও রাজস্ব ব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা

মোগল শাসনব্যবস্থায় রাজস্ব বিভাগ—অর্থাৎ দেওয়ানীর উপর জমি ও রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা-মকদ্দমা নিষ্পত্তির ভার ছিল। আর ফৌজদারী বিচারের ভার ছিল নবাবের উপর। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানি দেওয়ানীর ভার গ্রহণ করিলে কিছুকাল দেওয়ানী বিচারের ভার নবাবের উপরই ছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস্ দেওয়ানীর ভার সরাসরি গ্রহণ করিলে দেওয়ানী বিচারের ভারও কোম্পানিকে লইতে হইল। তিনি বাংলাদেশে ইংরেজদের রাজনৈতিক প্রাধান্যের সুযোগ লইয়া ফৌজদারী বিচারের ভারও কোম্পানির হস্তে গ্রহণ করিলেন। তিনি প্রতি জেলায় একটি করিয়া মফস্বল দেওয়ানী আদালত ও মফস্বল ফৌজদারী আদালত স্থাপন করিলেন। সদর দেওয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত স্থাপন করিয়া সেগুলির উপর দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ন্যস্ত করিলেন। অবশ্য ফৌজদারী মামলায় প্রাণদণ্ডের আদেশ নবাবের অনুমোদনসাপেক্ষ ছিল। এইভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস্ বাংলাদেশের বিচারক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হাতে লইয়া আসিলেন।

বিচারব্যবস্থার সংস্কার

* ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কার্যাদির উপর কতক পরিমাণ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ করে। ইহার অন্যতম শর্ত ছিল বাংলার গভর্ণরকে গভর্ণর-জেনারেল পদে উন্নীত করা এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের কাউন্সিলের উপর নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দান করা। ওয়ারেন হেস্টিংস্ সর্বপ্রথম গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন।

হিন্দুদের বিচারে হিন্দু ধর্মশাস্ত্র এবং মুসলমানদের বিচারে কোরাণ ও হদিসের বিধি প্রয়োগের ব্যবস্থা করিলেন। জরিমানার পরিমাণ যাহাতে অত্যধিক না হয় এবং সুদের পরিমাণ যাহাতে হ্রাস করা হয়, সেই ব্যবস্থাও তিনি করিয়াছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিস (১৭৮৬-৯৩ খ্রীঃ): লর্ড কর্ণওয়ালিস কোম্পানির আভ্যন্তরীণ শাসনে দুর্নীতি দূর করিবার এবং শাসনব্যবস্থাকে সুষ্ঠু ও সুবিন্যস্ত করিবার দায়িত্ব লইয়াই ভারতে আসিয়াছিলেন। প্রথমেই তিনি ইংরেজ কর্মচারীদের বেতন বাড়াইয়া দিয়া তাহাদের অবৈধ উপার্জনের পথ দৃঢ়ভাবে বন্ধ করিয়া দিলেন। তিনি অবশ্য ভারতীয়দের উপর কোন প্রকার শাসনসংক্রান্ত দায়িত্ব দিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। কোম্পানির কর্মচারিগণের সততা ও আনুগত্যের উপর বিশেষ জোর দিয়া তিনি কোম্পানির শাসনব্যবস্থাকে কতক পরিমাণে সুদক্ষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনিই ভারতের সিভিল সার্ভিসের (I.C.S.) গোড়াপত্তন করিয়াছিলেন। পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কারসাধন করিতে গিয়া তিনি দেশীয় জমিদারদের পুলিশী ক্ষমতার বিলোপসাধন করিলেন এবং গ্রামাঞ্চলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক একটি এলাকায় এক এক জন দারোগা নিযুক্ত করিলেন। পূর্বে কোম্পানির কর্মচারিগণ দেশীয় দালালদের নিকট হইতে কোম্পানির জন্য পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া কোম্পানির নিকট বিক্রয় করিত। ইহাতে তাহাদের প্রচুর লাভ হইত। কর্ণওয়ালিস সরাসরি দালালদের নিকট হইতে পণ্যদ্রব্যাদি ক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়া কোম্পানির আয় প্রচুর বাড়াইয়াছিলেন।

কর্মচারীদের দুর্নীতি দূরীকরণের ব্যবস্থা

পুলিশী ব্যবস্থার সংস্কার

কোম্পানির বাণিজ্য-সংক্রান্ত সংস্কার

কর্ণওয়ালিস ওয়ারেন হেস্টিংস্-প্রবর্তিত বিচারব্যবস্থাকে আরও উন্নত করিলেন। সদর নিজামত আদালত ছিল মুর্শিদাবাদে অবস্থিত, তিনি উহা কলিকাতায় স্থানান্তরিত করেন। পূর্বে নবাব ছিলেন উহার সর্বোচ্চ ভারপ্রাপ্ত। কর্ণওয়ালিস সেই ভার গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত করিলেন। ইহা ভিন্ন উহার অধীনে চারিটি ভ্রাম্যমাণ বিচারালয় স্থাপন করিলেন এবং বিচারকগণ দেশের বিভিন্নাংশে উপস্থিত হইয়া যাহাতে বিচারকার্যাদি সম্পাদন করিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করিলেন। পূর্বেকার দণ্ডবিধির কঠোরতা হ্রাস, আইনের চক্ষে সকলের সমতা এবং সাক্ষ্য গ্রহণের রীতি পরিবর্তন প্রভৃতি করিয়া তিনি বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন। রাজস্ব বিভাগ হইতে তিনি দেওয়ানী বিচারালয়কে পৃথক করিয়া সদর দেওয়ানী আদালতের অধীনে পর্যায়ক্রমে

বিচারব্যবস্থার সংস্কার



লর্ড কর্ণওয়ালিস

প্রাদেশিক বিচারালয়, জেলা বিচারালয়, সদর আমিন ও মুনসেফী বিচারালয় স্থাপন করিলেন। তিনি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারক্ষমতা বাতিল করিয়া দিয়া কেবল শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব দিয়াছিলেন।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য সংস্কার ছিল তাঁহার প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পূর্বে কোম্পানি পাঁচ বৎসরের জন্য, পরে আবার এক বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ইহাতে যাহারা জমিদারি গ্রহণ করিত তাহারা জমির উন্নতি সম্পর্কে উদাসীন থাকিত। কারণ তাহাদের হাতে

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩ খ্রীঃ)

জমিদারি সব সময় থাকিবে ইহার কোন নিশ্চয়তা ছিল না। পক্ষান্তরে কোম্পানির বৎসরে মোটামুটি কি পরিমাণ রাজস্ব আদায় হইবে সেই সম্পর্কে পূর্বেই ধারণা না পাওয়ায় বাজেট প্রস্তুত করিতে অসুবিধার সৃষ্টি হইত। এজন্য তিনি প্রথমে দশ বৎসরের জন্য জমি বন্দোবস্ত দিলেন এবং ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া সেই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী করিয়া দিলেন

গুণ-অপগুণ

(১৭৯৩ খ্রীঃ)। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের গুণ এবং অপগুণ উভয়ই ছিল। রায়তদের উচ্ছেদ, অতিমাত্রায় রাজস্ব আদায় প্রভৃতি কিছুকালের মধ্যে এই ব্যবস্থার ত্রুটি হিসাবে প্রকাশ পাইল। ইহা ভিন্ন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির দাম বৃদ্ধি পাইলেও সরকার রাজস্ব বাড়াইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল। অবশ্য জমিদারগণের অনেকে জমির উন্নয়ন, প্রজাবর্গকে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতির কালে সাহায্যদান, শিক্ষার জন্য বিদ্যালয় স্থাপন, জলাশয় খনন, রাস্তা নির্মাণ প্রভৃতিও করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে গুণ অপেক্ষা দোষের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় জমিদারি প্রথার বিলোপ ঘটান হইয়াছে।

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫ খ্রীঃ): প্রধানত সংস্কার কার্যাদির জন্যই লর্ড বেণ্টিঙ্ক ভারত-ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন। প্রথমেই তিনি রাজস্ব ব্যবস্থার কতক পরিবর্তন করিয়া কোম্পানির আর্থিক অনটন দূর করিলেন। সেই সময়ে ভারত হইতে চীনে আফিং চালান হইত। তিনি আফিং ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিয়া

রাজস্ব-সংস্কার

কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করিলেন। বিচার যাহাতে দ্রুত সম্পন্ন হইতে পারে সেজন্য তিনি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আপীল আদালত তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি

বিচারব্যবস্থার সংস্কার

কর্ণওয়ালিস-প্রবর্তিত বিচার-ব্যবস্থায় ভারতীয়দের নিয়োগ না



লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক

করিবার নীতি বাতিল করিলেন এবং যে-সকল ভারতীয় বিচারক হিসাবে কাজ করিতেন

তাঁহাদের বিচারক্ষমতা বাড়াইয়া দিলেন। বিচারালয়ে স্থানীয় ভাষা ব্যবহারের নিয়ম তিনিই চালু করিয়াছিলেন।

সমাজ-সংস্কারের জন্যই বেণ্টিঙ্কের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এ-বিষয়ে তিনি রাজা রামমোহন রায়ের সমর্থন পাইয়াছিলেন। তিনি ঠগী নামক দস্যুদের দমন করিয়া স্থান হইতে স্থানান্তরে যাইবার নিরাপত্তা বিধান করিয়াছিলেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট অনুসারে কোম্পানিকে বৎসরে শিক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইত। এই অর্থ কেবল প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হইত। রাজা রামমোহন এই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের জন্য ব্যয় করিবার জন্য লর্ড আমহার্স্টের নিকট পূর্বে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হয় নাই। রাজা রামমোহন শিক্ষিত বাঙালী সমাজের ইচ্ছাই যে প্রকাশ করিয়াছিলেন সেকথা বেণ্টিঙ্ক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এদিকে সেক্রেটারি প্রিন্সেপ সাহেব ছিলেন প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পক্ষপাতী আর গভর্ণর-জেনারেলের সভার আইনসদস্য লর্ড ম্যাকলে ছিলেন পাশ্চাত্য ভাষা, সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের পক্ষপাতী। বেণ্টিঙ্ক ম্যাকলের মত গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারী অর্থ ব্যয়ের ব্যবস্থা করিলেন। তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজ (১৮৩৫ খ্রীঃ) ও বোম্বাইয়ের এলফিন্‌স্টোন ইন্‌স্টিটিউশান স্থাপন করিয়াছিলেন। এইভাবে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও উন্নতি সাধন করিয়া তিনি ভারতীয়দের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

সতীদাহ নিবারণ

শিক্ষা-সংস্কার

লর্ড ডালহৌসী (১৮৪৮-৫৬ খ্রীঃ): লর্ড ডালহৌসী ভারত-ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী নীতির প্রযোক্তা হিসাবেই সমধিক কুখ্যাত। কিন্তু জনস্বার্থে অবদানও তাঁহার কম ছিল না। তিনি আভ্যন্তরীণ পরিবহণব্যবস্থা, শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নতি-সাধনে যথেষ্ট মনোযোগী ছিলেন। রুর্‌কির এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন, কলিকাতা বেথুন কলেজের ব্যয়ভার বহন, গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের আধুনিকীকরণ, গঙ্গার খাল খনন, 'মেরিয়া' নামক সমাজবিরোধীদের দমন, ভারতের রেলপথ নির্মাণ প্রভৃতি জনহিতকর কার্য তিনি সম্পন্ন করেন। ইহা ভিন্ন টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, ডাক চলাচল ও বিলির সুষ্ঠু ব্যবস্থা, পাঞ্জাবে সামরিক চলাচলের প্রয়োজনীয় রাস্তাঘাট নির্মাণ, বনসংরক্ষণ, চা-বাগানের উন্নয়ন প্রভৃতির জন্যও তাঁহার কার্যকাল স্মরণীয়। শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন কলেজের অনুপাতে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যার অপ্রতুলতা প্রভৃতির অব্যবস্থা দূরীকরণের প্রয়াস, শিক্ষা পরিদর্শন সংক্রান্ত সরকারী বিভাগ স্থাপন প্রভৃতির জন্য ভারতের শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাঁহার অবদান কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিবার যোগ্য।

আভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ

এই সূত্রে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে স্যার্ চার্লস্ উডের প্রতিবেদন (Wood's Dispatch) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেই যুগে বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষার উপর

অধিক গুরুত্ব দেওয়া হইত, অথচ প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ অবহেলিত হইত। পক্ষান্তরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে কেবল প্রাথমিক শিক্ষার উপরই জোর দেওয়া হইত। চার্লস্ উডের প্রতিবেদনে প্রাথমিক শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপের নির্দেশ ছিল। শিক্ষার ভিত্তি রচনায় ইহার অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, বলা বাহুল্য। লর্ড ডালহৌসী উডের এই নির্দেশ পূর্ণমাত্রায় সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন সরকারী সাহায্যের দ্বারা হাই স্কুল ও কলেজীয় শিক্ষার উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তাও উডের প্রতিবেদনে উল্লিখিত ছিল। শিক্ষাব্যবস্থার সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়া শিক্ষার কাঠামোকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিবার প্রয়োজনীয়তাও এই প্রতিবেদনে স্বীকৃত হইয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল (১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ)।

উডের প্রতিবেদন (Wood's Dispatch)

লর্ড রিপন* (১৮৮০-৮৪ খ্রীঃ) : লর্ড রিপনের শাসনকালে শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের অংশগ্রহণের দাবি স্বীকৃত হইয়াছিল। এজন্য লর্ড রিপনের নাম ভারতবাসী কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করে। ভারতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল লর্ড রিপন স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনভার ভারতীয়দের হস্তে ন্যস্ত করেন। গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাট নির্মাণ, শিক্ষার প্রসার, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, মহামারী ও সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রভৃতির ভার তিনি লোক্যাল বোর্ড নামক প্রতিনিধিসভার হস্তে ন্যস্ত করেন। ইহা ভিন্ন কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থার উন্নতি বিধান করিয়া এবং শহরাঞ্চলে উহার ব্যাপক প্রয়োগ করিয়া তিনি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ভার ভারতীয়দের উপর ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। নির্বাচনের মাধ্যমে অধিকাংশ সদস্য, মেয়র, চেয়ারম্যান প্রভৃতি নিয়োগের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন। এই সকল সংস্থাকে তিনি অধিকতর দায়িত্বশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন। অবশ্য কর্তব্যকার্যে অবহেলা করিলে এই সকল স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠান সরকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবে এই ব্যবস্থাও তিনি রাখিয়াছিলেন।

স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ভার ভারতীয়দের উপর ন্যস্তকরণ



লর্ড রিপন

লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-পত্রগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক কার্যকলাপের সমালোচনার অধিকার

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনরায় স্বীকৃত

* নবম শ্রেণীর পাঠ্যসূচীতে লেখা আছে *History of India up to the Middle of the 19th Century* এবং ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ পর্যন্ত উহা লিখিবার নির্দেশ আছে। অথচ ১৮৮০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপনের সংস্কার ইহাতে সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। যাহা হউক, সিলেবাসে যখন দেওয়া হইয়াছে সেজন্য রিপনের সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা দেওয়া হইল।

বাতিল করিয়া দিয়াছিলেন। লর্ড রিপন দেশীয় পত্রিকাগুলির সেই অধিকার পুনরায় ফিরাইয়া দিয়াছিলেন।

হাণ্টার কমিশন

শিক্ষার উন্নতির জন্য রিপন 'হাণ্টার কমিশন' নামে একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগ করিয়াছিলেন। ভারতে উচ্চ শিক্ষার তুলনায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা অতি সামান্য মাত্রায় বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং সেজন্য প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত এই সুপারিশ হাণ্টার কমিশন করিলে লর্ড রিপন উহা গ্রহণ করেন এবং সরকারী শিক্ষানীতির প্রবর্তন করেন।

বিচারব্যবস্থার সংস্কার : ইল্‌বার্ট বিল

সেই সময়ে ভারতীয় বিচারপতিগণ ইওরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন না। বিচারকদের মধ্যে ব্যক্তিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বিচারক্ষমতার তারতম্য থাকা রিপন অযৌক্তিক ও অন্যায় মনে করিলেন। তিনি স্যার্ ইল্‌বার্টের উপর এই বৈষম্য দূর করিবার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের ভার দিলেন। ইওরোপীয় বিচারপতিগণ ইহা তাঁহাদের পক্ষে অপমানজনক মনে করিয়া ইল্‌বার্ট বিলের বিরোধিতা শুরু করিলেন। পক্ষান্তরে, ভারতীয়রা এই বিলের সমর্থন করিয়া আন্দোলন শুরু করিলেন। এই আন্দোলনের তীব্রতার ফলে লর্ড রিপন আইনের খসড়ার কতক পরিবর্তন করিলেন। এই পরিবর্তনের ফলে স্থির হইল যে, ভারতীয় বিচারকদের বিচারালয়ে ইওরোপীয়দের বিচার হইলে ইওরোপীয়গণ ইচ্ছা করিলে অধিকাংশ ইওরোপীয় লইয়া জুরি গঠনের দাবি করিতে পারিবেন। এই ব্যবস্থায় ইওরোপীয় ও ভারতীয় বিচারকদের বৈষম্য পূর্ণমাত্রায় দূরীভূত হইল না বটে, কিন্তু এই বিল লইয়া আন্দোলন করিতে গিয়া ভারতীয়গণ তাঁহাদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার জন্য কিভাবে আন্দোলন করিতে হয় সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন।

কারখানা আইন

লর্ড রিপন প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করিয়া প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরবর্তী কালে আইন পাশ করা হইয়াছিল। তিনি একটি 'কারখানা আইন' পাশ করিয়া শিশু শ্রমিকদের মোট নয় ঘণ্টার বেশী কাজ করান নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। বিপজ্জনক যন্ত্রপাতি উপযুক্তভাবে ঘেরিয়া রাখার এবং সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা কারখানা পরিদর্শনের ব্যবস্থা তিনি করিয়াছিলেন।

বাণিজ্যিক সংস্কার

তিনি অবাধ-বাণিজ্য নীতির প্রচলন করিয়া এবং লবণ, মদ ও অস্ত্রশস্ত্র ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের উপর হইতে শুল্ক উঠাইয়া দিয়া বাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। লর্ড রিপনের উদার কার্যকলাপ ব্রিটিশ সরকারের মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

(২) ভারতীয়দের চেষ্টায় সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সংস্কার
(Social, Cultural and Religious Reforms under Indian Initiative)

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা সমগ্র ভারতকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডিতে ভাগ করিয়া দিয়াছিল। সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সর্বক্ষেত্রে ক্রমে এক অন্তর্মুখিতা ও আত্মবিস্মৃতি দেখা দিয়াছিল। ভারত-ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছিল। সংস্কৃতির ধর্মই হইল আঘাতের মধ্য দিয়া অগ্রসর হওয়া। আবদ্ধ জলে যেমন স্রোত আসে না বা জোয়ার-ভাঁটা খেলে না, সেরূপ আবদ্ধ সংস্কৃতিরও কোন অগ্রগতি থাকে না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত ভারত-ইতিহাসে এই বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

সপ্তদশ শতকের শেষভাগ হইতে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগ পর্যন্ত ভারতের অন্ধকার যুগ

পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশেই সর্বপ্রথম বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সেজন্য এই নূতন প্রভাবের ফলে যে এক নবজাগরণ ও নবচেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার কেন্দ্রস্থল ছিল বাংলাদেশ, আর তাহার ধারক ও বাহক ছিল বাঙালী জাতি। আরব দেশের সহিত বাণিজ্য-ব্যপদেশে আরবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব ইতালিতে বিস্তার লাভ করিবার ফলে যেমন ইওরোপীয় রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত হইয়াছিল সেইরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করিয়া ভারতীয় রেনেসাঁসের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। ইওরোপীয় রেনেসাঁসের ক্ষেত্রে ইতালি ও ইতালীয় জাতি যেরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল ভারতের রেনেসাঁস বা নবজাগরণে অনুরূপ অংশগ্রহণ করিয়াছিল বাঙালী জাতি ও বাংলাদেশ। ফলে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্মের ক্ষেত্রে এক যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল। সমাজ-সংস্কার, কুসংস্কার হইতে মুক্তি, বিধবা-বিবাহ, সমাজের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িতদের মুক্তি সাধন, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন—সব দিক্ দিয়া এক ব্যাপক মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই সময়কার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের চেষ্টায় সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম—সকল ক্ষেত্রে এক ব্যাপক সংস্কার সাধিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশে নবজাগরণের সূত্রপাত

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩ খ্রীঃ): ইওরোপীয় রেনেসাঁস যুগের ইতালির সহিত রেনেসাঁস যুগের—অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশের যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল। পেত্রার্ক, বোকাচো প্রভৃতি হিউম্যানিস্ট বা মানবধর্মী যেমন ইতালিতে নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন সেইরূপ ভারতের নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন মানবধর্মী বাঙালী মনীষী রাজা রামমোহন রায়। মানবধর্মী বা হিউম্যানিস্ট-সুলভ অনুসন্ধিৎসা, সংস্কারক-সুলভ মনোবল ও ঋষি-

বাংলাদেশ—ইওরোপের ইতালি : রামমোহন হিউম্যানিস্ট

সুলভ প্রজ্ঞা লইয়া। ভারতপথিক (কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্মানিত) রামমোহন এক যুগ-প্রবর্তনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শের শাহ্, আকবর প্রভৃতি উদারচেতা সুলতান-বাদশাহের প্রভাবে হিন্দু ও ইস্‌লামীয় ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির আংশিক সমন্বয় সাধিত হইলেও সম্পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিতে পারে নাই। ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যখন এদেশে বিস্তার লাভ করিল তখন হিন্দু, ইস্‌লামীয় ও পাশ্চাত্য—এই তিন প্রকার শিক্ষা, সংস্কৃতির সমন্বয়সাধনের প্রয়োজন হইল। এই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই রাজা রামমোহন রায় এই তিনের সমন্বয়-সাধন করিয়া এক নবযুগের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন।

হিন্দু, ইস্‌লামীয় ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়সাধক রামমোহন



রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় গ্রীক, হিব্রু, ইংরেজী, সীরীয় প্রভৃতি কোন ভাষার, বা হিন্দু, মুসলমান ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সারমর্ম উপলব্ধি করিতে ত্রুটি করেন নাই। এই সকল জাতির সাহিত্য, ধর্ম ও সংস্কৃতির আলোচনার ফলে তাঁহার মনে এই সত্যটি প্রকট হইয়া উঠিল যে সকল ধর্ম মূলত একই ভগবানে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অর্থহীন আচার-আচরণ, সামাজিক বা ধর্মীয় বাধানিষেধ কোন কিছুরই প্রকৃত মূল্য নাই। এজন্য তিনি হিন্দু ধর্মকে সংস্কারমুক্ত করিতে চাহিলেন। তাঁহার এই আগ্রহের ফলেই ব্রাহ্ম সমাজের গোড়া-পত্তন হইল (১৮২৮ খ্রীঃ)। শুধু ধর্মের ক্ষেত্রেই নহে—শিক্ষা, রাজনীতি, সমাজ সর্বত্র তিনি চাহিলেন এক নবযুগের, এক নূতন জীবনাদর্শের প্রবর্তন করিতে।

রাজা রামমোহন রায়ের অবদান

বাংলাদেশে তথা ভারতবর্ষে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন ব্যাপারে রাজা রামমোহন রায়ের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ভারতেও যাহাতে অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে সেজন্য তিনি তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের অনুরোধ ও প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্টে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার যে ব্যবস্থা করা হইয়াছিল তাহা সংস্কৃত, আরবী ও ফারসী শিক্ষার জন্য সরকার ব্যয় করিতে লাগিল। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা

লর্ড আমহার্স্টের নিকট রাজা রামমোহন রায়ের আবেদন ও প্রতিবাদ

তদানীন্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাগ্রহণের যে আগ্রহ দেখা দিয়াছিল তাহারই দাবি সরকারের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। যাহা হউক, ডেভিড্ হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২ খ্রীঃ) ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় কয়েকটি ইংরেজী শিক্ষার স্কুল এবং ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। পরে (১৮৫৫ খ্রীঃ) ইহাই প্রেসিডেন্সী কলেজ নাম ধারণ করিয়াছে। ডেভিড্ হেয়ার বাংলাদেশে তথা ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ-গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান তিনি স্থাপন করিয়া ইংরেজী ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ডেভিড্ হেয়ার : হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা

স্কটিশ ধর্মযাজক আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ও রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায় কলিকাতায় পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য 'জেনারেল এ্যাসেম্ব্লীজ ইন্স্টিটিউশান' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজই হইল আলেকজাণ্ডার ডাফ্-প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বর্তমান রূপ।

আলেকজাণ্ডার ডাফ্

রাজা রামমোহন রায় কেবল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উন্নয়ন, জাতিভেদ প্রথার দূরীকরণ, নারী জাতির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির চেষ্টা প্রভৃতি দ্বারা তিনি বাঙালীর শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন। সতীদাহ প্রথা নিবারণে তাঁহার সাহায্য ও সহায়তা না থাকিলে লর্ড বেণ্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ। হিন্দু বিধবাদের পুনঃ-বিবাহ, তাঁহাদিগকে সম্পত্তির অংশদান প্রভৃতি সংস্কারমূলক কার্যের জন্য চেষ্টা করিয়া রাজা রামমোহন রায় তাঁহার উন্নত মনের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছিলেন। এককথায় বলিতে গেলে তিনি ছিলেন ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের প্রকৃত উদ্যোক্তা। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন এবং ভারতীয়দের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার জন্য রাজা রামমোহন রায় যে চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন সেই পথ অনুসরণ করিয়াই পরবর্তী কালে ভারতের জাতীয় আন্দোলন ও সমাজ উন্নয়নের চেষ্টা চলিয়াছিল। এই সকল দিক্ দিয়া বিচার করিলে রামমোহনকে বাংলা তথা ভারতের রেনেসাঁস বা নবজাগরণের প্রবর্তক তথা ভারতের 'প্রথম আধুনিক মানুষ' বলিয়া আখ্যা দেওয়া যুক্তিযুক্ত হইবে।

রাজা রামমোহন রায়ের বহুমুখী মনীষা

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত

ডি'রোজিও (১৮০৯-৩১ খ্রীঃ) ও ইয়ং বেঙ্গল: রাজা রামমোহন রায়ের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ 'ইয়ং বেঙ্গল' (Young Bengal) ও 'ইয়ং বোম্বে' (Young Bombay) ভারতীয় সমাজ-জীবনের পুরাতন সবকিছুরই পরিবর্তনসাধন করিয়া, সবকিছু ভাঙিয়া-চুরিয়া এক নূতন রূপদানে সচেষ্ট হইয়াছিল। প্রাচীনকে ভাঙ্গিবার চেষ্টায় বিশেষভাবে 'ইয়ং বেঙ্গল' তদানীন্তন হিন্দু সমাজকে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের অধিক আঘাত হানিয়াছিল, তথাপি একথা স্বীকার করিতেই

'ইয়ং বেঙ্গল' ও 'ইয়ং বোম্বে'

হইবে যে তাহাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে বাঙালী জাতির জড়তা দূরীভূত হইয়া নবজাগরণের বিস্তৃতির পথ প্রস্তুত হইয়াছিল। ডেভিড্ হেয়ার, বেথুন, ডি'রোজিও প্রভৃতির অবদানও এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডি'রোজিও ছিলেন একজন এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান। শিক্ষান্তে তিনি হিন্দু কলেজে পাঁচ বৎসর অধ্যাপনার কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ম বুদ্ধি, দেশাত্মবোধ, সত্যের প্রতি পরম শ্রদ্ধা, স্বাধীনতা ও সমতার প্রতি অনুরাগ তাঁহাকে সমসাময়িক কালের সমাজ-সংস্কার ও জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে স্থাপন করিয়াছিল। ডি'রোজিও ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল আন্দোলনের প্রধান নেতা। তিনি এবং তাঁহার অনুগামীরা রামমোহন রায় অপেক্ষাও অধিকতর উদারপন্থী ছিলেন। তিনি রামমোহন রায় এবং ফরাসী বিপ্লবের ধারায় গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। শিক্ষক হিসাবে তাঁহার দক্ষতা, যুক্তিবাদে তাঁহার বিশ্বাস, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, মানুষ মাত্রেরই সমতা প্রভৃতির প্রতি তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় তাঁহাকে এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে দুর্ধর্ষ দেশপ্রেমিকে পরিণত করিয়াছিল। ছাত্রদের উপর তিনি এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন এবং এক বিরাট সংখ্যক ছাত্র (Derozian boys) তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় বিশেষ উল্লেখ্য। তাঁহার উপর তাহাদের গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ডি'রোজিওর অতি-উদার মতবাদ প্রচারে সাহায্য করিয়াছিল। ডি'রোজিওকে সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী কবি বলা ভুল হইবে না। তিনি মাতৃভূমির স্তুতি করিয়া ইংরেজীতে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার অতি-উদার মতবাদের জন্য তাঁহাকে হিন্দু কলেজে শিক্ষকতার কাজ ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। ইহার সামান্য দিনের মধ্যেই মাত্র ২২ বৎসর বয়সে কলেরা রোগে আক্রান্ত হইয়া ডি'রোজিও মৃত্যুমুখে পতিত হন।

ডেভিড্ হেয়ার, বেথুন, ডি'রোজিও

ডি'রোজিওর চিন্তাধারা



ডি'রোজিও

ডি'রোজিও ও তাঁহার অনুগামিগণ দেশের প্রচলিত প্রাচীন রীতি-নীতি, সামাজিক আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান, ঐতিহ্য সবকিছুর কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। স্ত্রী-জাতির সামাজিক অধিকার, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার প্রভৃতির জন্য তাঁহারা সোচ্চার ছিলেন। সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, সভাসমিতির মাধ্যমে ডি'রোজিয়ানগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংস্কারের কথা প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন সমাজের ধ্যানধারণার পক্ষে তাঁহাদের মতবাদ অত্যধিক অগ্রসর ছিল বলিয়া তাঁহাদের প্রচার

সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ডি'রোজিয়ানদের আন্দোলন

কোন প্রকৃত আন্দোলনের রূপ লাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহাদের প্রচারকার্যাদি কতকটা কেতাবী ধরনের ছিল। যাহা হউক, তাঁহারা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, কোম্পানির চার্টার এ্যাক্টের পরিবর্তন, জুরির সাহায্যে বিচার, জমিদারের অত্যাচার হইতে রায়তদের রক্ষা করা, ভারতীয়দের উচ্চ সরকারী কর্মচারী-পদে নিয়োগ প্রভৃতি নানাপ্রকার উন্নতিমূলক ব্যবস্থার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতবাদ গ্রহণ করিবার মত অগ্রসরতা তখনকার সমাজের ছিল না এজন্য তাঁহারা কৃতকমর্ হইতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহারা বাংলাদেশের আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতির পথিকৃৎ ছিলেন, ইহা অনস্বীকার্য।

ব্রাহ্ম সমাজ: রাজা রামমোহন হিন্দু ধর্মের অসার, আনুষ্ঠানিক দিক্‌টা বর্জন করিয়া বেদান্ত ও উপনিষদের ভিত্তিতে উহাকে কুসংস্কারমুক্ত এবং একেশ্বরবাদী করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার স্থাপিত 'আত্মীয় সভা' পরবর্তী কালের ব্রাহ্ম সমাজের সূচনা বলা যাইতে পারে। সর্বজনীনত্বই ছিল রামমোহন রায়ের ধর্মমতের মূল কথা। তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্ম ধর্ম হিন্দু ধর্ম হইতে পৃথক ছিল একথা মনে করা ভুল হইবে। বস্তুত মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথের ভাষায়, তিনি ছিলেন 'ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ' (Brahmin of the Brahmins)। তাঁহার ধর্মমতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন, ইস্‌লাম ও খ্রীষ্ট ধর্মমতের মূলগত একেশ্বরবাদেরই প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ব্রাহ্ম ধর্ম রামমোহন-প্রবর্তিত ধর্মমত হইতে অনেকটা পৃথক হইয়া পড়িয়াছিল, একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে।

রামমোহন কর্তৃক ব্রাহ্ম ধর্মের প্রচার

যাহা হউক, রামমোহনের আরব্ধ কার্য পরবর্তী কালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রীঃ) ও কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪ খ্রীঃ) সম্পন্ন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনকে ব্যাপক করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইলেন। ক্রমে অক্ষয়কুমার দত্তের (১৮২০-৮৬ খ্রীঃ) নেতৃত্বে বেদের অপৌরুষেয়তার সমালোচনা শুরু হইল। যুক্তিবাদের মাধ্যমে সবকিছু বিচার করিয়া দেখিবার এক প্রবণতা দেখা দিল। কেশবচন্দ্র সেনের বাগ্মিতা ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলনের প্রতি এক ব্যাপক ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করিল। অনেকে ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিয়া এই আন্দোলনের সামিল হইলেন। কেশবচন্দ্র সেনই ব্রাহ্ম ধর্ম বলিতে কি বুঝায় তাহা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র সেনের প্রগতিশীল সংস্কার নীতির সহিত মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও তাল রাখিয়া উঠিতে পারিলেন না। তিনি কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরবর্গকে ব্রাহ্ম সমাজ হইতে বহিষ্কার করিলেন। কেশবচন্দ্র ও তাঁহার অনুচরবৃন্দ একটি প্রতিদ্বন্দ্বী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন।

দেবেন্দ্রনাথ, কেশব সেন ও ব্রাহ্ম সমাজ

কেশবচন্দ্র যীশু খ্রীষ্টের ধর্মনীতির উপর ভিত্তি করিয়া অনুশোচনা ও ভগবদ্‌প্রেম ব্রাহ্ম ধর্মের মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করিলেন। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব সংকীর্তনের

অনুকরণে ব্রাহ্ম সমাজেও সংকীর্তন চালু করিলেন। এইভাবে তিনি যীশুবাদ ও চৈতন্য-বাদের সংমিশ্রণ সাধন করিলেন। চৈতন্যবাদের প্রভাবে ব্রাহ্ম সমাজেও ভক্তিবাদের বিস্তার ঘটিল। ব্রাহ্ম সমাজের অগ্রগতিশীল দলের স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী-শিক্ষা সম্পর্কে অত্যধিক উদার মতবাদ কেশবচন্দ্র সেনের মনঃপূত হইল না। পর্দা প্রথা উঠাইয়া দেওয়া, স্ত্রীজাতিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা দেওয়া বা স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক হইবে না—এই ছিল কেশব সেনের ধারণা। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশব সেন নিজ নাবালিকা কন্যাকে কোচবিহারের হিন্দু মহারাজের সহিত বিবাহ দিলে প্রগতিপন্থিগণ তাঁহার নেতৃত্ব ত্যাগ করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' নামে এক নূতন ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিলেন। কেশবচন্দ্র সেন-পরিচালিত ব্রাহ্ম সমাজ 'নববিধান' নামে পরিচিতি লাভ করিল।

'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ' ও 'নববিধান'



কেশবচন্দ্র সেন

সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ শাসনতান্ত্রিক উপায়ে সমাজ-সংস্কার সাধনের পক্ষপাতী ছিল। পর্দা প্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি পরিত্যাগ এবং বিধবা-বিবাহ, স্ত্রীজাতির উচ্চ শিক্ষা প্রভৃতি নানাবিধ প্রগতিশীল সংস্কারের জন্য সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ দাবি উত্থাপন করিল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইনের সমর্থন করিয়াছিলেন, ইহাতে হিন্দু সমাজের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব যে বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, উপরি-উক্ত সমাজ-সংস্কারের দাবির সবকয়টিই ক্রমে হিন্দু সমাজে গৃহীত হইয়াছে। জাতিভেদ প্রথার ক্ষেত্রে একথা বলা যাইতে পারে। জাতি বিসর্জন না দিয়াও অপর জাতির লোকের সহিত বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, সমুদ্র যাত্রা প্রভৃতি করা যায় এই রীতি হিন্দু সমাজেও আজ সর্বজনস্বীকৃত হইয়াছে। এই সকল দিক্ দিয়া বিচার করিলে নব যুগের সৃষ্টিতে ব্রাহ্ম সমাজের দান যথেষ্ট রহিয়াছে। অবশ্য একেশ্বরবাদ প্রচারে ব্রাহ্ম সমাজ অকৃতকার্য হইয়াছে একথা অনস্বীকার্য।

ব্রাহ্ম সমাজ ও সমাজ-সংস্কার

ঈশ্বরচন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১ খ্রীঃ): বাংলাদেশে নবজাগরণের পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছিল পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মনীষায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অসাধারণ কৃতিত্বের সহিত শিক্ষা সমাপন করিয়া প্রথমে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে প্রধান পণ্ডিত হিসাবে কার্য গ্রহণ

পরিচয়

করেন। স্মৃতি পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য 'ল কমিটি' (Law Committee) তাঁহাকে 'বিদ্যাসাগর' উপাধি দিয়াছিলেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করেন। অল্প কালের মধ্যেই তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে উন্নীত হন। সেই সময় তিনি সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপরাপর জাতির ছাত্রের প্রবেশাধিকার এবং পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা (Logic) সম্পর্কে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিতে সচেষ্ট হন।



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ছিলেন ব্যক্তিগত মর্যাদার প্রতীকস্বরূপ। কর্তৃপক্ষের সহিত মতানৈক্য ঘটিবার ফলে তিনি পদত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই সময়কার ইওরোপীয়দের আচরণে ভারতীয়দের প্রতি যে অমর্যাদা ও অবহেলা প্রদর্শিত হইত তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর দ্বিধাবোধ করেন নাই। যে সময়ে সাহেব কর্তৃপক্ষের খোশামোদ করা এবং তাহাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের নিকট নতি স্বীকার করা ছিল শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেরই স্বভাব, সেই সময়ে সম্পূর্ণ দেশীয় পোশাক—ধুতি, চাদর এবং চটি পরিহিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহেবদের ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ এবং প্রতিকার করিয়া বাঙালী তথা ভারতীয়দের আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

ব্যক্তিগত মর্যাদাবোধ

সমাজ-সংস্কারক হিসাবেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা তথা ভারত-ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া আছেন। বাংলাদেশের স্ত্রীলোকের সামাজিক মর্যাদা, তাঁহাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রভৃতি সম্পর্কে এই মহামনীষী যতদূর করিয়াছিলেন তাহা অপর কেহ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। স্ত্রীজাতিকে শিক্ষিত করিয়া তুলিতে পারিলেই তাঁহারা সমাজের গলগ্রহরূপে থাকিবেন না, সমাজে তাঁহাদের স্থান স্বীকৃত হইবে একথা উপলব্ধি করিয়া তিনি 'হিন্দু ফিমেল স্কুল' (Hindu Female School) স্থাপনে বেথুন সাহেবকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তিনি রাধাকান্ত দেব, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতির সাহায্য-সহযোগিতা পাইয়াছিলেন। সংস্কৃতে অনন্যসাধারণ পণ্ডিত হইলেও ঈশ্বরচন্দ্র ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং সংস্কৃত কলেজে চাকরি করিবার কালে সেখানে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাংলা ভাষার উন্নতিসাধনে বিদ্যাসাগরের অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি শিশুদের এবং বয়স্কদের জন্য সাহিত্য রচনা করিয়া বাংলা ভাষা

সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর : স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা

ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের উপর গুরুত্ব দান

ও সাহিত্যের উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি স্কুলের সর্বস্তরের শিক্ষার্থীর জন্য 'বোধোদয়', 'বর্ণপরিচয়', 'কথামালা', 'ঋজুপাঠ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলা ভাষায় 'বেতাল-পঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি রচনার দ্বারা বাংলা ভাষার উন্নতিসাধন করেন। ইহা ভিন্ন, 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা সহজতর করিয়া তোলেন।

বিধবা-বিবাহের আন্দোলনের সাফল্য

হিন্দু সমাজে বিধবাদের দুর্গতি লক্ষ্য করিয়া ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাদের পুনরায় বিবাহ দেওয়া এবং তাঁহাদিগকে মৃত স্বামীর সম্পত্তির অংশ দেওয়ার জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বিধবা-পুনঃবিবাহ আইনত স্বীকৃত হয়। এজন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান অবিস্মরণীয়। হিন্দুদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথা রদের জন্যও বিদ্যাসাগর আন্দোলন শুরু করিয়াছিলেন। বাংলাদেশের কুলীন ব্রাহ্মণগণ বহুবিবাহ করিতেন। এ-বিষয়ে আইন পাশ হইবার ব্যবস্থা যখন প্রায় স্থির সেই সময়ে মহাবিদ্রোহ (১৮৫৭ খ্রীঃ) শুরু হইলে তাহা আর সম্ভব হয় নাই।

বিদ্যাসাগর ছিলেন নির্ভীক সমাজ-সংস্কারক, অত্যুচ্চ পাণ্ডিত্যসম্পন্ন শিক্ষাবিদ্। তাঁহার দয়াশীলতা, সর্বোপরি তাঁহার মানবহিতৈষণা তাঁহাকে জাগ্রত বাংলার শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে চিহ্নিত করিয়াছিল।

সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খান (১৮১৫-৯৮ খ্রীঃ) : মুসলমান সম্প্রদায় পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ছিল না। ফলে হিন্দুরা যখন পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণ করিয়া সরকারী চাকরি গ্রহণ করিতে থাকিল তখন মুসলমানগণ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রহিয়া গেল। আব্দুল লতিফ প্রমুখ মুসলমান নেতা মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে হাজী মহম্মদ মহসীন মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারের জন্য প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করিলেন। এই অর্থ হইতে সরকার মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করিতে লাগিলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি কতকটা উৎসাহ জন্মিল। কিন্তু এ-বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাজ করিলেন সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খান। পরে ইনি 'স্যার' উপাধি পাইয়াছিলেন। তিনি আলিগড় আন্দোলনের প্রবর্তক ছিলেন। আলিগড়ে ১৮৭৫



স্যার সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খান

আলিগড় আন্দোলন

খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল কলেজ স্থাপিত হইলে উহার সূত্র ধরিয়া আলিগড়ে সমাজ ও শিক্ষার উন্নয়নের জন্য আন্দোলন চালু হইল। ইহা 'আলিগড় আন্দোলন' নামে পরিচিত।

স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খানকে 'মুসলমান সম্প্রদায়ের রামমোহন' বলিয়া কেহ কেহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। তিনি মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে আঘাত না দিয়া মুসলমানদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য চেষ্টিত ছিলেন। তিনি কুসংস্কারের বিরোধী ছিলেন, যুক্তিগ্রাহ্য সামাজিক ও ধর্মীয় রীতি-নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি আল্লা বা ঈশ্বরের বাণী—অর্থাৎ কোরাণকে শুধু ভগবানের বাণী হিসাবে না দেখিয়া সেই অনুসারে কাজ করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার আন্দোলন সমসাময়িক কালের রক্ষণশীল মুসলমান সম্প্রদায় ততটা গ্রহণ না করিলেও বিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত মুসলমানগণ তাঁহার যুক্তিবাদী মতকে গ্রহণ করিয়াছেন।

সমাজ ও ধর্ম সংস্কারক হিসাবে সৈয়দ আহ্‌ম্মদ

স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ খান ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু ও মুসলমানগণকে লইয়া 'ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এ্যাসোসিয়েশান' নামে একটি সংস্থা স্থাপন করেন। কিন্তু ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুসলমান ও ইংরেজদিগকে লইয়া 'মুসলমান এ্যাংলো-ওরিয়েণ্টাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশান অব আপার ইণ্ডিয়া' নামে অপর একটি সংস্থা গঠন করিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রভাব রোধ করা এবং ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে সুদৃঢ় করা। এই সংস্থা কতক পরিমাণে হিন্দু-বিরোধীও ছিল বটে। স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদের ভয় ছিল যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা ভারতে চালু হইলে উহাতে মুসলমান সম্প্রদায় সংখ্যালঘু হইয়া পড়িবে। এই সকল কারণে মুসলমানগণ যাহাতে কংগ্রেসকে সমর্থন না করেন সেই চেষ্টাও করা হইতে লাগিল।

ইউনাইটেড্ ইণ্ডিয়ান পেট্রিয়টিক এ্যাসো-সিয়েশান

ইল্‌বার্ট বিল আন্দোলন অবশ্য স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ সমর্থন করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কে সেই সময় তিনি ভারতমাতার দুইটি চক্ষু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন এবং এই দুই সম্প্রদায়ের ঐক্যের উপর জোর দিয়াছিলেন।

ইল্‌বার্ট বিলের সমর্থন

প্রার্থনা সমাজ: ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রধান নেতা কেশবচন্দ্র সেন মহারাষ্ট্রে ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্য গিয়াছিলেন। তাঁহারই প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজের ন্যায়ই যুক্তিবাদের উপর নির্ভর করিয়া ভগবানের উপাসনা ও সমাজ-সংস্কারের জন্য প্রার্থনা সমাজ নামে একটি সমাজ স্থাপিত হয় (১৮৬৭ খ্রীঃ)। প্রার্থনা সমাজ অবশ্য হিন্দু ধর্মের অংশ হিসাবে, হিন্দু ধর্মের আওতায় থাকিয়া ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার করিতে চাহিয়াছিল। বস্তুত নামদেব, তুকারাম, রামদাস প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় ধর্মগুরুর মূলনীতির উপর ভিত্তি করিয়া প্রার্থনা সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছিল। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা বর্জন, বিধবা-বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদের উন্নয়ন প্রভৃতি অতি-প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের উপর প্রার্থনা সমাজ জোর দিয়াছিল। মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে (১৮৪২-১৯০১ খ্রীঃ)

প্রার্থনা সমাজ—রাণাডে

ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রধান নেতা। তিনি ছিলেন প্রার্থনা সমাজের প্রাণস্বরূপ। ইহার সাফল্য সবই মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের অক্লান্ত চেষ্টায় সম্ভব হইয়াছিল। বিধবা-বিবাহ সমিতি, দাক্ষিণাত্য এডুকেশান সোসাইটি নামক সামাজিক সংস্কার ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সংস্থা দুইটি তিনি স্থাপন করিয়াছিলেন।



মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে

প্রার্থনা সমাজ কেবল মৌখিক প্রচারে তাঁহাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখেন নাই। অসবর্ণ বিবাহ, সমাজের সকল স্তরের লোকদের মধ্যে একই সঙ্গে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া, স্ত্রী-জাতির সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, বিধবা-বিবাহ দেওয়া প্রভৃতি কাজ করিয়া তাঁহারা প্রকৃত সমাজ উন্নয়ন করিয়াছিলেন। পরিত্যক্ত শিশু, পিতৃ-মাতৃহীন অসহায় শিশুদের জন্য অনাথ-আশ্রম তাঁহারা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

রাণাডের আদর্শ

মানুষে মানুষে সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করিয়া ভারতীয়দের এক উন্নততর জীবনের আস্বাদ দান করাই ছিল রাণাডের আদর্শ। মানুষের সেবা ও মানুষের প্রতি ভালবাসা ভগবানকে ভালবাসার পন্থাস্বরূপ বলিয়া তিনি মনে করিতেন। সমাজের উন্নতি রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের উপর নির্ভরশীল, আবার সামাজিক উন্নতি সাধন না হইলে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিবার যোগ্যতাও ভারতবাসীর থাকিবে না, একথা তিনি বলিতেন। সংস্কারক হিসাবে মহাদেব গোবিন্দ রাণাডেকে রাজা রামমোহনের সমগোত্রীয় বলা যাইতে পারে।

আর্য সমাজ—দয়ানন্দ

দয়ানন্দ (১৮২৪-৮৩ খ্রীঃ): আর্য সমাজ : পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া ব্রাহ্ম সমাজ ও প্রার্থনা সমাজ গঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল আর্য সমাজ ও রামকৃষ্ণ মিশন। স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী ছিলেন আর্য সমাজের স্থাপয়িতা (১৮৭৫ খ্রীঃ)। তিনি ছিলেন গুজরাটবাসী এবং একজন সংস্কৃত পণ্ডিত। পাশ্চাত্য শিক্ষা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তাঁহার অন্তর ছিল যেমন উদার তেমনি উচ্চ আদর্শে পরিপূর্ণ। তিনি সমগ্র ভারতে এক ধর্ম ও এক জাতি স্থাপনের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। এজন্য তিনি অ-হিন্দুদের 'শুদ্ধি'র মাধ্যমে হিন্দু ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার রীতি চালু করিয়াছিলেন। তিনি বেদ ও উপনিষদের আদর্শে সমাজকে পুনর্গঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। দয়ানন্দ আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁহার আদর্শ প্রচার করিয়া সমাজ-সংস্কার, সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে ভারতের জনসাধারণের গুরুত্ব সর্বপ্রথম সকলকে

বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। কেবল বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রচার সীমাবদ্ধ থাকিলে সমাজের উন্নতি ঘটিবে না একথা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বাল্য-বিবাহ রদ, জাতিভেদ প্রথার অবসান, স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার, বিধবা-বিবাহ প্রভৃতি ছিল আর্য সমাজের আদর্শ। দয়ানন্দ তাঁহার 'সত্যার্থ-প্রকাশঃ' নামক গ্রন্থে আর্য সমাজের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। আর্য সমাজ ধর্মবিষয়ে উদার-নীতির পক্ষপাতী ছিল। দয়ানন্দ-স্থাপিত আর্য সমাজের প্রধান আদর্শ ছিল হিন্দু ধর্ম ও সমাজ হইতে কুসংস্কার দূর করা এবং বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন করা। অ-হিন্দুকে 'শুদ্ধি'র মাধ্যমে হিন্দু সমাজে গ্রহণ করা ছিল আর্য সমাজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।



স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৬-৮৬ খ্রীঃ): শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন হিন্দু ধর্মের প্রতীকস্বরূপ। কিন্তু তাঁহার উদারতা ও মানবতার মাধ্যমে তিনি সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের পন্থাই প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের পূর্বে তাঁহার নাম ছিল গদাধর চট্টোপাধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষামুক্ত এবং সাধারণ অর্থে অশিক্ষিত এই মহামানব তাঁহার অকৃত্রিম ও হৃদয়স্পর্শী বাণী ও ভাবের দ্বারা হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তির যেমন প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তেমনি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান—সকল ধর্মের প্রতি সমপরিমাণ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া হিন্দু ধর্মকে সংকীর্ণতার গণ্ডিমুক্ত করিয়াছিলেন।

সর্ব-ধর্ম সমন্বয়ের বাণী



শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণ মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম এবং হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণ অনুসরণ করিয়া এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সকল ধর্ম একই ভগবানে পেঁৗছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র। রামকৃষ্ণ সকল জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করিবার উদার শিক্ষা দিয়াছিলেন। জীবের প্রতি দয়া প্রদর্শন করাকে তিনি ধৃষ্টতা মনে করিতেন, জীবের সেবা করাই হইল প্রকৃত ধর্ম একথা তিনি বলিতেন।

সকল ধর্ম একই ঈশ্বরে পেঁৗছিবার বিভিন্ন পন্থা মাত্র

জীবে প্রেম—জীবে দয়া নহে

যে সময়ে শিক্ষিত যুব সমাজ বহির্মুখী হইয়া হিন্দু জাতি ও ধর্মের সবকিছুর প্রতি একটা অবহেলার ভাব পোষণ করিতে শুরু করিয়াছিল সেই সময়ে রামকৃষ্ণ হিন্দু সমাজের সম্মুখে হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি প্রকাশ করিয়া হিন্দুদের আত্মবিস্মৃতির পথ হইতে আত্মদর্শনের পথে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রচলিত মূর্তি পূজার মাধ্যমেও চরম অধ্যাত্ম জ্ঞানলাভের পন্থা প্রদর্শন করিয়া রামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের শক্তির পুনঃপ্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেহরক্ষা করেন।

আত্মদর্শনের মনোবৃত্তি

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রীঃ): শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু জাতিকে নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে নিখিল বিশ্ব-ধর্ম সম্মেলনে হিন্দু ধর্মের আদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া পাশ্চাত্য জাতিকে হিন্দু তথা ভারতীয় ধর্মের প্রতি যেমন শ্রদ্ধাশীল করিয়া তুলিয়াছিলেন, তেমনি বাঙালী তথা ভারতবাসীকে পরধর্ম অনুকরণ না করিয়া নিজস্ব ধর্মের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখাইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণের ধর্মমতে সমাজসেবা ও জীবের প্রতি প্রেম ছিল ধর্মের মূল কথা। এই সূত্রে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী "বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর। জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥" বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। ভারতবাসী যখনই নিজের দিকে দৃষ্টি দিতে শিখিল তখনই ভারতীয় সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, সর্বক্ষেত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়া পাশ্চাত্য প্রভাব গ্রহণের দূরদর্শিতা তাহাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীকে আত্মবিস্মৃতির পথ ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনের পথের সন্ধান বিবেকানন্দ দিয়া গিয়াছিলেন। এ-বিষয়ে তাঁহার রচিত 'বর্তমান ভারত', 'পরিব্রাজক', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'কর্মযোগ', 'ভক্তিযোগ', 'জ্ঞানযোগ' প্রভৃতি পুস্তকের বিষয়বস্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে এক নূতন আদর্শ, এক নূতন চেতনার বিকাশ ঘটিতে লাগিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ মাত্র উনচল্লিশ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন।

রামকৃষ্ণ মিশন — শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ



স্বামী বিবেকানন্দ

পঞ্চদশ অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ
(Reaction against British Rule : Revolt of 1857)

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পটভূমিকা (Background of the Revolt of 1857) : ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহীদের নানাবিধ অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া শুরু হইলেও উহা উত্তর-ভারত ও মধ্য-ভারতের সর্বত্র এক ব্যাপক ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তৃতি অতিশয় দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হইয়াছিল। এইভাবে সাম্রাজ্য বিস্তারের আনুষঙ্গিক শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন স্বভাবতই দীর্ঘকাল প্রচলিত ভারতীয় জীবনযাত্রায় বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল। ফলে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও অসন্তোষ সমাজের প্রতি স্তরেই বিস্তার লাভ করিতেছিল। ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয়দের অর্থনৈতিক শোষণ, জমিদার, অভিজাতবর্গ, কৃষক, শিল্প-শ্রমিক, হস্তশিল্পী—সকল শ্রেণীর লোককেই আর্থিক দিক দিয়া দুর্দশাগ্রস্ত করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশদের রাজস্ব-নীতি, আইন-কানুন ও শাসনব্যবস্থা ভূমি-আশ্রয়ী ব্যক্তিবর্গকে ঋণগ্রস্ত করিয়াছিল। মহাজন ও ব্যবসায়ীদের নিকট তাহাদের ভূসম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার, দুর্নীতিগ্রস্ততা, পুলিশ, আদালতের কর্মচারীদের অর্থগৃধ্নুতা ভারতীয় জনসাধারণের দুর্দশার কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। নিম্ন পর্যায়ের ব্রিটিশ কর্মচারীদের অর্থাগমের প্রধান পথই ছিল জমিদার, কৃষকশ্রেণী প্রভৃতির উপর চাপ দিয়া অবৈধভাবে অর্থ আদায় করা। এই সকল কারণে সাধারণ লোক দারিদ্র্যের কবলে পড়িয়াছিল এবং একপ্রকার হতাশ হইয়াই তাহাদের অনেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। সমাজের উর্ধ্বতন শিক্ষিত সম্প্রদায় উচ্চ পদে নিযুক্ত হইবার এবং ইংরেজ কর্মচারীদের সমপরিমাণ বেতন পাইবার বা সমমর্যাদা লাভের কোন সুযোগ পাইত না। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষিত এবং সর্বোচ্চ সমাজের সহিতও ইংরেজ কর্মচারীরা কোন প্রকার সামাজিক যোগাযোগ রাখিত না। ভারতীয়দের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঔদ্ধত্য ছিল তাহাদের ব্যবহারের প্রকৃতি। ভীতি এবং সন্ত্রস্ততা ভিন্ন অন্য কোন প্রকার মনোভাব স্বভাবতই ব্রিটিশদের প্রতি ভারতীয়দের মধ্যে জন্মায় নাই।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পটভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম আফগান যুদ্ধ, পাঞ্জাবের সহিত যুদ্ধ এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধে ব্রিটিশ সামরিক পরাজয়ে ব্রিটিশ সামরিক শক্তি অপরাজেয় এই ধারণা যে ভ্রান্ত একথা ভারতীয়দের মনে জন্মিয়াছিল। এমন কি, যাহারা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ ছিল তাহারাও ব্রিটিশ পরাজয়ের সংবাদে মনে মনে আনন্দিত হইয়াছিল। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, ব্রিটিশ শাসন জনসাধারণের মনে কোন শ্রদ্ধা বা আনুগত্য অর্জনে সমর্থ হয় নাই।

ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতীয়দের শ্রদ্ধা বা আনুগত্যের অভাব

ব্রিটিশ শাসনের, বিশেষভাবে ব্রিটিশ কর্মচারীদের অত্যাচার-অবিচার ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক্ হইতেই ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে সিপাহীদের বিদ্রোহ, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেরিলিতে বিদ্রোহ, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে সিপাহীদের বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে কোল বিদ্রোহ, ছোটনাগপুরের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহাত্মক কার্যকলাপ, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের বারাসতের নিকট তিতুমীরের বিদ্রোহ, ১৮৫১ হইতে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে মোপ্‌লা বিদ্রোহ এবং ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ও বিহারে সাঁওতাল বিদ্রোহ ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের যে মানসিকতার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রমাণ করে। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়িয়া যে ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে প্রকাশ লাভ করিয়াছিল।

বিক্ষুব্ধ ভারতীয়গণের বিদ্রোহ

বিদ্রোহের কারণ (Causes of the Revolt): নানাপ্রকার কারণে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। লর্ড ডালহৌসী তাঁহার স্বত্ববিলোপ-নীতির প্রয়োগ দ্বারা এবং অরাজকতার অজুহাতে সাতারা, সম্বলপুর, নাগপুর, ঝাঁসি, অযোধ্যা, কর্ণাট, তাঞ্জোর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। পেশওয়া দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের পুত্র নানাসাহেবের বাৎসরিক ভাতাও তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সকল কার্যকলাপকে এই বিদ্রোহের রাজনৈতিক কারণ হিসাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক অযোধ্যা অধিকার ভারতের সর্বত্র, বিশেষভাবে অযোধ্যায় দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার ফলে অযোধ্যায় বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি হইয়াছিল। কোম্পানির দেশীয় সৈনিকদের মধ্যেও সেজন্য তীব্র বিরোধিতার ভাব দেখা দিয়াছিল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে কোম্পানির সিপাহীদের এক বিরাট সংখ্যা ছিল অযোধ্যার লোক। এই সকল সিপাহী কোম্পানির প্রতি আনুগত্যপূর্ণই ছিল এবং ভারতের অপরাপর অংশ জয়ে তাহারা যুদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের নিজের দেশ বিদেশীদের অধীনে যাইবে ইহা তাহারা সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিল না। তাহাদের স্থানীয় জাতীয়তাবোধ ইহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল। অযোধ্যা অধিকারের প্রধান যুক্তি ছিল নবাবের অত্যাচার হইতে প্রজাবর্গকে রক্ষা করা, অথচ লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক অযোধ্যা দখলের পর প্রজাবর্গের অবস্থার কোন উন্নতি ঘটে নাই। বরং তাহাদিগকে উচ্চ হারে কর ও রাজস্ব দিতে হইয়াছিল। অযোধ্যা রাজ্য দখল করিবার ফলে তথাকার নবাব পরিবারের আশ্রিত বহু ব্যক্তির ভাতা ও বৃত্তি বন্ধ হইয়া যায়। নবাবের শাসনকার্য পরিচালনায় নিযুক্ত বহুসংখ্যক কর্মচারী, অভিজাতবর্গ প্রভৃতি কর্মচ্যুত হওয়ায়

রাজনৈতিক কারণ

অযোধ্যা অধিকার



নানাসাহেব

তাঁহাদের আশ্রিত বহু লোক এবং তাঁহারা বেকার হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন বহু জমিদারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া সেই স্থলে নূতন জমিদার ও তালুকদার নিয়োগ করা হইয়াছিল। সম্পত্তিচ্যুত জমিদারগণ স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের সর্বাধিক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত হইলেন। ব্রিটিশের প্রতি অযোধ্যা রাজ্যে এক ভীষণ ও ব্যাপক বিদ্বেষ এবং ঘৃণার উদ্রেক হয়। লর্ড ডালহৌসী কর্তৃক অপরাপর বহু দেশীয় রাজ্য অধিকার, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক তাহাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতিভঙ্গ দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের মতলব সম্পর্কে সন্দেহ ও ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল। ব্রিটিশ মিত্রতার মূল্য ছিল তাহাদের সম্পূর্ণ অধীনে চলিয়া যাওয়া। এই সকল কারণে নানাসাহেব, ঝাঁসির রাণী, দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ ব্রিটিশের দৃঢ়প্রতিজ্ঞ শত্রুতে পরিণত হইয়াছিলেন।

সামাজিক কারণ

রাজনৈতিক কারণ ভিন্ন এই বিদ্রোহের পশ্চাতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণও ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক্ হইতে শুরু করিয়া প্রায় অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী কর্তৃক ভারতীয়দের উপেক্ষা এবং তাহাদের প্রতি শাসকশ্রেণীর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের সৃষ্টি করিয়াছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের আমল হইতেই ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার শাসক ও শাসিতের মধ্যে সামাজিক ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়াছিল। বিদ্রোহের পূর্বে, অর্ধ-শতাব্দী ধরিয়া এই অবস্থা ও তাচ্ছিল্য হ্রাস না পাইয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পক্ষান্তরে, শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ ও নির্ভীকতা দিন দিনই বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বভাবতই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে গভীর ঘৃণা ও ক্ষোভের সৃষ্টি হইয়াছিল। ইহা বিদ্রোহের সামাজিক কারণ বলা যাইতে পারে।

ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার



দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্

ব্রিটিশ-শাসিত অংশে জনসাধারণের অর্থনৈতিক দুরবস্থা এই বিদ্রোহের অর্থনৈতিক কারণ হিসাবে পরিগণিত হইয়া থাকে। ১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ অবধি মোট একশত বৎসর ধরিয়া প্রচুর পরিমাণ সোনারূপা এদেশ হইতে ইংলণ্ডে চলিয়া যাওয়ার ফলে ভারতীয়দের অর্থনৈতিক দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল। বিলাতী পণ্যদ্রব্যের সহিত প্রতিযোগিতায় ভারতীয় কুটির শিল্পজাত সামগ্রী টিকিতে পারিল না। ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পাইল। ব্রিটিশ-প্রবর্তিত রাজস্বব্যবস্থাও ভারতীয়দের উপর অর্থনৈতিক চাপ বৃদ্ধি করিয়াছিল। তদুপরি নানাপ্রকার কর স্থাপন

অর্থনৈতিক দুরবস্থা

এবং করের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রভৃতির ফলে ক্রমেই দেশের তথা জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিতেছিল। সৈনিকদের আর্থিক অবস্থাও তদ্রূপ ছিল। তাহাদের বেতন ছিল অত্যন্ত কম। ব্রিটিশ কর্মচারীদের তুলনায় তাহাদের বেতন ও ভাতার স্বল্পতা এবং তাহাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ব্যবহার সিপাহীদের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি করিয়াছিল। সিপাহীদিগকে ইংরেজ সামরিক কর্মচারীরা অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করিত, তাহাদিগকে পশু অপেক্ষা উন্নততর জীব বলিয়া মনে করিত না। ব্রিটিশ সৈন্য এবং ভারতীয় সিপাহী যুদ্ধের ব্যাপারে সমপরিমাণ দক্ষ ছিল। অথচ তাহাদের বেতন ছিল ইংরেজ সৈনিক অপেক্ষা বহু কম। সিন্ধু বা পাঞ্জাবে কাজ করিতে গেলে পূর্বে সিপাহীদিগকে ভাতা (allowance) দেওয়া হইত, কিন্তু পরে উহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সিপাহীদের অভিযোগ দীর্ঘকাল পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ সরকারের নজরে আসিয়াছিল, কিন্তু কোন প্রতিকার না হওয়ায় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরে সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছিল। তথাপি ব্রিটিশ সরকার অভিযোগের মূল কারণগুলি দূর করিতে সচেষ্ট হন নাই। বিদ্রোহীদের গুলি করিয়া হত্যা করিয়া তাহাদিগকে দমন করিতে চাহিয়াছিলেন।

সৈন্যদের অভিযোগ

এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব যখন ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের স্বার্থে এবং ভারতীয় সংস্কারকদের সমর্থনে প্রবর্তিত উন্নয়নমূলক সংস্কারগুলিও ভারতীয়রা সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিল। ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রভৃতিতে রক্ষণশীল ভারতীয়দের মনে এই কথাই জাগিল যে, ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন নিশ্চয়ই কোন দূরভিসন্ধি প্রণোদিত। সেই সময়কার ব্রিটিশ কর্মচারীবর্গের ব্যভিচারও জনসাধারণের মনে তাহাদের প্রতি এক তীব্র ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষা, রেলপথ, টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা, সতীদাহ প্রথা নিবারণ প্রভৃতির প্রবর্তন

সেই সময়ে খ্রীষ্টধর্মযাজকগণ হিন্দু ও মুসলমানগণকে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার চেষ্টা শুরু করিলে একথাই সকলের মনে জাগিল যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়দের সকলকেই ক্রমে খ্রীষ্টান করিয়া ফেলিবে। স্কুল, হাসপাতাল, জেলখানায় খ্রীষ্টান ধর্মযাজকগণ ভারতীয়দিগকে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম সম্পর্কে নানাপ্রকার কটূক্তি করিত। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ তাহাদের পারিবারিক সম্পত্তির অংশ পাইবে বলিয়া আইন পাশ করায় ব্রিটিশ সরকার যে-কোন উপায়ে ভারতীয়দিগকে ধর্মান্তরিত করিতে ব্যস্ত এই ধারণা হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করিয়াছিল।

ধর্মনৈতিক কারণ

রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও ধর্মনৈতিক কারণে যখন বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে সেই সময়ে এন্‌ফিল্ড্ রাইফ্‌ল্ (Enfield Rifle) নামে একপ্রকার বন্দুকের প্রচলন করা হইল। এই বন্দুকের টোটা দাঁত দ্বারা কাটিয়া

বন্দুকে পুরিতে হইত। এগুলি প্রস্তুত করিতে চর্বি ব্যবহার করা হইত। হঠাৎ রটিয়া গেল যে গরু ও শূকর উভয় প্রকার চর্বি এগুলিতে ব্যবহার করা হইয়াছে। স্বভাবতই ধর্মভীরু হিন্দু ও মুসলমান সিপাহীদের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মার্চ বাংলাদেশের বারাকপুর সামরিক ছাউনিতে মঙ্গল পাণ্ডে নামক জনৈক সিপাহী প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিল। অপরাপর সিপাহীও তাহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বারাকপুরের পল্টনটি ভাঙিয়া দিলেন। মঙ্গল পাণ্ডে ও তাহার সহায়ক ঈশ্বরী পাণ্ডেকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু ইহাতে বিদ্রোহের আগুন নির্বাপিত হইল না। ইহা মীরাটের সামরিক ছাউনিতে ছড়াইয়া পড়িল। ১০ই মে (১৮৫৭ খ্রীঃ) কর্ণেল ফিনিসকে মীরাটের সামরিক ছাউনিতে গুলি করা হইলে বিদ্রোহ প্রকৃতভাবে শুরু হইয়া গেল। ক্রমে উহা দিল্লীতে ছড়াইয়া পড়িল। মোগল বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে বিদ্রোহী সৈন্যগণ হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা করিল। ব্রিটিশ সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারিগণকে বিদ্রোহী সিপাহীরা হত্যা করিতে লাগিল।

প্রত্যক্ষ কারণ : এন্‌ফিল্ড্ রাইফ্‌লের প্রবর্তন

বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের বিদ্রোহ (২৯শে মার্চ, ১৮৫৭ খ্রীঃ)

মীরাটের বিদ্রোহ (১০ই মে, ১৮৫৭ খ্রীঃ)

বিদ্রোহের শুরু

বিদ্রোহের বিস্তার (Progress of the Revolt): সিপাহীদের বিদ্রোহ বাংলাদেশের বহরমপুর ও বারাকপুর হইতে মীরাট এবং সেই স্থান হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করিল। মীরাট হইতে বিদ্রোহীরা দিল্লী পৌঁছিয়া মোগল বংশধর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে হিন্দুস্থানের বাদশাহ্ বলিয়া ঘোষণা করিল। দিল্লী বিদ্রোহীদের অধিকারে আসিয়াছে সংবাদ পাওয়া মাত্র ফিরোজপুর ও মুজফ্‌ফরপুরের সিপাহীগণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। বিদ্রোহী সিপাহীদের সহিত জনসাধারণও যোগদান করিতে ত্রুটি করিল না। ক্রমেই বিদ্রোহের আগুন পাঞ্জাব, নৌসেরা, হতমর্দান, অযোধ্যা ও বর্তমান উত্তরপ্রদেশের অপরাপর অংশ, কানপুর, ঝাঁসি, বিহার ও বাংলাদেশে ছড়াইয়া পড়িল। ঝাঁসিতে ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁতীয়া তোপী, কানপুরে নানাসাহেব, বিহারে কুনওয়ার সিংহ প্রভৃতি বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। এটোয়া, মইনপুরী, রুরকি, এটা, হোদাল, মথুরা, লক্ষ্মৌ, বেরিলি, শাহ্‌জাহানপুর, মোরাদাবাদ, বোদাও, আজমগড়, এলাহাবাদ, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর, ফতেগড়, হাতরস ও অপরাপর বহু স্থানে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বিদ্রোহিগণ জেলখানা ভাঙিয়া কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল, সরকারী খাজাঞ্চীখানা লুঠ করিল। সিপাহীদের বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সর্বত্রই বেসামরিক জনসাধারণও বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। অযোধ্যার তালুকদার যাহারা সম্পত্তিচ্যুত হইয়াছিল তাহারা এবং কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান করিল। সমগ্র অযোধ্যায় বিদ্রোহ এক জাতীয় বিদ্রোহে রূপান্তরিত হইল। দাক্ষিণাত্য, রাজস্থান, মধ্যভারত প্রভৃতি অঞ্চলেও বিদ্রোহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। ঝাঁসির রাণী ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণদান করেন। তাঁহার অনুচর তাঁতীয়া তোপী পলাইয়া যান। পরে ধৃত হইয়া

বিদ্রোহের বিস্তৃতি

ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতীয়া তোপী, নানাসাহেব, কুনওয়ার সিংহ প্রভৃতি

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। প্রথমদিকে বিদ্রোহী সিপাহীরা সাফল্য লাভ করিলেও শেষ পর্যন্ত স্যার্ জন ল্যারেন্স্, হেভেলক, আউট্রাম প্রভৃতি ব্রিটিশ সেনাপতির সামরিক তৎপরতায় এবং ব্রিটিশ, নেপালী ও শিখ সৈন্যদের সাহায্যে ব্রিটিশ পক্ষ জয়লাভ করে। দিল্লী পুনরধিকার করিবার পর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে বন্দী করিয়া রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

বিদ্রোহীদের পরাজয়

বিদ্রোহ দমন (Suppression of the Revolt): ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের আক্রোশ কোন কোন স্থানে নির্দোষ ইওরোপীয় নারী এবং শিশুদের হত্যাকাণ্ডে প্রকাশ পাইয়াছিল সত্য, কিন্তু বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পৈশাচিকতা অনেক ক্ষেত্রেই সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। স্যার্ জন ল্যারেন্স, স্যার্ হেন্‌রী ল্যারেন্স, হেভেলক, আউট্রাম, স্যার্ কোলিন ক্যাম্পবেল প্রভৃতি ইংরেজ কর্মচারী ও সেনাপতির চেষ্টায় এবং শিখ ও নেপালী সেনাবাহিনীর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহ দমন করা হইয়াছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ঝাঁসির রাণী, তাঁতীয়া তোপী প্রভৃতি বীরত্ব ও রণকৌশলের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। বিদেশীদের বিতাড়িত করিয়া পরাধীন দেশকে স্বাধীন করিবার তাঁহাদের এই চেষ্টা ভারতের জনসাধারণের মনে এক গভীর শ্রদ্ধা ও দেশাত্মবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল।

বিদ্রোহীদের বীরত্ব

বিদ্রোহের প্রকৃতি (Nature of the Revolt): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ নিছক সিপাহীদেরই বিদ্রোহ না সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলনের প্রথম প্রকাশ সে-বিষয়ে মতানৈক্য রহিয়াছে। ভারতীয়দের মধ্যে এই বিদ্রোহকে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম যুদ্ধ বলিয়া বর্ণনা করিবার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা দেখা যায়। পক্ষান্তরে, অনেকে ইহাকে সিপাহী বিদ্রোহ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিদ্রোহকে 'সিপাহী বিদ্রোহ' কিংবা 'সশস্ত্র জাতীয় আন্দোলন'—এই দুই ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করাই যুক্তিযুক্ত হইবে। জে. বি. নর্টন, ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফ্ প্রমুখ ব্যক্তির মতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও পরে উহা ব্যাপকতা এবং জাতীয় আন্দোলনের প্রকৃতি লাভ করিয়াছিল। সমসাময়িক জনৈক মার্কিন লেখকও অনুরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। পক্ষান্তরে স্যার্ সৈয়দ আহ্‌ম্মদ, চার্লস্ রেকস্, জন কে, জনৈক বাঙালী সামরিক কর্মচারী দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সিপাহী বিদ্রোহ ভিন্ন কিছুই ছিল না। তাঁহাদের মতে বেসামরিক ব্যক্তিদের মধ্যে যাহারা এই বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল তাহাদের প্রধান এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল লুণ্ঠন ও গোলযোগের সুযোগ গ্রহণ করা। বস্তুত ভারতীয় জনসাধারণের দিক্ হইতে বিচার করিলে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, ভারতের জনসাধারণ এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে নাই। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ডক্টর সেন ও ডক্টর মজুমদার এবং আরও অনেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের নানাবিধ তথ্য উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। এইসব নূতন তথ্য এবং পূর্বে যে-সকল তথ্য পাওয়া গিয়াছিল—সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ প্রথমে সিপাহী বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইলেও শেষ পর্যন্ত উহা অযোধ্যা, মধ্য-প্রদেশের কোন কোন অংশ এবং বিহারের পশ্চিমাংশে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি—সিপাহী বিদ্রোহ বা জাতীয় যুদ্ধ (?)

হইয়াছিল একথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। সামরিক বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হইয়াছিল বলিয়া উহাকে সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া অথবা কোন কোন স্থানে উহা জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল বলিয়া উহাকে সম্পূর্ণ জাতীয় আন্দোলন হিসাবে বিবেচনা করা কতদূর যুক্তিযুক্ত হইবে বলা কঠিন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ডক্টর মজুমদার বা ডক্টর সেনের যুক্তি সর্বক্ষেত্রেই অকাট্য, এমন নহে। কেহ কেহ মনে করেন যে, তাঁহাদের দুইজনের সিদ্ধান্তই গতানুগতিক ও রক্ষণশীল মনোবৃত্তির পরিচায়ক। দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্‌কে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ বলিয়া ঘোষণা এবং বাহাদুর শাহ্ কর্তৃক দেশের হিন্দু-মুসলমান—সকল সম্প্রদায়ের লোককে ইংরেজ বিতাড়নে অগ্রসর হইবার জন্য আহ্বান প্রভৃতি এই বিদ্রোহকে জাতীয় বিদ্রোহে রূপান্তরিত করিয়াছিল বলিয়া অনেকে মনে করেন। জে. বি. নর্টন ও ডক্টর আলেকজাণ্ডার ডাফের মন্তব্য অনুধাবন করিলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হয়। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান ব্রিটিশদের বিতাড়িত করিতে হইলে সামরিক শক্তির প্রয়োজন এই ছিল সমসাময়িক ধারণা। নিরস্ত্র ভারতবাসীর পক্ষে আন্দোলন শুরু করা তখন কল্পনার বাহিরে ছিল। সুতরাং জাতীয় আন্দোলন সামরিক বাহিনীর মাধ্যমেই শুরু হইবে ইহাই ছিল যুক্তিযুক্ত। ইহা ভিন্ন ব্রিটিশ বিতাড়ন ছিল ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। বহু স্থানে কৃষকগণও বিদ্রোহে যোগদান করিয়াছিল। আর একথাও সত্য যে, কোন জাতীয় আন্দোলনেই দেশের সকল লোক যোগদান করিয়াছে এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে নাই। সিপাহীদের বিদ্রোহ হিসাবে শুরু হওয়াই ছিল তখনকার ভারতীয় পরিস্থিতিতে যুক্তিসম্মত পন্থা। সিপাহীদের বিদ্রোহের মাধ্যমে শুরু হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে জাতীয় বিদ্রোহের সম্মান না দিবার যুক্তি নাই। তথাপি একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে পেঁছানো সম্ভব হয় নাই। নূতন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হইলেই এই বিষয়ে যে মতানৈক্য রহিয়াছে তাহার অবসান ঘটিবে।

স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার অসুবিধা

বিফলতার কারণ (Causes of Failure): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের অসাফল্যের পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমত, বিদ্রোহীদের মধ্যে যোগাযোগ, সংহতির অভাবই ছিল ইহার প্রধান ত্রুটি। দ্বিতীয়ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন স্বভাবতই আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে সর্বত্র উহা একই পন্থা বা একই গতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়ত, বিদ্রোহীদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের পার্থক্য ছিল। নানাসাহেব হইতে চাহিয়াছিলেন পেশওয়া আর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ হইতে চাহিয়াছিলেন পুনরুজ্জীবিত মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট্। আদর্শের এই বিভিন্নতাও এই আন্দোলনকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। চতুর্থত, বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে নেতৃত্ব করিবার মত শক্তি এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার অভাব না থাকিলেও সমগ্র দেশ জুড়িয়া বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিবার মত ক্ষমতাবান নেতার অভাব বিদ্রোহের অসাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ভারতের কোন নৃপতি উহাতে যোগদান করেন নাই। সর্বশেষে,

বিদ্রোহের অসাফল্যের কারণ:
(১) যোগাযোগের অভাব
(২) বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক রূপ গ্রহণ
(৩) আদর্শের পার্থক্য
(৪) নেতৃত্বের অভাব
(৫) বিদ্রোহীদের সামরিক দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি—ব্রিটিশ শক্তির কূটকৌশল প্রভৃতি

সিপাহীদের অস্ত্রশস্ত্রের অভাব ও তাহাদের সামরিক ভুলভ্রান্তি এবং অপরপক্ষে ব্রিটিশ সামরিক ক্ষমতা ও কূটকৌশল বিদ্রোহের অসাফল্য অবশ্যম্ভাবী করিয়া তুলিয়াছিল।

ফলাফল (Outcome): কিন্তু ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ সাফল্য লাভ না করিলেও ইহার কতকগুলি সুফল দেখা দিয়াছিল। বহু সংখ্যক ভারতীয় সিপাহী, ইংরেজ নরনারী ও সামরিক কর্মচারী এই বিদ্রোহে প্রাণ হারাইয়াছিল সত্য, কিন্তু প্রাণনাশের বিনিময়ে কতকগুলি সুফলও পাওয়া গিয়াছিল। এই বিদ্রোহ হইতে ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকার একটি বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর এরূপ একটি বিশাল সাম্রাজ্যের শাসনভার ন্যস্ত রাখিবার বিপদ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ফলে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটাইয়া ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি শাসন স্থাপিত হইল। ইংলণ্ডের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এক ঘোষণা (১৮৫৮ খ্রীঃ) দ্বারা ভারতের শাসনকার্য পরিচালনার ভার তাঁহার পক্ষে একটি কাউন্সিল ও একজন সেক্রেটারির হস্তে ন্যস্ত করিলেন। ভারতে একজন রাজপ্রতিনিধি বা ভাইসরয় নিযুক্ত করিবার নীতি গৃহীত হইল। গভর্ণর-জেনারেলই ভাইসরয়-পদে নিযুক্ত হইবেন স্থির হইল। ইহা ভিন্ন এই ঘোষণায় ডালহৌসী-প্রবর্তিত স্বত্ববিলোপ-নীতি পরিত্যাগ করা হইল একথা জানাইয়া দিয়া দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে রাজ্যচ্যুতির যে আশংকা জাগিয়াছিল তাহা দূর করা হইল। ভারতীয় জনসাধারণকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় অধিকতর অংশদানের নীতিও গৃহীত হইল। ইহা ভিন্ন ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যাহাতে ঐক্যবদ্ধ আর কোন আন্দোলন না হইতে পারে সেজন্য 'সাম্রাজ্যবাদী বিভেদ-নীতি'র প্রয়োগ শুরু হইল। এই সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসকগণ সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে শুরু করিল। দেশীয় সিপাহীদের উপর যাহাতে বেশী নির্ভর করিতে না হয় সেজন্য ভারতে অধিক সংখ্যায় ব্রিটিশ সৈন্য আমদানি করা হইল। লর্ড ক্যানিং ভারতের সর্বপ্রথম গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় নিযুক্ত হইলেন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। তাঁহার উদার ও সহানুভূতিসম্পন্ন মনোবৃত্তির ফলে বিদ্রোহিগণ অযথা শাস্তিভোগ হইতে নিস্তার পাইল। কোনপ্রকার প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি না থাকিবার জন্য স্বভাবতই সিপাহী বিদ্রোহের ফলে যে ব্যাপক ইংরেজ বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা ক্রমে অপসৃত হইল।

কোম্পানির শাসন-ব্যবস্থার অবসান—মহারাণীর ঘোষণা

ভাইসরয় নিয়োগ

স্বত্ববিলোপ-নীতি পরিত্যক্ত

বিভেদ-নীতি

অধিক সংখ্যক ব্রিটিশ সৈন্য আমদানি

প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ক্যানিং-এর উদারতা

লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর কোম্পানির শাসনকার্য পরিচালনার ভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে গ্রহণের আনুষঙ্গিক সংস্কার ও সংগঠনকার্যে ব্যয়িত হইল। ভারতের সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ সৈন্য লইয়া গঠন করা হইল। গোলন্দাজ বাহিনীতে কোন দেশীয় সিপাহীকে স্থান দেওয়া হইল না। বিদ্রোহের কালে যে ঋণ হইয়াছিল উহা পরিশোধের জন্য এবং সরকারের আয়বৃদ্ধির

সংস্কার : সামরিক ও অর্থনৈতিক

বিদ্রোহের অসাফল্যের কারণ :

(১) যোগাযোগের অভাব

(২) বিক্ষিপ্ত ও আঞ্চলিক রূপ গ্রহণ

(৩) আদর্শের পার্থক্য

(৪) নেতৃত্বের অভাব

(৫) বিদ্রোহীদের সামরিক দুর্বলতা ও ভুলভ্রান্তি—ব্রিটিশ শক্তির কূটকৌশল প্রভৃতি

সংহতির অভাবই ছিল ইহার প্রধান ত্রুটি। দ্বিতীয়ত, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আন্দোলন স্বভাবতই আঞ্চলিক সীমায় আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। ফলে সর্বত্র উহা একই পন্থা বা একই গতিতে অগ্রসর হইতে পারে নাই। তৃতীয়ত, বিদ্রোহীদের মধ্যে উদ্দেশ্য ও আদর্শের পার্থক্য ছিল। নানাসাহেব হইতে চাহিয়াছিলেন পেশওয়া আর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ হইতে চাহিয়াছিলেন পুনরুজ্জীবিত মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট্। আদর্শের এই বিভিন্নতাও এই আন্দোলনকে দুর্বল করিয়া দিয়াছিল। চতুর্থত, বিদ্রোহীদের মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে নেতৃত্ব করিবার মত শক্তি এবং ক্ষমতাসম্পন্ন নেতার অভাব না থাকিলেও সমগ্র দেশ জুড়িয়া বিদ্রোহের নেতৃত্ব করিবার মত ক্ষমতাবান নেতার অভাব বিদ্রোহের অসাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ভারতের কোন নৃপতি উহাতে যোগদান করেন নাই। সর্বশেষে,

সৈন্য আমদানি

প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় লর্ড ক্যানিং-এর উদারতা

গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় নিযুক্ত হইলেন (১৮৫৮ খ্রীঃ)। তাঁহার উদার ও সহানুভূতিসম্পন্ন মনোবৃত্তির ফলে বিদ্রোহিগণ অযথা শাস্তিভোগ হইতে নিস্তার পাইল। কোনপ্রকার প্রতিহিংসার মনোবৃত্তি না থাকিবার জন্য স্বভাবতই সিপাহী বিদ্রোহের ফলে যে ব্যাপক ইংরেজ বিদ্বেষের উদ্রেক হইয়াছিল তাহা ক্রমে অপসৃত হইল।

লর্ড ক্যানিং-এর শাসনকালের অবশিষ্ট কয়েক বৎসর কোম্পানির শাসনকার্য পরিচালনার ভার ব্রিটিশ সরকারের হস্তে গ্রহণের আনুষঙ্গিক সংস্কার ও সংগঠনকার্যে ব্যয়িত হইল। ভারতের সেনাবাহিনীর মোট সংখ্যার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ ব্রিটিশ সৈন্য লইয়া গঠন করা হইল। গোলন্দাজ বাহিনীতে কোন দেশীয় সিপাহীকে স্থান দেওয়া হইল না। বিদ্রোহের কালে যে ঋণ হইয়াছিল উহা পরিশোধের জন্য এবং সরকারের আয়বৃদ্ধির

সংস্কার : সামরিক ও অর্থনৈতিক

জন্য আয়কর ও আমদানি শুল্ক স্থাপন করা হইল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সংখ্যক কর্মচারী ছাঁটাই করিয়া ব্যয়-সঙ্কোচ করা হইল। ইহা ভিন্ন রাজস্ব আইন, পেনাল কোড, ফৌজদারী আইন প্রভৃতির সংস্কার-সাধন করা হইল। বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় একটি করিয়া হাইকোর্ট এবং বোম্বাই ও মাদ্রাজে একটি করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইহার পূর্বেই (১৮৫৭ খ্রীঃ) স্থাপিত হইয়াছিল।

বিচার ও আইন সংক্রান্ত

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন (১৮৫৭-৫৮ খ্রীঃ)

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্ (Indian Councils Act) পাশ করিয়া কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ কাউন্সিলকে নিজ নিজ এলাকায় আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেওয়া হইল। গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রয়কে আইন পরিষদ (কাউন্সিল) কর্তৃক গৃহীত আইন বাতিল করিবার এবং জরুরী পরিস্থিতিতে অর্ডিন্যান্স পাশ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইল।

কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট্

নবযুগের সূচনার পথে ভারত (India on the Threshold of a New Era): ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছিল সত্য কিন্তু এই বিদ্রোহের শিক্ষা ভারতবাসীর অন্তর হইতে মুছিয়া গেল না। বিদ্রোহ দমন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অমানুষিক বর্বরতা ভারতবাসীকে মনেপ্রাণে ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ জাতির প্রতি বিদ্বেষী করিয়া তুলিল। পক্ষান্তরে দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহীদের সাহসিকতা, বীরের ন্যায় বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জীবনদান প্রভৃতির কাহিনী যখন দেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল তখন বিদ্রোহীদিগকে ব্যাপকভাবে সাহায্যদানে অগ্রসর না হওয়ার জন্য ভারতবাসীর অন্তরে গভীর অনুতাপের সৃষ্টি হইল। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ যখন ভারতবর্ষকে কুক্ষিগত করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ব্যস্ত সেই সময়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে ভারতীয়দের ভাবজগতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটিতে লাগিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের মাধ্যমে ভারতীয়দের অন্তঃস্থলে এক গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের শিক্ষা

পাশ্চাত্য ভাষা ও সাহিত্য আলোচনার মাধ্যমে পাশ্চাত্য দেশীয় রাজনীতি, অর্থনীতি, ইওরোপীয়দের জাতীয়তাবোধ ও দেশাত্মবোধ ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের গভীর প্রভাব বিস্তার করিল। ক্রমে গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ ভারতবাসীর জাতীয় আদর্শস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল। সরকারী সর্বোচ্চ কর্মচারী পদে (আই. সি. এস্.) ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যাপারে আন্দোলনের উদ্দেশ্যে, সমগ্র ভারতে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার এবং ভারতবাসীর স্বার্থরক্ষার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশান' (Indian Association) স্থাপন করিলেন। এইভাবে ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত ভারতের সূচনা হইল।

জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি

পরিশিষ্ট

বংশ-পরিচয়

মগধের রাজবংশাবলী

বিম্বিসারীয় বংশ :		
	বিম্বিসার	৫৪৪—৪৯৩ খ্রীঃ পূঃ
	অজাতশত্রু	৪৯৩—৪৬১ ”
	উদয়ভদ্র	৪৬১—৪৪৫ ”
	অনিরুদ্ধ ও মুণ্ড	৪৪৫—৪৩৭ ”
	নাগ দাসক	৪৩৭—৪১৩ ”
শৈশুনাগ বংশ :		
	শিশুনাগ	৪১৩—৩৯৫ খ্রীঃ পূঃ
	কাকবর্ণ	৩৯৫—৩৪৫ ”
নন্দ বংশ :		
	মহাপদ্মনন্দ	৩৪৫— ? খ্রীঃ পূঃ
	উগ্রসেন	
	ধননন্দ	? —৩২৪ ”
মৌর্য বংশ :		
	চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য	৩২৪—৩০০ খ্রীঃ পূঃ
	বিন্দুসার	৩০০—২৭৩ ”
	অশোক	২৭৩—২৩৬ ”
	* * *	
	বৃহদ্রথ	?
শুঙ্গ বংশ :		১৮৭—৭৫ খ্রীঃ পূঃ
	পুষ্যমিত্র শুঙ্গ	
	অগ্নিমিত্র	
	সুজ্যেষ্ঠ	
	বসুমিত্র	
	ভাগভদ্র	
	দেবভূতি	
কাণ্ব বংশ :		৭৫—৩০ খ্রীঃ পূঃ
	বসুদেব	
	ভূমিমিত্র	
	নারায়ণ	
	সুশর্মন্	

আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণ, শাসনব্যবস্থায় উচ্চকর্মচারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ প্রভৃতি দাবি কংগ্রেস উত্থাপন করিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকারী নীতি ও কার্যকলাপের সমালোচনায় বা সংস্কার দাবিতে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত সংযত এবং মর্যাদাপূর্ণ ভাষা ব্যবহারে ত্রুটি করিলেন না। ভারতবাসীর দাবির যৌক্তিকতা সম্পর্কে ব্রিটিশ জনমত ও ব্রিটিশ সরকারকে সচেতন করিয়া তোলাই ছিল তখনকার কংগ্রেসী আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

প্রথম দিকে সরকার কংগ্রেসী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অধিবেশনে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কেহ কেহ যোগদান করিয়াছিলেন। বাঙালী ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র বনার্জী প্রথম অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন, একথা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে এই অধিবেশনে যোগ দিয়াছিলেন এবং বক্তৃতা করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন শুরু হইবার পূর্বদিন পর্যন্ত কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছিল সেজন্য বাঙালী নেতৃবৃন্দের অনেকেই বোম্বাই উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রথম অধিবেশনে অপরাপর সকলের মধ্যে নরেন্দ্রনাথ সেন, কে. টি. তেলাং এবং আর. এম. সায়ানি ও এ. এম. ধরমসি নামক দুইজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম অধিবেশনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ

কংগ্রেসের আদর্শ ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সভাপতি উমেশচন্দ্র বনার্জী (১) ভারতের বিভিন্নাংশের দেশসেবকদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও সৌহার্দ্য স্থাপন, (২) পারস্পরিক পরিচিতি ও সৌহার্দ্যের মাধ্যমে জাতি, ধর্ম, প্রদেশগত যাবতীয় সংকীর্ণতা দূর করিয়া ভারতের সকল দেশ-প্রেমিকের মধ্যে জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি করিয়া সুদৃঢ়ভাবে জাতীয় ঐক্য স্থাপন, (৩) দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সুচিন্তিত মতামতের ভিত্তিতে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ণয় করা, এবং (৪) পরবর্তী এক বৎসর কংগ্রেস দেশবাসীর স্বার্থে কি কর্মপন্থা অনুসরণ করিবে তাহা স্থির করা—এই চারিটি কথার উল্লেখ করেন।*

কংগ্রেসের আদর্শের ব্যাখ্যা (১৮৮৫)

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ যোগদান করিলে ভারতের জাতীয় সম্মেলন ও কংগ্রেস একত্রিত হইয়া পড়ে। তখনও সরকার কংগ্রেসের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। এই অধিবেশন শেষে লর্ড ডাফরিণ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। তৃতীয় অধিবেশনের (১৮৮৭) পর মাদ্রাজের গভর্ণরও অনুরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। কংগ্রেসের প্রতি সরকারী মনোভাব প্রথম পর্যায়ে এইরূপ ছিল।

কংগ্রেসের প্রতি সরকারের সহানুভূতি

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশনে স্বদেশী জিনিসপত্রের প্রতি ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া ভারতীয় শিল্পগুলিকে উৎসাহিত করিবার জন্য একটি

* *Ibid.*, p. 537.

প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। সামাজিক দোষত্রুটি দূর করিবার জন্য কংগ্রেস একটি সামাজিক সম্মেলনও আহ্বান করে। এইভাবে কংগ্রেসী আন্দোলন যখন ক্রমেই ব্যাপকতা লাভ এবং শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল তখন কংগ্রেসের প্রতি সরকারের মনোভাবও পরিবর্তিত হইয়া গেল। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গেই ইংলণ্ডের রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গ ও পত্র-পত্রিকা কংগ্রেস-বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছিল। এমন কি, সেই সময় হইতেই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা শুরু হইয়াছিল। লণ্ডনের 'দি টাইমস্' (The Times) পত্রিকায় মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি কার্যকরী করার অর্থ ছিল ভারতীয়দিগকে স্বায়ত্তশাসন দান করা। কিন্তু ব্রিটিশ জাতি কংগ্রেসের এই বাগাড়ম্বরে বিভ্রান্ত হইয়া ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবে না। ইহা ভিন্ন কংগ্রেসের অধিবেশনে দুইজন মুসলমান প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও 'দি টাইমস্' পত্রিকায় মন্তব্য করা হইয়াছিল যে, কংগ্রেসের অধিবেশনে একজন মুসলমানও যোগদান করেন নাই। সাম্প্রদায়িকতার বিষ সর্বপ্রথম এইভাবে ছড়াইবার চেষ্টা শুরু হইয়াছিল।

কংগ্রেসের শক্তি সঞ্চয়ে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন

প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেসের কোন সংবিধান বা গঠনতন্ত্র ছিল না। কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ—যথা, দাদাভাই নৌরজী, দিনশ ওয়াচা, ফিরোজশাহ মেহ্‌তা, অক্টাভিয়ান হিউম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার কর্মপন্থা ও কার্যসূচী নির্ধারণ করিতেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশনে বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতার চেষ্টায় কংগ্রেসের 'বিষয় নির্বাচনী কমিটি' (Subjects Committee) গঠন করা হয়। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনার ভারও একটি কমিটির উপর দেওয়া হয়। এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বদরুদ্দিন তৈয়বজী নামে জনৈক সম্ভ্রান্ত মুসলমান।

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ

কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র রচনার ব্যবস্থা

কংগ্রেস সরকারের নিকট নানাবিধ দাবি উত্থাপন করিয়া চলিল কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের দাবি ভারতের মুষ্টিমেয় ব্যক্তিবর্গের দাবি বলিয়া তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিল। কংগ্রেস ভারতের অগণিত অশিক্ষিত, দরিদ্র জনগণের মুখপাত্র বলিয়া দাবি করিল। কিন্তু সরকার ইহাতেও অবহিত হইল না, কংগ্রেসের দাবি তাহারা এড়াইয়া চলিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তা মিঃ অক্টাভিয়ান হিউম সরকারের মনোভাবের নিন্দা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সরকারকে কংগ্রেস ভারতবাসীর প্রয়োজন সম্পর্কে শিখাইয়া তুলিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু সরকার সেই শিক্ষাগ্রহণে রাজী নহে।*


বদরুদ্দিন তৈয়বজী

* "The National Congress had endeavoured to instruct the Government, but the Government refused to be instructed." *An Advanced History of India*, p. 890, 3rd edn.

সাতবাহন (অন্ধ্র) বংশ

সিমুক

কৃষ্ণ

প্রথম সাতকর্ণী

* * *

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী

বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী

* * *

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী

কুষাণ বংশ

প্রথম কদ্‌ফিসিস্‌

দ্বিতীয় বা বিম কদ্‌ফিসিস

* * *

কণিষ্ক

বাশিষ্ক

হুবিষ্ক

গুপ্ত বংশ

শ্রীগুপ্ত

|

ঘটোৎকচ গুপ্ত

|

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

|

সমুদ্রগুপ্ত

|

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' (৩৮১—৪১৩ খ্রীঃ)

|

প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৫—৪৫৫ খ্রীঃ)

|

স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫—৪৬৭ খ্রীঃ)

|

জীবিতগুপ্ত (দ্বিতীয়)

থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশ

প্রভাকরবর্ধন

|

রাজ্যবর্ধন (দ্বিতীয়), হর্ষবর্ধন

বাংলার রাজবংশ

শশাঙ্ক (৬০৬-৬৩৭)

পাল বংশ :

গোপাল (৭৫০-৭৭০)
|
ধর্মপাল (৭৭০-৮১০)
|
দেবপাল (৮১০-৮৫০)
|
প্রথম বিগ্রহপাল (প্রথম শূরপাল)
|
নারায়ণপাল
|
রাজ্যপাল
|
দ্বিতীয় গোপাল
|
দ্বিতীয় বিগ্রহপাল

(প্রথম বিগ্রহপাল থেকে দ্বিতীয় বিগ্রহপাল: (৮৫০-৯৮৮))

|
প্রথম মহীপাল (৯৮৮-১০৩৮)
|
নয়পাল (১০৩৮-১০৫৫)
|
তৃতীয় বিগ্রহপাল (১০৫৫-১০৭০)
|
- দ্বিতীয় মহীপাল (১০৭০-১০৭৫)
  |
  গোবিন্দপাল
- দ্বিতীয় শূরপাল
- রামপাল (১০৭৫-১১২০)

সেন বংশ :

বীর সেন
|
সামন্ত সেন
|
হেমন্ত সেন

(সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন: সামন্তরাজ)

|
বিজয় সেন (১০৭৫-১১৫৮)
|
বল্লাল সেন (১১৫৮-১১৭৯)
|
লক্ষ্মণ সেন (১১৭৯-১২০৫)

দিল্লী সুলতানি

মহম্মদ-বিন-সাম (১১৯৩-১২০৬)

দাস বংশ : (১) কুতব-উদ্দিন অইবক্ (১২০৬-১২১০)
|
- (২) আরাম শাহ্ (১২১০-১২১১)
- কন্যা = (৩) শামস্-উদ্দিন ইলতুৎমিস্ (১২১১-১২৩৬)
  |
  - নাসির-উদ্দিন মহ্মুদ (বাংলাদেশ)
  - (৪) রুকন্-উদ্দিন ফিরোজ (১২৩৬)
    |
    (৭) আলা-উদ্দিন মসুদ (১২৪২-১২৪৬)
  - (৫) রাজিয়া (১২৩৬-১২৪০)
  - (৬) মুঈজ-উদ্দিন বহ্রাম মহ্মুদ (১২৪০-১২৪২)
  - (৮) নাসির-উদ্দিন (১২৪৬-১২৬৬)

(৯) উলঘ্ খাঁ বলবন বা গিয়াস্-উদ্দিন বলবন : নাসির-উদ্দিনের শ্বশুর (১২৬৬-১২৮৭)
|
- নাসির-উদ্দিন মহ্মুদ বুগ্রা খাঁ (বাংলাদেশ)
  |
  (১০) মুঈজ-উদ্দিন কৈকোবাদ (১২৮৭-১২৯০)
  |
  (১১) শামস্-উদ্দিন কৈউমুর্স (১২৯০)
- মহম্মদ
  |
  কাই-খসরু

ফতে খাঁ — জাফর খাঁ — (৬) নাসির-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্ (১৩৯০-১৩৯৪)

(৪) গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক শাহ্ (দ্বিতীয়) (১৩৮৮)

(৮) নসরৎ শাহ্ (১৩৯৪-১৩৯৯)

(৫) আবুবক্‌র শাহ্ (১৩৮৮-১৩৯০)

(৭) আলা-উদ্দিন সিকন্দর (প্রথম) (১৩৯৪)

(৯) মহম্মুদ তুঘ্‌লক (দ্বিতীয়) (১৩৯৯-১৪১৩)

দৌলত খাঁ (১৪১৩-১৪১৪)

দিল্লীর সৈয়দ সুলতানগণ (১৪১৪-১৪৫১)

(১) সৈয়দ খিজির খাঁ (১৪১৪-১৪২১)

(২) মুঈজ-উদ্দিন মুবারক শাহ্ (১৪২১-১৪৩৪)

ফরিদ খাঁ

(৩) মহম্মদ শাহ্ (১৪৩৪-১৪৪৫)

(৪) আলা-উদ্দিন আলম শাহ্ (১৪৪৫-১৪৫১)

দিল্লীর লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

(১) বহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯)

বারবক শাহ্ (জৌনপুর)

(২) নিজাম খাঁ, সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)

আলম্ খাঁ

(৩) ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬)

(১৬৫৮-১৭০৭)

- মহম্মদ
- (৭) মোয়াজ্জেম বা প্রথম বাহাদুর শাহ্ (প্রথম শাহ্ আলম্) (১৭০৭-১২)
  - (৮) জাহান্দার শাহ্ (১৭১২-১৩)
    - (১৪) আজিজ-উদ্দিন (দ্বিতীয় আলমগীর) (১৭৫৪-৫৯)
      - (১৫) দ্বিতীয় শাহ্ আলম (১৭৫৯-১৮০৬)
        - (১৬) দ্বিতীয় আকবর শাহ্ (১৮০৬-৩৭)
          - (১৭) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ (শেষ মোগল সম্রাট্) (১৮৩৭-৫৭, মৃত্যু ১৮৬২)
  - আজিম-উস্-শান
    - (৯) ফারুকশিয়ার (১৭১৩-১৯)
  - রফি-উস্-শান
    - (১০) রফি-উদ্-দরাজাত বা দ্বিতীয় শাহ্জাহান (১৭১৯)
    - (১১) রফি-উদ্-দৌলা (১৭১৯)
    - মহম্মদ ইব্রাহিম (১৭২০)
  - জাহান শাহ্
    - (১২) রোশন আখ্তার (মহম্মদ শাহ্) (১৭১৯-৪৮)
      - (১৩) আহম্মদ শাহ্ (১৭৪৮-৫৪)
- আজম্ (১৭০৭)
- আকবর (১৭০৪)
  - নেকুশিয়ার (১৭১৯)
- কামবক্স (১৭০৯)

দিল্লীর খল্‌জী বংশ (১২৯০-১৩২০)

কনৌজের তুল্‌ক খাঁ (কায়িম খাঁ)
- (১) জালাল-উদ্দিন ফিরোজ শাহ্‌ (১২৯০-১২৯৬)
  - (২) রুক্‌ন-উদ্দিন ইব্রাহিম (১২৯৬)
- শিহাব-উদ্দিন : মামুদ
  - (৩) আলা-উদ্দিন সিকন্দর সানী, মহম্মদ শাহ্‌ (১২৯৬-১৩১৬)
    - খিজির খাঁ
    - (৪) শিহাব-উদ্দিন উমর (১৩১৬)
    - (৫) কুতব-উদ্দিন মবারক শাহ্‌ (১৩১৬-১৩২০)

(৬) নাসির-উদ্দিন খসরু (১৩২০)

তুঘ্‌লক বংশ (১৩২০-১৪১৩)

- (১) গাজী মালিক : গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক (১৩২০-১৩২৫)
  - (২) মহম্মদ জুনা : মহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লক (১৩২৫-১৩৫১)
- রজ্জব
  - (৩) ফিরোজ শাহ্‌ (১৩৫১-১৩৮৮)
    - ফতে খাঁ
      - (৪) গিয়াস-উদ্দিন তুঘ্‌লক শাহ্‌ (দ্বিতীয়) (১৩৮৮)
      - (৮) নসরৎ শাহ্‌ (১৩৯৪-১৩৯৯)
    - জাফর খাঁ
      - (৫) আবুবক্‌র শাহ্‌ (১৩৮৮-১৩৯০)
    - (৬) নাসির-উদ্দিন মহম্মদ শাহ্‌ (১৩৯০-১৩৯৪)
      - (৭) আলা-উদ্দিন সিকন্দর (প্রথম) (১৩৯৪)
      - (৯) মহমুদ তুঘ্‌লক (দ্বিতীয়) (১৩৯৯-১৪১৩)

দৌলত খাঁ (১৪১৩-১৪১৪)

দিল্লীর সৈয়দ সুলতানগণ (১৪১৪-১৪৫১)

(১) সৈয়দ খিজির খাঁ (১৪১৪-১৪২১)
- (২) মুঈজ-উদ্দিন মুবারক শাহ্‌ (১৪২১-১৪৩৪)
- ফরিদ খাঁ
  - (৩) মহম্মদ শাহ্‌ (১৪৩৪-১৪৪৫)
    - (৪) আলা-উদ্দিন আলম শাহ্‌ (১৪৪৫-১৪৫১)

দিল্লীর লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬)

(১) বহ্‌লুল লোদী (১৪৫১-১৪৮৯)
- বারবক শাহ্‌ (জৌনপুর)
- (২) নিজাম খাঁ, সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)
  - (৩) ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬)
- আলম্‌ খাঁ

দিল্লীর মোগল সম্রাট বংশ (১৫২৬-৩৯, ১৫৫৪-১৮৫৮)

(১) জহির-উদ্দিন বাবর (১৫২৬-৩০)

- (২) নাসির-উদ্দিন হুমায়ুন (১৫৩০-৩৯, ১৫৫৪-৫৬)
  - (৩) জালাল-উদ্দিন আকবর (১৫৫৬-১৬০৫)
    - (৪) জাহাঙ্গীর (সেলিম) (১৬০৫-২৭)
      - খসরু
        - দাওয়ার বক্স
      - পরভেজ
      - (৫) খুররম (শাহজাহান) (১৬২৭-৫৮) (মৃত্যু, ১৬৬৬)
        - দারাশিকো
        - সুজা
        - (৬) ঔরংজেব (১৬৫৮-১৭০৭)
          - মহম্মদ
          - (৭) মোয়াজ্জেম বা প্রথম বাহাদুর শাহ (প্রথম শাহ আলম) (১৭০৭-১২)
            - (৮) জাহান্দার শাহ (১৭১২-১৩)
              - (১৪) আজিজ-উদ্দিন (দ্বিতীয় আলমগীর) (১৭৫৪-৫৯)
                - (১৫) দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬)
                  - (১৬) দ্বিতীয় আকবর শাহ (১৮০৬-৩৭)
                    - (১৭) দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (শেষ মোগল সম্রাট) (১৮৩৭-৫৭, মৃত্যু ১৮৬২)
            - আজিম-উস্-শান
              - (৯) ফারুকশিয়ার (১৭১৩-১৯)
            - রফি-উস্-শান
              - (১০) রফি-উদ্-দরাজাত বা দ্বিতীয় শাহজাহান (১৭১৯)
              - (১১) রফি-উদ্-দৌলা (১৭১৯)
              - মহম্মদ ইব্রাহিম (১৭২০)
            - জাহান শাহ
              - (১২) রোশন আখতার (মহম্মদ শাহ) (১৭১৯-৪৮)
                - (১৩) আহম্মদ শাহ (১৭৪৮-৫৪)
          - আজম (১৭০৭)
          - আকবর (১৭০৪)
            - নেকুশিয়ার (১৭১৯)
          - কামবক্স (১৭০৯)
        - মুরাদ
      - শাহরিয়ার
    - মুরাদ
    - দানিয়াল
  - মির্জা মহম্মদ
- কামরান
- হিন্দাল
- আসকরী

দিল্লীর আফগান বংশ (১৫৪০-৫৫)

ফরিদ-উদ্দিন : শের খাঁ :

শের শাহ	১৫৪০-৪৫
ইসলাম শাহ	১৫৪৫-৫৪
ফিরোজ শাহ	১৫৫৪

মারাঠা বংশাবলী

জিজাবাঈ = শাহ্‌জী = তুকাবাঈ

ব্যাঙ্কোজী বা একোজী (তাঞ্জোর)

সইবাঈ = শিবাজী (১৬২৭-৮০) = সয়রাবাঈ

প্রথম শম্ভুজী (১৬৮০-৮৯)

তারাবাঈ = রাজারাম = রাজস্‌বাঈ (১৬৯০-১৭০০)

শাহ্‌ (দ্বিতীয় শিবাজী) (১৭০৮-৪৯)

তৃতীয় শিবাজী (১৭০০-১২)

দ্বিতীয় শম্ভুজী (কোলহাপুর) (১৭১২-৬০)

(দত্তক) রামরাজা

রামরাজা (১৭৪৯-৭৭)

চতুর্থ শিবাজী

দ্বিতীয় শাহ্‌ (দত্তক) (১৭৭৭-১৮১০)

প্রতাপসিংহ (১৮১০-৩৯) শাহ্‌জী রাজা

পেশওয়া বংশ

বিশ্বনাথ

বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০)

প্রথম বাজী রাও (১৭২০-৪০)

চিমনজী আপ্পা

সদাশিব রাও ভাও (মৃত্যু, ১৭৬১)

দ্বিতীয় বালাজী বাজী রাও (নানাসাহেব) (১৭৪০-৬১)

রঘুনাথ রাও (রাঘোবা) (১৭৭৩-৭৪)

বিশ্বাস রাও (মৃত্যু, ১৭৬১) (প্রথম) মাধব রাও (১৭৬১-৭২) নারায়ণ রাও (১৭৭২-৭৩)

(দ্বিতীয়) মাধব রাও নারায়ণ (১৭৭৪-৯৬)

অমৃত রাও (দত্তক) দ্বিতীয় বাজী রাও (১৭৯৬-১৮১৮) চিমনজী আপ্পা (১৭৯৬)

বিনায়ক রাও

নানাসাহেব

বাংলার নবাববংশ

মুর্শিদকুলী খাঁ
(১৭০৩-২৭)
|
কন্যা = সুজা-উদ্দিন খাঁ
(১৭২৭-৩৯)
|
সরফরাজ খাঁ
(১৭৩৯-৪০)

* * *

আলিবর্দী খাঁ
(১৭৪০-৫৬)
|
(কন্যা) আমিনা বেগম = জৈন-উদ্দিন
|
সিরাজ-উদ্-দৌলা
(১৭৫৬-৫৭)

* * *

মিরজাফর
(১৭৫৭-৬০, ১৭৬৩-৬৫)
|
(কন্যা) ফতেমা বেগম = মিরকাশিম (১৭৬০-৬৩) | নজম্-উদ্-দৌলা (১৭৬৫-৬৬) | সৈইফ্-উদ্-দৌলা (১৭৬৬-৭০)

শিখ গুরুগণ : গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৮)
|
গুরু অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২)
|
গুরু অমরদাস (১৫৫২-৭৪)
|
গুরু রামদাস (১৫৭৪-৮১)
|
গুরু অর্জুনমল (১৫৮১-১৬০৬)
|
গুরু হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫)
|
গুরু হররায় (১৬৪৫-৬১)
|
গুরু হরকিশন (১৬৬১-৬৪)
|
গুরু তেগ বাহাদুর (১৬৬৪-৭৫)
|
গুরু গোবিন্দ সিংহ (১৬৭৫-১৭০৮)

শিখ নেতা : বান্দা (১৭০৮-১৬)
শিখ শক্তি সাময়িকভাবে হ্রাসপ্রাপ্ত
কাপুর সিংহ

বারটি শিখ মিস্‌ল : ভাঙ্গি, কান্‌হিয়া, সুকারচাকিয়া, নাকাই, **ফাইজুল্লাপুরিয়া, আলুওয়ালিয়া, রামগারিয়া,** ডালিওয়ালিয়া, কারোয়া সিঙ্গিয়া, **নিশানওয়ালা, শহীদ ও মাইহাং, এবং ফুলকিয়া।**

রঞ্জিৎ সিংহের পূর্বপুরুষ ও উত্তরপুরুষ

বুধ সিংহ (১৭১৬)
|
নোধ সিংহ (১৭১৬-৫২)
|
চরত সিংহ (১৭৫২-৭৪)
|
মহা (মহান) সিংহ (১৭৭৪-৯০)
|
রঞ্জিৎ সিংহ (১৭৯০-১৮৩৯)
|
খড়ক সিংহ (১৮৩৯-৪০)
|
নৌ নিহাল সিংহ (১৮৪০)
|
চাঁদ কাউর (১৮৪০-৪১)
|
শের সিংহ (১৮৪১-৪৩)
|
দলীপ সিংহ (১৮৪৩-৪৯)

ব্রিটিশ আমলের গভর্ণর ও গভর্ণর-জেনারেলগণ

(১) বাংলার গভর্ণরগণ

রবার্ট ক্লাইভ	১৭৫৭-৬০
ভ্যান্সিটার্ট	১৭৬০-৬৪
(লর্ড) রবার্ট ক্লাইভ (দ্বিতীয় বার)	১৭৬৪-৬৭
ভেরেল্‌স্ট্‌	১৭৬৭-৬৯
কার্টিয়ার	১৭৬৯-৭২
ওয়ারেন হেস্টিংস্‌	১৭৭২-৭৪

(২) বাংলার গভর্ণর-জেনারেলগণ

(১৭৭৩ খ্রীঃ রেগুলেটিং এ্যাক্ট্‌ অনুসারে নিযুক্ত)

ওয়ারেন হেস্টিংস্‌	১৭৭৪-৮৫
স্যার্‌ জন্‌ ম্যাক্‌ফার্‌সন্‌	১৭৮৫-৮৬
লর্ড কর্ণওয়ালিস	১৭৮৬-৯৩
স্যার্‌ জন্‌ শোর	১৭৯৩-৯৮
লর্ড ওয়েলেস্‌লী	১৭৯৮-১৮০৫
লর্ড কর্ণওয়ালিস (দ্বিতীয় বার)	১৮০৫
স্যার্‌ জর্জ বার্লো	১৮০৫-০৭
আর্ল অব্‌ মিণ্টো (প্রথম)	১৮০৭-১৩
মার্‌কুইস্‌ অব্‌ হেস্টিংস্‌	১৮১৩-২৩
লর্ড আমহার্স্ট	১৮২৩-২৮
লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক	১৮২৮-৩৩

(৩) ভারতের গভর্ণর-জেনারেলগণ

(১৮৩৩ খ্রীঃ চার্টার এ্যাক্ট্‌ অনুসারে নিযুক্ত)

লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক	১৮৩৩-৩৫
স্যার্‌ চার্লস্‌ (লর্ড) মেট্‌কাফ্‌	১৮৩৫-৩৬
লর্ড অক্‌ল্যাণ্ড	১৮৩৬-৪২
লর্ড এলেনবরা	১৮৪২-৪৪
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪-৪৮
লর্ড ডালহৌসী	১৮৪৮-৫৬
লর্ড ক্যানিং	১৮৫৬-৫৮

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র অনুসারে ভারতের প্রথম গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয়

লর্ড ক্যানিং	১৮৫৮-৬২

মডেল প্রশ্নাবলী

প্রথম অধ্যায়

Essay type

1. Why is geography so important to history?
   ভূগোল ইতিহাসের ক্ষেত্রে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?
2. Determine the influence of geography on the country, people and history of India.
   ভারত, ভারতবাসী এবং ভারত-ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব নির্ণয় কর।
3. What are the different races that compose the Indian population?
   কোন্ কোন্ জাতি লইয়া ভারতীয় লোকসংখ্যা গঠিত?
4. Is it correct to regard Indian culture as a composite culture? Give reasons for your answer.
   ভারতীয় সংস্কৃতিকে মিশ্র সংস্কৃতি বলিয়া বিবেচনা করা ঠিক হইবে কি? যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া বল।
5. Why is there a fundamental unity among the Indians?
   ভারতীয়দের মধ্যে মৌলিক ঐক্য কেন বিদ্যমান?
6. What do you mean by 'Unity in diversity' among the Indians?
   'বৈচিত্র্যের মধ্যে একতা' ভারতীয়দের ক্ষেত্রে এই কথার তাৎপর্য কি?
7. 'India offers unity in diversity.' Elucidate.
   'বৈচিত্র্যের মধ্যে একতার দৃষ্টান্তস্বরূপ দেশ ভারতবর্ষ।' ব্যাখ্যা কর।

Short-answer type

1. Discuss:
   (i) Relation of Geography with History.
   (ii) Influence of geography on India.
   (iii) Influence of geography on Indian history.
   (iv) Influence of geography on Indian people.
   আলোচনা কর:
   (১) ভূগোল ও ইতিহাসের সম্পর্ক।
   (২) ভারতের উপর ভূগোলের প্রভাব।
   (৩) ভারত-ইতিহাসের উপর ভূগোলের প্রভাব।
   (৪) ভারতীয়দের উপর ভূগোলের প্রভাব।
2. What are the diversities to be noticed in India?
   ভারতে কি কি বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়?
3. What fundamental unity holds the Indian together?
   কি মৌলিক ঐক্য ভারতীয়দের একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছে?
4. What are the names of the different racial groups that compose the Indian population?
   যে যে জাতির লোক লইয়া ভারতের লোকসংখ্যা গঠিত সেগুলির নাম কি কি?
5. Explain the composite nature of the Indian culture.
   ভারতীয় সংস্কৃতি 'মিশ্র সংস্কৃতি' একথা বুঝাইয়া বল।

Objective type

1. Tick off the correct answer in the space provided.
নির্দিষ্ট স্থানে √ চিহ্ন দিয়া সঠিক উত্তরটি দেখাইয়া দাও।

(i) Indian people are a racially ... people.

pure	
healthy	
mixed	
honest	

(১) ভারতীয়গণ জাতিগতভাবে একটি ... জাতি।

মৌল	
স্বাস্থ্যবান	
মিশ্রিত	
সৎ	

(ii) The Indian culture is a ... culture.

unitary	
composite	
multiple	
backward	

(২) ভারতীয় সংস্কৃতি একটি ... সংস্কৃতি।

ঐকিক	
মিশ্র	
বহুমুখী	
পশ্চাৎপদ	

দ্বিতীয় অধ্যায়

Essay type

1. What are the sources of ancient Indian history ?
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি কি কি ?
2. How do the accounts of the foreign travellers and writers help us in writing the history of ancient India ?
বিদেশী পর্যটক ও লেখকদের রচনা কিভাবে আমাদিগকে ভারত-ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে ?
3. Discuss the sources of medieval Indian history.
মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।
4. What are the source materials for writing the history of modern India ?
আধুনিক যুগের ইতিহাস রচনার উপাদানগুলি কি কি ?
5. Discuss the principal sources of ancient and medieval Indian history.
প্রাচীন ও মধ্য যুগের ভারত-ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলি সম্পর্কে আলোচনা কর।

Short-answer type

1. Discuss the importance of the following in reconstructing the history of ancient India.
(*a*) Inscriptions, (*b*) Coins, (*c*) Foreigners' accounts, (*d*) Archaeological remains.
প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় নিম্নলিখিত উপাদানগুলির গুরুত্ব আলোচনা কর।
(ক) লিপি, (খ) মুদ্রা, (গ) বৈদেশিক রচনা, (ঘ) প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।

Objective type

1. Who are the authors of the following ? Point out the correct answer.
Memoirs of Jahangir — Answer : Babur ☐ Feruz Shah ☐ Jahangir ☐
Memoirs of Babur — " Akbar ☐ Babur ☐ Humayun ☐
নিম্নলিখিত গ্রন্থের রচয়িতা কে ? শুদ্ধ উত্তরটি দেখাও।
জাহাঙ্গীরের জীবনস্মৃতি — উত্তর : বাবর ☐ ফিরুজ শাহ্ ☐ জাহাঙ্গীর ☐
বাবরের জীবনস্মৃতি — " আকবর ☐ বাবর ☐ হুমায়ুন ☐

তৃতীয় অধ্যায়

Essay type

1. Give an idea of the Indus Civilisation. How old was it?
   সিন্ধু-সভ্যতা সম্পর্কে একটি ধারণা দাও। এই সভ্যতা কত কাল আগের সভ্যতা?
2. Give in brief an account of the Indus Valley Civilisation. What is the historical significance?
   সিন্ধু-সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি?
3. What do you know of the Indus Valley Civilisation?
   সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা সম্পর্কে কি জান?
4. Briefly describe the social and economic life of the Vedic Aryans.
   বৈদিক আর্যদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।
5. Who were the Aryans? Briefly describe their political organisation.
   আর্য কাহারা ছিলেন? তাঁহাদের রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
6. What do you know of the social and political life of the Aryans in the Vedic Age?
   বৈদিক যুগের আর্যদের সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবরণ দাও।
7. Write a short account of the social and religious life of the Vedic Aryans. What is called Vedanta?
   বৈদিক আর্যদের সামাজিক ও ধর্মনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। বেদান্ত বলিতে কি বুঝ?

Short-answer type

1. What was the character of the Indus Civilisation?
   সিন্ধু-সভ্যতার প্রকৃতি কিরূপ ছিল?
2. What were the other civilisations that had developed near about the same time with the Indus Civilisation?
   সিন্ধু-সভ্যতার সমসাময়িক আর কোন্ কোন্ সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল?
3. Write what you know about the streets and buildings discovered at Harappa and Mohenjodaro.
   হরপ্পা ও মহেঞ্জোদরোতে প্রাপ্ত রাস্তা এবং দালান সম্পর্কে যাহা জান লিখ।
4. What are the four Vedas? Which has composed first?
   চারি বেদ কি কি? কোন্‌টি সর্বপ্রথম রচিত হইয়াছিল?
5. What were the different stages or Asramas in life of the Vedic Aryans?
   বৈদিক আর্যদের জীবনের বিভিন্ন পর্যায় বা আশ্রম কিরূপ ছিল?
6. Describe the Vedic social life.
   বৈদিক সমাজের বর্ণনা দাও।

Objective type

1. Tick off the correct answer:

   (a) Nature of the Indus Civilisation

rural		urban		modern	

   (b) Indus Civilisation was contemporary with

Vedic civilisation		Egyptian-Chinese-Mesopotemian civilisations		Mahommedan civilisation	

(১) ✓ চিহ্ন দ্বারা শুদ্ধ উত্তরটি দেখাইয়া দাও :

(ক) সিন্ধু-সভ্যতার প্রকৃতি

গ্রাম্য		নগর		আধুনিক	

(খ) সিন্ধু-সভ্যতা যে-সকল সভ্যতার সমসাময়িক ছিল

বৈদিক সভ্যতার		মিশরীয়-চৈনিক-মেসোপটেমিয়া সভ্যতার		মুসলমান সভ্যতার	

2. What do you mean by the four stages or Asramas in the life of the Vedic Aryans? Mark them as 1, 2, 3, 4 according to precedence.

Childhood ☐ Vanaprastha ☐ Adult age ☐
Brahmacharya ☐ Sannyasa ☐ After life ☐ Garhastya ☐

(২) বৈদিক আর্যদের জীবনের চারি আশ্রম কি কি? ১, ২, ৩, ৪ লিখিয়া কোন্‌টির পর কোন্‌টি দেখাইয়া দাও।

বাল্যজীবন ☐ বানপ্রস্থ ☐ কৈশোর ☐ ব্রহ্মচর্য ☐
সন্ন্যাস ☐ পরজন্ম ☐ গার্হস্থ্য ☐

3. What is the relation between the Vedas and Upanishads? Mark the correct answer.

Upanishads are the slokas of the Vedas ☐
" " " books composed before the Vedas ☐
" " " the philosophical knowledge derived from the Vedas ☐
" " " parts of the Rig Veda ☐
" " " the other name for Sham Veda ☐

(৩) বেদ ও উপনিষদের পারস্পরিক সম্পর্ক কি? শুদ্ধ উত্তরটি দাগ কাটিয়া দেখাও।

উপনিষদ্‌ বেদের শ্লোক ☐
" বেদের পূর্বে রচিত গ্রন্থ ☐
" বেদের উপর চিন্তার ফলে উদ্ভূত দার্শনিক জ্ঞান ☐
" ঋগ্বেদের অংশ ☐
" সামবেদের অপর নাম ☐

চতুর্থ অধ্যায়

Essay type

1. Discuss the teachings of Mahavira and Buddha.
মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্মনীতি সম্পর্কে আলোচনা কর।
2. Review the life and teachings of Mahavira.
মহাবীরের জীবনী ও ধর্মনীতি আলোচনা কর।
3. Review the life and teachings of Gautama Buddha.
গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও ধর্মনীতি আলোচনা কর।
4. Distinguish between the teachings of Mahavira and Buddha.
মহাবীর ও বুদ্ধের ধর্মনীতির পার্থক্য বুঝাইয়া বল।

Short-answer type

1. What do you understand by Eightfold path?
অষ্টাঙ্গিক মার্গ বলিতে কি বুঝ?
2. What are the virtues emphasised by Mahavira?
কোন্‌ কোন্‌ সৎকর্মের উপর মহাবীর জোর দিয়াছেন?
3. Why did Jainism and Buddhism grow up?
জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম কেন উদ্ভূত হইয়াছিল?

Objective type

1. In which religion the doctrine of existence of life is extended to stone and metals? Tick off the correct answer :

Answer : Buddhism ☐ Hinduism ☐ Jainism ☐ Vaishnavism ☐

(১) কোন ধর্মমতে পাথর ও ধাতুর মধ্যে প্রাণ বিদ্যমান বলিয়া মনে করা হয়? শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দিয়া দেখাও :

বৌদ্ধ ধর্ম ☐ হিন্দু ধর্ম ☐ জৈন ধর্ম ☐ বৈষ্ণব ধর্ম ☐

2. Fill in the gaps :

The original name of Buddha was — .
Mahavira died at — .
Gautama Buddha preached his first sermon at — .
Mahavira belonged to a — clan.

(২) শূন্যস্থান পূর্ণ কর :

বুদ্ধের আদি নাম ছিল — ।
মহাবীর — দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।
গৌতম বুদ্ধ — তাঁহার ধর্মমত সর্বপ্রথম প্রচার করেন।
মহাবীর — বংশের সন্তান ছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

Essay type

1. Give in brief an account of the foreign invasions from after the coming of the Aryans till the Huna invasion.

আর্যদের ভারত আগমনের পর হইতে হূণ আক্রমণ পর্যন্ত বৈদেশিক আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

2. Discuss the political condition of North-West India before the Persian and Greek invasions.

পারসীক ও গ্রীক আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা কর।

3. Give an account of Alexander's invasion of India. What was its direct result?

আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ দাও। ইহার প্রত্যক্ষ ফল কি হইয়াছিল?

4. Discuss the nature of resistance offered by the Indians against the foreign invaders. Why did the Indians fail?

বৈদেশিক আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রতিরোধের ধরন কিরূপ ছিল সে-সম্পর্কে আলোচনা কর। ভারতীয়দের অসাফল্যের কারণ কি?

5. Discuss the social and cultural effects of the foreign invasions on the Indians.

ভারতীয়দের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের উপর বৈদেশিক আক্রমণের ফলাফল আলোচনা কর।

6. Who were the Rajputs? Give an account of the rise of the Rajputs.

রাজপুতগণ কাহারা? রাজপুতদের অভ্যুত্থানের বিবরণ দাও।

Short-answer type

1. Who were the Bactrians? What do you know of their invasion of India?

বাহ্লিকগণ কাহারা? তাহাদের ভারত আক্রমণ সম্পর্কে কি জান?

2. Describe Alexander's war with Poros.

পুরুর সহিত আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধের বিবরণ দাও।

3. Who were the Kushanas? Who was their greatest king?
কুষাণগণ কাহারা? তাহাদের শ্রেষ্ঠ রাজা কে?
4. Describe the efforts of Poros to save his country against Alexander's invasion.
আলেকজাণ্ডারের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য পুরুর চেষ্টার বর্ণনা কর।

Objective type

1. Tick off the correct answers : (১) শুদ্ধ উত্তরটি দাগ কাটিয়া দেখাও :

Alexander was the king of		আলেকজাণ্ডার রাজা ছিলেন :	
Greece	☐	গ্রীস	☐
Rome	☐	রোম	☐
Macedon	☐	ম্যাসিডন	☐
Bactria	☐	ব্যাকট্রিয়া	☐
Alexander invaded India in		**আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন :**	
427 B. C.	☐	খ্রীঃ পূঃ ৪২৭	☐
327 A. D.	☐	খ্রীঃ ৩২৭	☐
273 B. C.	☐	খ্রীঃ পূঃ ২৭৩	☐
326 B. C.	☐	খ্রীঃ পূঃ ৩২৬	☐
327 B. C.	☐	খ্রীঃ পূঃ ৩২৭	☐
The greatest king of the Kushanas was		**কুষাণদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন :**	
Kadphises I	☐	প্রথম কদ্‌ফিসিস্	☐
Vima Kadphises	☐	বীম কদ্‌ফিসিস্	☐
Kanishka	☐	কণিষ্ক	☐

2. King of which country stood against Alexander in defence of freedom
Mark the correct answer : Taxila ☐ Paurava ☐ Madra ☐

(২) কোন্ দেশের রাজা আলেকজাণ্ডারের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার জন্য দাঁড়াইয়াছিলেন?
শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দাও : তক্ষশিলা ☐ পৌরব ☐ মদ্র ☐

ষষ্ঠ অধ্যায়

Essay type

1. Write in brief the history of the expansion of Magadha into an empire from Bimbisara to Asoka.
বিম্বিসার হইতে অশোক পর্যন্ত মগধের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
2. Who was Chandragupta Maurya? What were his achievements.
চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কে ছিলেন? তাঁহার কৃতিত্ব কি কি?
3. Review the career and achievements of Asoka.
অশোকের জীবনী ও কৃতিত্বের আলোচনা কর।
4. Discuss Asoka's place in history.
ইতিহাসে অশোকের স্থান নির্ণয় কর।
5. Who was the founder of the Gupta empire? How did Samudragupta extend it?
গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? সমুদ্রগুপ্ত এই সাম্রাজ্য কিভাবে বিস্তৃত করিয়াছিলেন?
6. Sketch the career of Samudragupta and examine him as a statesman and a warrior.
সমুদ্রগুপ্তের জীবনী বিবৃত কর। দূরদর্শী রাজনীতিক এবং যোদ্ধা হিসাবে তাঁহার সমালোচনামূলক আলোচনা কর।

7. Write in brief the history of the Guptas from Chandragupta I to Skandagupta.
প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে স্কন্দগুপ্ত পর্যন্ত গুপ্ত বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

8. Give in brief the history of the story of Harshavardhana's conflict with Sasanka of Gauda. Did Harshavardhana really succeed in the conflict ?
গৌড়ের শশাঙ্কের সহিত হর্ষবর্ধনের দ্বন্দ্বের বিবরণ সংক্ষিপ্তভাবে দাও। এই দ্বন্দ্বে হর্ষবর্ধন কি প্রকৃতই জয়ী হইয়াছিলেন ?

9. Describe the extent of Sasanka's empire. Estimate his achievements.
শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি বর্ণনা কর। তাঁহার কৃতিত্বের তর্জমা কর।

10. Who was the founder of the Pala dynasty of Bengal ? Who was the greatest king of the dynasty ? Give reasons for your answer.
বাংলার পাল বংশের স্থাপয়িতা কে ছিলেন ? এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ? যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া বল।

11. Account for the rise of the Palas under Gopala and form an estimate of the work of Dharmapala.
বাংলাদেশে গোপালের নেতৃত্বে পাল বংশের উত্থান বর্ণনা কর এবং ধর্মপালের কার্যাবলীর বিচার কর।

12. Give in brief the history of the Pala rule in Bengal with special reference to Dharmapala and Devapala.
ধর্মপাল ও দেবপালের শাসনকাল সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া পাল যুগের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

Short-answer type

1. Describe Chandragupta's defence of the country against Seleukos's invasion.
সেলুকাসের আক্রমণের বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের দেশরক্ষার বিবরণ দাও।

2. What was the impact of the Kalinga War on Asoka ?
অশোকের উপর কলিঙ্গ যুদ্ধের কি প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল ?

3. Discuss Skandagupta's exploits against the Huna invasion.
হূণ আক্রমণের বিরুদ্ধে স্কন্দগুপ্তের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

4. How did Kanauj come under the Pushyabhuti dynasty of Thaneswar ?
থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের অধীনে কনৌজ কিভাবে আসিয়াছিল ?

5. To what extent was Harshavardhana successful in making the world 'Gaudaless' ?
পৃথিবীকে 'গৌড়শূন্য' করিতে হর্ষবর্ধন কিরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন ?

6. What is *Matsya-nyaya* ? How did the Bengalees save Bengal from *Matsya-nyaya* ?
'মাৎস্য-ন্যায়' কাহাকে বলে ? 'মাৎস্য-ন্যায়' হইতে কিভাবে বাঙালীরা বাংলাদেশকে রক্ষা করিয়াছিল ?

Objective type

Tick off the correct answer : শুদ্ধ উত্তরটি ✓ চিহ্ন দিয়া দেখাও।

(1) The founder of the Maurya dynasty was : (১) মৌর্য বংশের স্থাপয়িতা ছিলেন

Mura	☐	মুরা	☐
Chandragupta I	☐	প্রথম চন্দ্রগুপ্ত	☐
Bindusara	☐	বিন্দুসার	☐
Chandragupta	☐	চন্দ্রগুপ্ত	☐
Bimbisara	☐	বিম্বিসার	☐

(ii) The greatest king of the Maurya dynasty was : (২) মৌর্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা ছিলেন।

Bimbisara	☐	বিম্বিসার	☐
Chandragupta	☐	চন্দ্রগুপ্ত	☐
Asoke	☐	অশোক	☐
Bindusara	☐	বিন্দুসার	☐

(iii) Skandagupta defended the country against : (৩) স্কন্দগুপ্ত দেশকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

Bactrian invasion	☐	বাহ্লিক আক্রমণ হইতে	☐
Parthian invasion	☐	পহ্লব ,, ,,	☐
Huna invasion	☐	হূণ ,, ,,	☐
Kushan invasion	☐	কুষাণ ,, ,,	☐
Seleukos's invasion	☐	সেলুকাসের ,, ,,	☐

সপ্তম অধ্যায়

Essay type

1. Write an essay on the social condition prevailing in India from the Maurya period till the foundation of the Muslim rule in India.
   মৌর্য যুগ হইতে শুরু করিয়া মুসলমান শাসনের পূর্বাবধি ভারতের সামাজিক পরিস্থিতির আলোচনামূলক প্রবন্ধ লিখ।
2. Describe the cultural development under the Guptas.
   গুপ্ত রাজত্বকালে সাংস্কৃতিক উন্নতির বর্ণনা কর।
3. Write a note on the Pallava Art.
   পল্লব শিল্প সম্পর্কে একটি টীকা লিখ।
4. Discuss the art and architecture that flourished in South India.
   দক্ষিণ-ভারতে শিল্প ও স্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনা কর।
5. What do you know of the art and literature under the Palas of Bengal ?
   বাংলার পাল বংশের রাজত্বকালে শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে কি জান ?

Short-answer type

1. Write notes on :
(i) Foreign influence on Maurya sculpture, (ii) Gandhara Art, (iii) Chola Art.
১। টীকা লিখ :
(১) মৌর্য ভাস্কর্যের উপর বৈদেশিক প্রভাব, (২) গান্ধার শিল্প, (৩) চোল শিল্প।

2. Why are the following noted in History ? (i) Pataliputra, (ii) Mahabalipuram, (iii) Conarak, (iv) Ajanta, (v) Ellora, (vi) Elephanta, (vii) Sanchi.

২। নিম্নলিখিতগুলি ইতিহাসে বিখ্যাত কেন ? (১) পাটলিপুত্র, (২) মহাবলীপুরম্, (৩) কোণারক, (৪) অজন্তা, (৫) ইলোরা, (৬) এলিফ্যান্টা, (৭) সাঁচী।

Objective type

1. Fill in the gaps :
   (a) Completely Indian art and sculpture had developed side by side with Gandhara art in places like — — .
   (b) The gate way to South Indian temples is called — .
   (c) Kailash Temple is situated at — .

১। শূন্যস্থান পূরণ কর :
   (ক) গান্ধার শিল্পের পাশাপাশি সম্পূর্ণ ভারতীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের নিদর্শন — — স্থানে পাওয়া যায়।
   (খ) দক্ষিণ-ভারতের মন্দিরগুলির তোরণ দ্বারকে — বলে।
   (গ) কৈলাস মন্দির—অবস্থিত।

অষ্টম অধ্যায়

Essay type

1. Briefly narrate the story of the spread of the Indian culture and civilisation beyond India.
   ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।
2. What are the areas outside India where Indian culture civilisation had been spread in ancient times?
   প্রাচীন যুগে ভারতের বাহিরে কোন্ কোন স্থানে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল ?

Short-answer type

1. Give the history of the spread of Indian culture and civilisation in Central Asia.
   মধ্য-এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস দাও।
2. How had the Indian culture and civilisation been spread in Champa, Cambodia, Malay, Sumatra and other neighbouring countries?
   চম্পা, কম্বোজ, মালয়, সুমাত্রা এবং অপর নিকটবর্তী দেশসমূহে কিভাবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিয়াছিল ?

Objective type

1. What are the following?
   Tick off the correct answer:
   (i) Ankorbhat:
   - A street name ☐
   - Name of a king ☐
   - A temple in Cambodia ☐
   - A place in Java ☐
   - A king of Sumatra ☐

   (ii) Kumarghosa:
   - Brother of Aswaghosa ☐
   - Priest of Bayon temple ☐
   - The Bengalee preceptor of the Sailendra kings ☐
   - Prince of Sumatra ☐

১। নিম্নলিখিতগুলি কি ?
শুদ্ধ উত্তর ✓ দাগ দিয়া বুঝাও :
(১) আঙ্কোরভাট :
- রাস্তার নাম ☐
- রাজার নাম ☐
- কম্বোজের একটি মন্দির ☐
- যবদ্বীপের একটি রাজপ্রাসাদ ☐
- সুমাত্রার একজন রাজা ☐

(২) কুমারঘোষ :
- অশ্বঘোষের ভ্রাতা ☐
- বেয়ন মন্দিরের পুরোহিত ☐
- শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজগণের ধর্মগুরু ☐
- সুমাত্রার যুবরাজ ☐

নবম অধ্যায়

Essay type

1. Give in brief the history of the establishment of Muslim rule in India from the Arab conquest of Sind till the accession of Qutb-uddin Aibak as Sultan in 1206 A. D.
   আরবদের সিন্ধু-বিজয় হইতে শুরু করিয়া ১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতব-উদ্দিন অইবকের সুলতান-পদ গ্রহণ পর্যন্ত ভারতে মুসলমান অধিকার স্থাপনের ইতিহাস দাও।
2. Narrate the principal raids of Sultan Mahmud of Gazni. What were their direct results?
   গজনীর সুলতান মামুদের প্রধান অভিযানগুলির বিবরণ দাও। তাঁহার অভিযানের প্রত্যক্ষ ফল কি হইয়াছিল ?

3. Give in brief the story of Muhammad Ghori's Indian expeditions with special reference to the two battles of Tarain (1191, 1192 A. D.).
মহম্মদ ঘুরীর ভারত অভিযানগুলি তরাইনের প্রথম এবং দ্বিতীয় যুদ্ধের (১১৯১, ১১৯২ খ্রীঃ) বিশেষ উল্লেখ-সহ বর্ণনা কর।

4. What were the contributions of Iltutmish and Balban to the consolidation of the Muslim rule in India ?
ভারতে মুসলমান অধিকার সুদৃঢ় করিতে ইল্‌তুৎমিস ও বলবনের অবদান কি ছিল ?

5. Describe the expansion of the Sultanate under Alauddin Khalji.
আলা-উদ্দিন খল্‌জীর অধীনে সুলতানি সাম্রাজ্য বিস্তারের বিবরণ দাও।

6. Whom do you consider the most important of the Tughluq Sultans ? Give reasons for your answer.
তুঘ্‌লক বংশের সুলতানদের মধ্যে কাহাকে তুমি সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে কর যুক্তি দিয়া বুঝাইয়া দাও।

7. Do you consider Muhammad bin Tughluq to be a mad king ? Give reasons for your answer.
মহম্মদ-বিন্‌-তুঘ্‌লককে উন্মাদ রাজা বলিয়া মনে কর কি ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর।

8. How did Muhammad bin Tughluq and Firuz Tughluq contribute to the downfall of the Delhi Sultanate ?
মহম্মদ-বিন-তুঘ্‌লক ও ফিরোজ তুঘ্‌লক কিভাবে দিল্লী সুলতানির পতনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন ?

9. Account for the decline of the Delhi Sultanate (Turko-Afghan Empire).
দিল্লী সুলতানির (তুর্কী-আফগান সাম্রাজ্যের) অধঃপতনের কারণ নির্দেশ কর।

10. Who was the real founder of the Mughal empire ?
মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা কে ছিলেন ?

11. Give the history of the Mughal conquest of India from the first Battle of Panipath (1526) to the second Battle of Panipath (1556).
পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬ খ্রীঃ) হইতে পাণিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত ভারতে মোগল বিজয়ের ইতিহাস দাও।

12. Who was Sher Shah ? Narrate the history of his rise to the Delhi imperial throne.
শের শাহ্‌ কে ছিলেন ? দিল্লীর সম্রাট্‌-পদে আসীন হওয়া পর্যন্ত তাঁহার ইতিহাস বর্ণনা কর।

13. Examine Akbar's claim to be regarded as 'Great'.
আকবরকে 'মহান্‌' বলিবার যৌক্তিকতা আলোচনা কর।

14. Narrate Rana Pratap's struggle against the Mughals. What was its ultimate result ?
মোগলদের বিরুদ্ধে রাণা প্রতাপের দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও। ইহার শেষ ফল কি হইয়াছিল ?

15. How did Akbar make himself a National King ?
আকবর নিজেকে ভারতীয়দের জাতীয় সম্রাটে কিভাবে পরিণত করিয়াছিলেন ?

16. Examine Aurangzeb as a ruler. What was his responsibility for the downfall of the Mughal empire ?
শাসক হিসাবে ঔরংজেবের বিচার কর। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তিনি কতদূর দায়ী ছিলেন ?

17. What were the causes of the decline of the Mughal empire ?
মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের কারণ কি ছিল ?

Short-answer type

1. Discuss Alauddin Khalji's administrative and military reforms.
আলা-উদ্দিন খল্‌জীর প্রশাসনিক ও সামরিক সংস্কার সম্পর্কে আলোচনা কর।
2. What were the public welfare measures adopted by Firuz Tughlug?
ফিরুজ তুঘ্‌লক জনসাধারণের উপকারার্থে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন?
3. Write a note on Shah Jahan's magnificance.
শাহ্‌জাহানের জাঁকজমকপ্রিয়তার উপর একটি টীকা লিখ।
4. Who was Nur Jahan? What were the effects of her influence on Jahangir's administration?
নূরজাহান কে ছিলেন? জাহাঙ্গীরের শাসনব্যবস্থার উপর তাঁহার প্রভাবের ফলাফল কিরূপ হইয়াছিল?
5. How did Auranzeb alienate the Rajputs, Jats and the Sikhs?
ঔরংজেব রাজপুত, জাঠ ও শিখদিগকে কিভাবে শত্রুতে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন?
6. Write notes on:
(i) Chengiz, (ii) Taimur, (iii) Nadir Shah, (iv) Ahmmad Shah Abdali, (v) Guru-Govinda Singh, (vi) Sangram Singh, (vii) Rana Pratap.
টীকা লিখ:
(১) চিঙ্গিজ, (২) তৈমুর, (৩) নাদির শাহ্‌, (৪) আহ্‌ম্মদ শাহ্‌ আব্‌দালী, (৫) গুরু গোবিন্দ সিংহ, (৬) সংগ্রাম সিংহ, (৭) রাণা প্রতাপ।

Objective type

1. Tick off the correct answer:
(i) Who sacked the Somnath Temple:
Sabuktigin ☐ Muhammad of Ghur ☐ Sultan Mahmud ☐ Alptigin ☐
(ii) With which Mughal Emperor did Sher Shah struggle for the Delhi throne:
Babur ☐ Himu ☐ Humayun ☐ Jahangir ☐
(iii) Who was Rana Pratap: King of Ambar ☐
King of Bikanir ☐ King of Mewar ☐ King of Jaisalmir ☐

১। ✓ চিহ্ন দ্বারা সঠিক উত্তরটি দেখাইয়া দাও:
(১) কে সোমনাথ মন্দিরটি লুণ্ঠন করিয়াছিলেন?
সবুক্তিগীন ☐ মহম্মদ ঘুরী ☐ সুলতান মামুদ ☐ আল্‌প্তিগীন ☐
(২) কোন্‌ মোগল বাদশাহের সহিত শের শাহের দিল্লীর সিংহাসনের জন্য দ্বন্দ্ব হইয়াছিল?
বাবর ☐ হিমু ☐ হুমায়ুন ☐ জাহাঙ্গীর ☐
(৩) রাণা প্রতাপ কে ছিলেন? অম্বরের রাজা ☐
বিকানীরের রাজা ☐ মেবারের রাজা (রাণা) ☐ জয়সল্মীরের রাজা ☐

দশম অধ্যায়

Essay type

1. Discuss the effects of the impact of Muhammedan rule on the social and economic life of the Indians.
ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান শাসনের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা কর।

2. Discuss the impact of Muhammedan rule on the art, architecture and literature of India.

ভারতের শিল্প, স্থাপত্য ও সাহিত্যের উপর মুসলমান শাসনের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

3. Write a note on the Mughal art and architecture.

মোগল শিল্প ও স্থাপত্যের উপর টীকা লিখ।

4. Write what you know of the reaction of the Indian society and culture under the impact of the Muslim culture.

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির উপর মুসলমান সংস্কৃতির প্রভাব সম্পর্কে যাহা জান লিখ।

5. Write notes on :

(i) Ramananda, (ii) Namdev, (iii) Kabir, (iv) Nanak, and (v) Sree Chaitanya.

টীকা লিখ :

(১) রামানন্দ, (২) নামদেব, (৩) কবীর, (৪) নানক, এবং (৫) শ্রীচৈতন্য।

Short-answer type

1. Write a note on the art, literature and language under the Sultanate.

সুলতানি আমলে শিল্প, সাহিত্য ও ভাষা সম্পর্কে টীকা লিখ।

2. What common features do you notice in the preachings of Kabir, Nanak and Sree Chaitanya ?

কবীর, নানক ও শ্রীচৈতন্যের ধর্মমতের মধ্যে কি কি ঐক্য তুমি লক্ষ্য কর ?

3. Give a short account of the architecture under the Mughals.

মোগল আমলের স্থাপত্য শিল্প সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

4. Write notes on :

(i) Social condition under the Sultanate.

(ii) Social reforms under Akbar.

(iii) Mughal art and painting.

টীকা লিখ :

(১) সুলতানি আমলের সামাজিক অবস্থা,

(২) আকবরের সামাজিক সংস্কার,

(৩) মোগল শিল্প ও চিত্র।

Objective type

1. Tick off the correct answer :

What is Tajmahal ?

Fort ☐

Tomb ☐

Mosque ☐

১। শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দাও :

তাজমহল সৌধটি কি ?

দুর্গ ☐

সমাধি-সৌধ ☐

মসজিদ ☐

2. Fill in the gaps :

(i) Amir Khasru was a — .

(ii) Ziauddin Barni was the greatest — of the Sultanate period.

(iii) *Akbarnama* was written by — .

(iv) Dewan-i-Am and Dewan-i-Khas was caused to be built by Mughal emperor — .

(v) Abdul Hamid Lahori was the author of — .

৫। শূন্যস্থান পূরণ কর :

(১) আমীর খস্রু একজন — ছিলেন।

(২) জিয়া-উদ্দিন বরণী সুলতানি আমলের শ্রেষ্ঠ — ছিলেন।

(৩) আকবরনামা — কর্তৃক রচিত হইয়াছিল।

(৪) দেওয়ান-ই-আম্ এবং দেওয়ান-ই-খাস্ মোগল সম্রাট্ — কর্তৃক নির্মিত হইয়াছিল।

(৫) আব্দুল হামিদ লাহোরী — রচনা করিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

(a)

Essay type

1. Estimate the character and achievements of Shivaji.
   শিবাজীর চরিত্র ও কৃতিত্ব বর্ণনা কর।
2. Describe briefly the administrative system built up by Shivaji.
   শিবাজীর রাজ্যশাসন প্রণালী সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
3. Review the life and work of Shivaji.
   শিবাজীর জীবনী ও কার্যকলাপ পর্যালোচনা কর।
4. Give in outline the career of Shivaji. What were his ideals? How far did he succeed?
   শিবাজীর জীবনী সংক্ষেপে লিখ। তাঁহার আদর্শ কি ছিল? তিনি কতদূর সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন?

Short-answer type

1. Discuss Aurangzeb's treatment of Shivaji in his court.
   ঔরংজেবের রাজসভায় শিবাজীর প্রতি যে আচরণ করা হইয়াছিল সে-বিষয়ে আলোচনা কর।
2. Narrate Shivaji and Afzal Khan episode.
   শিবাজী ও আফজল খাঁর ঘটনার বর্ণনা দাও।
3. What were the aims and ideals of Shivaji?
   শিবাজীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ কি ছিল?

Objective type

1. Mark the correct answer:

(1) What title did Shivaji adopt at his coronation?

- Samrat ☐
- Rajadhiraj ☐
- Gopalaka ☐
- Chatrapati-Go-brahman-Prajapalaka ☐
- Rastrapati Praja-brahman-Palaka ☐

১। শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দাও :

(১) শিবাজী তাঁহার অভিষেকের সময় কি কি উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন?

- সম্রাট্ ☐
- রাজাধিরাজ ☐
- গোপালক ☐
- ছত্রপতি-গো-ব্রাহ্মণ-প্রজাপালক ☐
- রাষ্ট্রপতি প্রজা-ব্রাহ্মণ-পালক ☐

(ii) What is *Chauth* ?

One-third share of the government revenue ☐
One-tenth " " " " " ☐
One-sixth " " " " " ☐
One-fourth " " " " " ☐

(২) 'চৌথ' কাহাকে বলে ?

সরকারকে দেয় রাজস্বের তৃতীয়াংশ ☐
" " " দশমাংশ ☐
" " " ষষ্ঠাংশ ☐
" " " চতুর্থাংশ ☐

(iii) Who was Khafi Khan ?

Poet ☐
Priest ☐
Historian ☐
Artist ☐

(৩) খাফি খাঁ কে ছিলেন ?

কবি ☐
পুরোহিত ☐
ঐতিহাসিক ☐
শিল্পী ☐

(b)

Essay type

1. Discuss the relations of the Sikhs with the Mughals from Guru Arjun to Guru Govinda Singh.
গুরু অর্জুন হইতে গুরু গোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত শিখ-মোগল সম্পর্ক আলোচনা কর।
2. What is 'Khalsa' ? What led to its rise ?
'খাল্‌সা' কাহাকে বলে ? খাল্‌সার উৎপত্তি কেন হইয়াছিল ?
3. Sketch the career and statesmanship of Ranjit Singh.
রঞ্জিৎ সিংহের জীবনী ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার বিবরণ দাও।
4. Discuss in brief Anglo-Sikh relations between 1839 and 1849.
১৮৩৯ হইতে ১৮৪৯ খ্রীঃ পর্যন্ত ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক আলোচনা কর।

Short-answer type

1. Write notes on :
(i) Teg Bahadur,
(ii) Guru Govinda Singh.

১। সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :
(১) তেগ্‌ বাহাদুর,
(২) গুরু গোবিন্দ সিংহ।

2. What do you know of Queen mother Jhindan ?
রাণীমাতা ঝিন্দন সম্পর্কে কি জান ?

Objective type

1. Tick off the correct answer :
Who was called 'Indian Napoleon' ?

Dalip Singh ☐
Ranjit Singh ☐
Naunihal Singh ☐

১। সঠিক উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া দেখাও :
ভারতের নেপোলিয়ন কাহাকে বলা হইত ?

দলীপ সিংহ ☐
রঞ্জিৎ সিংহ ☐
নৌনিহাল সিংহ ☐

দ্বাদশ অধ্যায়

Essay type

1. Give an account of the Anglo-French rivalry in the Deccan.
   দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও।
2. Trace the circumstances leading to the Battle of Plassey, 1757. What were its results ?
   যে-সকল ঘটনা প্রবাহে ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহার বর্ণনা দাও। এই যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল ?
3. Trace the history of the Anglo-French rivalry in Bengal.
   বাংলাদেশে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের ইতিহাস দাও।
4. Give in brief the story of the transformation of the East India Company from a trading company to political power.
   বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কিভাবে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও।
5. Sketch the career of Siraj-ud-dowla.
   সিরাজ-উদ্-দৌলার জীবনী বিবৃত কর।

Short-answer type

1. Why did Siraj attacked Fort William ?
   ফোর্ট উইলিয়াম সিরাজ কি কারণে আক্রমণ করিয়াছিলেন ?
2. Discuss the part played by Robert Clive in the conspiracy leading to the Battle of Plassey.
   যে ষড়যন্ত্রের ফলে পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহাতে রবার্ট ক্লাইভ কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।
3. Write notes on :
   (i) Dupleix, (ii) Mir Jafar.
   টীকা লিখ :
   (১) ডুপ্লে, (২) মিরজাফর।
4. What do you know of the following ?
   (i) Vasco-da-gama, (ii) Thomas Roe, (iii) Hawkins, (iv) Alivardi Khan, (v) Mohanlal.
   নিম্নলিখিতদের সম্পর্কে কি জান ?
   (১) ভাস্কো-ডা-গামা, (২) টমাস্ রো, (৩) হকিন্স, (৪) আলিবর্দী খাঁ, (৫) মোহনলাল।
5. Discuss the effects of the Battle of Plassey.
   পলাশীর যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর।

Objective type

1. Mark the correct answer :
   ১। শুদ্ধ উত্তরটি দাগ দাও :

   (i) In which year was the Battle of Plassey fought ?
   (১) কোন্ বৎসর পলাশীর যুদ্ধ ঘটিয়াছিল?

1657	☐	১৬৫৭	☐
1567	☐	১৫৬৭	☐
1757	☐	১৭৫৭	☐
1857	☐	১৮৫৭	☐

(ii) Who came from Madras to recapture Calcutta after Siraj-ud-dowla had captured in 1756 ?

Holwell and Watson	☐	Clive and Watson	☐
Watson and Saunders	☐	Clive and Holwell	☐

(২) সিরাজ-উদ্-দৌলা কলিকাতা দখল করিলে মাদ্রাজ হইতে কে কে কলিকাতা পুনর্দখলের জন্য আসিয়াছিলেন ?

হলওয়েল ও ওয়াট্সন	☐	ক্লাইভ ও ওয়াট্সন	☐
ওয়াট্সন ও সণ্ডার্স	☐	ক্লাইভ ও হলওয়েল	☐

ত্রয়োদশ অধ্যায়

Essay type

1. Examine the contribution of Robert Clive to the foundation of British empire in India.
ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনে রবার্ট ক্লাইভ কি কি করিয়াছিলেন তাহা বিশ্লেষণ কর।

2. Give in outline the history of Bengal from the Battle of Plassey (1757) to the Battle of Buxar (1764).
১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধ হইতে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ পর্যন্ত বাংলাদেশের মোটামুটি ইতিহাস দাও।

3. Describe the British relations with Mir Jafar and Mir Qasim.
মিরজাফর ও মিরকাশিমের সহিত ব্রিটিশ সম্পর্ক বর্ণনা কর।

4. Give an estimate of Mir Qasim.
মিরকাশিমের কৃতিত্ব বিচার কর।

5. Give in brief the events leading to the Battle of Buxar. What were its consequences ?
বক্সার যুদ্ধের কারণগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। যুদ্ধের ফলাফল কি হইয়াছিল ?

6. Trace the growth of British power in Bengal during the years 1757-1765 A.D.
১৭৫৭ হইতে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে বাংলাদেশে ব্রিটিশ শক্তি প্রসারের ইতিহাস লিখ।

7. What were the contributions of Warren Hastings to the consolidation of the British rule in India ?
ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করিবার জন্য ওয়ারেন হেষ্টিংস্ কি কি করিয়াছিলেন ?

8. What were the measures adopted by Lord Wellesley for the expansion of British power in India ?
ভারতে ব্রিটিশ শক্তি প্রসারে লর্ড ওয়েলেস্লী কি কি পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন ?

9. Explain what you understand by Subsidiary Alliance. How did it help in the expansion of British power in India ?
অধীনতামূলক মিত্রতা বলিতে কি বুঝ ? এই মিত্রতা চুক্তি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রসারে কিভাবে সাহায্য করিয়াছিল ?

10. What do you mean by *Doctrine of Lapse* ? Who introduced it and with what results ?
স্বত্ববিলোপ-নীতি বলিতে কি বুঝ ? কে এই নীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং উহার ফলাফল কি হইয়াছিল ?

11. Review the measures adopted by Lord Dalhousie for the expansion of the British power in India.
ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিস্তারকল্পে লর্ড ডালহৌসী কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহার আলোচনা কর।

Short-answer type

1. Discuss the implication of the Grant of Dewani to the East India Company in 1765.
১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়ানী প্রদানের অর্থ কি আলোচনা কর।

3. 'Mir Qasim was the last independent Nawab of Bengal.'—Explain.
'মিরকাশিম বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন।'—বিশ্লেষণ কর।
4. Discuss the effects of the Battle of Buxar, 1764.
১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বক্সার যুদ্ধের ফলাফল আলোচনা কর।
5. What was 'Double Government'? What were its effects?
'দ্বৈত শাসন' কি ছিল? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল?
6. What part did Hyder Ali and Tipu play for the defence of their country?
হায়দর আলি ও টিপু তাঁহাদের দেশরক্ষার জন্য কি করিয়াছিলেন?
6. Write notes on: (i) First Anglo-Maratha War. (ii) Second Anglo-Maratha War.
টীকা লিখ: (১) প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ। (২) দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ।
7. Write short notes on: (i) Treaty of Basein, (ii) Nepal War, (iii) Pindari, (iv) Treaty of Seringapattam, (v) Nana Fadnavis.
সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ: (১) ব্যাসিনের সন্ধি, (২) নেপাল যুদ্ধ, (৩) পিণ্ডারী, (৪) সেরিঙ্গাপত্তমের সন্ধি, (৫) নানা ফড়নবিশ।

Objective type

1. Tick off the correct answer:
(a) In which year did the East India Company obtain the Grant of Dewani of Bengal?
1674 ☐ 1764 ☐ 1765 ☐ 1664 ☐ 1665 ☐

১। সঠিক উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া দেখাও:
(ক) কোন বৎসর ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাংলাদেশের দেওয়ানী লাভ করিয়াছিলেন?
১৬৭৪ ☐ ১৭৬৪ ☐ ১৭৬৫ ☐ ১৬৬৪ ☐ ১৬৬৫ ☐

(b) Who introduced the Subsidiary Alliance?
Lord Dalhousie ☐
Lord Bentinck ☐
Lord Wellesley ☐
Lord Hastings ☐
Lord Cornwallis ☐

(খ) অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি কে প্রচলন করিয়াছিলেন?
লর্ড ডালহৌসী ☐
লর্ড বেণ্টিঙ্ক ☐
লর্ড ওয়েলেস্‌লী ☐
লর্ড হেষ্টিংস্ ☐
লর্ড কর্ণওয়ালিস ☐

2. Fill in the gaps: (i) Doctrine of Lapse was introduced by Lord ——. (ii) Treaty of Sagauli brought —— war to a close. (iii) Treaty of Mangalore was signed between —— and ——.

২। শূন্যস্থান পূরণ কর: (১) স্বত্ববিলোপ-নীতি লর্ড —— প্রবর্তন করিয়াছিলেন। (২) সগৌলির সন্ধি —— যুদ্ধের অবসান ঘটাইয়াছিল। (৩) ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি —— এবং —— মধ্যে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

চতুর্দশ অধ্যায়

Essay type

1. Give an account of the administrative and judicial reforms under Warren Hastings.
ওয়ারেন হেষ্টিংসের অধীনে শাসনসংক্রান্ত ও বিচারসংক্রান্ত সংস্কারগুলির বিবরণ দাও।
2. Write what you know about Warren Hastings' administrative and revenue measures.
ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসন ও রাজস্ব বিষয়ক ব্যবস্থাগুলির বিবরণ দাও।

3. Describe briefly the reforms of Lord Cornwallis.
লর্ড কর্ণওয়ালিসের সংস্কারগুলির সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

4. Who introduced Permanent Settlement? Trace the circumstances leading to it.
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে প্রচলন করিয়াছিলেন? যে ঘটনা প্রবাহে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হইয়াছিল তাহা বর্ণনা কর।

5. Why is the administration of William Bentinck so important in Indian history?
ভারত-ইতিহাসে উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের শাসনকাল এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?

6. Describe the reforms introduced by Lord William Bentinck.
লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের সংস্কারগুলির বর্ণনা দাও।

7. Discuss the judicial reforms of Lord Bentinck.
লর্ড বেন্টিঙ্কের বিচারব্যবস্থার সংস্কারগুলির আলোচনা কর।

8. Describe the reforms measures undertaken by Lord Dalhousie.
লর্ড ডালহৌসী যে-সকল সংস্কার প্রবর্তন করিয়াছিলেন সেগুলির আলোচনা কর।

9. What was Lord Dalhousie's responsibility for the Revolt of 1857?
১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য লর্ড ডালহৌসীর দায়িত্ব কতদূর?

10. What were Raja Rammohan Roy's contributions to the Indian Renaissance.
ভারতীয় নবজাগরণে রাজা রামমোহন রায়ের অবদান কি ছিল?

11. Write a note on the social and cultural reforms initiated by Raja Rammohan Roy and Iswar Chandra Vidyasagar.
রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্কারের প্রবর্তন করিয়াছিলেন সে-বিষয়ের উপর টীকা লিখ।

Short-answer type

1. Write notes on: (i) Derozio, (ii) Young Bengal, (iii) Dayananda, (iv) Syed Ahmmed Khan, (v) Prarthana Samaj.
টীকা লিখ: (১) ডি'রোজিও, (২) ইয়ং বেঙ্গল, (৩) দয়ানন্দ, (৪) সৈয়দ আহ্মদ খান (৫) প্রার্থনা সমাজ।

2. What were the contributions of Brahma Samaj to the social regeneration of Bengal?
বাংলার সামাজিক নবচেতনার ক্ষেত্রে ব্রাহ্ম সমাজের অবদান কি ছিল?

3. Write a note on Ramkrishna Paramhansa. What was the importance of his religious ideas and thoughts?
রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কে একটি টীকা লিখ। তাঁহার ধর্মীয় আদর্শ ও চিন্তাধারার গুরুত্ব কি ছিল?

4. What was the most characteristic part of Dayananda's ideas?
দয়ানন্দের চিন্তাধারার সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিকটি কি?

5. Who was the main figure of the Prarthana Samaj? What were the ideals the Prarthana Samaj stood for?
প্রার্থনা সমাজের মূল ব্যক্তি কে ছিলেন? এই সমাজের আদর্শ কি ছিল?

6. What were contributions of Pandit Iswarchandra Vidyasagar of the social reforms, Bengali language, literature and spread of education?
সামাজিক সংস্কার, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এবং শিক্ষার প্রসারের ক্ষেত্রে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান কি ছিল?

Objectixe type

1. Give direct (in one word) answer to the following: (i) Who was the founder of Arya Samaj? (ii) Who may be called the father of Indian Renaissance? (iii) 'Different religions are but different ways to reach God.' Who said this?

১। এক কথায় উত্তর দাও : (১) আর্য সমাজের স্থাপয়িতা কে ছিলেন ? (২) ভারতীয় নবজাগরণের পিতৃপুরুষ কে ছিলেন ? (৩) 'বিভিন্ন ধর্ম একই ঈশ্বরে পৌঁছিবার ভিন্ন ভিন্ন পথমাত্র।' একথা কে বলিয়াছিলেন ?

পঞ্চদশ অধ্যায়

Essay type

1. Examine the causes of the Great Revolt of 1857.
   ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের কারণগুলি বিচার কর।
2. Do you think that the Revolt of 1857 was a national revolt ? Give reasons for your answer.
   ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহকে তুমি জাতীয় বিদ্রোহ বলিয়া মনে কর কি ? তোমার উত্তরের পশ্চাতে যুক্তি প্রদর্শন কর।
3. What was the character of the Revolt of 1857 ?
   ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রকৃতি কি ছিল ?
4. Discuss the causes of the failure of the Revolt of 1857.
   ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিফলতার কারণগুলির আলোচনা কর।
5. What were the results of the Revolt of 1857 ?
   ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের ফলাফল কি হইয়াছিল ?

Short-answer type

1. Discuss the background of the Revolt of 1857.
   ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পটভূমিকা আলোচনা কর
2. Who was Lakshmi Bai ? What part did she play in the revolt of 1857 ?
   লক্ষ্মীবাঈ কে ছিলেন ? ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে তিনি কি অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন ?
3. Explain the Doctrine of Lapse.
   স্বত্ববিলোপ-নীতির ব্যাখ্যা কর।
4. Write notes on : (i) Tantia Topi, (ii) Nana Shaib.
   টীকা লিখ : (১) তাঁতিয়া তোপী, (২) নানাসাহেব।
5. What were the areas to which the Revolt of 1857 had spread ?
   কোন্ কোন্ স্থানে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ বিস্তার লাভ করিয়াছিল ?
6. How was the Revolt of 1857 suppressed ?
   ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ কিভাবে দমন করা হইয়াছিল ?
7. What was the Declaration of the Queen Victoria of 1858 ?
   মহারানী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ঘোষণা কি ছিল ?

Objective type

1. Who was the Mughal descendant declared the Emperor of Hindustan by the rebels in 1857 ? Mark the correct answer.

   Ahmmed Shah II ☐
   Muhammed Shah II ☐
   Bahadur Shah II ☐
   Barbak Shah II ☐

১। কোন্ মোগল বংশধরকে বিদ্রোহীরা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের মোগল বাদশাহ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল ? সঠিক উত্তরটি দাগ দাও।

দ্বিতীয় আহম্মদ শাহ্ ☐
" মহম্মদ শাহ্ ☐
" বাহাদুর শাহ্ ☐
" বারবক শাহ্ ☐

[দশম শ্রেণীর পাঠ্যাংশ]

সূচীপত্র

দ্বিতীয় খণ্ড
জাতীয় আন্দোলন

তৃতীয় খণ্ড
সংবিধান ও নাগরিকতা

INDIA AND HER PEOPLE
(HISTORY)

The main objectives of teaching history will be :—

(1) To inculcate the love of the motherland, reverence for its past, and a belief in its future destiny as the home of a united co-operative society based on love, truth and justice.

(2) To awaken in the pupil a proper understanding of his social and geographical environment and an urge to improve it.

(3) To develop the basic concept of India as a land of unity in diversity and strengthen the growth of national solidarity.

(4) To broaden the pupil's mind so as to develop mutual respect for various religious and culture patterns.

(5) To imbibe and develop the individual and social virtues that make a man a reliable associate and trusted neighbour.

(6) To develop a sense of the rights and responsibilities of citizenship and inspire a sense of pride and dignity in personal honesty.

PART B
History of Freedom Movement

I. (a) Impact of western contact. Remaking of India : introduction of western education—intellectual reawakening, growth of Indian Nationalism. Impact of the ideas preached by Bankim Chandra and Vivekananda, economic exploitation of the people, educated unemployment, sense of unity fostered by easy means of communication, role of the Press, rediscovery of India. Urge towards responsible government.

(b) Political association from the Landholders' Society to the Home Rule League.

(c) Indigo Agitation, protest against Arms Act and the Vernacular Press Act, Ilbert Bill controversy, leadership of Surendranath Banerjee. All-India National Conference, 1883.

II. Foundation of the Indian National Congress, 1885. Its leaders and activities up to 1905. Changing role, Congress not destined to be Her Majesty's opposition : Growing discontent against the policy of 'prayer and petition'.

III. Partition of Bengal (1905)—a Challenge to Indian Nationalism. Swadeshi and Boycott Movement. Muslim Participation. National Education Movement.

IV. (a) Growth of militant nationalism. Bal Gangadhar Tilak, Aurobindo Ghosh, Bepin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai.

(b) Revolutionary struggle in Bengal, Maharastra and the Punjab.

V. New leader: M. K. Gandhi. Aftermath of World War I. Disillusionment against the British and discontent against their measures of repression. Jalianwalla Bagh Massacre. Gandhiji's concept of Satyagraha—Non-violent Non-Co-operation and Khilafat movements—a short history. (Congress divided: the Home Rule Movement: the Swarajya Party; revival of revolutionary extremism).

VI. New phase in the Freedom Movement: The Lahore Congress; demand for complete independence under Jawaharlal Nehru's leadership, historical importance of the 26th January, British Policy of "kicks and kisses". Round Table Conferences. Civil Disobedience Movements. Role of Jinnah and Muslim League. Abdul Gaffar Khan and Abul Kalam Azad. Congress participation in Government—disillusionment.

VII. Impact of the Second World War. 'Quit India' and August Upsurge. Netaji and the INA. Exploits of the Azad Hind Fauj; The Naval Revolt, Failure of British efforts at conciliation: Cripps Mission, Cabinet Mission. Interim Government. Transfer of Power—Indian Independence Act, 1947—creation of two Dominions—India and Pakistan. India as Republic (1950).

PART C

A. Broad features of Indian Constitution.

I. Independent India: Constituent Assembly: Making of the Constitution. Preamble, the National Flag, the National Anthem, Broad features of the Constitution (The Indian Union and the Constituent States and Union Territories. Parliament, the Union Executive), the Judiciary. The State Executive, Legislature and Judiciary.

II. The Electorate. Directive Principles of State Policy.

III. Fundamental Rights.

B. Citizenship—Rights and Duties of the Citizen.

স্বদেশকথা

[দ্বিতীয় খণ্ড]

জাতীয় আন্দোলন

প্রথম অধ্যায়

(ক) পাশ্চাত্যের সংস্পর্শের প্রভাব : নূতন ভারত সৃষ্টি
(Impact of Western Contact : Remaking of India)

পটভূমিকা :

"তার পরে শূন্য হল ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ নিবিড় নিশীথে
দিল্লিরাজশালা—
একে একে কক্ষে কক্ষে অন্ধকারে লাগিল মিশিতে
দীপালোকমালা।
শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর বীভৎস চীৎকারে
মোগলমহিমা
রচিল শ্মশানশয্যা—মুষ্টিমেয় ভস্মরেখাকারে
হল তার সীমা ॥" —রবীন্দ্রনাথ।

মোগল যুগের শেষে বিচ্ছিন্নতা ও অনৈক্য

মোগলমহিমা যেদিন শ্মশানশয্যা রচনা করিয়া বিস্মৃতির অন্তরালে গমনোদ্যত সেদিন শবলুব্ধ গৃধ্রদের ন্যায়ই বিভিন্ন স্থানীয় শক্তি বিশাল মোগল সাম্রাজ্যকে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিল। ফলে সমগ্র ভারতে দেখা দিল এক ব্যাপক অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা। রাজনীতির গণ্ডি ছাড়াইয়া এই বিচ্ছিন্নতা সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম ও অর্থনীতি সর্ব ক্ষেত্রে বিস্তারলাভ করিল। ভারত ইতিহাসে তখন এক অন্ধকার যুগের সূচনা হইয়াছে বলা যাইতে পারে। ভারতের জাতীয় জীবনের ধারা তখন রুদ্ধ ও অগ্রগতিহীন। সেই সময়কার ভারতবাসীর রাজনৈতিক ঔদাসীন্য ও অনৈক্যের সুযোগ লইয়া শিথিল মোগল মুষ্টি হইতে রাজদণ্ড হস্তগত করিয়া ইংরেজ বণিকগণ ভারতবাসীকে এক নূতন পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিল। ইংরেজ বণিকদের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হইল।

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত

দীর্ঘকাল ইংরেজ শাসনের ফলে ভারতের জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে দেখা দিল এক বিরাট পরিবর্তন। পর-সম্পদলোভী ইংরেজ বণিকদের অসাধু প্রতিযোগিতায় ভারতের কুটির শিল্পগুলির অপমৃত্যু ঘটিল। ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ভিত্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামগুলি পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িল। কিন্তু যে বিষ প্রাণনাশ করে সেই বিষই আবার বিষক্ষয় করে। ইংরেজ শাসনের ক্ষেত্রেও হইল তাহা-ই।

ইংরেজ শাসনের কুফল

ইংরেজ অধিকার সর্বপ্রথম বাংলাদেশেই দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছিল। ফলে ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতির মধ্যে প্রথম বিস্তার লাভ করে। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসিবার ফলে বাংলা তথা ভারতের ইতিহাসে এক যুগসন্ধিক্ষণ উপস্থিত হয়। শের শাহ্, আকবর প্রভৃতি উদারচেতা সুলতান-বাদশার আমলে ভারতের মূল হিন্দু এবং ইসলামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির কতক সমন্বয় ঘটিয়াছিল। কিন্তু এই দুইয়ের পূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটে নাই। এজন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি যখন এই দেশে বিস্তার লাভ করিল তখন হিন্দু, ইসলামীয় ও পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক ঐতিহাসিক প্রয়োজন দেখা দিল। এই তিনের সমন্বয়সাধন করিয়া এক নূতন ভারত গঠনের সূচনা করিলেন রাজা রামমোহন রায়। ক্রমে সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, অর্থনীতি সকল ক্ষেত্রে এক নবচেতনা বা নবজাগরণের ফলে এক নূতন ভারত সৃষ্টি হইতে চলিল। এই নবচেতনা বা নবজাগরণের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহার উন্মেষ। পাশ্চাত্য শিক্ষার ইহা ছিল শ্রেষ্ঠ অবদান।

ভারত ইতিহাসের যুগসন্ধিক্ষণ

রামমোহন : নূতন ভারত গঠনের সূচনা



রাজা রামমোহন রায়

অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ হইতে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে একদিকে যেমন ভারতে ব্যাপক রাজনৈতিক আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল অপরদিকে সেই সময়ে তেমনি ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নবযুগের সৃষ্টি করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে ভারতীয় সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, সর্বত্র এক নূতন জীবন সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইহার প্রেরণা ইংরেজী তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমেই আসিয়াছিল।

ইংরেজী শিক্ষার ফলে নবযুগের সূচনা

ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম অংশ পর্যন্ত ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি শিক্ষার বিস্তার তাহাদের দায়িত্ব বলিয়া মনে করিত না। স্বভাবতই ভারতের চিরাচরিত শিক্ষাপদ্ধতি তখনও চালু ছিল। মুসলমানদের মাদ্রাসা-মক্তব আরবী-ফারসী ভাষা এবং হিন্দুদের টোল ও পাঠশালা সংস্কৃত ও স্থানীয় ভাষা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু ইওরোপীয় খ্রীষ্টধর্ম যাজকগণ ও কোম্পানির কোন

শিক্ষার ব্যাপারে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উদাসীনতা

কোন কর্মচারী প্রথম ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন। যাজকগণ অর্থাৎ খ্রীষ্টান মিশনারিগণ সর্বপ্রথম ইংরেজী শিক্ষার স্কুল ও ছাপাখানা স্থাপন করেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারই অবশ্য ছিল তাঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। যাহা হউক, তাঁহারাই ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা বাংলাদেশেই প্রথম শুরু হইয়াছিল।

রাজা রামমোহন রায় ছিলেন ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত। শিক্ষা, সমাজ-সংস্কার, রাজনীতি, দেশপ্রেম—সকল ক্ষেত্রেই তিনি নবজাগরণের সূচনা করিয়াছিলেন। আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত ছাড়াও ইংরেজী, হিব্রু, গ্রীক, সিরীয় প্রভৃতি ভাষায় তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। ইংরেজ হিউম্যানিস্ট (Humanist) বা মানব-ধর্মী ফ্রান্সিস বেকন হইতে আরম্ভ করিয়া লক্, নিউটন, হিউম, গিবন, ভল্টেয়ার, পেইন প্রভৃতি মনীষীর চিন্তাধারার সহিত তিনি পরিচিত ছিলেন। তিনি একথা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, আধুনিক ভারত গড়িয়া তুলিতে হইলে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার একান্ত প্রয়োজন।

রামমোহন কর্তৃক ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তাবোধ

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইনে কোম্পানিকে বৎসরে মোট এক লক্ষ টাকা ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল। এই অর্থ যাহাতে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে রসায়নশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা ও চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থার জন্য ব্যয় করা হয় সেজন্য রাজা রামমোহন বাংলার গভর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্স্টকে (১৮২৩-২৮) অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই অনুরোধ ব্যর্থ হয়। কোম্পানি আরবী, ফারসী ও সংস্কৃত শিক্ষার জন্যই সেই অর্থ ব্যয় করিতে থাকে। কিন্তু ইহার পূর্বেই ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে রাজা রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ার ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় হিন্দু কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাই পরে (১৮৫৫) প্রেসিডেন্সী কলেজ নাম ধারণ করিয়াছে। ডেভিড হেয়ার ছিলেন ঘড়িব্যবসায়ী স্কটিশ ইংরেজ। বাংলাদেশে তথা ভারতে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনে তিনি এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'স্কুল বুক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়া তিনি ইংরেজী ভাষায় পুস্তক রচনা ও প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।



ডেভিড হেয়ার

হিন্দু কলেজ স্থাপন (১৮১৭)

ডেভিড হেয়ার ও 'স্কুল বুক সোসাইটি'

হিন্দু কলেজ স্থাপনের ফলে তখন কলিকাতায় নূতন শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে প্রগতিবাদী আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে হিন্দু কলেজ অত্যধিক গুরুত্ব অর্জন করে। 'ইয়ং বেঙ্গল' (Young Bengal) নামে একটি সমিতি রাজা রামমোহনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া

ডি'রোজিও

প্রগতিবাদী আন্দোলন শুরু করে। ইহার প্রধান নেতা ছিলেন হিন্দু কলেজের জনৈক পোর্তুগীজ অধ্যাপক লুই ভিভিয়ান ডি'রোজিও। বাঙালী যুবসমাজের মনে বৈজ্ঞানিক এবং যুক্তিবাদী চিন্তাধারা জাগাইয়া তুলিতে তাঁহার দান ছিল অপরিসীম। বাঙালী যুবসমাজের মনে স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতা, দেশপ্রেম ও স্বাধীনতাস্পৃহার বীজ তিনি বপন করিয়াছিলেন।


ডি'রোজিও

ইংরেজী শিক্ষার অপরাপর বিদ্যালয়

১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে মিশনারিগণ শ্রীরামপুর কলেজ স্থাপন করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা মাদ্রাসা, কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতিতে ইংরেজী শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ডাফ্ নামে জনৈক স্কটিশ মিশনারী রাজা রামমোহনের সহায়তায় 'জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইনষ্টিটিউশন' নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কলিকাতা স্কটিশ চার্চ কলেজ ইহার বর্তমান রূপ।


উইলিয়াম কেরী

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রবর্তনে লর্ড বেণ্টিঙ্ক (১৮২৮-৩৫) এবং তাঁহার কাউন্সিলের আইন-সদস্য (Law Member) লর্ড ম্যাকলের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট অনুসারে কোম্পানিকে প্রতি বৎসর যে এক লক্ষ টাকা শিক্ষা খাতে ব্যয় করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছিল সেই অর্থ কেবল প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হইত। পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাজা রামমোহন রায় এই অর্থ ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানে ব্যয় করিবার জন্য কোম্পানির কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। রাজা রামমোহন রায় শিক্ষিত বাঙালী সমাজের ইচ্ছাই যে প্রকাশ করিয়াছিলেন তাহা ক্রমে ইংরেজদের নিকট পরিস্ফুট হইয়া উঠে।

প্রিন্সেপ সাহেব ও লর্ড ম্যাকলের মতানৈক্য

বেণ্টিঙ্ক কর্তৃক ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তন (১৮৩৫)

ফলে ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর-জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক ইংরেজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। এ-বিষয়ে সরকারের সেক্রেটারি প্রিন্সেপ সাহেব ও গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য লর্ড ম্যাকলের মধ্যে মতানৈক্য উপস্থিত হয়। সেক্রেটারি প্রিন্সেপ ছিলেন

প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার পক্ষপাতী। কিন্তু লর্ড ম্যাকলে চাহিয়াছিলেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য, বিজ্ঞান প্রভৃতি অধ্যয়ন-অধ্যাপনার ব্যবস্থা করিতে। বেণ্টিঙ্ক লর্ড ম্যাকলের মত-ই গ্রহণ করিয়া ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের আদেশ দেন (১৮৩৫)। তিনি কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ এবং বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন কলেজ স্থাপন করিয়া শিক্ষার উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছিলেন।



লর্ড বেণ্টিঙ্ক ও লর্ড ম্যাকলের আলোচনা

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ভারতে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সরকারী কাজের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কর্মচারী প্রস্তুত করা। প্রশাসন ভিন্ন ইংরেজদের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিতে নিয়োগের জন্যও ইংরেজী ভাষা জানা কর্মচারীর প্রয়োজন ছিল। ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষক প্রভৃতিরও প্রয়োজন ছিল। এই সকল প্রয়োজন মিটাইবার উদ্দেশ্যে ভারতীয়দের মধ্য হইতে কিছু সংখ্যক লোককে ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তোলা দরকার ছিল। ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে ইওরোপীয় সংস্কৃতি বিস্তারের আগ্রহও এ-বিষয়ে সহায়ক হইয়াছিল। তাহারা মনে করিত যে, অপরাপর সংস্কৃতির তুলনায় ইওরোপীয় সংস্কৃতি শ্রেষ্ঠতর। রাজা রামমোহন চাহিয়াছিলেন পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারের মাধ্যমে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহিত ভারতীয়দের পরিচিতি ঘটাইতে এবং উহার মাধ্যমে এক নূতন ভারত গড়িয়া তুলিতে। আর ইংরেজগণ চাহিয়াছিল নিজেদের কাজ চালাইবার সুবিধার জন্য এবং তাহাদের সংস্কৃতি সম্পর্কে উচ্চ ধারণাবশত ভারতীয়দের কিছু সংখ্যক লোককে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া তুলিতে। আদর্শের এই পার্থক্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি ভারতবাসী ও ইংরেজ শাসকদের মনোভাবের পার্থক্য স্বভাবতই ঘটাইল। ফলে ইংরেজগণ ভারতীয়দের উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা স্থাপনে তেমন আগ্রহী হইল না।

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের পশ্চাতে ইংরেজদের মূল উদ্দেশ্য

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইল। ঐ বৎসর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংলণ্ডস্থ 'বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল' (Board of Control)-এর প্রেসিডেণ্ট একটি নির্দেশনামায় ভারতের ইংরেজ সরকারকে প্রাথমিক স্তর হইতে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত শিক্ষাব্যবস্থাকে সুবিন্যস্ত করিতে বলিলেন। এই নির্দেশনামা 'উডের ডেসপাচ' (Wood's Dispatch)

উড সাহেবের নির্দেশনামা (Wood's Dispatch, 1854)

নামে খ্যাত। ইহাতে স্কুল পর্যায়ে মাতৃভাষার সহিত ইংরেজী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে বলা হইল। কলেজ পর্যায় হইতে ইংরেজীকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রসার করা এবং ভারতীয়দিগকে ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ করিয়া তোলা ছিল চার্লস্ উড্ সাহেবের নির্দেশনামার মূল উদ্দেশ্য।

কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারে উড্ সাহেবের নির্দেশনামা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে। ইহার মূল উদ্দেশ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করা হইল। এই তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ভারতে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চা পূর্ণোদ্যমে চলিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে স্কুল-কলেজ স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটিল। সরকার ভিন্ন ভারতীয়গণও স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তারের ব্যবস্থা করিতে লাগিল।

ভারতীয়দের পুনর্জাগরণ : ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের জন্য ব্রিটিশ সরকার, মিশনারিগণ ও ভারতীয়দের চেষ্টা সত্ত্বেও এই শিক্ষা অতি অল্পসংখ্যক ভারতবাসীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এই সীমিত সংখ্যক ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশের যুক্তিবাদ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞানলাভের ফলে সমাজ সংস্কার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতন্ত্র, মানুষ মাত্রেরই সম-অধিকার প্রভৃতি সম্পর্কে এক নূতন ধারণা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। মিল, বেন্হাম, পেইন প্রভৃতি মনীষীর রচনা পাঠের ফলে ভারতীয়দের মধ্যে এক উদারনৈতিক ভাবধারার প্রকাশ শুরু হয়। অন্যায়-অবিচার, সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা এবং বৈষম্যমূলক ব্যবহারের প্রতিবাদ করিবার মানসিক শক্তি ও আগ্রহ ভারতবাসীর মধ্যে জাগিয়া উঠে। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি সম্পর্কে গবেষণার ফলে ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রকৃত মূল্য কি তাহা ভারতীয়দের মধ্যে প্রকাশিত হইল। ভারতের প্রাচীন সবকিছু জানিয়া আধুনিক সবকিছুর মূল্যায়নের চেষ্টা চলিল। বহু ইওরোপীয় পণ্ডিত এবং ব্রিটিশ কর্মচারীদের জ্ঞানী-গুণী অনেকে এই ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহী হইয়া উঠিলেন। উইলিয়াম জোনসের নাম এ-বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার উদ্দেশ্য ছিল এশিয়ার প্রাচীন ইতিহাস, শিল্পকলা, বিজ্ঞান,

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে নূতন মানসিকতার সৃষ্টি



উইলিয়াম জোনস

প্রাচীন ভারতকে জানিবার আগ্রহ

সাহিত্য সর্বকিছু সম্পর্কে অনুসন্ধান ও গবেষণা করা। বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অসংখ্য গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস-ঐতিহ্য পুনরাবিষ্কারের ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটির অবদান অপরিসীম। সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে জনাথন ডানকান সাহেবের প্রচেষ্টায় বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজও স্থাপিত হইয়াছিল। পাশ্চাত্য দেশীয়, বিশেষভাবে ফ্রান্স ও জার্মানির পণ্ডিতগণ ভারতীয় শিল্পকলা, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন ও গবেষণার কাজে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটির অবদান

ভারতীয় সর্বকিছুর প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক

ভারতের অতীত ইতিহাস, ধর্ম ও সাহিত্য সম্পর্কে পুনরায় অবহিত হইবার ফলে ভারতবাসীর মনে ভারতের নিজস্ব সর্বকিছুর উপর আন্তরিক শ্রদ্ধার উদ্রেক হইল। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে প্রথমদিকে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে পাশ্চাত্য যাবতীয় কিছুর উপর যে অন্ধ বিশ্বাস এবং পাশ্চাত্যের অনুকরণপ্রিয়তা দেখা দিয়াছিল উহার অবসান ঘটিল। ভারতীয়দের দৃষ্টিতে ভারতীয় ইতিহাস-ঐতিহ্যের মূল্যায়ন করিতে গিয়া কোন কোন ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতীয় সর্বকিছুর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এইরূপ এক নূতন ধারণা সৃষ্টি হইবার ফলে ভারতবাসীর অন্তরের হীনমন্যতা দূর হইয়া আত্মনির্ভরশীলতা দেখা দিয়াছিল। ভবিষ্যতের জাতীয় আন্দোলনের মানসিক প্রস্তুতি এইভাবে হইতে লাগিল।

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ: (১) পাশ্চাত্য শিক্ষার অবদান: পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে আসিয়া ভারতীয়দের, বিশেষভাবে শিক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে যুক্তিবাদ, স্বাধীন চিন্তা, উদার নীতি প্রভৃতি আধুনিক যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি বদ্ধমূল হইল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির ইতিহাস পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতবাসীর অন্তরে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইওরোপের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ভারতবাসীর উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। গ্রীসের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালি ও জার্মানির জাতীয় ঐক্য আন্দোলন প্রভৃতির সাফল্য স্বভাবতই ভারতবাসীকে নিজ দেশের পরাধীনতা সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করিয়া তুলিল। ঊনবিংশ শতাব্দী ছিল ইওরোপীয় ইতিহাসের এক উদারনৈতিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যুগ। সেই সময়ে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রসার স্বাভাবিকভাবেই ভারতবাসীর অন্তরে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৬৭) ক্ষুদ্র দেশ জাপানের আভ্যন্তরীণ বিপ্লব এবং দ্রুত উন্নতি ভারতবাসীকে জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেমের পথে আরও অগ্রসর করিয়া দিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে আসিবার ফলে ভারতবাসী জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রের প্রভাবে গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল একথা অনস্বীকার্য। ভারতীয়দের, বিশেষভাবে বাঙালী জাতির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ পাশ্চাত্য শিক্ষার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অবদান, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব : জাতীয়তা-বোধের উন্মেষ

(২) **বঙ্কিমচন্দ্রের ধ্যানধারণার প্রভাব :** পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হইয়াছিল কিন্তু উহা এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল বাঙালী মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সাহিত্য কীর্তির মাধ্যমে।

বঙ্কিমের আত্মমর্যাদা-বোধ

বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুইজন স্নাতকের অন্যতম ছিলেন। তিনি ইংরেজ সরকারের অধীনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্ব, আত্ম-মর্যাদাবোধ, সর্বোপরি তাঁহার দেশপ্রেম বাঙালী তথা ভারতবাসীর মধ্যে এক গভীর জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিয়াছিল।


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের তেজস্বিতার নিকট সে যুগের ইংরেজ পদস্থ কর্মচারীদের পরাজয় স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যে যুগে পদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ কোন ভারতীয়ের পক্ষে করা প্রায় অসম্ভব ছিল সেই সময় বঙ্কিমচন্দ্র নিজ মর্যাদায় সামান্যতম আঘাত সহ্য করেন নাই। কর্ণেল ডাফিন তাঁহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিলে বঙ্কিমচন্দ্র ডাফিনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করিয়া তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে ত্রুটি স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভারতীয়দের জাতীয় মর্যাদাবোধের প্রতীকরূপে চিহ্নিত হইয়াছিলেন। ইংরেজদের অধীনে সরকারী চাকরি করিলেও বঙ্কিমের অন্তর ছিল প্রকৃত দেশপ্রেমিকের অন্তর। তাঁহার নানাবিধ রচনার মাধ্যমে তিনি একদিকে যেমন বাংলা ভাষার উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন তেমনি সমাজের নৈতিকতা এবং দেশবাসীর দেশাত্মবোধ বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। নিজে সরকারী চাকরি করিয়াও তিনি ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার নানা প্রকার ত্রুটি তাঁহার রচনার মাধ্যমে সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিতে ভয় পান নাই। 'বাংলা শাসনের কল', 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' ও 'কমলাকান্তের দপ্তর' নামক তাঁহার ব্যঙ্গ রচনা দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

তেজস্বী ব্যক্তিত্বের প্রভাব

তাঁহার কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থে তিনি কৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ মানব হিসাবে দেখাইয়া একদিকে যেমন গোঁড়া হিন্দুদের আত্মবিশ্বাস বাড়াইয়া দিয়াছিলেন, তেমনি তাঁহার রচনায় বেন্থাম ও মিলের হিতবাদ প্রচার করিয়া তিনি নবজাত জাতীয়তাবোধকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু দেশপ্রেম তথা জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার এবং উহাকে এক অমোঘ শক্তিতে পরিণত করিবার ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) ছিল অতুলনীয়। আনন্দমঠ বাঙালী জাতিকে জাতীয়তাবোধের দীক্ষায় দীক্ষিত করিয়াছিল। আনন্দমঠের 'সন্তানদল' সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ন্যায় দেশমাতৃকাকে কালীমাতা রূপে

আরাধনা করিত। দেশমাতার ধূলিমলিন, অধঃপতিত অবস্থার পরিবর্তন করিয়া তাঁহাকে তাঁহার আসল রূপে রূপমণ্ডিত করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ। এই আদর্শকে সফল করিবার জন্যই তাহারা সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী। দেশমাতৃকার কাছে তাহারা উৎসর্গীকৃত। আনন্দমঠ বাঙালী এবং ক্রমে ভারতবাসীকে যতদূর জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল সেরূপ অন্য কোন কিছুই করে নাই। স্বদেশী আন্দোলনে (১৯০৫) এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাসে 'বন্দেমাতরম্' ভারতবাসীর নিকট দেশাত্মবোধের বীজমন্ত্র রূপে কাজ করিয়াছে। এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অসংখ্য স্বাধীনতা সৈনিক হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করিয়াছে।

আনন্দমঠের অবদান

'বন্দেমাতরম্' জাতীয়তাবাদের বীজমন্ত্র

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার রচনার মাধ্যমে দেশপ্রেমকে ধর্মে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম তাঁহার রচনায় দেশপ্রেমে পরিণত হইয়াছিল।* একমাত্র শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবি' ভিন্ন অপর কোন বাংলা রচনা বাঙালী যুবসমাজকে দেশাত্মবোধে অতটা প্রভাবিত করিতে পারে নাই। (১) জাতির স্বার্থ ও নিজের স্বার্থকে এক এবং অভিন্ন করিয়া দেখা, এবং (২) জাতির স্বার্থবৃদ্ধির জন্য নিজেকে উৎসর্গ করাই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের জাতীয়তাবোধের মূল বৈশিষ্ট্য।


শরৎচন্দ্র

(৩) **বিবেকানন্দের ধ্যানধারণার প্রভাব :** পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিস্তারের ফলে যখন বাঙালীদের মধ্যে নিজস্ব শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, আচার-আচরণের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখা দিয়াছিল, ভারতীয়দের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি যখন অনুরাগ সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সময় স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব ভারতীয়দের এই হীনমন্যতার অবসান ঘটাইয়াছিল। নৈতিকতা ও ধর্মকে ত্যাগ করিয়া কোন আন্দোলনই ভারতের বুকে সাফল্যলাভে সমর্থ হয় নাই। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ধর্মাশ্রয়ী সংস্কৃতি। দক্ষিণেশ্বরের ঋষি শ্রীরামকৃষ্ণ হিন্দু ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি সর্বজন সম্মুখে প্রকাশ করিয়া বাঙালীদের বিদেশী অনুকরণের পথ হইতে সরাইয়া আনিয়াছিলেন। তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নরেন্দ্রনাথ দত্ত—পরবর্তী কালে স্বামী বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণের বাণীকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছাইয়া দিয়াছিলেন। এই বাণী ছিল সর্ব-ধর্মসমন্বয়ের বাণী, বিভিন্ন ধর্মের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধার বাণী। ধর্মের ক্ষেত্রে বাঙালী জাতির চিন্তা যখন আত্মবিস্মৃতির পথ ত্যাগ করিয়া আত্মদর্শনের দিকে ধাবিত হইল তখন উহা এক বিশাল শক্তি হিসাবে জাতীয়

ভারতীয়দের হীনমন্যতার অবসান

শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী—সর্ব-ধর্মসমন্বয়ের-বাণী

* "Bankim Chandra converted patriotism into religion and religion into patriotism." Bharatiya Vidya Bhavan Publication : *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Vol. X. Part II. p. 496.

জীবনের প্রতি স্তরে এক নবচেতনা, নবজাগরণের সৃষ্টি করিল। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ—জীবকে শিবজ্ঞানে সেবার আদর্শ প্রচার করিয়া এবং কার্যে পরিণত করিয়া ভারতের পুনরুজ্জীবনের পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু জাতির স্রষ্টা হিসাবে, জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারক হিসাবে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান ছিল অপরিসীম। হিন্দুধর্মের মূল নীতির যুক্তিবাদী বিশ্লেষণ করিয়া তিনি হিন্দু ধর্মকে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা অগ্রসর জাতি ইওরোপীয়দের মধ্যেও শ্রদ্ধার আসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে বাঙালী তথা ভারতীয়দের মধ্যে আত্মমর্যাদাবোধ বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

জাতীয়তাবোধের সম্প্রসারক বিবেকানন্দ



রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

দরিদ্র, নিপীড়িত দেশবাসীর সেবাকেই বিবেকানন্দ ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ভারতের প্রকৃত শক্তি দরিদ্র, অশিক্ষিত, অস্পৃশ্য, অনাদৃত ভারতবাসীর উন্নতির মধ্যে নিহিত। ভারতবাসীকে একথাই তিনি মনে করিতে বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী মাত্রেই তাঁহার ভাই। ভারতবাসীর কাছে ভারতভূমি হইল স্বর্গ, ভারতের উন্নতি হইল ভারতবাসীর উন্নতি। তাঁহার দেশপ্রেম এক অতি উচ্চ জীবনাদর্শে রূপান্তরিত হইয়াছিল। তিনি ভারতবাসীকে একথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন যে, ভারতবাসী মাত্রেই দেশমাতৃকার কাছে বলিপ্রদত্ত, অর্থাৎ ভারতবাসীর সবকিছুই দেশমাতৃকার নিকট উৎসর্গীকৃত। হীনমন্যতা, কাপুরুষতার মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না, সাহসিকতা ও বীরত্বের মাধ্যমেই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব, একথা তিনি বলিয়াছিলেন।

তাঁহার জীবনাদর্শ দেশপ্রেম, দেশবাসীর সেবা

বিবেকানন্দ ভারতবাসীকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করিতে চাহিয়াছিলেন। দেশ ও দেশবাসীর সেবা, দেশ ও দেশবাসীর উন্নতিকে তিনি ধর্ম বলিয়া জ্ঞান করিতেন। স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক ভারতের জাতীয়তাবাদের জনক বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক

(৪) **অর্থনৈতিক শোষণ, শিক্ষিতদের বেকারি, সহজ সংযোগব্যবস্থা প্রভৃতির প্রভাব :** ভারতবাসীদের মধ্যে জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রসারের আরও নানাবিধ কারণ ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে

ইংলণ্ডে যে শিল্প-বিপ্লব ঘটিয়াছিল তাহার ফলে সেই দেশে যন্ত্রযুগের সূচনা হয়। মানুষের শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রশক্তি ব্যবহারের ফলে অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়। উৎপাদন-প্রণালীর এই পরিবর্তনের ফলে উৎপন্ন সামগ্রীর উৎকর্ষ যেমন বৃদ্ধি পাইয়াছিল তেমনি অল্প সময়ে অধিক উৎপাদন সামগ্রীর মূল্যও হ্রাস করিয়াছিল। এই সকল বিলাতী পণ্য ভারতের বাজার-বন্দর ছাইয়া ফেলিলে ভারতের কুটির শিল্পগুলি বিশেষভাবে বস্ত্র ও রেশম শিল্প টিঁকিতে পারিল না। বিদেশীদের অসাধু প্রতিযোগিতায় ভারতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্প সবকিছুরই বিনাশ ঘটিল। ক্রমে অসংখ্য লোক বেকার হইয়া পড়িল। ইহার ফলে কৃষি-জমির উপর চাপ বৃদ্ধি পাইল। শিল্প-শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সকলেই কৃষির মাধ্যমে জীবিকা-নির্বাহের চেষ্টা শুরু করিল। বিদেশী ব্রিটিশ সরকার ভারতের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নের কোন চেষ্টা করা দূরের কথা ইংরেজ বণিকদের সুবিধার জন্য বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীল চাষের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া শস্য উৎপাদনের ব্যাঘাত ঘটাইল। বাংলাদেশ নীলকুঠিতে ছাইয়া গেল। 'নীলকর' সাহেবদের অত্যাচার প্রবাদ-বাক্যে পরিণত হইল। দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণে ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ভারত তখন সম্পূর্ণভাবে কৃষি-আশ্রয়ী দেশে পরিণত হইয়াছে। ভারতের কৃষিজাত কাঁচামাল বিদেশে চালান যাইত তাহা হইতে তৈয়ারী সামগ্রী প্রস্তুত হইয়া বহুগুণ অধিক মূল্যে পুনরায় ভারতের বাজারে-বন্দরে ফিরিয়া আসিত। এইভাবে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে ভারতবাসীর দারিদ্র্য শোচনীয়তার চরমে পৌঁছিল। দাদাভাই নৌরজীর উক্তি এই বিষয়ে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি একসময় ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছিলেন যে, ভারতবাসীর গড় মাথাপিছু বার্ষিক আয় মাত্র ২০ টাকার বেশি না হইবার কারণ হইল ব্রিটিশ সরকারের শোষণনীতি। ব্রিটিশ সরকারের কৃষিব্যবস্থার উন্নয়নে উদাসীনতার ফলে কিছুকাল পর পরই দুর্ভিক্ষ দেখা দিতে লাগিল। এমতাবস্থায় যখন ভারতে

ইংরেজগণ কর্তৃক ভারতীয়দের শোষণ

বিলাতী সামগ্রীর প্রতিযোগিতা ভারতীয় ব্যবসায়-বাণিজ্য, শিল্পের সর্বনাশ

কৃষির প্রতি ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা



দীনবন্ধু মিত্র



দাদাভাই নৌরজী

জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটিল তখন স্বাভাবিকভাবেই উহা ক্রমে জনসাধারণের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িল।

এদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসারের ফলে বহু ভারতবাসী পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া উঠিল। প্রথমে প্রশাসনিক প্রয়োজনে এইরূপ শিক্ষিত ভারতীয়দের কর্মসংস্থান সম্ভব হইলেও শিক্ষিতের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল তখন কর্মসংস্থান আর সম্ভব হইল না। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধিতে যে অসন্তোষের উদ্রেক হইল উহা শিক্ষিত বেকারদের জাতীয়তাবোধকে বহু গুণে শক্তিশালী করিয়া তুলিল। ভারতবাসীর স্বার্থের ব্যাপারে বিদেশী ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতাই যে ভারতের পশ্চাৎপদতার জন্য দায়ী একথা সকলের অন্তরে বদ্ধমূল হইল।

শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যাবৃদ্ধি

ভারতবাসীর মধ্যে যখন জাতীয়তাবোধ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে, সেই সময়ে একদিকে ইংরেজ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য এবং ভারতীয়দের প্রতি অমর্যাদাসূচক ব্যবহার, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার, ভারতবাসীর প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণ এবং অপরদিকে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার দাবির প্রতি উপেক্ষা ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধকে বহু গুণে শক্তিশালী করিয়া তুলিল।

ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের অমর্যাদাসূচক, অত্যাচারী ও বৈষম্যমূলক ব্যবহার

ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ প্রসারের ব্যাপারে ছাপাখানার প্রভাবের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেশীয় ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে ভারতবাসীর মধ্যে চিন্তাশীল বুদ্ধিজীবী ও মনীষীদের চিন্তাধারার বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল। বাংলা, হিন্দী, আসামী, তেলেগু, তামিল, কানাড়া, মারাঠী, উড়িয়া প্রভৃতি বিভিন্ন দেশীয় ভাষায় রচনার মাধ্যমে ভারতবাসীর রাজনৈতিক শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল মুদ্রাযন্ত্র। সাময়িক পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি ভারতের জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়া ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপাখানার প্রভাব এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ছাপাখানার প্রচলনের ফল

প্রশাসনিক সুবিধা এবং বাণিজ্যের সুযোগবৃদ্ধির জন্য ইংরেজগণ ভারতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে রেলপথ, রাস্তা নির্মাণ, নদীপথে স্টীমার চালনা, টেলিগ্রাম, ডাক চলাচল প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়াছিল। বাণিজ্যের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তাহা রপ্তানির জন্য বন্দরে পৌঁছান প্রভৃতির সুযোগ ইহাতে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রশাসনিক প্রয়োজনে এক স্থান হইতে অপর স্থানে দ্রুত চলাচলের এবং সংবাদ সংগ্রহের সুবিধা ইহাতে ঘটিয়াছিল। কিন্তু ভারতীয়দের দিক্ হইতে এই যোগাযোগের সুযোগ বিভিন্ন অংশের লোকের মধ্যে ঐক্যবোধ সৃষ্টি করিতে সাহায্য করিয়াছিল। এই ঐক্যবোধ আবার ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের ধারণাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল।

যোগাযোগ ব্যবস্থার ফলে একতাবোধ ও জাতীয়তাবোধের প্রসার

(৫) **জাতীয়তাবাদের প্রসারে সংবাদপত্রের ভূমিকা :** ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে, বিশেষত ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর হইতে ভারতীয়দের মালিকানায় এবং সম্পাদনায় দেশীয় ভাষায় পত্রিকার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই সকল সংবাদপত্র ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করিয়া জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেমের শিক্ষায় ভারতবাসীকে শিক্ষিত করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে ইংরেজদের সম্পাদনা ও মালিকানায় যে-সকল পত্রিকা প্রকাশিত হইত সেগুলি ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া চলিত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর ভারতের শাসনব্যবস্থা কোম্পানির হাত হইতে ব্রিটিশ সরকারের হাতে চলিয়া যাইবার ফলে এই সকল সংবাদপত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ভাল হউক আর মন্দ হউক, সরকারী নীতি ও কার্যকলাপ সমর্থন করিয়া চলা। এগুলির দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকভাবেই ছিল ভারতবাসীর স্বার্থবিরোধী।

> ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী

> ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্রগুলির ভারতবাসীর স্বার্থ-বিরোধিতা

কিন্তু ভারতবাসী কর্তৃক সম্পাদিত সংবাদপত্রগুলি একদিকে যেমন ব্রিটিশ সরকারের ত্রুটির সমালোচনা করিত, অপরদিকে তেমনি ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ করিয়া, ইংরেজদের অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া ভারতীয়দের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়, আত্মমর্যাদাবোধ এবং জাতীয়তা-বোধ জাগাইয়া তুলিতেছিল। বাংলাদেশে হরিশ মুখার্জী পরিচালিত 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' (Hindoo Patriot) ব্রিটিশ সরকারের পুলিশব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের প্রতিবাদ করিয়া, ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাবিদ্রোহের জাতীয়তাবাদী প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিয়া ভারতীয়দের মনে নির্ভীকতা ও স্বাধীনতাস্পৃহার সৃষ্টি করিয়াছিল। অনুরূপ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত 'ইণ্ডিয়ান মিরার' (Indian Mirror), সাংবাদিক গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'বেঙ্গলী', নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশন্যাল পেপার' ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করিয়াছিল।

> 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'

> 'ইণ্ডিয়ান মিরার'

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতীয় সংবাদপত্র মাত্রেই দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। এ-বিষয়ে সোমপ্রকাশ, শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার, বঙ্গদর্শন, আর্যদর্শন প্রভৃতি বাঙালীদের মনে একথাই বদ্ধমূল করিয়াছিল যে, যতদিন ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিবে ততদিন ভারতবাসীর অবস্থার কোন উন্নতি সম্ভব হইবে না। আর্যদর্শন পত্রিকা ইতালির জাতীয় ঐক্যের নেতৃবৃন্দ ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি প্রভৃতি এবং অপরাপর বিপ্লবীর জীবনাদর্শ বিশ্লেষণ করিয়া বাঙালীর মনে দেশাত্মবোধের এক অদম্য প্রেরণা জাগাইয়া

> 'সোমপ্রকাশ', 'শিক্ষাদর্পণ ও সংবাদসার', 'বঙ্গদর্শন', 'আর্যদর্শন' প্রভৃতি

তুলিয়াছিল। অমৃতবাজার পত্রিকা ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। যশোহরের (অধুনা বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) গ্রামে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শিশিরকুমার ঘোষ ছিলেন ইহার সম্পাদক। তিন বৎসর পর এই পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। তখন উহার একাংশ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইত। কিন্তু দেশীয় ভাষায় পত্রিকাগুলি ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করিত বলিয়া ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন (১৮৭৬-৮০) তাঁহার কুখ্যাত 'দেশীয় ভাষায় পত্রিকা আইন' (Vernacular Press Act) পাশ করিয়া সেগুলির সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনার ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই আইনের আওতা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অমৃতবাজার পত্রিকা এক রাত্রির মধ্যেই সম্পূর্ণ ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাংলাদেশ এবং সমগ্র উত্তর ভারতে জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম জাগাইয়া তুলিবার ব্যাপারে এই পত্রিকার অবদান অপরিসীম। এই সকল সংবাদপত্র ভিন্ন আরও বহু পত্রিকা দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছিল।

অমৃতবাজার পত্রিকা



শিশিরকুমার ঘোষ



লর্ড লিটন

বাংলাদেশ ভিন্ন বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও অনুরূপ সাংবাদিকতা জাতীয়তাবাদের প্রসারে সহায়ক হইয়া উঠিয়াছিল। এগুলির মধ্যে লাহোরের 'ট্রিবিউন', বোম্বাইয়ের 'কেশরী', যুক্তপ্রদেশের 'ইণ্ডিয়ান হিরাল্ড', মাদ্রাজের 'হিন্দু' প্রভৃতি সংবাদপত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

লাহোরের 'ট্রিবিউন', মাদ্রাজের 'হিন্দু' ইত্যাদি

জনমত গঠনে এবং জনমত প্রকাশের ব্যাপারে সংবাদপত্র হইল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং স্বাধীনতা-স্পৃহা ব্যাপকভাবে জাগাইবার ব্যাপারে, জনমত গঠন ও প্রকাশে ভারতীয় সংবাদপত্রের অবদান ছিল অপরিসীম।

ভারতীয় সংবাদপত্রের অবদান

(৬) **ভারতের পুনরাবিষ্কার:** মহৎ কাজ মাত্রেই চাই মহান্ আদর্শ। মোগল যুগের অবসান এবং ইংরেজ আমলের প্রারম্ভে ভারতবাসী আত্মকেন্দ্রিক এবং আদর্শচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল। জাতীয় ঐক্য বা দেশাত্মবোধের ধারণা ছিল তখন অত্যন্ত ক্ষীণ ভারতবাসী তখন আত্মবিস্মৃত এবং অবচেতন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই

অবচেতন জাতীয় জীবনে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাব যে নূতন শক্তি, ধ্যানধারণার সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার ফলে ভারতবাসী আত্মবিস্মৃতির পথ হইতে আত্মদর্শনের পথে ফিরিয়া আসে। আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত ভূখণ্ড লইয়া গঠিত, প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ ভারত পরস্বার্থসিদ্ধির কেন্দ্র হিসাবে পরিণত হইয়াছে একথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে যে নবচেতনার সৃষ্টি হইয়াছিল উহার ফলে ভারতীয়গণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিল। পরাধীনতার অমর্যাদা, নিজ দেশে পরের পদানত থাকার অসম্মান, বিদেশী শোষণে ক্লিষ্ট ভারতবাসীর দারিদ্র্য সবকিছু ভারতবাসী এক নূতন দৃষ্টি লইয়া দেখিতে লাগিল। এক নূতন জীবনাদর্শ, এক নূতন স্বাধীন ভারত তাহাদের মানসচক্ষে উদ্ভাসিত হইল। পরমুখাপেক্ষিতার স্থলে আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভরশীলতা, একতার মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে বিদেশী শাসনের অবসান ঘটাইয়া এক সুস্থ, শোষণহীন, দারিদ্র্যমুক্ত স্বাধীন সমাজ গঠনের আদর্শ ভারতবাসীকে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিল। এক নূতন ভারত উহার প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি নবীকরণের মাধ্যমে নূতন রূপ লইয়া তাহাদের মানসচক্ষে দেখা দিল। জাতীয়তাবোধের প্রসারের যে-সকল কারণ সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হইয়াছে উহার সামগ্রিক ফল ছিল এক নূতন জীবনাদর্শ সম্বলিত, স্বাধীন নব-আবিষ্কৃত ভারত।

নূতন জীবনাদর্শ সম্বলিত স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন

দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য ভারতীয়দের আগ্রহ : ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রসারের ফলে তাহাদের নিকট একথাই স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, যতদিন ভারতবাসী বিদেশী সরকারের অধীন থাকিবে ততদিন ভারতীয়দের জাতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রেই উন্নতি সম্ভব হইবে না। ভারতীয়দের হাতে ভারতের শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব না আসিলে ভারতবাসীর সামাজিক, অর্থনৈতিক কোন ক্ষেত্রেই দুরবস্থার অবসান ঘটিবে না। একথাও তাহাদের নিকট পরিষ্কার হইয়াছিল যে, বিদেশী শাসকবর্গের হাত হইতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ বা কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক উন্নয়নের একমাত্র উপায়ই ছিল ভারতীয়দের দাবিকে সোচ্চার করিয়া তোলা। প্রথম দিকে ভারতীয়দের দাবি প্রধানত সরকারী চাকরিতে অধিকতর সংখ্যায় প্রবেশ অধিকার, সর্বোচ্চ পদে ভারতীয়দের গ্রহণ প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়দের দাবির প্রকৃতি ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হইতে থাকে। এই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় আইনসভায় ভারতীয়দের গ্রহণের দাবিতে। পরবর্তী কালে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার এ্যাক্ট পাশ করিবার পূর্বে যখন ইংলণ্ডে এ-বিষয়ে আলোচনা শুরু হয় তখন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন নামক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও অপরাপর বাঙালী নেতার পক্ষে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট এক দরখাস্ত পেশ করা হয়। ইহাতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নানাবিধ ত্রুটির উল্লেখ করিয়া সেগুলির প্রতিকার দাবি করা হয়। এই সকল দাবির

ভারতীয়দের হস্তে শাসনক্ষমতা ভারতীয়দের অবস্থা উন্নয়নের একমাত্র উপায়

জাতীয়তাবোধের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন

মধ্যে শাসনক্ষমতা ও আইন প্রণয়ন ক্ষমতা পৃথকীকৃত করিয়া সম্পূর্ণ আলাদাভাবে আইনসভা গঠনের এবং উহাতে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণ করিয়া সেই আইনসভাকে গণতান্ত্রিক করিয়া তুলিবার দাবি ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ভারতীয় প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করিবার দাবি এইভাবে উত্থাপিত হইয়াছিল।

ইহা ভিন্ন, ম্যাজিস্ট্রেট ও বিচারকের ক্ষমতা একই ব্যক্তির উপর ন্যস্ত না রাখিয়া উহার পৃথকীকরণের দাবিও করা হইয়াছিল। এই দরখাস্ত ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল। উদারচেতা ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের অনেকে ভারতবাসীর এই দাবির প্রতি সমর্থন জানাইয়াছিলেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের দাবি স্বীকৃত না হইলেও ভারতবাসী যে গণতান্ত্রিক পন্থায় দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য আগ্রহী একথা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। জাতীয় আন্দোলনের ইহা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।*

দায়িত্বশীল সরকার গঠনের আগ্রহ

(খ) রাজনৈতিক সমিতি: জমিদার সমিতি হইতে হোমরুল লীগ পর্যন্ত (Political Associations : From Landholders' Society to Home Rule League)

বাংলা তথা ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনেরও পথিকৃৎ ছিলেন। ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার দাবি, ভারতীয়দের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের বৈষম্যমূলক নীতির এবং অন্যায়মূলক আদেশ ও আইনকানুনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া রাজা রামমোহন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের সূচনা করিয়া গিয়াছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকার 'প্রেস অর্ডিন্যান্স' (Press Ordinance) জারি করিয়া ভারতে কোন সংবাদপত্র প্রকাশ শুরু করিবার পূর্বে সরকারের নিকট হইতে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করেন। লাইসেন্স বাতিল করিবার অধিকারও এই আদেশের বলে সরকারকে দেওয়া হয়। রাজা রামমোহনের নেতৃত্বে দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রভৃতি পাঁচজন গণ্যমান্য বাঙালী এই আদেশের বিরুদ্ধে দৃঢ় ভাষায় ইংলণ্ডের রাজা ও তাঁহার কাউন্সিলের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। অনুরূপ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে 'জুরি আইন' (Jury Act) পাশ করিয়া হিন্দু বা মুসলমান সদস্য লইয়া গঠিত জুরি কোন ইওরোপীয় বা ভারতীয় খ্রীষ্টানের বিচার

রাজা রামমোহন—রাজনৈতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ



দ্বারকানাথ ঠাকুর

* Vide *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Vol. X. Part II, pp. 450, 455.

করিতে পারিবে না, এই নিয়ম চালু করা হয়। পক্ষান্তরে ইওরোপীয় বা ভারতীয় খ্রীষ্টান লইয়া গঠিত জুরি হিন্দু, মুসলমান সকলেরই বিচার করিতে পারিবে স্থির হয়। এই বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধেও রামমোহন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট প্রতিবাদ জানাইয়া দরখাস্ত করেন। এইরূপ বৈষম্যমূলক আচরণ ভারতীয়দিগকে ব্রিটিশ সরকারের শত্রুতে পরিণত করিবে একথা উল্লেখ করিতে রামমোহন দ্বিধাবোধ করেন নাই। এইভাবে রাজা রামমোহন রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত করিয়া গিয়াছিলেন।

প্রেস অর্ডিন্যান্স ও জুরি আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

সমসাময়িক কালে ইওরোপের জাতীয় আন্দোলন, বিপ্লব প্রভৃতিও ভারতবাসীর রাজনৈতিক আন্দোলনের আগ্রহ বৃদ্ধি করিয়াছিল। বাংলাদেশে এই আগ্রহ অত্যধিকভাবে পরিলক্ষিত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ফ্রান্সে পুনরায় বিপ্লব দেখা দিলে কলিকাতায় এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। ইওরোপে উদারনৈতিক আন্দোলন মাত্রেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করিত। এইভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাথমিক প্রস্তুতির পর ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার এবং রাজনৈতিক দাবি আদায়ের জন্য স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

ইওরোপীয় রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব

প্রাথমিক প্রস্তুতির পর রাজনৈতিক স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

জমিদার সমিতি : জমি-মালিক সমিতি : সর্বপ্রথম যে সংগঠন স্থাপিত হইল উহা পূর্ণমাত্রায় রাজনৈতিক সংগঠন ছিল একথা বলা চলে না। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা এবং কলিকাতার উপকণ্ঠের জমিদারগণ হিন্দু কলেজে এক সভার অনুষ্ঠান করেন। এই সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে 'জমিদারি সমিতি' (Zamindary Association) নাম দিয়া একটি সমিতি স্থাপন করা হয়। অল্পকালের মধ্যেই অবশ্য এই সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া 'জমি-মালিক সমিতি' (Landholders' Society) করা হয়। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার জমির মালিক মাত্রেই এই সমিতির সভ্য হইতে পারিতেন। দ্বারকনাথ ঠাকুর ছিলেন এই সমিতির উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রধান। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জমিদারের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করা ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। কিন্তু দ্বারকানাথ ঠাকুর নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের পথ দেখাইয়া ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও অভাব-অভিযোগ দূর করিবার এবং প্রয়োজনীয় সংস্কার দাবি করিবার শিক্ষা দিয়া গিয়াছিলেন। কলিকাতা টাউন হলে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক জমি খাস দখলে লইবার



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অভিযোগের প্রতিকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন

বিরুদ্ধে আপত্তি জানাইবার জন্য যে বিরাট সভার আয়োজন জমি-মালিক সমিতি করিয়াছিল তাহাতে দ্বারকানাথ ঠাকুর যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রদের লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার ও রাজনৈতিক অধিকার রক্ষা করিবার জন্য শীঘ্রই দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ ব্যক্তিদের লইয়া রাজনৈতিক সংগঠন গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন তাহারা উপলব্ধি করিবেন। যাহা হউক, জমি-মালিক সমিতি জমির মালিকদের অভাব-অভিযোগ দূর করিবার এবং তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য স্থাপিত হইলেও নিয়মতান্ত্রিক ও আইনসম্মত উপায়ে সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। এই সমিতির শাখা ভারতের বিভিন্নাংশে স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে সর্ব-ভারতীয় সংগঠন গড়িয়া তুলিবার দৃষ্টান্তও এই সমিতিই স্থাপন করিয়াছিল।

সর্ব-ভারতীয় সংগঠন স্থাপনের আদর্শ

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি : বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি : রাজা রামমোহনের বন্ধু উইলিয়াম এ্যাডাম ভারতবাসীর অভাব-অভিযোগ ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে ইংলণ্ডে জনমত গঠনের জন্য 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (British India Society) নামে যে সমিতি গঠন করিয়াছিলেন উহার সহিত জমি-মালিক সমিতি যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিল। এমনকি দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরামর্শে জমি-মালিক সমিতির পক্ষে ইংলণ্ডে আন্দোলন চালাইবার জন্য টমসন সাহেবকে নিযুক্ত করা হয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর কিছুকাল ইংলণ্ডে থাকিয়া দেশে ফিরিবার কালে টমসন সাহেব তাঁহার সঙ্গে বাংলাদেশে আসেন। তাঁহার নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া বাংলাদেশে 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি গড়িয়া উঠে (১৮৪৩)। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের যাবতীয় সংবাদ সংগ্রহ করা এবং আইনসম্মত ও শান্তিপূর্ণভাবে সেগুলির প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করা। জমি-মালিক সমিতি এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি ছিল অভিজাত ব্যক্তিদের সংগঠন। এজন্য জনসাধারণের মধ্যে এগুলির প্রভাব তেমন বিস্তৃত হয় নাই। তথাপি রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি এবং নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করিতে জমি-মালিক সমিতি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির গুরুত্ব যথেষ্ট ছিল।

বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি—প্রথম রাজনৈতিক সংগঠন

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন : ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে ইওরোপীয়দের বিচার কেবলমাত্র কলিকাতা সুপ্রীম কোর্ট করিতে পারিত। মফস্বলে কোন ইংরেজ কর্মচারীর অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে কলিকাতায় আসিয়া সাধারণ লোকের পক্ষে বিচারপ্রার্থী হওয়া প্রায়ই সম্ভব হইত না। এই বৈষম্য দূর করিবার জন্য গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের আইন-সদস্য ড্রিংকওয়াটার বেথুন চারিটি বিল বা আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। ইহাতে ফৌজদারী বিচারালয়গুলিকে ফৌজদারী অপরাধের জন্য যে-কোন ইওরোপীয়কে বিচার করিবার ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা হইল। ইওরোপীয়দের প্রতিবাদে শেষ পর্যন্ত এই বিলগুলি আইনে পরিণত হইল না।

এইভাবে ন্যায়সংগত সংস্কার বাধাপ্রাপ্ত হইলে বাংলার নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। ভারতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণ ও তাহাদের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের জন্য শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজন তাঁহারা উপলব্ধি করিলেন। ফলে জমি-মালিক সমিতি ও বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি একত্রীভূত হইয়া 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (British Indian Association) নামে এক রাজনৈতিক সমিতি জন্মগ্রহণ করিল (১৮৫১)। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের পিতা বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এই এ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন।

এই সমিতি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের চার্টার আইন (Charter Act) পাশ করিবার প্রাক্কালে ভারতের আইনসভা, ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া গঠনের, প্রশাসনিক ও আইন প্রবর্তন ক্ষমতা পৃথকীকরণ, ম্যাজিস্ট্রেটদের শাসন এবং বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ প্রভৃতি দাবি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের নিকট উত্থাপন করিয়াছিল। এই সকল দাবি ব্রিটিশ সরকার স্বীকার না করিলেও আইন প্রবর্তন ও প্রশাসন ক্ষমতা আংশিকভাবে পৃথক করা হয়। ইহাতে উৎসাহিত হইয়া ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ—দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি (১) আইনসভায় ভারতীয়দের গ্রহণ, (২) আইনের চক্ষে সকলের সমান অধিকার, (৩) শিক্ষার জন্য অধিকতর পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা, (৪) ভারতে আই. সি. এস. পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন চালাইলেন।

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ছিল অভিজাত ব্যক্তিবর্গের সমিতি। ইহা স্বভাবতই কতক পরিমাণে রক্ষণশীল নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিত। তথাপি শাসনতান্ত্রিক ও প্রশাসনিক সংস্কার আদায়ের উদ্দেশ্যে ইহার আন্দোলন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় হইয়া আছে। এই সমিতির অনুরূপ সমিতি পুনা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে স্থাপিত হইয়াছিল। এই সকল সমিতির সহিত ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিত। ফলে ইহা এক সর্ব-ভারতীয় রূপ লাভ করিয়াছিল। এই সর্ব-ভারতীয় চরিত্র ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনকে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী করিয়া তুলিয়াছিল। ব্রিটিশ সরকার ইহাকে ভারতীয় জনমতের প্রতিনিধি বলিয়া মনে করিতেন এবং বিভিন্ন সংস্কার প্রবর্তনের পূর্বে এই সমিতির মতামত গ্রহণ করিতেন।

সর্ব-ভারতীয় চরিত্র

দি ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন : ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে 'দি ন্যাশন্যাল এ্যাসোসিয়েশন' (The National Association) বা জাতীয় সভা নামে একটি সংস্থা কলিকাতার পাইকপাড়ার রাজার বাড়ীতে স্থাপন করা হয়। কিন্তু ঐ বৎসরই ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপিত হইলে ইহার অস্তিত্ব লোপ পায়।

ইণ্ডিয়ান লীগ : ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে আনন্দমোহন বসু, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি বাঙালী মনীষী ভারতে দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপনের দাবি উত্থাপন

করেন। ভারতের শাসন ভারতবাসী চালাইবে, এই রাজনৈতিক ধারণা তাঁহাদের বক্তৃতায় প্রচারিত হইলে বাঙালীদের মধ্যে এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। সেই সময়ে যে-সকল রাজনৈতিক সংগঠন বিদ্যমান ছিল সেগুলির মাধ্যমে এই নূতন রাজনৈতিক


আনন্দমোহন বসু


কৃষ্ণদাস পাল

আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা সম্ভব হইবে না বিবেচনা করিয়া বাঙালী নেতৃবৃন্দ 'ইণ্ডিয়া লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক সঙ্ঘ গড়িয়া তোলেন (১৮৭৫)। ইণ্ডিয়া লীগ সামান্য কাল ইহার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যে ইহা রাজনৈতিক আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া দিয়াছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনকে প্রকৃত জাতীয় চরিত্র ইণ্ডিয়া লীগই দিয়াছিল, ইহা অনস্বীকার্য।

রাজনৈতিক আন্দোলনকে জাতীয় চরিত্র দান

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন : ১৮৭৬ খৃীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক জনসভা আহ্বান করিয়া 'ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি নূতন রাজনৈতিক সংস্থা স্থাপন করা হয়। ইহার প্রতিষ্ঠার ফলে ইণ্ডিয়া লীগের অবসান ঘটে। সুরেন্দ্রনাথের নিজের কথায়, নব-ভারতের জাতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে কাজ করা, দেশে শক্তিশালী জনমত গঠন করা, ভারতের বিভিন্ন জাতি-ধর্মের লোককে ঐক্যবদ্ধ করা, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগাইয়া তোলাই ছিল ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও আদর্শ।

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য


সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

হোমরুল লীগ : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু ইহার সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, লালা লাজপৎ রায়, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি ছিলেন সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী। এইভাবে কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে বিভক্ত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতি ছিলেন চরমপন্থী। দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজশাহ মেহতা, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রভৃতি ছিলেন নরমপন্থী। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দলের প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হইল। চরমপন্থিগণ কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। পর বৎসর তিলককে ব্রিটিশ সরকার কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে মুক্তিলাভ করিয়া তিনি ভারতে স্বায়ত্ত-শাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি রাজনৈতিক সঙ্ঘ স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিলক 'হোমরুল লীগ' (Home Rule League) নামে একটি সঙ্ঘ স্থাপন করেন। অপরদিকে অ্যানি বেসান্ত প্রথমে কংগ্রেসের সম্মতিক্রমে হোমরুল লীগ স্থাপনে উদ্যোগী হইয়া কংগ্রেসের সম্মতি পাইলেন না। তিনিও ঐ বৎসরের (১৯১৬) সেপ্টেম্বর মাসেই হোমরুল লীগ নামে একটি রাজনৈতিক সঙ্ঘ স্থাপন করেন। বোম্বাই,



ফিরোজশাহ মেহতা

তিলকের হোমরুল লীগ



বালগঙ্গাধর তিলক



অ্যানি বেসান্ত

কানপুর, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তিনি তাঁহার হোমরুল লীগের শাখা স্থাপন করেন। তিলক এবং অ্যানি বেসান্ত পৃথকভাবে হোমরুল লীগ

স্থাপন করিলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর জন্য স্বায়ত্তশাসন আদায় করা। তিলক ও অ্যানি বেসান্ত পরস্পর পরস্পরের সহিত যোগাযোগ রাখিয়া চলিলেন।

অ্যানি বেসান্তের হোমরুল লীগ

তিলকের চেষ্টায় হোমরুল আন্দোলন সমগ্র ভারতে এক গভীর উদ্দীপনার সৃষ্টি করিল। এই আন্দোলনের তীব্রতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাইলে ব্রিটিশ সরকার ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এক ঘোষণায় ক্রমপর্যায়ে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসন দান করা ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য বলিয়া উল্লেখ করিলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস তিলক তথা চরমপন্থীদিগকে পুনরায় সদস্যভুক্ত করিলেন। সেই সময় হইতে কংগ্রেসে নরমপন্থী মতের বিলোপ ঘটিয়া চরমপন্থী মতের প্রাধান্য ঘটে।

ভারত সেবক সংঘ বা সার্ভেণ্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি : বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া গোপালকৃষ্ণ গোখলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে সার্ভেণ্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া বা ভারত সেবক সংঘ নামে একটি রাজনৈতিক সংঘ স্থাপন করেন। দেশমাতৃকার জন্য নির্ভীকভাবে সকল বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইবার মনোবৃত্তি গঠন করা ছিল এই সংঘের উদ্দেশ্য। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে দেশ এবং দেশবাসীর স্বার্থ বৃদ্ধি করিবার জন্য দেশসেবাকে ধর্ম হিসাবে গ্রহণ করাই ছিল এই সংঘের নীতি। এজন্য কাজ ও চিন্তায় দেশকে সর্বাগ্রে স্থাপন করা, দেশবাসীকে ভাই বলিয়া মনে করা, নিজের আয়ের একাংশ দেশের কাজে ব্যয় করিবার প্রতিশ্রুতি দান এবং দেশসেবার মাধ্যমে নিজ স্বার্থসিদ্ধি হইতে বিরত থাকা প্রভৃতি শপথ এই সংঘের সদস্যদের গ্রহণ করিতে হইত। এইভাবে গোখলে আনন্দমঠের আদর্শকে বাস্তব রূপ দান করিয়াছিলেন।

আনন্দমঠের আদর্শের বাস্তব রূপদান


গোপালকৃষ্ণ গোখলে

বোম্বাই, পুনা ও মাদ্রাজ : বাংলাদেশের পরই বোম্বাই প্রদেশে রাজনৈতিক চেতনা ও রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপনের ক্ষেত্র উল্লেখযোগ্য। ফিরোজশাহ মেহতা, বদরুদ্দিন তৈয়বজী, কাশীনাথ ত্রিম্বক তেলাং—এই তিনজন নেতার নেতৃত্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এ্যাসোসিয়েশন (Bombay Presidency Association) নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি স্থাপিত হয় (১৮৮৫)। ইলবার্ট বিল সংক্রান্ত আন্দোলনের ফলেই এই সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার অনেক আগে (১৮৫২) বোম্বাই এ্যাসোসিয়েশন নামে অপর একটি সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সমিতি অল্পকালের মধ্যেই দুর্বল হইয়া পড়ে এবং ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইহার বিলোপ ঘটে। জ্ঞানেশ

বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এ্যাসোসিয়েশন (১৮৮৫)

পুনার সার্বজনিক সভা (১৮৬৭)

বাসুদেব যোশী ও মহাদেব গোবিন্দ রাণাডের নেতৃত্বে পুনার সার্বজনিক সভা (১৮৬৭), জি. সুব্রহ্মনিয়া আয়ার ও আনন্দ চারলুর নেতৃত্বে মাদ্রাজের মহাজন সভা (১৮৮৪) ভিন্ন আরও বহু রাজনৈতিক সংঘ এবং সমিতি ভারতের অপরাপর অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী উদ্দেশ্য ও আদর্শ লইয়া স্থাপিত হইয়াছিল।

মাদ্রাজের মহাজন সভা (১৮৮৪)



জ্ঞানেশ বাসুদেব যোশী   মহাদেব গোবিন্দ রাণাডে   জি. সুব্রহ্মনিয়া আয়ার

উপরি-উক্ত আলোচনা হইতে একথা স্পষ্টভাবেই বুঝা যায় যে, ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা যেমন বাংলাদেশেই হইয়াছিল, রাজনৈতিক সংঘ, সমিতি প্রভৃতি যেগুলির মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শক্তি অর্জন করিয়াছিল সেগুলির অধিকাংশই বাংলাদেশে বাঙালী মনীষীদের নেতৃত্বে স্থাপিত হইয়াছিল।

বাংলাদেশ ও বাঙালী নেতৃত্বের অবদান

(গ) নীল বিদ্রোহ : অস্ত্র আইন ও দেশীয় ভাষার সংবাদ-পত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : ইলবার্ট বিল বিতর্ক : ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব-ভারত জাতীয় সম্মেলন (Indigo Agitation : Protest against Arms Act and Vernacular Press Act : Ilbert Bill Controversy : All-India National Conference, 1883)

নীল বিদ্রোহ : অত্যাচার-অবিচার যখন সহ্যের মাত্রা ছাড়াইয়া যায় তখন দুর্বল, নিরীহ সাধারণ মানুষের মনেও কিভাবে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠে, তাহার দৃষ্টান্ত উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে (১৮৫৮-৬০) নীল বিদ্রোহে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজগণ বাংলাদেশে প্রথম নীল চাষ শুরু করে। তখনও রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম নীল উৎপাদন প্রণালী আবিষ্কৃত হয় নাই। নীল গাছের চাষ করিয়া নীল উৎপাদন করা তখন অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় ছিল। ইংলণ্ড এবং অপরাপর দেশে নীল রপ্তানি করিয়া প্রচুর লাভ হইত। এজন্য বহু ইংরেজ বাংলাদেশের বিভিন্নাংশে কুঠি স্থাপন করিয়া নীল চাষ করিতে

নীল চাষ প্রবর্তন

প্রবৃত্ত হয়। এই সকল সাহেব নীলকর সাহেব নামে পরিচিত ছিল। তাহাদের কুঠি নীলকুঠি নামে অভিহিত হইত। বাংলার নদীয়া, যশোহর, পাবনা, ময়মনসিংহ, মালদহ, রাজসাহী প্রভৃতি জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নীল চাষ হইত। বিহারের কোন কোন অঞ্চল এবং বারাণসীর নিকটবর্তী কয়েকটি স্থানেও নীল চাষ করা হইত।

নীলকর সাহেবরা জমি ক্রয় করিয়া নিজ ব্যয়ে যেমন নীল চাষ করিত, আবার কৃষকদিগকে অর্থ দাদন দিয়া তাহাদের জমিতে নীল চাষ করিবার শর্তে চুক্তি স্বাক্ষর করাইয়া লইত। নিজেদের জমিতে চাষকে বলা হইত 'নিজ-আবাদ চাষ' আর চুক্তি-বন্ধ কৃষকদের জমিতে চাষকে বলা হইত 'রায়তি চাষ'। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় জমিদারের নিকট হইতে জমি বন্দোবস্ত লইয়া সেই অঞ্চলের রায়তদিগকে নীল চাষ করিতে বাধ্য করা হইত। নিজ-আবাদ চাষে দেশীয় প্রজাবর্গকে জোরজবরদস্তি করিয়া বিনা পারিশ্রমিকে বা অতি সামান্য পারিশ্রমিকে কাজ করান হইত। রায়তি চাষের ক্ষেত্রে সামান্য অর্থ দাদনের বিনিময়ে রায়তের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও উর্বর জমিতে নীল চাষ করিতে এবং অতি সামান্য দামে উৎপন্ন নীল ফসল নীলকর সাহেবদিগকে দিতে হইত। বাজার দরের এক-তৃতীয়াংশ দামও রায়তদিগকে দেওয়া হইত না। ইহা ভিন্ন, ফসল নীলকুঠিতে পৌঁছাইয়া দিবার ব্যয়, নীলকর সাহেবদের গোমস্তাদের অবৈধ দাবি মিটাইবার পর নীল চাষীদের হাতে কিছুই থাকিত না। ফলে একবার দাদন গ্রহণ করিলে বংশ পরম্পরায় নীলকর সাহেবদের নিকট ঋণ রহিয়া যাইত। কেহ ঋণ পরিশোধ করিতে চাহিলে তাহাও গ্রহণ করা হইত না। ইহার ফলে রায়তগণ নীলকর সাহেবদের ভূমিদাসে পরিণত হইত।

নিজ-আবাদ চাষ ও রায়তি চাষ

নীলচাষী রায়তগণ ভূমিদাসে রূপান্তরিত

নীল চাষ যতই লাভজনক হইয়া উঠিতে লাগিল নীলকর সাহেবরা ততই বেশি পরিমাণ জমি নীল চাষের অধীনে আনিতে চাহিল। এজন্য রায়তদের বাড়ীঘর ভাঙ্গিয়া দিয়া বা আগুনে পোড়াইয়া দিয়া সেই জমিতে নীল চাষের ব্যবস্থা করা হইত। নীল চাষে অবহেলা করিলে বা সময়মত যোগান না দিতে পারিলে রায়তদের ধরিয়া লইয়া গিয়া তাহাদের উপর দৈহিক নির্যাতন করা হইত। এই নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক রায়ত মারা যাইত। নীলকর সাহেবরা একদল করিয়া পশ্চিমী লাঠিয়াল রাখিত। রায়তদের উপর নির্যাতন, তাহাদের বাড়ীঘর ধ্বংস করা, আগুন লাগাইয়া পোড়াইয়া দেওয়া সবকিছুর জন্য এই সকল লাঠিয়ালকে নিয়োগ করা হইত। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও বর্বরতা হইতে রায়তদের পরিবার-পরিজন এমনকি স্ত্রীলোকও রেহাই পাইত না।

নীলকর সাহেবদের অত্যাচার

নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার বা সেগুলির প্রতিকার দাবি করিবার সাহস কাহারো ছিল না। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ সবই ছিল নীলকর সাহেবদের পক্ষে। নীলকুঠিতে আতিথেয়তা গ্রহণ করিয়া সেখানে থাকিয়া শিকার প্রভৃতি করিয়া আনন্দ-উল্লাস করা ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রায় সকলেরই অভ্যাস ছিল। এজন্য কোন রায়ত ইচ্ছা থাকিলেও এই সকল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে নীলকর

সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিচারপ্রার্থী হইতে সাহস পাইত না। কোন কোন জমিদার রায়তদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। ফলে তাঁহারাও রায়তদের পক্ষে দাঁড়াইতে সাহসী হইতেন না। এমন কি উকিল, মোক্তার প্রভৃতি আইনজীবীও নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে আদালতে উপস্থিত হইতে চাহিতেন না। অনেক ক্ষেত্রে অত্যাচারী নীলকর সাহেবদিগকেই 'অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট' (Honorary Magistrate) নিয়োগ করা হইত। এইভাবে ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, আদালত এমনকি সমগ্র ব্রিটিশ প্রশাসন নীলকর সাহেবদের সপক্ষে ছিল। দুই-একজন ন্যায়পরায়ণ ম্যাজিস্ট্রেট এই সকল অত্যাচার দমনের চেষ্টা করিলেও রায়তদের দুঃখের শেষ ছিল না।

ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ, এককথায় সমগ্র প্রশাসন নীলকর সাহেবদের সমর্থক

ম্যাজিস্ট্রেট স্যার এশলি ইডেন একবার রায়তদের জমিতে তাহাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তিমূলকভাবে নীল চাষ বন্ধ করিবার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু নদীয়ার কমিশনার এই আদেশের বিরোধিতা করিয়াছিলেন।

স্যার এশলি ইডেন

রায়তগণ নীলচাষের চুক্তি অমান্য করিলে তাহাদিগকে ফৌজদারি আদালতে সোপর্দ করিবার আইন পাশ করিতে নীলকর সাহেবরা সরকারের উপর চাপ দিতে থাকে। প্রথমে সরকার ইহাতে রাজী না হইলেও ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে একটি আইন পাশ করিয়া (Regulation V) রায়তগণ নীল চাষে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অভিযুক্ত হইবে এবং সেজন্য যথাযথ শাস্তি পাইবে স্থির হইল।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের আইন (Regulation V)

এইভাবে যখন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে বাংলাদেশে এক সন্ত্রাসের রাজত্ব চলিতে লাগিল তখন 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, অমৃতবাজার পত্রিকার স্থাপয়িতা ও সম্পাদক শিশির কুমার ঘোষ এবং রামগোপাল ঘোষ এই সব অমানুষিক অত্যাচারের কথা জনসাধারণের কাছে তুলিয়া ধরিলেন। কিন্তু প্রকৃত কার্যকরী এবং সক্রিয় নেতৃত্ব আসিল বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাস নামে বর্তমান নদীয়া জেলার চৌগাছা গ্রামের সাধারণ পরিবারের দুই ভাইয়ের মধ্য দিয়া।

হিন্দু প্যাট্রিয়ট ও অমৃতবাজার পত্রিকার অবদান

নীলকর সাহেবদের দেওয়ানের কাজ করিতে গিয়া এই দুই ভাই রায়তদের উপর অমানুষিক অত্যাচার নিজ চক্ষে দেখিয়াছিলেন। তাঁহারা চাকরি ছাড়িয়া দিয়া চৌগাছা গ্রামবাসী রায়তদিগকে সংঘবদ্ধভাবে নীল চাষ না করিবার জন্য শপথ গ্রহণ করাইলেন। এভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের পথ এই দুই ভাই প্রদর্শন করিলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের রায়তগণও নীলচাষ না করিবার শপথ গ্রহণ করিল। নীলকর সাহেব ও তাহার লাঠিয়ালরা চৌগাছা গ্রাম আক্রমণ করিয়া রায়তদের উপর অত্যাচার করিল। একজন রায়ত প্রাণে মারা গেল। কিন্তু বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয় যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইলেন তাহা ক্রমে নদীয়া, যশোহর, পাবনা,

বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ও দিগম্বর বিশ্বাসের সক্রিয় নেতৃত্ব : বিদ্রোহের সূচনা

বিদ্রোহের বিস্তার

মালদহ, রাজসাহীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ঔরঙ্গাবাদ ও বানিয়াগাঁও নামক স্থানের নীলকুঠি বিদ্রোহীরা আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিল। মালদহেও এইরূপ ঘটনা ঘটিল।

এমতাবস্থায় সরকার নীলবিদ্রোহীদিগকে দমন করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। নানা স্থানে পুলিশ ভিন্ন সেনাবাহিনীকেও বিদ্রোহ দমনে নিয়োগ করা হইল। এদিকে নীলকর সাহেবদের সমিতির চাপে সরকার ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সাময়িকভাবে এক আইন পাশ করিয়া (Act XI of 1860) দাদন লইবার পর কোন রায়ত নীল চাষ না করিলে তাহাকে চুক্তিভঙ্গের অপরাধে ক্ষতিপূরণ দিতে এবং কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে স্থির করিলেন। ইহা ভিন্ন নীলকর সাহেবদের অত্যাচার-অবিচার, নীলচাষীদের অসুবিধা প্রভৃতির তদন্ত করিবার জন্য একটি তদন্ত কমিশন নিয়োগেরও ব্যবস্থা করা হইল। এই আইন বিদ্রোহীদিগকে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করিয়া তুলিল। প্রায় বিশ লক্ষ* লোক জীবনমরণ পণ করিয়া নীল চাষ না করিতে এবং নীলকর সাহেবদের সহিত নীল চাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ না হইতে বা দাদন না লইতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। পরিস্থিতি ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া সরকার ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আইনটি আর বলবৎ রাখিলেন না। তদন্ত কমিশন বা নীল কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বাংলার ছোট লাট (Lieutenant Governor) জে. পি. গ্রাণ্ট রায়ত এবং নীলকর সাহেব উভয়ের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে কতকগুলি সুপারিশ করিলেন। এগুলি ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে এক আইনে সন্নিবিষ্ট হইল। অবশ্য এই আইনে নীলকর সাহেবদের স্বার্থের দিকটাই বেশি দেখা হইয়াছিল। যাহা হউক, এই সকল ব্যবস্থা করিয়াও নীল চাষ আর বেশি দিন চলিল না। রাসায়নিক পদ্ধতিতে কৃত্রিম নীল প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে নীল চাষও ক্রমে বন্ধ হইয়া গেল। বিহারে অবশ্য আরও বেশ কিছুকাল নীল চাষ চলিতে লাগিল। কিন্তু সেখানেও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের ফলে বাংলাদেশের ন্যায় বিহারের রায়তগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জকিতিয়া নামক গ্রামে সর্বপ্রথম এই বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আইন (Act XI of 1860)

বিশ লক্ষ লোকের বিদ্রোহে যোগদান

নীল তদন্ত কমিশন : ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের আইন

কৃত্রিম নীল আবিষ্কারের ফলে নীল চাষের অবসান

বিহারে নীলবিদ্রোহ

বাংলাদেশে নীলচাষীদের উপর নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের এক কলঙ্কজনক অধ্যায়। পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি অভিমানী ইংরেজগণ নিজ দেশে আইন করিয়া দাসপ্রথা যখন তুলিয়া দিয়াছিল ঠিক সেই সময়ে তাহারা বাংলা ও বিহারে নূতন করিয়া এক দাসত্বপ্রথা চালু করিতে দ্বিধাবোধ করে নাই। ব্রিটিশ প্রশাসনিক ক্ষমতা নীলকর সাহেবদের স্বার্থে ব্যবহার করিয়া

বাংলাদেশে নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ব্রিটিশ শাসনের কলঙ্কময় অধ্যায়

* "20 lakhs of poor ryots combined and resolved, even at the sacrifice of their hearth and homes, nay of their lives, not to cultivate their lands with indigo, nor to enter into any fresh contract with the planters for the same." *Ibid*., p. 931.

বাঙালী তথা ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ জাতি এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি এক গভীর ঘৃণার সৃষ্টি করিয়াছিল। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নীলকর সাহেবদের সন্ত্রাসের কাহিনী এবং নিরীহ দেশীয় প্রজাবর্গের ও তাহাদের পরিবার-পরিজনের উপর অত্যাচারের বর্ণনা দর্পণের ন্যায়ই সকলের সমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছিল। নীলদর্পণ তদানীন্তন ভারতে এক গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছিল। রেভারেণ্ড জে. লং-এর তত্ত্বাবধানে মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন। এজন্য রেভারেণ্ড লং-কে একমাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে এবং অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'

নীলবিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ আন্দোলন। শত অত্যাচার করিয়াও নীলচাষীদিগকে দমনে ব্রিটিশ সরকার ও নীলকর সাহেবদের ব্যর্থতা ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি প্রমাণিত করিয়াছিল। আইন অমান্য আন্দোলনের ইহা ছিল সর্বপ্রথম অভিজ্ঞতা। পরবর্তীকালে এই অস্ত্রই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বৃহত্তরভাবে মহাত্মা গান্ধী সর্ব-ভারতে প্রয়োগ করিয়াছিলেন। নীলবিদ্রোহ মুহ্যমান শিক্ষিত বাঙালী জাতিকে জাগাইয়া তুলিয়াছিল। জাতীয়তা-বোধের এক গভীর প্রভাব নীলবিদ্রোহের মাধ্যমে বিস্তৃত হইয়াছিল। ভারতীয় আন্দোলনের প্রথম সুদৃঢ়, সফল পদক্ষেপ ছিল এই নীলবিদ্রোহ।

নীলবিদ্রোহ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ আন্দোলন

আইন অমান্য আন্দোলনের সর্বপ্রথম দৃষ্টান্ত

জাতীয়তাবোধের বিস্তার

অস্ত্র আইন ও দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ : লর্ড লিটন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় (১৮৭৬-৮০) নিযুক্ত হইয়া আসিলে ইংলণ্ডের রক্ষণশীল মন্ত্রিসভার প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলীর (Disraeli) সাম্রাজ্যবাদী, রক্ষণশীল নীতির প্রয়োগ ভারতবর্ষেও শুরু হইল। তাঁহার শাসনকালে ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরোধী কয়েকটি আইন প্রবর্তিত হইলে সেগুলির বিরুদ্ধে সমগ্র দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু হইয়াছিল।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইওরোপে বার্লিন চুক্তি দ্বারা ইংলণ্ড রাশিয়ার গ্রাস হইতে তুরস্ককে রক্ষা করিয়াছিল বটে ; কিন্তু তুরস্কের মিত্র হিসাবে এই চুক্তি সম্পাদনে সাহায্যের পুরস্কার হিসাবে ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিজরেলী তুরস্কের নিকট হইতে সাইপ্রাস দখল করিয়াছিলেন। এই ব্যাপারে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলিতে ব্রিটিশ-বিরোধী প্রবন্ধাদি বাহির হয়। ইহা ভিন্ন লিটনের আফগান-নীতি, শাসনসংক্রান্ত বিভিন্ন আদেশের কঠোর সমালোচনা বিশেষভাবে বাংলাভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়। লর্ড লিটন দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি কোন প্রকার বিরুদ্ধভাব সৃষ্টি করিতে পারে এরূপ কোন মন্তব্য বা তথ্য যাহাতে ছাপাইতে না পারে সেজন্য 'দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইন' (Vernacular Press Act) পাশ করিলেন। এই আইন দ্বারা দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রগুলির রাজনৈতিক বা সামাজিক

দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ

বিষয়ে সমালোচনা করিবার অধিকার কাড়িয়া লওয়া হইল। বাংলাভাষায় সংবাদপত্রগুলিই ব্রিটিশ সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করিত সর্বাপেক্ষা বেশি। বলা বাহুল্য, বাংলাভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলি সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী চেতনার সহিত তাল রাখিয়া চলিয়াছিল। এগুলিকে দমন করাই ছিল লিটন-প্রবর্তিত দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইনের মূল উদ্দেশ্য। অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল সমসাময়িককালের সর্বাপেক্ষা নির্ভীক, জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাংলাভাষায় মুদ্রিত পত্রিকা। লিটনের সংবাদপত্র আইন এড়াইবার উদ্দেশ্যে এই পত্রিকা এক রাত্রিতে বাংলা হইতে ইংরেজীতে রূপান্তরিত হয়। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা বিস্তারে অমৃতবাজার পত্রিকার অবদান ছিল অপরিসীম।

অমৃতবাজার পত্রিকার অবদান

ঐ বৎসরই (১৮৭৮) লর্ড লিটন অস্ত্র আইন (Arms Act) পাশ করিয়া ভারতীয়দের পক্ষে কোন প্রকার আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার বা বহন করা নিষিদ্ধ করেন। ইওরোপীয়রা অবশ্য এই আইনের আওতার বাহিরে ছিল। এইভাবে অস্ত্র আইন একদিকে যেমন ইওরোপীয় ও ভারতীয়দের মধ্যে বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি ইওরোপীয় তথা ইংরেজ ও ভারতীয়দের মধ্যে শাসক এবং শাসিতের সম্পর্ক সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল।

অস্ত্র আইনে ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্য

ইংরেজ জাতির ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে যে ধারণা তখনও বিদ্যমান ছিল, তাহা লর্ড লিটনের উপরি-উক্ত দুইটি বৈষম্যমূলক এবং দমনমূলক আইন প্রবর্তনের ফলে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইল। লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল আইনকানুন ভারতবাসীর জাতীয় আন্দোলনের দিক্ দিয়া শাপে বর হইল। দুই বৎসর পূর্বে (১৮৭৬) সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস. পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বয়স একুশ হইতে কমাইয়া উনিশ করা হইলে সুরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে, ভারতীয়দের পক্ষে এত অল্প বয়সে এই পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করা সম্ভব হইবে না। সমগ্র ভারতে এই ব্যাপার লইয়া আন্দোলন গড়িয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিনি ভারতের বিভিন্নাঞ্চলে বক্তৃতা দিয়া আই. সি. এস. পরীক্ষার সর্বোচ্চ বয়ঃসীমা বাড়াইবার এবং ভারতেও এই পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা হউক এই দাবি করিলেন। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতবর্ষে এক রাজনৈতিক তথা জাতীয় ঐক্যবোধের সৃষ্টি করা। সুরেন্দ্রনাথের চেষ্টায় ভারতের সুবিশাল জনসমাজ জাতি-ধর্ম-আচার-আচরণ নির্বিশেষে একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিল। এই ঐক্যের মধ্যে ভবিষ্যতে রাজনৈতিক আন্দোলনে সর্ব-ভারতীয় ঐক্যের ইঙ্গিত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই আন্দোলন ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ রহিল না। ব্যারিস্টার লালমোহন ঘোষকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উপরি-উক্ত দাবি পেশ করিবার জন্য ইংলণ্ডে পাঠান হইল। লণ্ডনে এক বিশাল জনসভায় লালমোহন ঘোষের যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা এক দারুণ প্রভাব বিস্তার করিল। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই আই. সি. এস নিয়োগসংক্রান্ত নিয়মকানুনের পরিবর্তনের প্রস্তাব কমন্স সভায় উত্থাপিত হইল।

অস্ত্র আইন ও দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন

এইরূপ সময়ে লর্ড লিটনের দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন ও অস্ত্র আইন প্রবর্তিত হইলে সেগুলির বিরুদ্ধে এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু হইল। কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট প্রতিবাদ সভায় ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে বহু প্রতিনিধি যোগদান করিয়া সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্যের প্রমাণ দিলেন। লিটনের দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র আইন বাতিল করিবার প্রস্তাব এই সভায় গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব সম্বলিত স্মারকলিপি ইংলন্ডের পার্লামেন্টে প্রেরণ করা হয়। শেষ পর্যন্ত লর্ড রিপনের শাসনকালে (১৮৮০-৮৪) লিটন-প্রবর্তিত দেশীয় ভাষায় মুদ্রিত সংবাদপত্রগুলির রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে সমালোচনার অধিকার ফিরাইয়া দেওয়া হয়। ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের এই সাফল্য ভারতের জাতীয় আন্দোলনের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বহুগুণে বাড়াইয়া দিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

কলিকাতা টাউন হলে প্রতিবাদ সভা

দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত



লর্ড রিপন

জাতীয় আন্দোলন উৎসাহিত

ইলবার্ট বিল বিতর্ক: ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ যখন এক শক্তিশালী প্রভাবে পরিণত হইয়াছে সেই সময় ইলবার্ট বিল লইয়া এক প্রবল আন্দোলনের সুযোগ উপস্থিত হইল। লর্ড রিপন ছিলেন উদারপন্থী শাসক। তাঁহার শাসনকাল কতকগুলি উদারনৈতিক সংস্কারের জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত ফৌজদারী আইনবিধি অনুসারে কোন ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা জজ (Sessions Judge) ইওরোপীয়দের বিচার করিতে পারিতেন না। দশ বৎসর পর (১৮৮৩) লর্ড রিপনের আমলে এই ব্যাপার লইয়া এক জটিল সমস্যা দেখা দিল। ইতিমধ্যে বহু ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও জজ দায়রা বিচারকের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। অথচ জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে তাঁহাদিগকে ইওরোপীয়দের বিচার করিতে দেওয়া হইত না। এই অযৌক্তিক বৈষম্যের প্রতি স্বভাবতই ভারতীয় নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পতিত হইল। লর্ড রিপন এই জাতিভেদমূলক, যুক্তিহীন বৈষম্য দূর করিতে সচেষ্ট হইলেন। তদানীন্তন আইনসদস্য স্যার ইলবার্ট (Sir Ilbert) একটি আইনের খসড়া প্রস্তুত করিলেন। ইহা 'ইলবার্ট বিল' (Ilbert Bill) নামে খ্যাত। এই আইনের খসড়ায় ভারতীয় ম্যাজিস্ট্রেট এবং দায়রা জজদিগকে ইওরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট ও দায়রা জজদের সমপর্যায়ভুক্ত করা হইল।

ইলবার্ট বিলে ভারতীয় ও ইওরোপীয় বিচারকদের ক্ষমতার বৈষম্য দূরীকরণের চেষ্টা

ইলবার্ট বিলে জাতিগত বৈষম্যের ভিত্তিতে সরকারী কর্মচারীর ক্ষমতার তারতম্য দূর করিবার নীতি গৃহীত হইলে ইওরোপীয়রা ইহা অপমানজনক মনে করিয়া ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে এক তীব্র বিরোধিতা শুরু করিল। তাহারা 'ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন' অর্থাৎ প্রতিরক্ষা সমিতি (Defence Association) নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া ইওরোপীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য আন্দোলন চালাইল। তাহারা লর্ড রিপনকে নানাভাবে বিব্রত করিয়া তুলিল, এমনকি পরোক্ষভাবে তাঁহাকে অপমান করিতেও তাহারা ছাড়িল না। পরিস্থিতির চাপে রিপন ইলবার্ট বিলের কতক পরিবর্তনসাধনে বাধ্য হইলেন। স্থির হইল যে, ভারতীয় বা ইওরোপীয় ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা দায়রা জজের আদালতে বিচারের কালে ইওরোপীয়গণ জুরি (Jury) দ্বারা বিচার প্রার্থনা করিতে পারিবে। সেই জুরি অধিকাংশ ইওরোপীয় লইয়া গঠিত হইবে। এইভাবে সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে জাতিগত পার্থক্যের ভিত্তিতে বৈষম্য দূর করিবার জন্য রিপনের চেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ হইল।

ইওরোপীয়দের প্রতিবাদ আন্দোলন

ইলবার্ট বিলের পরিবর্তনসাধন

ইলবার্ট বিল লইয়া ইওরোপীয়গণ যখন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করিল তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ জাতীয় নেতা এই বিল সমর্থন করিয়া এক প্রতি-আন্দোলন গড়িয়া তুলিলেন। ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলনের সামিল হইলেন। ইলবার্ট বিলের কতকগুলি ধারা শেষ পর্যন্ত সংশোধিত হইলে ভারতীয়দের আন্দোলন সফল হইল না বটে, কিন্তু এই আন্দোলনের ফলে ভারতবাসীর মধ্যে আন্দোলনের মাধ্যমে অভাব-অভিযোগ দূর করিবার শিক্ষা বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐক্যবন্ধ আন্দোলনের কাছে সরকারকে যে নতি স্বীকার করিতে হয় একথা ইওরোপীয়দের আন্দোলনের সাফল্যে প্রমাণিত হইয়াছিল। সংঘবন্ধ সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনের মাধ্যমেই ব্রিটিশ সরকারকে ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করিতে বাধ্য করা সম্ভব এই শিক্ষা ভারতীয়রা লাভ করে। ইলবার্ট বিল লইয়া যে আন্দোলন ও পাল্টা আন্দোলন হইয়াছিল তাহা ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছিল এবং ভারতবাসীর রাজনৈতিক ঐক্য আরও দৃঢ় করিয়াছিল। ইহাই ছিল ইলবার্ট বিল আন্দোলনের গুরুত্ব।

ভারতীয়দের ইলবার্ট বিল সমর্থন

ইলবার্ট বিল আন্দোলনে শিক্ষা

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন : নীলবিদ্রোহ, অস্ত্র আইন, দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র আইন, ইলবার্ট বিল আন্দোলন প্রভৃতি ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনকে ক্রমেই সর্ব-ভারতীয় রূপদান করিয়াছিল। জাতীয় ঐক্যবোধ, সংঘবন্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের শক্তি ও প্রয়োজনীয়তা শিক্ষিত ভারতবাসী যখন উপলব্ধি করিয়াছে সেই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব-ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন আহ্বানের সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন। তিনি ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে

সর্ব-ভারতীয় ও জাতীয় ভিত্তিতে স্থায়ী রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন

'ভারতের জাতীয় সম্মেলন' (Indian National Conference) নামে এক জাতীয় সম্মেলন কলিকাতার এলবার্ট হলে আহ্বান করিলেন (ডিসেম্বর ২৮-৩০)। বাংলাদেশের প্রতিনিধি ভিন্ন বোম্বাই, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বিহার, পাঞ্জাব প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নাংশের প্রতিনিধিরা এই জাতীয় সম্মেলনে যোগদান করিলেন। ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য একটি জাতীয় তহবিল খোলা হইল। এই সম্মেলনে ভারতবাসীদের প্রতিনিধি লইয়া দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্থাপন, প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ, বেকার সমস্যার সমাধান, পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে ভারতে শিল্প ও কারখানা স্থাপনের প্রয়োজনীয় শিক্ষা বিস্তার প্রভৃতি নানাবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচিত হয়। এইভাবে একটি স্থায়ী সংগঠনের উপর ভিত্তি করিয়া সর্ব-ভারতীয় রাজনৈতিক ঐক্য গড়িয়া উঠিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় জাতীয় সম্মেলন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত বলা যাইতে পারে।

জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা, ১৮৮৫ খ্রীঃ

(Foundation of the Indian National Congress, 1885)

কংগ্রেসের উৎপত্তি : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ চিরস্মরণীয় ঘটনা। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন কলিকাতায় ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স বা ভারতের জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া একটি স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করিয়া তুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন সেই সময়ে মিঃ এলান অক্টাভিয়ান হিউম (Mr. Allan Octavian Hume) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকদিগকে (Graduates) উদ্দেশ্য করিয়া এক খোলা চিঠি প্রকাশ করেন। এই চিঠিতে ভারতবাসীর মানসিক, নৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উন্নতিসাধনের জন্য একটি স্থায়ী সংগঠন গড়িয়া তুলিবার উপদেশ তিনি দেন। তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড ডাফরিণ (১৮৮৪-৮৮) নিজেও এই ধরনের একটি প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত ছিলেন। বস্তুত তিনিই মিঃ হিউমকে এই ব্যাপারে প্রেরণা দিয়াছিলেন।* শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে ভারতীয়দের মতামত ও মনোভাব এইরূপ প্রতিষ্ঠান হইতেই জানিতে পারা যাইবে, এই ছিল তাঁহার ধারণা। মিঃ হিউম এবং সেই সময়কার শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ভারতীয়দের চেষ্টায় ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ভারতের জাতীয়

মিঃ এলান অক্টাভিয়ান হিউমের খোলা চিঠি

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা

* Vide *British Paramountcy and Indian Renaissance*, Vol. X, Part II, p. 530

কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন বসে। বাঙালী ব্যারিস্টার মিঃ উমেশচন্দ্র বনার্জী (Mr. W. C. Bonnerjee) এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন।

সাধারণ্যে এই ধারণাই প্রচলিত যে, মিঃ হিউম-ই ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জনক। কিন্তু কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে অন্যান্য আরও অনেক মতবাদ



লর্ড ডাফরিণ



অক্টাভিয়ান হিউম



উমেশচন্দ্র বনার্জী

আছে। কেহ কেহ মনে করেন যে, ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের দিল্লীর দরবার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শ হিসাবে কাজ করিয়াছিল। আবার কাহারো কাহারো মতে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হইয়াছিল উহা হইতেই জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার প্রেরণা পাওয়া গিয়াছিল। অ্যানি বেসান্তের মতে মাদ্রাজে থিওসোফিক্যাল কনভেনশন (Theosophical Convention) নামে যে সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহাতে যে সতরজন ভারতীয় নেতা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারাই জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনের কল্পনা করিয়াছিলেন। অ্যানি বেসান্ত সুরেন্দ্রনাথকে ঐ সতরজন নেতার অন্যতম বলিয়া উল্লেখ করিলেও সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং বলিয়াছিলেন যে, তিনি ঐ সময়ে কলিকাতায় জাতীয় সম্মেলনের কার্যে ব্যস্ত ছিলেন। এইভাবে নানা মুনির নানা মতের মধ্যে কংগ্রেসের উৎপত্তির প্রকৃত ইতিহাস কতকটা অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। পট্টভি সীতারামিয়া তাঁহার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাসে একথার উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু একটু তলাইয়া দেখিলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সুরেন্দ্রনাথ তথা তাঁহার ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যে ভারতের জাতীয় সভার আহবান করিয়াছিলেন তাহাতেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বীজ উপ্ত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় যখন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ঠিক সেই সময়ে জাতীয় সম্মেলন আহবান করিয়া কলিকাতায় ভারতের বিভিন্ন অংশের লোকের উপস্থিতির সুযোগ লইয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে ভারতের জাতীয়তাবোধ যখন স্থায়ী সংগঠনের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী হইবার

কংগ্রেসের উৎপত্তি সম্পর্কে নানা মত

সুরেন্দ্রনাথের ভারতের জাতীয় সম্মেলন জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত

পথে অগ্রসর হইতেছিল তখন সুরেন্দ্রনাথ জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করিয়া সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজন মিটাইতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। জাতীয় সম্মেলনের ধ্যান-ধারণাকে ভিত্তি করিয়াই ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশন ২৪শে ডিসেম্বর শেষ হয়। উহার পরের দিন অর্থাৎ ২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এই সভায় উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও উদ্যোক্তাগণ সুরেন্দ্রনাথের জাতীয় সম্মেলনের কার্যবিবরণী সুরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে জানিয়া লইয়াছিলেন। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত ছিল ভারতের জাতীয় সম্মেলন বা ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্স। মিঃ অক্টাভিয়ান হিউম উদ্যোগী হইয়া সেই সময়কার জাতীয়তাবাদী ধারণাকে সংগঠিত রূপদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মিঃ হিউম লর্ড লিটনের দমনমূলক নীতির ফলে ভারতবাসীর মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল উহার ফলে কোন গণবিদ্রোহ যাহাতে ঘটিতে না পারে সেজন্য ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে লইয়া কংগ্রেসের ন্যায় একটি সংগঠন গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। কংগ্রেস দেশকে ব্রিটিশ শাসনমুক্ত করুক একথা তাঁহার কল্পনায় স্থান পায় নাই। বরঞ্চ ব্রিটিশ শাসনকে বিপদ হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই তিনি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার কাজে উদ্যোগী হইয়াছিলেন।

জাতীয় কংগ্রেস স্থাপনে মিঃ হিউমের প্রকৃত উদ্দেশ্য

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যকলাপ ও কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ : ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে কংগ্রেসের সর্বপ্রথম অধিবেশনের পর হইতে অদ্যাবধি প্রতি বৎসর ভারতের কোন-না-কোন স্থানে কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। প্রথম অধিবেশনে ভারতের বিভিন্ন অংশ হইতে মোট ৭২ জন প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর অবশিষ্ট কয়েক বৎসর কংগ্রেসের কার্যকলাপ প্রধানত দুইটি মূল নীতির উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছিল : (১) সরকারী কার্যকলাপের ও সরকারের নীতির সমালোচনা এবং (২) ভারতবাসীদের উন্নতি সাধনের জন্য সংস্কার দাবি করা। প্রত্যক্ষ বা সক্রিয় আন্দোলনে অবতীর্ণ না হইয়া প্রস্তাব পাশ করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই ছিল সেই সময়কার কংগ্রেস সদস্যদের কর্মপন্থা। দেশবাসীর দারিদ্র্য, লর্ড লিটনের অস্ত্র আইন, আবগারি শুল্ক, লবণ কর প্রভৃতি ভারতীয়দের স্বার্থ-বিরোধী বিষয়ে সরকারী নীতির সমালোচনা ও সংস্কার কংগ্রেস দাবি করিতে লাগিল। স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন, নির্বাচনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা গঠন, সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার প্রবর্তন, ভারতীয়দের সামরিক শিক্ষা দান, সামরিক খাতে ব্যয় হ্রাস, প্রশাসনিক ও বিচার ক্ষমতা পৃথকীকরণ, ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ডে একই সঙ্গে

প্রাথমিক পর্যায়ে কংগ্রেসের কার্যকলাপের পশ্চাতে দুইটি মূলনীতি : সমালোচনা ও সংস্কার দাবি

কংগ্রেসের বিভিন্ন দাবি

কংগ্রেসের প্রাথমিক চেষ্টায় কোন ফল হইল না দেখিয়া কংগ্রেস ভারতবর্ষ এবং ইংলণ্ড উভয় দেশেই কংগ্রেসের দাবির সমর্থনে জনমত গঠনের চেষ্টা শুরু করিল। এজন্য ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একটি ব্রিটিশ কমিটি গঠিত হইল। এই কমিটির তত্ত্বাবধানে ইংলণ্ড হইতে 'ইণ্ডিয়া' নামে একখানা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করা হইল (১৮৯০)। ইহা ভিন্ন, ভারত সম্পর্কে সভা-সমিতিতে বক্তৃতার কাজও চলিল। দাদাভাই নৌরজী তাঁহার কর্মজীবনের অধিকাংশ সময় ইংলণ্ডে অতিবাহিত করিয়া 'ইণ্ডিয়া' পত্রিকার মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নামে যে শোষণ চলিতেছে সে-বিষয়ে ইংলণ্ডের জনসাধারণ ও রাজনীতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইবার কংগ্রেসের দাবির প্রতি ব্রিটিশ নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি পড়িল। ইতিমধ্যে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের সদস্য চার্লস ব্রাডলফ (Charles Bradlaugh) স্বয়ং যোগদান করিলেন। পর বৎসর তিনি কংগ্রেসের দাবির ভিত্তিতে ভারতের আইনসভাগুলির সম্প্রসারণের জন্য নিজে একটি বিল বা আইনের প্রস্তাব ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে উত্থাপন করিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সরকার নিজেই একটি বিল উত্থাপন করিয়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে উহা পাশ করিল। এই আইন 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট' (India Councils Act) নামে অভিহিত। ইহাই ছিল জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনের সর্বপ্রকার উল্লেখযোগ্য সাফল্য।

ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডে একই সঙ্গে আন্দোলনের ব্যবস্থা

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট

'ইণ্ডিয়া কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট' অনুসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যসংখ্যা সামান্য বৃদ্ধি করা হইল। অবশ্য এই সংখ্যাবৃদ্ধি কংগ্রেসের দাবির তুলনায় অকিঞ্চিৎকর ছিল। কিন্তু এই আইন অনুসারে বর্ধিত সদস্যসংখ্যা গভর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কাউন্সিল ইচ্ছা করিলে নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ করিতে পারিবেন, একথা স্বীকৃত হইল। লর্ড ল্যান্সডাউন (১৮৮৮-৯৪) নির্বাচনের মাধ্যমেই এই নূতন সদস্যপদ পূরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এই সামান্য ব্যবস্থায় কংগ্রেস সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, কংগ্রেসী আন্দোলন পূর্ববৎ চলিল।

কংগ্রেসী দাবির আংশিক স্বীকৃতি

এযাবৎ কংগ্রেস আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের, অনুরোধ-উপরোধের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই নিষ্ক্রিয় নীতির বিরুদ্ধে কংগ্রেসের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিল। সরকার-বিরোধী মনোভাবও ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতা কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নীতি ত্যাগ করিয়া কার্যকরীভাবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইবার প্রস্তাব করিলেন। ভারতবাসীর মধ্যে আত্মনির্ভরশীলতা, জাতীয়তাবোধ এবং ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে তিলক

কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতিতে অসন্তোষের সূচনা

'কেশরী' নামক পত্রিকা প্রকাশ করিলেন। তিলক শিবাজী উৎসব প্রবর্তন করিয়া ভারতবাসীকে শিবাজীর দেশাত্মবোধ, বীরত্ব ও আত্মপ্রত্যয়ের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিতে লাগিলেন। তাঁহার এই চেষ্টা মারাঠা জাতির মধ্যে এক অসাধারণ উৎসাহ-উদ্দীপনা ও জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিল। সামান্য কাল পূর্বে মারাঠা জাতি স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। জাতীয় পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনে যোগদানে তাহাদের বিশেষ উৎসাহ থাকিবে, ইহাতে আশ্চর্য কি!* তিলক ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন তেজস্বী পুরুষ।

তিলক, অরবিন্দ, বিপিন পাল প্রভৃতি সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল হইতে শুরু করিয়া ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ কুড়ি বৎসর কংগ্রেস কুড়িটি অধিবেশনে শাসনসংস্কার, ভারতীয়দের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া আইনসভা গঠন প্রভৃতি দাবি-দাওয়া উত্থাপিত করিয়াছিল। বৎসরের পর বৎসর একই ধরনের দাবি-সম্বলিত প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করিয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট তাহা পেশ করিতেছিল। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট ভিন্ন অপর কোন উল্লেখযোগ্য সংস্কার কংগ্রেস আদায় করিতে সমর্থ হয় নাই। কংগ্রেসের নেতৃবর্গের অধিকাংশই তখন ব্রিটিশ সরকার ও ব্রিটিশ রাজনীতিকদের উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার উপর আস্থাবান ছিলেন। আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে দাবি স্বীকার করাইয়া লইবার নীতিতে তাঁহারা বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তাহাদের এই নীতি তেমন সাফল্যলাভ না করিলেও ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ জাগাইয়া তুলিবার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। ইহা ভিন্ন, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ এ্যাক্ট প্রবর্তনের ফলে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে আইনসভায় ফিরোজশাহ মেহ্‌তা, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতা নির্বাচিত হইয়া ভারতীয়দের অভাব-অভিযোগ, রাজনৈতিক দাবি প্রভৃতি ব্রিটিশ সরকারের সম্মুখে সরাসরি উপস্থাপিত করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের বিংশতিতম অধিবেশনে কংগ্রেস দাবির মাত্রা আরও বাড়াইল। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতীয় প্রতিনিধি গ্রহণের দাবি কংগ্রেস উত্থাপন করিল। তথাপি ইহা অনস্বীকার্য যে, তখন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংগঠন হিসাবেই চলিতেছিল। অনেক পূর্বেই বাংলার মনীষী বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও অশ্বিনীকুমার দত্ত জনসাধারণের সহিত কংগ্রেসের যোগাযোগ-হীনতার তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

কংগ্রেসের সাফল্য বিচার

শিক্ষিত মধ্যবিত্তদের সংগঠন



অশ্বিনীকুমার দত্ত

* *Idem.*

কিন্তু তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতা কর্তৃক কংগ্রেসকে সক্রিয় আন্দোলনের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টার ফলে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এক নূতন চেতনার সৃষ্টি হয়। সংস্কার আদায়ের জন্য ভিক্ষাপাত্র লইয়া বার বার ব্রিটিশের নিকট আবেদন-নিবেদন নীতির বিরুদ্ধে অসন্তোষের সৃষ্টি হইতে থাকে। এই অসন্তোষ কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এবং বাহিরে ক্রমে বৃদ্ধি পায়।

নূতন চেতনার সৃষ্টি

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ, ১৯০৫ খ্রীঃ
(Partition of Bengal, 1905)

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে এক গভীর জাতীয়তাবাদী জাগরণের সূচনা হইয়াছিল। ভারতবর্ষে যখন জাতীয় আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিতেছিল সেই সময়ে জাপানের হস্তে রাশিয়ার পরাজয় সমগ্র এশিয়ায় এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। চীন, পারস্য, ভারতবর্ষ, জাপান সর্বত্র বৈদেশিক প্রভাব বা অধীনতা মুক্ত হইবার এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের বর্বরোচিত ব্যবহার ভারতে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি তিক্ততা বৃদ্ধি করিল। বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি ছিল জাতীয় আন্দোলনের পুরোভাগে। বলা বাহুল্য, ঐ সকল আন্তর্জাতিক ঘটনা বাঙালী জাতিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়া তোলে।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রভাব: এশিয়ার সর্বত্র জাতীয়তাবাদী প্রভাব

সেই সময়ে লর্ড কার্জন (১৮৯৯-১৯০৫) ছিলেন ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়। তিনি ছিলেন স্বৈরাচার ও সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী। তাঁহার শাসনকালে বাঙালীর তথা ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ কঠিন বাধার সম্মুখীন হয়। লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন-নীতি, জনমত উপেক্ষা করিয়া নিজ ইচ্ছানুযায়ী যে-কোন ব্যবস্থা অবলম্বন, সর্বোপরি তাঁহার ঔদ্ধত্যপূর্ণ উক্তি জাতীয় আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিবার সুযোগ দান করিল। বাংলার জাতীয়তাবাদ সংগ্রামের পথে অগ্রসর হইল। লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ, কলিকাতা পৌরসভার উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি, ভারতীয়দের সততা সম্পর্কে তাঁহার কটূক্তি এক দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি করিল। কিন্তু তাঁহার বাংলা ব্যবচ্ছেদ অগ্নিতে ঘৃতাহুতির কাজ করিল। বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে দারুণ বিক্ষোভ ও ব্যাপক আন্দোলনের সৃষ্টি হইল উহা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন নামে পরিচিত।

লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী শাসন



লর্ড কার্জন

লর্ড কার্জন বাংলাদেশকে বিভক্ত করিয়া বাঙালী জাতির জাতীয়তাবোধকে আঘাত হানিবার উদ্দেশ্যে সর্বপ্রথম ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা এবং চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সহিত সংযুক্ত করিবার কথা ছিল। কিন্তু এই পরিকল্পনা প্রকাশিত হইলে বাংলাদেশের সর্বত্র এক গভীর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই বাঙালী জাতিকে এইভাবে দ্বিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাবের বিরোধিতা শুরু করে। পূর্ববঙ্গের শহর, নগর, গ্রাম সর্বত্র প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। কার্জনের পরিকল্পনায় পূর্ববঙ্গকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিবার প্রস্তাব ছিল এজন্য ইহার প্রতিবাদ পূর্ববঙ্গেই অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল। লর্ড কার্জন স্বয়ং পূর্ববঙ্গ সফর করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, বাঙালীর জাতীয়তাবোধ কত দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে ভবিষ্যতে এই জাতীয়তাবোধ যে বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে একথা উপলব্ধি করিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের বাংলা ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনা

বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ

এদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসও বাংলা ও বাঙালীর এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদের সামিল হইল। বাংলাদেশ ব্যবচ্ছেদ পরিকল্পনার বিরোধিতা করিয়া কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ করিল। এই পরিস্থিতিতে সরকার ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু লর্ড কার্জন বাঙালী জাতির রাজনৈতিক আন্দোলন ও জাতীয়তাবোধের তীব্রতা লক্ষ্য করিয়া উহা দমনের উদ্দেশ্যে বাংলা ব্যবচ্ছেদের গোপন ব্যবস্থা করিয়া চলিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস হইতেই কার্জনের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার কতক কতক সংবাদ প্রকাশিত হয়। বাঙালী জাতি তখন হইতেই ইহার বিরোধিতা শুরু করে। ঐ বৎসর জুলাই মাসে সরকার বাংলা ব্যবচ্ছেদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই ব্যবচ্ছেদের পশ্চাতে কার্জনের যুক্তি ছিল এই যে, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা লইয়া গঠিত বিশাল প্রদেশের শাসনভার একই ব্যক্তি অর্থাৎ গভর্ণরের উপর ন্যস্ত রাখা শাসন-কার্যের দক্ষতার দিক্ দিয়া উচিত নহে। এজন্য বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, রাজসাহী বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং দার্জিলিং—এক কথায় উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গকে আসামের সহিত সংযুক্ত করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' (Eastern Bengal and Assam) নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠন করা হইল। এই প্রদেশটির শাসনভার একজন ছোটলাট বা লেফটেনাণ্ট গভর্ণরের (Lieutenant Governor) উপর থাকিবে, ঢাকা শহর হইবে এই নূতন প্রদেশের রাজধানী। পক্ষান্তরে মূল বাংলা প্রদেশ বিহার-উড়িষ্যা ও পশ্চিমবঙ্গে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)

পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নূতন প্রদেশ গঠন

শাসনের সুবিধার অজুহাত দেখান হইলেও লর্ড কার্জনের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙালী জাতিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদের জাতীয়তাবাদী ঐক্য বিনষ্ট করা। পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গ আসামের সহিত সংযুক্তির ফলে যে নূতন প্রদেশ

গঠন করা হইয়াছিল তাহাতে হিন্দুদিগকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করিয়া এবং সাম্প্রদায়িক বিভেদের সৃষ্টি করিয়া বাঙালীর ঐক্যবোধকে আঘাত করা হইয়াছিল। অন্যদিকে বিহার-উড়িষ্যার সহিত পশ্চিমবঙ্গকে সংযুক্ত করিয়া মূল বাংলা প্রদেশেও বাঙালীকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত করা হইয়াছিল। বস্তুত, শাসনকার্যের সুবিধার জন্য নূতন প্রদেশ গঠন করিতে হইলে বাংলাদেশ হইতে বিহার এবং উড়িষ্যাকে পৃথক করিলেই চলিত এবং তাহাই ছিল যুক্তিসম্মত। কিন্তু বাঙালীকে দমন করিবার উদ্দেশ্য লইয়া লর্ড কার্জন বাংলা ব্যবচ্ছেদ করিয়া বাঙালীর জাতীয় ঐক্য এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐক্য দুই-ই বিনাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই দেশবিভাগ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে কার্যকরী হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল।

শাসনকার্যের সুবিধা অজুহাত মাত্র: বাঙালীর জাতীয়তাবাদী শক্তিকে আঘাত করা ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বিনাশ করা মূল উদ্দেশ্য

বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া: স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলন: বাংলা ব্যবচ্ছেদ বা বঙ্গভঙ্গ বাঙালী জাতির তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ঐক্যের উপর এক কঠিন আঘাতস্বরূপ ছিল। কিন্তু সেই দিন বাঙালী জাতি এই আঘাতের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইতে ত্রুটি করে নাই। বাঙালী জাতি বঙ্গভঙ্গকে দেশমাতার অঙ্গচ্ছেদের মতই এক মর্মন্তুদ ঘটনা বলিয়া ধরিয়া লইল। বঙ্গভঙ্গের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশের সর্বত্র এক গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের শহরে, নগরে, গ্রামে সর্বত্র বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চার হইয়া উঠে। বাঙালী মনীষী সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে এক তীব্র আন্দোলনের শুরু হয়। তাঁহার 'বেঙ্গলী' পত্রিকা, এবং 'হিতবাদী', 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গকে এক জাতীয় বিপর্যয় ও সর্বনাশাত্মক ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করে। প্রথমদিকে ইংরেজ রক্ষণশীল পত্র-পত্রিকায়ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। 'ইংলিশম্যান', 'স্টেটস্‌ম্যান', 'পাইওনিয়ার' প্রভৃতি পত্রিকা এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এমন কি, ইংলণ্ডের 'লণ্ডন ডেইলি নিউজ' (London Daily News), 'দি লণ্ডন টাইমস্' (The London Times), 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' (Manchester Guardian) প্রভৃতি পত্রিকায় বাঙালী জাতির মতামত উপেক্ষা করিয়া নূতন প্রদেশ গঠনকে লর্ড কার্জনের দূরদর্শিতার কাজ হয় নাই এবং ইহার ফলে গঠিত দুইটি প্রদেশেই গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করিবে, একথা উল্লেখ করা হয়। 'বেঙ্গল ন্যাশন্যাল চেম্বার অব্ কমার্স" (The Bengal National Chamber of Commerce) নামক ইংরেজ বণিক সভাও ইহার প্রতিবাদ করিতে ত্রুটি করে নাই।

বাঙালীর জাতীয়তাবাদী ঐক্যের উপর কঠিন আঘাত

দেশীয় ও বিদেশীয় পত্র-পত্রিকায় বঙ্গভঙ্গের বিরূপ সমালোচনা

এদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হইল তাহাতে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শহরবাসী, গ্রামবাসী সকলেই সমান উৎসাহ লইয়া যোগদান করিল। আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন বাংলাদেশের 'মুকুটহীন রাজা' সুরেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়। লর্ড কার্জন এই আন্দোলনের তীব্রতা ও ব্যাপকতা দেখিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইবার চেষ্টা শুরু করিলেন। তিনি কূটচালে ঢাকার নবাব সলিমউল্লাহ্‌কে নিজ পক্ষে টানিয়া লইলেন। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামক নূতন প্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতা হেতু নবাব সলিমউল্লাহ্‌ই সেই প্রদেশে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ও সম্মানিত ব্যক্তি হইবেন এবং তাঁহার নিজ শহর ঢাকা এক সমৃদ্ধশালী নগরে পরিণত হইবে এই প্রলোভনে তাঁহাকে দলে টানিলেন। ফলে মুসলমানদের একাংশ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন রহিল। এই আন্দোলন যখন স্বদেশী আন্দোলনে অর্থাৎ বিলাতী জিনিসমাত্রেই বর্জন এবং স্বদেশজাত জিনিসপত্র ব্যবহারের জন্য আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল, ইংরেজগণ তখন বঙ্গভঙ্গের সমর্থন শুরু করিল। কিন্তু তাহাতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের শক্তি বা ব্যাপকতা হ্রাস পাইল না।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্ব : হিন্দু-মুসলমান, শহর-গ্রাম, ধনী-দরিদ্র সকলের আন্দোলনে অংশগ্রহণ

লর্ড কার্জন কর্তৃক ঢাকার নবাবকে নিজ পক্ষে আনয়ন : সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়ার সূচনা

প্রতিবাদে যখন ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়িল না তখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ব্রিটিশ-বিরোধী এক সক্রিয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল। কৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে 'বয়কট' আন্দোলনের প্রস্তাব করিলেন। মফস্বল অঞ্চলেই বয়কট আন্দোলনের সূচনা হইয়াছিল। খুলনা জেলার বাগেরহাট শহরে এক বিরাট জনসভায় (জুলাই ১৭, ১৯০৫) বঙ্গভঙ্গ রদ না হওয়া পর্যন্ত ইংলণ্ডে প্রস্তুত সামগ্রী বয়কট করা অর্থাৎ ব্যবহার না করার এবং ছয় মাসের মধ্যে কোন আনন্দানুষ্ঠানে যোগ না দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইল। লালমোহন ঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকার মাধ্যমে প্রস্তাব করিলেন যে, বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য ব্রিটিশ জাতির দৃষ্টি আকর্ষণের শ্রেষ্ঠ

'বয়কট' আন্দোলনের সূচনা : বাগেরহাটে সভা



কৃষ্ণকুমার মিত্র



কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

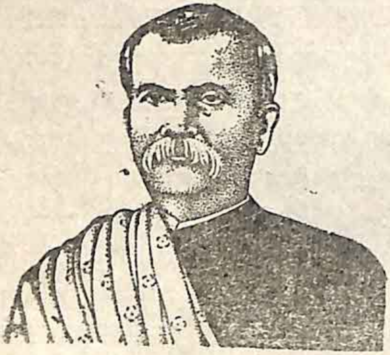
পন্থা হইল বিলাতী বস্ত্র ব্যবহার ত্যাগ করা। এইভাবে বিলাতী সামগ্রী বর্জনের নীতি গৃহীত হইল। কৃষ্ণকুমার মিত্র ও লালমোহন ঘোষ ভিন্ন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের নাম বয়কট আন্দোলন কার্যকরী করিবার ব্যাপারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বয়কট আন্দোলন কেবলমাত্র বিলাতী পণ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রহিল না। দিনাজপুরে তথাকার মহারাজার সভাপতিত্বে এক সভায় (জুলাই ২১, ১৯০৫) জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, পঞ্চায়েত প্রভৃতির সদস্য এবং সকল অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট (Honorary Magistrate)-কে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ জানাইয়া এবং পরবর্তী বার মাস জাতীয় শোক কাল হিসাবে পালনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। বাংলাদেশের বিভিন্নাঞ্চলে দিনাজপুর ও বাগেরহাটের প্রস্তাবসমূহের অনুকরণে প্রস্তাব গৃহীত হইলে বয়কট আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকে। কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্ররাও সভায় সমবেত হইয়া বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ এবং বয়কট আন্দোলন সমর্থন করেন। আগস্ট মাসের ৭ তারিখে কলিকাতা টাউন হলে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু জনসমাগম ক্রমশ বাড়িতে থাকিলে টাউন হলের বাহিরে আরও দুইটি পৃথক সভার ব্যবস্থা করিতে হয়। টাউন হলে সভাপতিত্ব করেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। বাহিরের দুইটি জনসভায় সভাপতিত্ব করেন ভূপেন্দ্রনাথ বসু ও অম্বিকাচরণ মজুমদার। কলিকাতার

দিনাজপুর সভা

কলিকাতার বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের বয়কট আন্দোলন সমর্থন



মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী (১৮৬০-১৯২৯)



অম্বিকাচরণ মজুমদার (১৮৫১-১৯২২)

ছাত্রসমাজের এক বিরাট সংখ্যা সেইদিন কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়া শোকযাত্রার ন্যায় শোভাযাত্রা করিয়া টাউন হলের সভায় যোগদান করেন। 'ঐক্যবদ্ধ বাংলা', 'একতাই বল', 'বন্দেমাতরম্', 'বঙ্গভঙ্গ চাই না' প্রভৃতি ধ্বনি দিয়া তাঁহারা সেইদিন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে এক নূতন শক্তি দান করিয়াছিলেন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বঙ্গভঙ্গকে বাঙালী জাতির এক চরম দুর্দৈব বলিয়া বর্ণনা করিলেন। ঐ বৎসর পুণ্য মহালয়ার দিন (সেপ্টেম্বর ২৮) কালীঘাটের কালীমন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত বাঙালী শপথ লইয়াছিলেন "বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিব না, বিদেশীয়দের দোকান হইতে কোন পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিব না", ইত্যাদি। কার্জন-প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গকে অন্যায়মূলক,

৭ই আগস্ট, ১৯০৫ কলিকাতা টাউন হলের সভা : বয়কট সমর্থন

অপ্রয়োজনীয়, স্বেচ্ছাচারমূলক কাজ বলিয়া নিন্দা করা হইল এবং মফস্বলের শহরাদিতে যে বয়কট আন্দোলনের ডাক দেওয়া হইয়াছিল তাহা সর্ববাদিসম্মতভাবে সমর্থিত হইল। এইভাবে বয়কট আন্দোলন বাংলাদেশের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। বাংলার ছাত্রসমাজ বিলাতী দ্রব্যাদি যাহাতে কেহ ক্রয় না করে সেজন্য দোকানে দোকানে পিকেটিং শুরু করিল।

ক্রমে বয়কট আন্দোলন সামাজিক ক্ষেত্রেও বিস্তৃত হইল। বাংলাদেশ ও দাক্ষিণাত্যের স্ত্রীলোকগণ স্থির করিলেন, রেশমী চুড়ি অর্থাৎ বিলাতী কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি আর ব্যবহার করিবেন না।* বরিশালে উড়িষ্যাবাসী পাচকগণ 'সাহেবীখানা' প্রস্তুত করিবে না স্থির করিল। অনুরূপ ফরিদপুরের মুচী সম্প্রদায় বিলাতী জুতা মেরামত করিতে রাজী হইল না। কালীঘাটে ধোপারা বিলাতী কাপড় না ধুইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। হিন্দু পুরোহিতগণ পূজাপার্বণে বিলাতী লবণ, বস্ত্র, চিনি ইত্যাদি ব্যবহার করা ধর্ম-বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এইভাবে উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম সর্বত্র বয়কট আন্দোলন এক সর্বাত্মক বিলাতী বর্জনে পরিণত হইল।

সামাজিক ক্ষেত্রে বয়কট প্রসারিত

বয়কট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল অর্থনৈতিক। এই অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যের আবার দুইটি পৃথক দিক্ ছিল—যথা, (১) বিলাতী পণ্যদ্রব্য বয়কট করিয়া, বিশেষভাবে মাঞ্চেষ্টারে প্রস্তুত বস্ত্রাদি বর্জন করিয়া ইংরেজ জাতিকে অর্থনৈতিক দিক্ দিয়া ক্ষতিগ্রস্ত করা এবং তাহার মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের উপর বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য চাপ সৃষ্টি করা। (২) বিলাতী সামগ্রীর প্রতিযোগিতায় মৃত বা মৃতপ্রায় দেশীয় শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলা এবং নূতন শিল্প স্থাপন করিয়া ভারতকে আত্মনির্ভরশীল করিয়া তোলা। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র বয়কট আন্দোলন একটি নেতিবাচক আন্দোলন। বিলাতী পণ্য বর্জন করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেশীয় শিল্পজাত সামগ্রী বিলাতী সামগ্রীর স্থান গ্রহণ না করিতে পারিলে বয়কট আন্দোলন অর্থহীন হইয়া পড়িত, সন্দেহ নাই। এজন্য বয়কট আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে শুরু হইল স্বদেশী আন্দোলন। সুতরাং বয়কট আন্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলন একটি অপরটির পরিপূরক ছিল। বয়কট ও স্বদেশী একই আন্দোলনেরই দুইটি দিক্। একটি নেতিবাচক (negative) অপরটি ইতিবাচক (positive)। বিলাতী জিনিসপত্র বর্জন করা এবং স্বদেশী জিনিসপত্র ক্রয় করা ছিল এই আন্দোলনের দুইটি ধারা। এই আন্দোলনে বাংলার ছাত্রসমাজের অবদান শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। বিলাতী সামগ্রী বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং করা, বিলাতী কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করিয়া উহাতে প্রকাশ্য স্থানে অগ্নিসংযোগ করা প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার ছাত্রসমাজ সর্বত্র এক জাতীয়তাবাদী উৎসাহের সৃষ্টি করিয়াছিল। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার অবদানও এ-বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি' (Dawn Society) বয়কট ও স্বদেশী

বয়কট আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন পরস্পর পরিপূরক

ছাত্রসমাজের অবদান

* এই সূত্রে 'ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি বঙ্গনারী কভু হাতে আর পরোনা' গানটি উল্লেখযোগ্য।

আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীত দেশমাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মহামন্ত্র রূপে ধ্বনিত হইতে লাগিল। এই মহামন্ত্রের প্রভাবে একদিকে যেমন বাঙালী জাতি ও ক্রমে সমগ্র ভারতবাসী এক নবশক্তি লাভ করিল অপরদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অন্তরে ইহা বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন এক অভূতপূর্ব জাতীয়তাবাদী চেতনায় ভারতবাসীকে, বিশেষভাবে বাঙালী জাতিকে

বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের প্রভাব



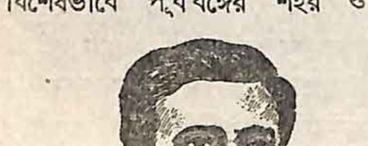
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ (স্বদেশী আমলে)



শিবনাথ শাস্ত্রী

উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, এবং রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় আরও অনেকের রচিত জাতীয়তাবাদী সঙ্গীত বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তুলিল। মুকুন্দ দাশ দেশাত্মবোধক গান গাহিয়া বাংলার, বিশেষভাবে পূর্ববঙ্গের শহর ও গ্রামাঞ্চলের জনগণকে মাতাইয়া তুলিলেন।

স্বদেশী সঙ্গীতের প্রভাব



কবি রজনীকান্ত সেন



সুব্রহ্মনিয়া ভারতী

দাক্ষিণাত্যে কবি সুব্রহ্মনিয়া ভারতী দেশাত্মবোধক সঙ্গীত রচনা করিয়া জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। বিপিনচন্দ্র পাল ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্বালাময়ী বক্তৃতা বাঙালী জাতির অন্তরে বিদ্রোহের

আগুন জ্বালাইয়া দিল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বিলাতী পোশাকধারী বাঙালী বিদেশী পোশাক পরিত্যাগ করিয়া, নারী জাতি গৃহস্থালীর কাজ ফেলিয়া রাখিয়া, ছাত্রসমাজ স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া দিয়া, উকিল, মোক্তার বিচারালয় ত্যাগ করিয়া, এমন কি বহু সংখ্যক জমিদার, ব্যবসায়ী নিজেদের আর্থিক নিরাপত্তার কথা ভুলিয়া গিয়া বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিলেন। এইভাবে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এক সর্বাত্মক আন্দোলনে পরিণত হইল।

আন্দোলনের ব্যাপকতা

স্বদেশী আন্দোলনের উদ্দীপনায় দেশীয় কাপড়ের কল, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা কোম্পানি, সাবানের কারখানা, ঔষধের কারখানা, চিনি, লবণ, দিয়াশলাই প্রস্তুতের কারখানা এবং বহু বৃহদায়তন ও কুটির শিল্প গড়িয়া উঠিল। শিবনাথ শাস্ত্রী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, আনন্দমোহন বসু, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সুন্দরীমোহন দাশ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, রমেশচন্দ্র দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রমুখ বাঙালী মনীষী এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিলেন।

দেশীয় শিল্পোন্নয়ন

বাঙালী মনীষীদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ



আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়



সুন্দরীমোহন দাশ

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইলেও—অর্থাৎ বিলাতী সামগ্রী বর্জন ও দেশীয় সামগ্রী ব্যবহার এবং সেজন্য দেশীয় শিল্পোন্নয়ন এই আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হইলেও ক্রমে ইহা দেশীয় সবকিছুর প্রতি এক গভীর মমত্ববোধে রূপান্তরিত হইয়া পড়ে। তবে ভারতবর্ষে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের প্রভাবেই এই মমত্ববোধ জাগিয়াছিল, বলা বাহুল্য।

লর্ড কার্জন ঢাকার নবাব ও উঁহার সমর্থকদিগকে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিলেও মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেকেই এই আন্দোলনের সহিত হিন্দুদের সহিত সমভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর আব্দুল রসুলের সভাপতিত্বে কলিকাতার রাজাবাজারে অনুষ্ঠিত এক বিরাট সভায় মুসলমান সম্প্রদায়

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সহিত সহানুভূতিশীল নহে ইংরেজদের এই মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করা হয়। ইহা ভিন্ন, এক প্রস্তাবে একথাও বলা হয় যে, মুসলমান সম্প্রদায় শুধু বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নহে, অপরাপর সকল ক্ষেত্রেই হিন্দুদের সহিত ঐক্যবদ্ধ। স্বদেশী জিনিসপত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রেও মুসলমানদের পূর্ণ সমর্থন আছে একথাও এই সভায় ঘোষণা করা হয়। লিয়াকৎ হুসেন, আব্দুল হালিম গজনভি, মহম্মদ ইস্মাইল চৌধুরী প্রমুখ গণ্যমান্য মুসলমানও বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন।

মুসলমান সম্প্রদায়ের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সমর্থন



লিয়াকৎ হুসেন



আব্দুল রসুল

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই অক্টোবর হইতে বঙ্গভঙ্গ বা বাংলা ব্যবচ্ছেদ কার্যকরী হইয়াছিল। ঐ দিনে বাংলাদেশের সর্বত্র বাঙালীরা উপবাস থাকিয়া উহাকে জাতীয় শোকদিবস হিসাবে পালন করিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঐদিন 'রাখীবন্ধন' উৎসবের মাধ্যমে দ্বিখণ্ডিত বাংলার মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যে অটুট, বাঙালী মাত্রেই যে ভাই ভাই এই মনোভাবের প্রকাশ করিলেন। বাঙালীরা একে অপরের হাতে রাখী বাঁধিয়া দিয়া হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান নির্বিশেষে বাঙালীরা যে ভাই ভাই এবং তাহাদের ঐক্য যে অটুট এবং উহা কোন শক্তিই বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ দিল। বাঙালী জাতির ঐক্য যে অটুট তাহার প্রতীক হিসাবে ঐদিন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার নীলরতন সরকার, মতিলাল ঘোষ, লিয়াকৎ হুসেন, আব্দুল হালিম গজনভি প্রমুখ বাঙালীর উপস্থিতিতে 'ফেডারেশন হল'-এর ভিত্তি স্থাপন করা হইল। আনন্দমোহন বসু অসুস্থ অবস্থায় এই সভায় উপস্থিত হইয়া ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাখীবন্ধন

ফেডারেশন হলের ভিত্তি স্থাপন

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অঞ্চলেও বিস্তৃত হইয়া এক সর্ব-ভারতীয় চরিত্র লাভ করে। বালগঙ্গাধর তিলক সমগ্র পশ্চিম-ভারতে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনকে এক শক্তিশালী ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত

করিলেন। বোম্বাই প্রদেশে তিলক ভিন্ন পরাঞ্জপে, শ্রীমতী কেতকার, শ্রীমতী যোশী বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। পাঞ্জাবে এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন রাম গঙ্গারাম, পণ্ডিত চণ্ডিকা দত্ত, মুন্সীরাম (পরবর্তী কালে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ) প্রভৃতি। মাদ্রাজ প্রদেশে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন সুব্রহ্মানিয়া আয়ার, আনন্দ চারলু, টি. এম. নায়ার প্রভৃতি নেতার চেষ্টায় বিস্তারলাভ করিয়াছিল। এইভাবে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন বাংলাদেশে এবং আপাতদৃষ্টিতে বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলন হিসাবে শুরু হইয়া এক বৃহত্তর জাতীয় আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল।

বোম্বাই, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের বিস্তৃতি

জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন : বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে বাঙালী ছাত্রসমাজ অংশগ্রহণ করিলে উহা অত্যধিক শক্তি সঞ্চয় করে। নেতৃবৃন্দের অগ্নিক্ষরা বক্তৃতায় বাঙালী ছাত্রসমাজের অন্তরে দেশপ্রেম ও ব্রিটিশ-বিরোধী বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন তাহাদের হস্তে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে এক অমোঘ অস্ত্রে পরিণত হইল। বিলাতী সামগ্রী বিক্রয়ের বিরুদ্ধে পিকেটিং, বিলাতী বস্ত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ, সভাসমিতিতে যোগদান, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া ছাত্রসমাজের দৈনন্দিন কাজ হইয়া দাঁড়াইল। যুবসমাজ এইভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে ব্রিটিশ সরকারের ভীতির সঞ্চার হইল, তাহারা যুব তথা ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে প্রথমে কার্লাইল সার্কুলার (Carlisle Circular) জারি করিয়া স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের শাস্তির ব্যবস্থা করিলেন। ছাত্রদের জলপানি (Scholarship) কাটিয়া দিবার, যে যে কলেজের ছাত্ররা আন্দোলনে যোগদান করিবে সেগুলির অনুমোদন নাকচ করিবার, ছাত্ররা পিকেটিং করিলে তাহারা যে স্কুলে বা কলেজে পড়িত সেই সকল বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা অধ্যক্ষের কৈফিয়ৎ তলব করিবার জন্য এই সার্কুলারে বলা হইল। মিঃ কার্লাইল ছিলেন বাংলা সরকারের চীফ সেক্রেটারী বা প্রধান সচিব। শিক্ষা-অধিকর্তা মিঃ পেড্লার হ্যারিসন রোডে (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) পিকেটিং করিবার দায়ে ছাত্ররা যে কলেজে পড়িত উহার অধ্যক্ষের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। এই সকল সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে এক বিরাট সভায় আব্দুল রসুল, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতা সরকারী আদেশের তীব্র নিন্দা করিলেন এবং জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রস্তাব করিলেন।

বাংলার ছাত্রসমাজকে দমনের চেষ্টা

কার্লাইল সার্কুলার

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা

ইহা ভিন্ন, অপর দিক্ দিয়াও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। বহু ছাত্র, শিক্ষক স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়া বিদেশী স্কুল-কলেজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহাদের শিক্ষার জন্যও জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা একান্ত দরকার ছিল। সরকারের দমননীতি এবং বহু সংখ্যক ছাত্রকে স্কুল-কলেজ হইতে বহিষ্কার প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে 'জাতীয় স্কুল' নামে বিভিন্ন অঞ্চলে

অনেক স্কুল স্থাপিত হইল। শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু নামে একজন ছাত্র 'এণ্টি-সার্কুলার সোসাইটি' (anti-Circular Society) নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া সরকার কর্তৃক স্কুল-কলেজ হইতে বহিষ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে লাগিল। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'ডন সোসাইটি'র কার্য-কলাপও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সতীশচন্দ্রের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ময়মনসিংহের রাজা ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, বিপিনচন্দ্র

এণ্টি-সার্কুলার সোসাইটি ; ডন সোসাইটি



সুবোধচন্দ্র মল্লিক



ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

পাল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ নেতা জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন। সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা এজন্য দান করিলেন। ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



তারকনাথ পালিত



সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী

পাঁচ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী জাতীয় শিক্ষা পরিষদে আড়াই লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর এক বিরাট সম্মেলনে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (National Council of Education) নামে একটি পরিষদ গঠিত হইল। এই সম্মেলনে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তারকনাথ পালিত, ডাঃ নীলরতন সরকার, আব্দুল রসুল, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন

দাশ, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি বাঙালী মনীষীর প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। মাতৃভাষা ও সাহিত্য, ইংরেজী সাহিত্য, ভারতীয় ইতিহাস, দর্শন, দেশীয় এবং পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও আদর্শ বিস্তার, বৈজ্ঞানিক, কারিগরি এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শরূপে বর্ণিত হইল। ভারতের জাতীয়তাবাদের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সাহিত্য, বিজ্ঞান, কারিগরি বিদ্যার প্রসারের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়াছিলেন তারকনাথ পালিত, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ নীলরতন সরকার, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি।

কলিকাতায় জাতীয় কলেজ ও স্কুলের প্রতিষ্ঠা

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হয়। অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজের উপ-অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া এই কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করেন। ঐ বৎসরই বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট নামে একটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। উহাই পরবর্তী কালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছে। মফস্বল অঞ্চলেও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ উহার কার্যকলাপ প্রসারিত করিয়াছিল। রংপুর জাতীয় স্কুল ও ঢাকা জাতীয় স্কুল ভিন্ন বাংলাদেশের অপরাপর যাবতীয় জাতীয় স্কুল জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছিল।

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট স্থাপন

বাংলার বাহিরেও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন বিস্তারলাভ করিয়াছিল। বেরার, বোম্বাই প্রদেশ, মাদ্রাজ প্রদেশে ১৯০৬ হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কালে বহু জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বাংলার জাতীয় শিক্ষা পরিষদের আদর্শে অন্ধ্র অঞ্চলে 'অন্ধ্র জাতীয় শিক্ষা পরিষদ' (Andhra National Council of Education) স্থাপিত হইয়াছিল। এলাহাবাদ ও অযোধ্যায় জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয় কলিকাতা জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে অনুমোদিত স্কুল হিসাবে স্থাপিত হইয়াছিল। এইভাবে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের পরিপূরক হিসাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও দেশাত্মবোধের এক অতি সুন্দর বহিঃপ্রকাশ বলা যাইতে পারে। এইভাবে বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাঙালী মনীষীরা ভারতের নেতৃত্ব দিয়াছিলেন।

বাংলার বাহিরে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রসার

চতুর্থ অধ্যায়

(ক) সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব
(Growth of Militant Nationalism)

ঊনবিংশ শতকের শেষ কয়েক বৎসরে ভারতের জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার যে পরিবর্তন ঘটিয়া এক নূতন জাতীয়তাবাদের সৃষ্টি হইয়াছিল উহাই সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ নামে পরিচিত। এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদ (১) ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্ম, ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ, (২) ভারতের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন

এবং (৩) স্বরাজ অর্থাৎ ব্রিটিশ অধীনতা হইতে মুক্তি এই তিনটি মূল আদর্শকে ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। মহারাষ্ট্র, বাংলা ও পাঞ্জাব এই তিনটি অঞ্চলকে কেন্দ্র করিয়া এই নূতন জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং ক্রমে উহা এক সর্ব-ভারতীয় চরিত্রে রূপান্তরিত হয়। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ও বিপিনচন্দ্র পাল এবং পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায় ছিলেন সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা। তাঁহারা ভারতের তিনটি পৃথক অংশে যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী ধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন সেগুলি ক্রমে একত্রিত হইয়া এবং বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া সমগ্র ভারতকে প্লাবিত করিয়াছিল। সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদ সর্ব-ভারতীয় রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে **ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ** অধ্যায়। এই নূতন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ চরমপন্থী (Extremists) বা জাতীয়তাবাদী (Nationalists) নামে পরিচিত ছিলেন।

সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ও উহার আদি প্রবক্তাগণ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠার পর হইতে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকার এবং ব্রিটিশ রাজনীতিকদের সদিচ্ছা ও ন্যায্য বিচারে আস্থাবান ছিল। ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আনুগত্য রাখিয়া আবেদন-নিবেদন নীতির অনুসরণ করাই ছিল কংগ্রেসের পন্থা। প্রতি বৎসর একই ধরনের প্রস্তাব পাশ করিয়া বার বার ভিক্ষা পাত্র লইয়া ব্রিটিশের কাছে অনুরোধ-উপরোধ কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেরই সমর্থিত নীতি ছিল। কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্ব হইতেই এই আবেদন-নিবেদন নীতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের একাংশের অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠিল। আবেদন-নিবেদনের বিরোধীরা 'চরমপন্থী' (Extremists) নামে অভিহিত হইলেন আর আবেদন-নিবেদনের সমর্থকগণ পরিচিত হইলেন 'নরমপন্থী' (Moderates) নামে। চরমপন্থীরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা প্রথম দিকে তেমন প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হইলেন না।

কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরোধিতা

চরমপন্থীদের উদ্ভব

লর্ড কার্জনের স্বৈরাচারী নীতি ভারতীয় জাতীয়তাবাদকে সংগ্রামের পথে ঠেলিয়া দিতে সাহায্য করিয়াছিল। কলিকাতা পৌরসভা এবং ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বাড়াইয়া লর্ড কার্জন আইন প্রবর্তন করিলে সরকারের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইল তাহাতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে কতক পরিমাণে উগ্র রূপ দান করিল। ইহার পর কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যখন আন্দোলন শুরু হইল এবং উহা ক্রমে সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হইল তখন ভারতের জাতীয়তাবাদ স্পষ্টভাবেই সংগ্রামশীল হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনও কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নরমপন্থী রহিয়া গিয়াছেন। মহারাষ্ট্রের বালগঙ্গাধর তিলক, বাংলার অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন চরমপন্থী মতবাদের প্রবক্তা। বিপিনচন্দ্র পাল প্রথমে নরমপন্থী

চরমপন্থীর প্রবক্তাগণ : তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল ও লাজপৎ রায়

নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন বটে, কিন্তু ক্রমে তিনিও চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। ভারতের জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের মধ্যেও এই পরিবর্তন শুরু হয়।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যখন বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে পরিণত হইয়াছিল তখন ভারতবাসীর জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম অভূতপূর্ব শক্তি সঞ্চয় করে। এই নূতন জাতীয়তাবাদী চেতনা ব্রিটিশ স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া উঠিলে সরকার স্বদেশী আন্দোলন দমনের চেষ্টায় অত্যাচার শুরু করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসী নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ তখনও ব্রিটিশ সরকারের উপর আস্থা রাখিয়া চলিবার নীতি অনুসরণ করিতে লাগিলেন। ইহার ফল হইল সম্পূর্ণ বিপরীত। বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেসী নরমপন্থীদের প্রতিপক্ষ হিসাবে দাঁড়াইলেন। কংগ্রেসে নরমপন্থীদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য তখনও বিদ্যমান।

নরমপন্থীদের ব্রিটিশ সরকারের উপর আস্থা

নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য ছিল। নরমপন্থীরা মনে করিতেন যে, ভারতবাসীর সেই সময়কার পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ শাসনে থাকা অপরিহার্য ছিল। অভিজ্ঞতার দিক্ দিয়া, শিক্ষার দিক্ দিয়া পশ্চাৎপদ ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারের সরাসরি বিরোধিতা অপেক্ষা সহযোগিতার মাধ্যমে লাভবান হইবে। কিন্তু বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সেই সময়ে যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাবের প্রসার ঘটিয়াছিল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে কংগ্রেস নেতৃত্ব দান করিবে এই আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে বাংলার নরমপন্থী নেতৃবৃন্দও বয়কট, স্বদেশী ও জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করিলেন না। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করিল। এমতাবস্থায় বাংলার চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বালগঙ্গাধর তিলকের অনুসরণে শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করিলেন (১৯০৬)। বালগঙ্গাধর তিলক, লালা লাজপৎ রায় প্রভৃতি চরমপন্থী নেতা শিবাজী উৎসবে যোগদানের জন্য কলিকাতা আসিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ নরমপন্থী নেতা এই উৎসবে যোগদানে বিরত রহিলেন। নরমপন্থীদের মধ্যে একমাত্র অশ্বিনীকুমার দত্ত চরমপন্থীদের প্রতি তাঁহার সমর্থন জানাইলেন। এইভাবে স্বদেশী আন্দোলনের ন্যায় চরমপন্থী মতবাদও ক্রমে এক সর্ব-ভারতীয় মতবাদে রূপান্তরিত হইল।

নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য

নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের পার্থক্য রাজনৈতিক আদর্শ এবং সেই আদর্শ বাস্তবে পরিণত করিবার পন্থা কি হইবে এই দুই দিক্ দিয়াই বিদ্যমান ছিল। নরমপন্থীরা ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিয়া ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যেরূপ স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ভোগ করে ততটুকু অধিকারই চাহিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে চরমপন্থিগণ চাহিয়াছিলেন ব্রিটিশ অধিকারমুক্ত পূর্ণ স্বরাজ। এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের পার্থক্য নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রভেদের সৃষ্টি করিয়াছিল।

দুই দলের রাজনৈতিক আদর্শ ভিন্ন রূপ

রাজনৈতিক আদর্শ কার্যকরী করিবার ক্ষেত্রে নরমপন্থিগণ বিশ্বাস করিতেন যে, ভারতীয়দের শাসনকার্যের ক্ষমতার অভাব এবং ভারতীয়দের মধ্যে একতার অভাব হেতু ভারতের অগ্রগতি ব্রিটিশ সরকারের অধীনে থাকিলেই সম্ভব হইবে। তাঁহারা চাহিয়াছিলেন শান্তিপূর্ণ উপায়ে ধীর পদক্ষেপে ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে ভারতের অগ্রগতি সাধন করিতে। পক্ষান্তরে চরমপন্থিগণ চাহিয়াছিলেন সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের মাধ্যমে স্বরাজ আদায় করিতে। এজন্য তাঁহারা সরকারের সব কিছুর সহিত সংস্রব ত্যাগ অর্থাৎ বয়কট করিতে এবং শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ (Passive Resistance) আন্দোলন করিতে চাহিলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই অসহযোগ আন্দোলন পরে মহাত্মা গান্ধীর হস্তে এক শক্তিশালী ব্রিটিশ-বিরোধী অস্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। চরমপন্থীরা অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে যেমন আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মপ্রত্যয় এবং নিজ পায়ে দাঁড়াইবার শিক্ষা ও শক্তি ভারতবাসীকে দিতে চাহিয়াছিলেন তেমনি অসহযোগের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারের উপর ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য চাপ সৃষ্টি করিতে চাহিয়াছিলেন।

আদর্শ রূপায়ণে দুই দলের পন্থার বিভিন্নতা

চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়া চলিতে লাগিল। গোখলের ন্যায় নেতার নেতৃত্বও নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ রোধ করিতে পারিল না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস অধিবেশনে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিরোধ সংঘর্ষের পর্যায়ে পেঁছিল। নরমপন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় চরমপন্থীদের ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হইল না। চরমপন্থীরা সাময়িকভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থীদের রাজনৈতিক মতবাদ প্রাধান্য লাভে সমর্থ না হইলেও বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল এবং লালা লাজপৎ রায়ের শক্তিশালী নেতৃত্বে চরমপন্থীদের সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদী প্রভাব ক্রমে সর্ব-ভারতে বিস্তার লাভ করিল। 'সন্ধ্যা', 'কেশরী', 'যুগান্তর', 'নবশক্তি', 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে চরমপন্থীরা ভারতের যুবসমাজকে এক নূতন জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের ধারায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। অল্পকাল পরে কংগ্রেসে চরমপন্থীদেরই জয় হইল। কংগ্রেস চিরতরে উহার আবেদন-নিবেদনের নীতি পরিত্যাগ করিয়া সক্রিয় আন্দোলনের পথে নামিল। এইভাবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নূতন পথে পরিচালিত হইতে থাকে।

সুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী-দের মধ্যে প্রকাশ্য সংঘর্ষ

শেষ পর্যন্ত চরম-পন্থীদের জয়

বালগঙ্গাধর তিলক (১৮৫৬-১৯২০): মহারাষ্ট্রের পেশওয়া বংশের সন্তান বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন ভারতের নূতন জাতীয়তাবাদের অর্থাৎ সংগ্রামী জাতীয়তা-

বাদের জনক। মারাঠা বীর, দেশাত্মবোধ ও স্বাধীনচেতনার মূর্ত প্রতীক শিবাজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ বালগঙ্গাধর তিলক ভারতের ইতিহাস-ঐতিহ্যের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা জাগাইয়া তুলিয়া তাহাদিগকে দেশপ্রেমের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে* তিনি শিবাজী উৎসবের অনুষ্ঠান করেন। শিবাজীর জীবনাদর্শ জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া দেওয়াই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি সেই সময়ে বলিয়াছিলেন যে এই উৎসব ভারতের অপরাপর অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িবে এবং ভারতবাসীকে দেশাত্মবোধের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবে। কাজেও তাহাই হইয়াছিল। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় শিবাজী উৎসব পালিত হয়। ইহার পর প্রতি বৎসর এই উৎসব কলিকাতায় এমন কি বাংলার মফস্বল শহরাদিতে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎসবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার বিখ্যাত কবিতা 'শিবাজী উৎসব' পাঠ করিয়াছিলেন। শিবাজী উৎসব ভিন্ন মহারাষ্ট্রের গণপতি উৎসবকে তিলক এক জাতীয় উৎসবে পরিণত করিয়া উহার মাধ্যমে স্বাদেশিকতার প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হন।

তিলক সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের জনক

শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন (১৮৯৫)

গণপতি উৎসব



তিলক (শিবাজী উৎসব)

তিলক ছিলেন আজীবন সংগ্রামী। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তিলক এজন্য ব্রিটিশ সরকারের অপদার্থতাকেই দায়ী করেন। তাঁহার 'কেশরী' (১৮৮৯) পত্রিকায় তিনি দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে ব্রিটিশ সরকারের নিষ্ক্রিয়তার কঠোর সমালোচনা করেন এবং জনসাধারণকে ব্রিটিশ সরকারকে খাদ্য সরবরাহের জন্য চাপ দিতে নির্দেশ দেন। এমন কি, তিনি তাহাদিগকে খরা, দুর্ভিক্ষ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য উৎসাহ দান করেন।

---

* 15th March 1895: Vide: *British Paramountcy and Indian Renaissance* Vol. X, Part II, p. 579. 'The Shivaji festival was first held on 15th April 1896': Tripathi's *The Extremist Challenge*, p. 59.

বালগঙ্গাধর তিলক ছিলেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিক, নির্ভীক স্বাধীনতা সৈনিক এবং অনন্যসাধারণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী পুরুষ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিকাংশ নেতা যখন ব্রিটিশ সরকারের নিকট ভিক্ষা পাত্র লইয়া আবেদন-নিবেদনের নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছিলেন তখন তিনি তাঁহার ইতিহাসবিখ্যাত উক্তির মাধ্যমে তাঁহার রাজনৈতিক তথা ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ বর্ণনা করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন 'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'। সেই দিন হইতে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আদর্শের মূলমন্ত্র ছিল 'স্বরাজ'।

স্বরাজ জন্মগত অধিকার

তিলক তাঁহার সংগ্রামী এবং আপোসহীন দেশাত্মবোধের জন্য একাধিকবার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় শিবাজী উৎসব উপলক্ষে তিলক এক অগ্নিক্ষরা বক্তৃতা দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতায় দেশরক্ষার জন্য শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁর হত্যা অন্যায় ছিল না এই যুক্তি দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য ছিল এই যে, দেশরক্ষা, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য হত্যার কাজও নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমেরই পরিচায়ক। এই বক্তৃতার দশদিনের মধ্যে পুনার কালেক্টর মিঃ র‍্যাণ্ড্ এবং লেফ্টেনাণ্ট্ আয়ার্স্ট নামে একজন সামরিক কর্মচারীকে চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় হত্যা করিলে সরকার তিলককে গ্রেপ্তার করেন। পুনায় প্লেগ প্রতিরোধের অজুহাতে ব্রিটিশ সৈন্যরা জনসাধারণের উপর যে অত্যাচার চালাইয়াছিল তাহার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য চাপেকার ভ্রাতারা এই হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিলককে ব্রিটিশ সরকার তাহাদের প্রধান শত্রু মনে করিতেন। সুতরাং এই অজুহাতে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া শিবাজী উৎসবে তাঁহার বক্তৃতার জন্যই এই হত্যা অনুষ্ঠিত হইয়াছে যুক্তি দেখাইলেন। কিন্তু তাঁহার দোষ প্রমাণিত না হওয়া সত্ত্বেও তাঁহাকে ১৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। ইহাতে তিলকের প্রভাব দমন করা দূরে থাকুক, ভারতবাসীর মনে তিলকের প্রতি শ্রদ্ধা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার সংগ্রামী মতবাদের প্রতি সমর্থন ব্যাপকতর হইল। দেশবাসী তাঁহাকে 'লোকমান্য' উপাধিতে ভূষিত করিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিল।

তিলকের মতবাদ ও ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি

তিলকের ১৮ মাস কারাদণ্ড

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কেশরী পত্রিকায় মজফ্ফরপুরে ক্ষুদিরামের বোমা নিক্ষেপের উল্লেখ করিয়া তিলক লিখিয়াছিলেন যে, যতদিন ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে স্বরাজ না দিবেন ততদিন ভারতবর্ষ হইতে বোমা নিক্ষেপ দূর করা যাইবে না। এজন্য রাজদ্রোহিতার অভিযোগে তিলককে দীর্ঘ ছয় বৎসর মান্দালয়ে কারাবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী ধারা ভারতে প্রসারলাভ করিয়াছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে কারামুক্তির পর ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিলক এবং চরমপন্থীদের কংগ্রেসে পুনরায় প্রবেশ করিতে দেওয়া হইলে কংগ্রেস চরমপন্থীদের প্রাধান্যাধীন হইয়া পড়ে।

তিলকের ছয় বৎসর দেশ হইতে নির্বাসন ও কারাদণ্ড : কারামুক্তির পর কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশ : চরমপন্থীদের প্রাধান্যলাভ

অরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০) : মহারাষ্ট্রে বালগঙ্গাধর তিলক যেমন সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন তেমনি বাংলাদেশে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। তিলক শিবাজীর দেশাত্মবোধ, ব্যক্তিত্ব, তেজস্বিতা এবং স্বাধীন চেতনা দ্বারা যেমন উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, অরবিন্দও তেমনি স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, অরবিন্দ ঘোষও তিলকের ন্যায় হিন্দু ধর্ম, ভারতের অর্থনীতির পুনরুজ্জীবন এবং বিদেশী শাসনের অবসান—এই তিনটি মূল নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তাঁহার মতবাদ রচনা করিয়াছিলেন। চরমপন্থী মতবাদের এই তিনটিই ছিল মূল বৈশিষ্ট্য। 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত অরবিন্দের প্রবন্ধে তাঁহার উপর ফরাসী বিপ্লবের সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থীদের চরমপন্থী। তাঁহার জাতীয়তাবোধ ও দেশপ্রেম ভারতের পূর্ণ স্বরাজ ভারতবাসীর বিপ্লবী কর্মপন্থার মাধ্যমেই লাভ করা সম্ভব বলিয়া বিশ্বাসী ছিল। স্বার্থপরতা, দুর্বলতা, কাপুরুষতা বা ভাবপ্রবণতার মাধ্যমে তাহা কদাচ সম্ভব নহে। নরমপন্থী কংগ্রেসীদের তিনি 'অ-জাতীয়তাবাদী' (un-national) বলিয়া আখ্যা দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডে শিক্ষা সমাপন করিয়া অরবিন্দ বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষপদে যখন কাজ করিতেছিলেন সেই সময়ে তিনি উদয়পুরের বিপ্লবী ঠাকুরসাহেবের সংস্পর্শে আসেন। তাঁহার নিকট প্রেরণা লাভ করিয়া অরবিন্দ বাংলাদেশে বিপ্লবী সংস্থা স্থাপনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ বাংলাদেশে আসিয়া সত্যেন বসু, হেমচন্দ্র কানুনগো প্রভৃতি মেদিনীপুরের যুবকদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই নির্দেশে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা অনুশীলন সমিতি নামক গোপন বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করিবার এবং উহার কার্যকলাপ সুসংগঠিত করিবার জন্য বরোদা হইতে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ-বিরোধ আন্দোলন শুরু হইলে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ কর্তৃক স্থাপিত কলেজের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিয়া অরবিন্দ যখন ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা আসিলেন তখন অনুশীলন সমিতির সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব

ধর্ম, অর্থনীতি ও স্বরাজ—চরমপন্থী রাজনীতির মূল বৈশিষ্ট্য



ঋষি অরবিন্দ

অরবিন্দের উপর বিপ্লবের প্রভাব

অনুশীলন সমিতির সহিত যোগাযোগ

তিলক মহারাষ্ট্র ও মারাঠা জাতির মধ্যে যেরূপ সংগ্রামী জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি করিয়াছিলেন অরবিন্দ সেরূপ করিয়াছিলেন বাংলা ও বাঙালীর মধ্যে। কিন্তু তিলকের

তুলনায়ও অরবিন্দের ধ্যানধারণা ছিল অধিকতর চরমপন্থী। তিনি ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী। জাতীয়তাবাদ ছিল তাঁহার নিকট ধর্মস্বরূপ, এবং দেশমাতৃকা নিজ মাতৃস্বরূপা। কংগ্রেসের ভিক্ষা পাত্র লইয়া ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদন নীতির তিনি কঠোর সমালোচক ছিলেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে তিনি ভারতবাসী, বিশেষভাবে বাঙালী জাতির অন্তরে নূতন জাতীয়তাবাদী অর্থাৎ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী মনোভাব জাগাইয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যে গভীর জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা সংগ্রামী জাতীয়তাবাদে রূপান্তরিত হইয়াছিল।

বাংলা ও বাঙালীর মধ্যে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রবর্তক অরবিন্দ

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার মাণিকতলা অঞ্চলে একটি বোমা প্রস্তুতের কারখানা আবিষ্কৃত হইলে অরবিন্দ ঘোষকে অপরাপর ৪৭ (৩৬ ?) জন বিপ্লবীর সহিত গ্রেপ্তার করা হয়। আলিপুর বিচারালয়ে অরবিন্দের বিচার চলিল। চরমপন্থীদের নেতৃত্ব দিবার দোষে অরবিন্দকে ব্রিটিশ সরকার শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জন দাশের (পরবর্তী কালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন) অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি বেকসুর খালাস পাইলেন। ইহার পর আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধির ফলে তিনি পণ্ডিচেরিতে যোগসাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রত্যক্ষ রাজনীতি হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেলেন (১৯০৯)।

আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দের বিচার : বেকসুর মুক্তি : আধ্যাত্মিক জীবন গ্রহণ

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২) : চরমপন্থীদের রাজনৈতিক মতবাদ ভারতের সনাতন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন এবং পূর্ণ স্বরাজ এই তিন বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল একথার উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। বিপিনচন্দ্র পাল ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী একেশ্বরবাদী ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ছিলেন নরমপন্থী এবং ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যপূর্ণ। কিন্তু তাঁহার এই মতবাদ ক্রমেই পরিবর্তিত হইতে থাকে এবং তিনি চরমপন্থী মতবাদে বিশ্বাসী হইয়া পড়েন। ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রভাবে প্রভাবিত হন এবং তাঁহার জাতীয়তাবোধের মূল আদর্শ হইয়া উঠে ভগবানের মধ্যে মানুষকে দেখা এবং মানুষের মধ্যে ভগবানকে দেখা।*

বিপিনচন্দ্র নরমপন্থী নীতিতে বিশ্বাসী



বিপিনচন্দ্র পাল

* "The ideal is that of humanity in God, of God in humanity."' (Uttarpara Library speech of B. C. Pal), vide : Tripathi's *The Extremist Challenge*, p. 29.

এইভাবে ধর্মকে রাজনীতিতে প্রয়োগ ইতিপূর্বে কেহ করেন নাই। তারপর ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থী মতবাদের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন। ঐ বৎসর তিনি কংগ্রেসের ভিক্ষা পাত্র লইয়া ব্রিটিশের নিকট হইতে দান গ্রহণের কঠোর সমালোচনা শুরু করিলেন।

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন : বিপিনচন্দ্রের অনন্যসাধারণ বাগ্মিতার প্রভাব

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রোধের আন্দোলনের কালে বিপিনচন্দ্র পালের চরমপন্থী মতবাদ বাংলাদেশে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করিল। তাঁহার অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা এবং 'নিউ ইন্ডিয়া' ও 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তাঁহার ক্ষুরধার রচনা বাংলার তথা ভারতীয় যুবসমাজের মধ্যে একদিকে যেমন স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবোধের প্রবল বন্যার সৃষ্টি করিল, অপরদিকে তেমনি ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইয়া তুলিল। বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয়দের অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের হাতিয়ার হিসাবে যেমন কাজ করিল ব্রিটিশের উপর আঘাত হানিবার অস্ত্ররূপেও শক্তি সঞ্চয় করিল। লর্ড কার্জনের দমন নীতি বিপিনচন্দ্র পালের মোহভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে পূর্ণমাত্রায় চরমপন্থীতে রূপান্তরিত করিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসান এবং স্বরাজ স্থাপন তাঁহার জীবনের একমাত্র আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। তিনি তিলক, অরবিন্দ প্রভৃতির সহিত যুগ্মভাবে চরমপন্থী মতবাদে বাঙালী তথা ভারতীয়দের উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন।

বিপিনচন্দ্র সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের প্রবক্তায় রূপান্তরিত

বিপিনচন্দ্রের কারাদণ্ড

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ ঘোষের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বিচারের কালে তিনি সরকারের পক্ষে সাক্ষী দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁহাকে ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইল। ইহাতে বিপিনচন্দ্র পালের প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইল, বলা বাহুল্য।



লালা লাজপৎ রায়

লালা লাজপৎ রায় (১৮৬৫-১৯২৮) : সর্ব-ভারতীয় চরমপন্থী নেতৃবর্গের অন্যতম ছিলেন পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপৎ রায়। ধর্মের দিক্ দিয়া প্রথমে ব্রাহ্ম মতাবলম্বী হইলেও তিনি শেষ পর্যন্ত আর্য সমাজভুক্ত হইয়া পড়েন। গুরুদত্ত, হংসরাজ প্রভৃতি আর্যসমাজীদের প্রভাব তাঁহার উপর গভীরভাবে পতিত হয়। ফলে ভারতের প্রাচীন ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার অন্তরে জাগিয়া উঠে। কংগ্রেসের আদর্শ বা আন্দোলন হইতে প্রথমে তিনি নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহার মতে কংগ্রেস জনসাধারণের সহিত সংযোগহীন গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সংস্থা ছিল। প্রকৃত

প্রথম পর্যায়ে লাজপৎ রায়ের কংগ্রেসের প্রতি উদাসীনতা

জাতীয় আন্দোলনের পদ্ধতি কংগ্রেস অনুসরণ করিত না এজন্য লালা লাজপৎ রায় কংগ্রেসের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সচেতনতার যেমন অভাব, জাতীয় আদর্শের প্রতি আস্থাও তাঁহাদের তেমন নাই। লালা লাজপৎ রায় ছিলেন তিলকের রাজনৈতিক আদর্শে বিশ্বাসী। কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভিক্ষানীতির তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিরোধী। দেশের পুনরুজ্জীবন এবং ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বরাজ স্থাপন ছিল তাঁহার জীবনাদর্শ। সেই সময়ে যে নূতন জাতীয়তাবাদী আদর্শ অর্থাৎ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটিয়াছিল উহার প্রসারের ব্যাপারে লালা লাজপৎ রায়ের উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল। স্বাধীনতাকে তিনি জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ বলিয়া মনে করিতেন। এজন্য তিনি বলিয়াছিলেন পৃথিবীর সকল সম্পদ জাতীয় মর্যাদা ও স্বাধীনতার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন, বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব তিনি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ করিয়া পাঞ্জাবে উহার প্রসারসাধন করিয়াছিলেন। ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি ব্রিটিশ সরকারের উদাসীনতা লালা লাজপৎ রায়ের অন্তরে এই ধারণাই বদ্ধমূল করিয়াছিল যে, ভারতবাসীকে নিজ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হইতে হইবে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে একথা তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলে নরমপন্থীদের ও চরমপন্থীদের মধ্যে আদর্শগত পার্থক্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। দেশাত্মবোধ এবং দেশের জন্য আত্মত্যাগকে লাজপৎ রায় পরম ধর্ম বলিয়া মনে করিতেন। চরমপন্থীদের উপর ব্রিটিশ সরকারের রোষ স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজদ্রোহিতার অভিযোগে লাজপৎ রায়কে মান্দালয়ে কিছুকালের জন্য নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের ধারা সর্ব-ভারতীয় ধারায় পরিণত করিতে চারিজন নেতার অন্যতম ছিলেন লালা লাজপৎ রায়। অপর তিনজন ছিলেন তিলক, অরবিন্দ ও বিপিন পাল।

ব্রিটিশ শাসনমুক্ত স্বরাজ লাজপতের জীবনাদর্শ

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব

দেশাত্মবোধ ও দেশের জন্য আত্মত্যাগ লালা লাজপৎ রায়ের নিকট ধর্মে পরিণত

(খ) বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী সংগ্রাম
(Revolutionary Struggle in Bengal, Maharastra and the Punjab)

বাংলাদেশ: উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ঘটে। ক্রমে উহা সর্ব-ভারতে বিস্তার লাভ করে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই এই সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের একটি ধারা বিপ্লবী সংগ্রাসের দিকে চলিতে থাকে। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা জেনারেল এ্যাসেম্বলীজ ইন্‌স্টিটিউশানের (অধুনা স্কটিশ চার্চ কলেজ) কয়েকজন ছাত্র প্রমথনাথ মিত্রকে সভাপতি করিয়া একটি সমিতি স্থাপন করেন। উহার নাম তাঁহারা দেন অনুশীলন সমিতি। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আনন্দমঠ, বিবেকানন্দের

অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা (১৯০২)

জীবনাদর্শ এবং ইতালির জাতীয় ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতা ম্যাৎসিনি ও গ্যারিবল্ডির দৃষ্টান্ত তাঁহাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও তাঁহাদের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের অন্যতম প্রথম প্রবক্তা অরবিন্দ ঘোষ আনন্দমঠের আদর্শে বিপ্লবী সঙ্ঘ স্থাপনের কল্পনা করিতেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সেই সুযোগ উপস্থিত হইলে তিনি বরোদা হইতে কলিকাতা আসিয়া মেদিনীপুরের হেমচন্দ্র কানুনগো, সত্যেন বসু ও অপরাপর কয়েকজনকে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন। অরবিন্দ তখন বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন বিপ্লবে বিশ্বাসী। ফরাসী বিপ্লব, ইংলণ্ডের শাসনতান্ত্রিক বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস, আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা আন্দোলন, ইতালির জাতীয় স্বাধীনতা ও ঐক্যের দৃষ্টান্ত অরবিন্দকে বিপ্লবের কার্যকারিতা সম্পর্কে নিঃসন্দিহান করিয়াছিল। ইহা ভিন্ন, বরোদায় ঠাকুরসাহেব নামক জনৈক বিপ্লববাদীর সংস্পর্শে আসিয়া তিনি নিজে বোম্বাইয়ের বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করিয়াছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বরোদা হইতে কলিকাতা বিপ্লবী সংগঠনের কাজের জন্য পাঠাইয়াছিলেন। অরবিন্দ-ই যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে যতীন্দ্র উপাধ্যায় নাম দিয়া বরোদার সামরিক বিভাগে নিযুক্ত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথের সামরিক শিক্ষা শেষ হইলে তাঁহাকে অরবিন্দ কলিকাতা পাঠান। কিন্তু যতীন্দ্রনাথ বিপ্লবী সংগঠনের কাজে তেমন সাফল্যলাভে সমর্থ না হওয়ায় নিজ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোষের উপর অরবিন্দ সেই দায়িত্ব ন্যস্ত করেন।


প্রমথনাথ মিত্র (১৮৫৩-১৯১০)

অরবিন্দ ঘোষ ও বাংলার বিপ্লবী সংগঠন

অনুশীলন সমিতি উহার সদস্য যুবকদের মানসিক ও দৈহিক শক্তি বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত লাঠিখেলা, ব্যায়ামচর্চা প্রভৃতি ব্যবস্থা করিয়াছিল। আপাতদৃষ্টিতে ব্যায়াম প্রভৃতির অনুশীলন চলিলেও গোপনে এই সমিতি বিপ্লবী সন্ত্রাসে উহার সদস্য যুবকদের শিখাইয়া তুলিবার চেষ্টা চালাইতেছিল। বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সংগঠনী ক্ষমতার ফলে একদল নির্ভীক, দেশাত্মবোধসম্পন্ন যুবক অনুশীলন সমিতিতে যোগদান করে। শুধু তাহাই নহে, ইঁহাদের মধ্য হইতে অনেককে বাংলাদেশের বাহিরে, এমন কি মাদ্রাজে পর্যন্ত বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া তুলিবার কাজে তিনি পাঠাইয়াছিলেন।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কর্তৃক বিপ্লবী সংগঠনের কাজ

প্রথমে এই বিপ্লবী সংগঠনের মুখপত্র 'যুগান্তর' পত্রিকা অফিসেই অনুশীলন সমিতির কর্মকেন্দ্র' ছিল। কিন্তু পুলিশের নজর এড়াইবার জন্য মাণিকতলা মুরারি-

পুকুরের এক বাগানবাড়ীতে অনুশীলন সমিতির আখড়া বা কর্মকেন্দ্র স্থানান্তরিত করা হয়। এই বাগানবাড়ীতে বোমা প্রস্তুতের কাজ এবং আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের শিক্ষার কাজ গোপনে চলিতে থাকে। এদিকে অরবিন্দও নিষ্ক্রিয় রহিলেন না। বিপ্লবী প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ভবানী মন্দির' নামক গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। এই গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের বিপ্লবী ধারণার প্রভাব

মুরারিপুকুর বাগান-বাড়ী বিপ্লবী প্রশিক্ষণ-কেন্দ্র



সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০৮)



বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯)

পরিলক্ষিত হয়।* ঐ বৎসরই বাংলাদেশে লর্ড কার্জনের বাংলা ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হইলে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমে চলিল। ইহা ভিন্ন তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, লাজপৎ রায় প্রমুখ সংগ্রামী জাতীয়তাবাদী নেতার চেষ্টায় ভারতের জাতীয়তাবাদ সংগ্রামশীল হইয়া উঠিলে বিপ্লবী সন্ত্রাসের কাজ আরও বিস্তার লাভ করিল।

সন্ত্রাসবাদী প্রস্তুতি

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকিলে ব্রিটিশ সরকার উহা দমন করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিলেন না। যুবসমাজ, বিশেষভাবে ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার উদ্দেশ্যে নানা প্রকার বাধানিষেধ আরোপ করা হইল। সভাসমিতিতে ছাত্রদের যোগদান করা, পিকেটিং করা প্রভৃতির বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকার ত্রুটি করিলেন না। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দেওয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইল। কিন্তু বাংলার যুবসমাজ তখন জাগিয়া উঠিয়াছে। কার্জনের বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ তাহারা মায়ের অঙ্গচ্ছেদের ন্যায়ই অপমান-জনক ও মর্মান্তিক বলিয়া উহার প্রতিকারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এমতাবস্থায় সরকারী দমনমূলক অত্যাচার তাহাদিগকে মরিয়া করিয়া তুলিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন আহূত হইলে বাংলার গণ্যমান্য নেতা মাত্রেই উহাতে যোগদানের

বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন : ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক আন্দোলন দমনের জন্য অত্যাচার শুরু

* Vide Tripathi's *The Extremist Challenge*, p. 65.

জন্য গেলে তাঁহাদিগকে পুলিশ নির্মমভাবে প্রহার করিল। এদিকে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানকারীদের বিচারের নামে অবিচার এবং সংবাদপত্রগুলির উপর জুলুম করিতে লাগিলেন। বিচারকের আসনে বসিয়া তিনি প্রশাসকের ন্যায় আন্দোলন দমনে বদ্ধপরিকর হইয়া উঠিলেন। বাংলার যুবসমাজ স্বভাবতই তাঁহার উপর বিরূপ হইয়া উঠিল। তাঁহার আদালতে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দিবার অপরাধে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক কিশোর সুশীলকে কিংসফোর্ড পনর ঘা বেত মারিবার আদেশ দিলেন। এই ঘটনার পর বাংলার বিপ্লবী যুবসমাজের ধৈর্য আর বাঁধ মানিল না। কিংসফোর্ডকে হত্যা করিয়া তাঁহার অন্যায়, অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে কলিকাতায় জাতীয় কলেজ স্থাপিত হইলে অরবিন্দ বরোদা কলেজের উপাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করিয়া ৭৫০ টাকা মাসিক বেতনের পরিবর্তে মাত্র ৭৫ টাকা মাসিক বেতন গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষ হইয়া আসিলেন। মুরারিপুকুরের বাগানবাড়ীতে তাঁহার যোগাযোগ স্বভাবতই স্থাপিত হইল। মুরারিপুকুরের বাগানবাড়ীতে বিপ্লবী সমিতির সহিত বাংলার বিপ্লবীদের অনেকেই সংযুক্ত ছিলেন।

প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণের পরিকল্পনা

অনুশীলন সমিতির সহিত অরবিন্দ এবং বাংলার বিপ্লবী যুবকদের সংযোগ



সুশীল সেন (?—১৯১৫)



পুলিনবিহারী দাশ (১৮৭৭-১৯৪৯)

রাসবিহারী বসু, কানাইলাল দত্ত, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), সত্যেন বসু প্রভৃতি সকলেই ছিলেন এই সমিতির বিপ্লবী কর্মী। ঢাকা ও মেদিনীপুরে এই বিপ্লবী সমিতি অর্থাৎ অনুশীলন সমিতির শাখা খোলা হইয়াছিল। ঢাকা শাখার প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন পুলিনবিহারী দাশ।

কিংসফোর্ডকে হত্যা করিয়া তাঁহার অত্যাচারের অবসান ঘটান চাই—এই প্রতিজ্ঞা বাংলার বিপ্লবীরা গ্রহণ করিলেন। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের এই খবর পাইতে বিলম্ব হইল না। কিংসফোর্ডকে বিপ্লবীদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য সরকার তাঁহাকে মজফ্ফরপুরে বদলি করিলেন। কিন্তু বিপ্লবীরা সেখানেও তাঁহার উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রফুল্ল চাকি এবং মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসুকে বোমা ও পিস্তল দিয়া

প্রফুল্ল চাকি ও ক্ষুদিরাম: কিংসফোর্ড হত্যার চেষ্টা

কিংসফোর্ডকে হত্যা করিবার জন্য মজফ্ফরপুরে পাঠান হইল। ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল কিংসফোর্ডের গাড়ী মনে করিয়া ভুলক্রমে ব্যারিস্টার কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা যে গাড়ীতে যাইতেছিলেন উহার উপর বোমা নিক্ষেপ করিলে কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা উভয়েই মারা



ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮)



প্রফুল্ল চাকি (১৮৮৮-১৯০৮)

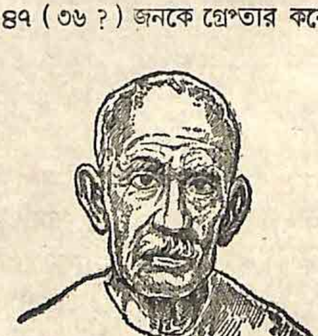
গেলেন। মোকামা স্টেশনে পুলিশ প্রফুল্ল চাকিকে গ্রেপ্তার করিতে গেলে তিনি নিজ রিভলভারের গুলিতে আত্মহত্যা করিলেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়িলেন এবং বিচারে তাঁহার ফাঁসী হইল। উনিশ বৎসরের যুবক ক্ষুদিরামের নির্ভীকতা এবং বিচারকালে তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিল। ক্ষুদিরাম বাঙালী জাতি তথা ভারতবাসীর অন্তরে শ্রদ্ধার চির আসনে অধিষ্ঠিত হইলেন।

ক্ষুদিরামের ফাঁসী (১৯০৮)

ক্ষুদিরাম যেদিন ধরা পড়িলেন তাহার পরদিন প্রাতে বিপ্লবীদের বিভিন্ন গোপন আস্তানায় পুলিশ হানা দিয়া অরবিন্দ-সহ মোট ৪৭ (৩৬ ?) জনকে গ্রেপ্তার করে (মে,



কানাই দত্ত (১৮৮৭-১৯০৮)



অবিনাশ ভট্টাচার্য (১৮৮২-১৯৬১)

১৯০৮)। বিপ্লবীদের কোন অবস্থায়ই কোন তথ্য ফাঁস করা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু নরেন গোঁসাই বিপ্লবী রীতি ও প্রতিজ্ঞা উপেক্ষা করিয়া রাজসাক্ষী হইলেন এবং যাবতীয় গোপন

তথ্য বলিয়া দিতে রাজী হইলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের মধ্যেই নরেন গোঁসাইকে গুলি করিয়া হত্যা করিলেন। এজন্য তাঁহারা জেলের বাহির হইতে পিস্তল সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বিচারে কানাইলাল ও সত্যেনের ফাঁসী হইল। দেশমাতার সেবায় বিশ্বাসঘাতকের স্থান নাই একথা সত্যেন ও কানাই জীবন দিয়া প্রমাণ করিলেন। চিত্তরঞ্জনের চেষ্টায় বিচারে অরবিন্দ খালাস পাইলেন। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, অবিনাশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি অনেকেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল। এই মকদ্দমা আলিপুর বোমার মামলা নামে পরিচিত।

আলিপুর বোমার মামলা

আলিপুর বোমার মামলার সময় হইতে বাংলার বিপ্লবিগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ফলে বাংলার বিভিন্নাংশে বহু গোপন বিপ্লবী সমিতি গড়িয়া উঠিল। এগুলির মধ্যে অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টি-ই ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। বিচ্ছিন্ন হইলেও এই সকল গোপন বিপ্লবী সমিতির মধ্যে যোগাযোগ ছিল। সরকারী অত্যাচার বিপ্লবীদের বিচ্ছিন্ন করিলেও তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে পারিল না। বিপ্লবী আন্দোলন বাংলার বাহিরে যুক্ত-প্রদেশ (উত্তরপ্রদেশ), পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র এবং ভারতের অপরাপর বিভিন্ন স্থানে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। এমন কি, ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মদনলাল ধিংড়া নামে জনৈক ভারতবাসী লণ্ডনের ইণ্ডিয়ান অফিসের একজন পদস্থ অফিসার কার্জন-উইলিকে (Curzon-Wyllie) গুলি করিয়া হত্যা করেন। কারণ ইনি ভারতে থাকাকালে স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িত যুবকদের কয়েকজনকে ফাঁসীর হুকুম দিয়াছিলেন। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে ইংলণ্ডস্থ জনসাধারণের মধ্যেও ভীতির সঞ্চার হইল।

বিপ্লবিগণ বিচ্ছিন্ন কিন্তু বিনাশপ্রাপ্ত নহে



মদনলাল ধিংড়া

ব্রিটিশ সরকার দমননীতির কঠোরতা ক্রমেই বাড়াইয়া চলিলেন। সভাসমিতি, সংবাদপত্র, সবকিছুই দমনমূলক আইনের কবলে পড়িল। কলিকাতাস্থ অনুশীলন সমিতিকে নিষিদ্ধ করা হইল (অক্টোবর, ১৯০৯)। কিন্তু বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্রতা ও কংগ্রেসের আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কার্জন-প্রবর্তিত বঙ্গভঙ্গ বাতিল করিতে বাধ্য হইলেন। ইতিপূর্বে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মোরলি-মিণ্টো শাসনতান্ত্রিক সংস্কার চালু করিয়া কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়ান হইল। প্রাদেশিক আইনসভায়ও অনুরূপ ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইল। কিন্তু ভারতবাসীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও জাতীয় ঐক্য বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে এই সংস্কার আইনে সাম্প্রদায়িক নির্বাচনব্যবস্থা প্রবর্তিত

বঙ্গভঙ্গ বাতিল (১৯১১)

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের মোরলি-মিন্টো সংস্কার

হইল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যাদিগকে বাজেট বা অপরাপর প্রস্তাব সম্পর্কে বিতর্ক, নূতন কোন প্রস্তাব উত্থাপন, এবং এই সকল ব্যাপারে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইল। ছোটলাট (Lieutenant Governor) শাসিত প্রদেশ-গুলিতে শাসনকার্যের সুবিধার জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি (Executive Council) গঠনের ব্যবস্থা করা হইল। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শাসন পরিষদে (Executive Council) ভারতীয়দের নিয়োগের নীতি সর্বপ্রথম এই সংস্কার আইনে স্বীকৃত হইল। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন ভারতীয়দের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে সমর্থ হইল না। সংস্কার দাবি সেজন্য অব্যাহত রহিল।

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ অরবিন্দের বাংলাদেশ পরিত্যাগে এবং বহুসংখ্যক বিপ্লবীর দ্বীপান্তরেও থামিল না। রাসবিহারী বসু, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন), নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) প্রভৃতি বিপ্লবী তরুণদের নেতৃত্বে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রস্তুতি গোপনে চলিতে লাগিল। রাসবিহারী বসু তাঁহার কর্মকেন্দ্র



রাসবিহারী বসু (১৮৮৫ ১৯৪৫)



নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮৯ ১৯৫৪)

বাংলার বাহিরে বিস্তার করিলেন। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হইয়াছিল বটে, কিন্তু ভারতের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লী স্থানান্তরিত হইয়া গিয়াছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ভাইসরয় ও গভর্ণর-জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৯১০-১৬) আনুষ্ঠানিকভাবে শোভাযাত্রা করিয়া দিল্লীতে কার্যভার গ্রহণের জন্য অগ্রসর হইলে

রাসবিহারী বসু

প্রকাশ্য দিবালোকে রাসবিহারী বসু তাঁহার উপর বোমা নিক্ষেপ করিলেন। হার্ডিঞ্জ আহত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গী ভারতীয় একজন মারা গেলেন। রাসবিহারীকে গ্রেপ্তারের জন্য এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হইল, কিন্তু তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইল না। তিনি পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের লইয়া বিদ্রোহ সৃষ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। সেখানে তাঁহারই অনুচরদের একজনের বিশ্বাস-ঘাতকতার ফলে তাঁহার দলের প্রায় সকলেই ধরা পড়িলে রাসবিহারী ছদ্মবেশে ও ছদ্মনামে জাপানে চলিয়া যান (১৯১৫)। বিদেশী সাহায্য লইয়া দেশ উদ্ধারের চেষ্টা করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।

বাঙালী বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, নির্ভীক নেতা ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বা বাঘা যতীন। হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় এই বিপ্লবী অধিনায়ক গ্রেপ্তার হন। কিন্তু বিচারে তিনি মুক্তি পান। ইহার পর তিনি সর্ব-ভারতীয় বিপ্লবী দলের সহিত সংযুক্ত হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে বাঙালী বিপ্লবিগণ জার্মানির ন্যাশন্যাল পার্টির সহিত যোগাযোগ স্থাপন করিয়া সেই দেশ হইতে আগ্নেয়াস্ত্র আনাইবার ব্যবস্থা করিলে দুইটি জাহাজভর্তি অস্ত্রশস্ত্র ভারতের দিকে রওয়ানা হইল। একটি বাংলা-দেশের সুন্দরবনের রাইমঙ্গল নামক স্থানে অপরটি উড়িষ্যায় পৌঁছিবার কথা ছিল। একটি তৃতীয় জাহাজও হাতিয়াতে আসিবার কথা ছিল। বালেশ্বর রেল লাইন দখল করিয়া ইংরেজদের সংযোগপথ রোধ করাই ছিল বিপ্লবীদের পরিকল্পনা। বাঘা যতীন তাঁহার সহকর্মী চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী, জ্যোতিষ পাল, নীরেন দাশগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্তকে লইয়া বালেশ্বর রওয়ানা হইলেন। যতীন ঘোষাল ও হরিকুমার চক্রবর্তী







বাঘা যতীন (১৮৭০-১৯১৫) চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী হরিকুমার চক্রবর্তী (১৮৮২-১৯৬৩)

সুন্দরবন অঞ্চলে যাত্রা করিলেন। বিদেশ হইতে অস্ত্র সংগ্রহের জন্য বাঘা যতীনের নির্দেশে ফাদার মার্টিন ছদ্ম নামে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রওয়ানা হইলেন বাটাভিয়ার দিকে। ব্রিটিশ সরকার গোপনে এই জাহাজগুলির সংবাদ পাওয়ায় সেগুলি আর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিতে পারিল না। কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস্ টেগার্ট বাঘা যতীনকে ধরিবার উদ্দেশ্যে এক সশস্ত্র পুলিশবাহিনী লইয়া বালেশ্বর পৌঁছিলেন। পুলিশের নজর যখন এড়ান সম্ভব হইল না তখন বাঘা যতীন ও তাঁহার দল বুড়ীবালাম নদীর তীরে ঘাঁটি স্থাপন করিয়া পুলিশের সহিত লড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। উভয় পক্ষে রীতিমত খণ্ডযুদ্ধ শুরু হইল। চিত্তপ্রিয় গুলির আঘাতে ঘটনাস্থলেই মারা গেলেন। গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত জ্যোতিষ ও বাঘা যতীনকে গ্রেপ্তার করা হইল বটে, কিন্তু যতীনকে প্রাণে বাঁচান গেল না। ব্রিটিশের শাস্তি তিনি এড়াইয়া গেলেন। জ্যোতিষকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। নীরেন ও মনোরঞ্জনের ফাঁসী হইল।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)

এইসব কারণে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। তিনি বিদেশী সাহায্য সংগ্রহের জন্য মালয়, জাপান, কোরিয়া, চীন, আমেরিকা, জার্মানি প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে এম. এন. রায় (মানবেন্দ্রনাথ রায়), হরি সিং প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিভ্রমণ করিলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। তিনি অবশ্য আজীবন বিপ্লবী চিন্তা লইয়াই চলিয়াছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়)

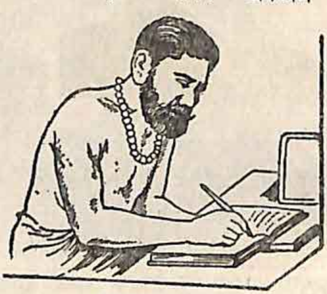
বাঘা যতীন, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির বিদেশী অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই সত্য কিন্তু বাংলাদেশে বিপ্লবের মূল গভীরে চলিয়া গিয়াছিল। সেই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ থাকিলেও বিপ্লবের অনুশীলন গোপনে চলিতে লাগিল।

মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ

মহারাষ্ট্র : বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদ সর্বপ্রথম মহারাষ্ট্রেই জন্ম লইয়াছিল। শিবাজীর জন্মভূমি মহারাষ্ট্র দেশ ভারতের অপরাপর অংশের তুলনায় অল্পকাল পূর্বে ব্রিটিশের নিকট স্বাধীনতা হারাইয়াছিল। মারাঠা জাতির মধ্যে স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের স্পৃহা সর্বাপেক্ষা বেশী থাকিবে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। জনসাধারণের চরম দুরবস্থায়ও ব্রিটিশ সরকার উদাসীন রহিলেন। বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্‌কে নামক একজন সাধারণ ব্যক্তির অন্তরে একথাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠে যে, এই দুর্ভিক্ষের জন্য বিদেশী শাসনই দায়ী। ফাদ্‌কে সেই সময় হইতেই ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার উদ্দেশ্যে একদল সাধারণ লোককে দেশপ্রেমের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। তাহাদিগকে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিখাইয়া তুলিয়া সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে ব্রিটিশ শাসনের উচ্ছেদ ঘটাইতে চাহিলেন। এই বিপ্লবী সংগঠনের প্রয়োজনীয় ব্যয় সংকুলানের জন্য রাজনৈতিক ডাকাতি করিয়া বিত্তশালীদের নিকট হইতে তিনি অর্থ সংগ্রহ করিলেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাদ্‌কে তাঁহার অনুচরদের লইয়া ধামারি গ্রাম আক্রমণ করিয়া উহা লুঠ করিলেন এবং পুলিশের সহিত এক খণ্ডযুদ্ধ করিলেন। পুলিশ ফাদ্‌কের গ্রেপ্তারের জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার সন্ধান পাইল না। ইহার পর আরও কয়েকটি ডাকাতি তিনি করিলেন এবং সরকারী খাজাঞ্চীখানা লুঠ করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। কিন্তু ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য সংগৃহীত অর্থ তাঁহার অনুচরদের মধ্যে কয়েকজন আত্মসাৎ করিলে ফাদ্‌কে অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িলেন। অল্পকাল পর তিনি রোহিলা সর্দার ইস্‌মাইল খানের সাহায্যে পাঁচশত রোহিলা এবং অপরাপর ব্যক্তির সাহায্যে আরও চারিশত অনুচর

মহারাষ্ট্রে স্বাধীনতা-স্পৃহার গভীরতা

১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় দারুণ দুর্ভিক্ষ



বাসুদেব ফাদ্‌কে

বাসুদেব বলবন্ত ফাদ্‌কের ব্রিটিশ বিতাড়নের পরিকল্পনা

রাজনৈতিক ডাকাতি

সংগ্রহ করিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কিন্তু মেজর দানিয়েল এবং নিজামের পুলিশ কমিশনার মাহমুদ সাহেব গোপনে এই পরিকল্পনার সংবাদ পাইয়া ফাদ্‌কেকে বহু চেষ্টার পর গ্রেপ্তার করিলেন। বিচারে তাঁহার নির্বাসন দণ্ড হইল (১৮৮২)। এডেনে নির্বাসন দণ্ড ভোগ করিবার কালে স্বেচ্ছায় খাদ্য গ্রহণ প্রায় ত্যাগ করিলে তিনি যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হইয়া এক বৎসরের মধ্যে (১৮৮৩) প্রাণ হারাইলেন।

ফাদ্‌কের গ্রেপ্তার : নির্বাসন (১৮৮২)

ফাদ্‌কের মৃত্যু (১৮৮৩)

দেশপ্রেমের ও দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিপ্লবের পন্থা অবলম্বন ফাদ্‌কেই প্রথম করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শের জন্য আত্মবিসর্জন মহারাষ্ট্রে এক গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তাঁহারই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বালকৃষ্ণ চাপেকার এবং দামোদর চাপেকার নামে দুই ভ্রাতা পুনার কালেক্টর মিঃ র‍্যাণ্ড্ এবং লেফ্‌টেনাণ্ট্ আয়ার্স্ট নামে জনৈক সামরিক কর্মচারীকে হত্যা করিয়াছিলেন। পুনায় প্লেগ মহামারীরূপে দেখা দিলে প্লেগ প্রতিরোধের নামে জনসাধারণের উপর অত্যাচার, স্ত্রীলোকের প্রতি দুর্ব্যবহার প্রভৃতির প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় এই হত্যাকাণ্ড করিয়াছিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক কর্তৃক অনুষ্ঠিত শিবাজী উৎসবের দশ দিনের মধ্যেই এই দুই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহাকে এজন্য দায়ী করিয়া ১৮ মাস কারাদণ্ড দেওয়া হইয়াছিল। চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী হইয়াছিল (১৮৯৭)।

চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয় ফাদ্‌কের দৃষ্টান্তে প্রভাবিত

দুইজন ব্রিটিশ কর্মচারী হত্যা

চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের ফাঁসী : তিলকের কারাদণ্ড

মহারাষ্ট্রে জাতীয়তাবাদকে সংগ্রামের পথে চালিত করিয়াছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক। তাঁহার গণপতি উৎসব এবং শিবাজী উৎসব ধর্ম ও ইতিহাসের দৃষ্টান্তে জনসাধারণকে রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলনের জন্য অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিয়াছিল। তিলকের কেশরী পত্রিকার প্রভাব এ-বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গণপতি উৎসব ও শিবাজী উৎসব

বালকৃষ্ণ চাপেকার ও দামোদর চাপেকার দুই ভাই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে (১৮৯৭) তাঁহাদেরই তৃতীয় ভ্রাতা বাসুদেব চাপেকার ও তাঁহার এক বন্ধু তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া দ্রাভিড ভ্রাতৃদ্বয়কে (Dravid Brothers) হত্যা করিলেন। কারণ এই দুই ইংরেজ ভ্রাতার নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়কে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হইয়াছিল। এজন্য ব্রিটিশ সরকার দ্রাভিড ভ্রাতৃদ্বয়কে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন। বাসুদেব ও তাঁহার বন্ধুর প্রাণদণ্ড হইয়াছিল, বলা বাহুল্য।

বাসুদেব চাপেকার : দ্রাভিড ভ্রাতৃদ্বয়কে হত্যা

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ঠাকুরসাহেব নামক জনৈক রাজপুত অভিজাত ব্যক্তি সমগ্র পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের সংগঠনের কাজ করিতেছিলেন। তিনি এজন্য বোম্বাইয়ে একটি গোপন সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। পাঁচজন সদস্য লইয়া একটি পরিষদ এবং বহু মারাঠা গণ্যমান্য রাজনীতিককে সদস্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া ঠাকুর-

ঠাকুরসাহেব : বোম্বাই গোপন সমিতি

সাহেব বোম্বাইয়ের বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রস্তুতি চালাইতেছিলেন। ঠাকুরসাহেবের সংস্পর্শে আসিয়া অরবিন্দ ঘোষ বরোদা কলেজে কর্মরত অবস্থায় এই বোম্বাই সমিতির সদস্য হইয়াছিলেন। এই গোপন সমিতি মহারাষ্ট্র এবং মারাঠা জাতির মধ্যে বিপ্লবী মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে সচেষ্ট ছিল। ঠাকুরসাহেব সেনাবাহিনীর মধ্যে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে কতক পরিমাণে সাফল্যলাভও করিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে বোম্বাই গোপন সমিতি বা ঠাকুরসাহেবের কার্যকলাপের আর বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

অরবিন্দের উপর ঠাকুর সাহেবের প্রভাব

কিন্তু মহারাষ্ট্র ছিল ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবের উর্বর ক্ষেত্র। চাপেকার ভ্রাতাদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে বাল্যকালেই বিনায়ক দামোদর সাভারকর গভীরভাবে প্রভাবিত হইয়াছিলেন। চাপেকার ভ্রাতাদের অসমাপ্ত কার্য সমাপ্ত করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সাভারকর ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে নাসিকে 'মিত্র মেলা' নামে এক সমিতি স্থাপন করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা এবং প্রয়োজনবোধে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা। চারি বৎসর পর (১৯০৪) পুনায়ও 'মিত্র মেলা' সংগঠিত হয় এবং উহার নাম পরিবর্তন করিয়া 'অভিনব ভারত' রাখা হয়। বিনায়ক দামোদর সাভারকরের অভিনব ভারত ইতালির স্বাধীনতা ও জাতীয় ঐক্যের জনক ম্যাৎসিনির 'ইয়ং ইতালি' নামক সমিতির আদর্শে গঠিত ছিল। বোম্বাই, নাসিক ও পুনার বিদ্যালয় মাত্রেই অভিনব ভারতের গোপন শাখা খোলা হইয়াছিল। এই সকল গোপন সমিতি আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাইতে উদ্যোগী ছিল। সাভারকরের 'তলোয়ার' পত্রিকা ছিল বিপ্লবী মনোভাব জাগাইয়া তুলিবার এক অতি শক্তিশালী মুখপত্র।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর : 'মিত্র মেলা' —'অভিনব ভারত'



ম্যাৎসিনি

অভিনব ভারতের আদর্শ ব্রিটিশ বিতাড়ন

পাঞ্জাব : পাঞ্জাবে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রস্তুতি শুরু হয় ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ বৎসর শাহরাণপুর জেলার দামোলা নদীর তীরে কয়েকজন যুবক দেশের জন্য জীবন বিসর্জন দিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া একটি গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি স্থাপন করেন। প্রবাসী বাঙালী পরিবারের যুবক জে. এম. চট্টোপাধ্যায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন।* বলা বাহুল্য, শাহরাণপুরের গুপ্ত সমিতির কর্মপদ্ধতি ও আদর্শ ভারতের অপরাপর অঞ্চলে স্থাপিত বিপ্লবী সমিতিগুলি হইতে ভিন্ন ছিল না। সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশ

শাহরাণপুরে গুপ্ত সমিতি স্থাপন (১৯০৪)

* Vide *History of Freedom Movement*, Vol. II p. 304 ff.

শাসনের অবসান ঘটাইয়া স্বদেশের মুক্তিসাধন ছিল এই গুপ্ত সমিতির মূল আদর্শ। কিছুকাল পর এই সমিতির কর্মকেন্দ্র শাহরাণপুর হইতে রুরকিতে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে নূতন আরও বহু সদস্য এই সমিতিতে যোগদান করেন। রুরকি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা এই সমিতির কর্মসূচীতে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। হরদয়াল সিং, অজিত সিং ও সুফি অম্বাপ্রসাদ নামে তিনজন নির্ভীক কর্মী এই বিপ্লবী সমিতিতে যোগদান করিলে ইহার শক্তি বৃদ্ধি পায়। সেই সময়ে বাংলাদেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূত্রে বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলন শুরু হইয়াছে। এই আন্দোলন সারা ভারতের ন্যায় পাঞ্জাবেও দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা প্রবাসী বাঙালী শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতির মাধ্যমে বাংলার বিপ্লবীদের সহিত গোপনে যোগাযোগ রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। হরদয়াল সিংয়ের সুযোগ্য নেতৃত্বে পাঞ্জাবে বিপ্লবীদের মধ্যে দেশাত্মবোধের এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা বিস্তারলাভ করে এবং বিপ্লবী কার্যকলাপের ক্ষেত্রে এক দারুণ উৎসাহের সৃষ্টি হয়। পাঞ্জাবের স্বনামধন্য নেতা লালা লাজপৎ রায় বিপ্লবী সমিতিকে নানাভাবে সাহায্য করিতেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রের তিলকের ন্যায়ই তিনি ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেসী আন্দোলনের সহিত যুক্ত রহিলেন। বিপ্লবীরা গোপনে অস্ত্রসংগ্রহ, বোমা প্রস্তুত প্রভৃতি কাজ চালাইতে লাগিলেন, আর অজিত সিং ও অম্বাপ্রসাদ সাধারণের মধ্যে বিপ্লবের প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে বিপ্লবী পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

রুরকিতে গুপ্ত সমিতি স্থানান্তরিত

হরদয়াল সিং, অজিত সিং, অম্বাপ্রসাদ—বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ

লালা লাজপৎ রায়ের সমর্থন

পাঞ্জাবে বিপ্লবী সন্ত্রাসের জন্য আর্য সমাজের অবদানের কথাও উল্লেখযোগ্য। ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবের বিপ্লবী কার্যকলাপের জন্য আর্য সমাজই প্রধানত দায়ী মনে করিতেন। বস্তুত, ১৯০৭ হইতে শুরু করিয়া ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাবতীয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে আর্য সমাজের সদস্যগণের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক।

আর্য সমাজ ও বিপ্লবী কার্যকলাপ

যাহা হউক, ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশদ্রোহিতার অপরাধে লালা লাজপৎ রায় এবং অজিত সিংকে দেশ হইতে নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কিন্তু ছয় মাস পর তাঁহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হইলে তাঁহারা দেশে ফিরিয়া আসেন। পরবর্তী কিছুকাল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ প্রায় বন্ধ থাকে। কিন্তু ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় বিপ্লবী কার্যকলাপ শুরু হয়। অজিত সিং ব্রিটিশ সরকার-বিরোধী প্রচারপত্র পাঞ্জাবের সর্বত্র বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিবার চেষ্টা শুরু হইলে তিনি পারস্যে পলাইয়া যান। ভাই পরমানন্দ ধরা পড়িলেন, তাঁহার নিকট হইতে বোমা প্রস্তুত প্রণালী সম্পর্কে একখানা পুস্তক পাওয়া যায়। কলিকাতার বিপ্লবিগণও এই পুস্তক ব্যবহার করিতেন। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী কার্যকলাপের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন

১৯০৭-০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিপ্লবী কার্যকলাপ স্তিমিত

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী কার্যকলাপের পুনরাবৃত্তি

হরদয়াল সিং। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে বয়কট এবং অসহযোগ আন্দোলনের জন্য জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে তিনি লাহোরে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে হরদয়াল ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে বিপ্লবী কার্যকলাপের নেতৃত্ব পড়িল তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য জে এম. চট্টোপাধ্যায় ও দীননাথের উপর। দিল্লীর আমীরচাঁদও তাঁহাদের সহিত যোগদান করেন। জে. এম. চট্টোপাধ্যায়ও কিছুকালের মধ্যে ইংলন্ডে চলিয়া যান। কিন্তু তাঁহার পূর্বে তিনি বাংলার বিপ্লবীদের অন্যতম প্রধান নেতা রাসবিহারী বসুর সহিত দীননাথের পরিচয় করাইয়া দিয়া গিয়াছিলেন। রাসবিহারী বসু সেই সময়ে দেরাদুনে কর্মরত ছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় বিপ্লবী কার্যকলাপ, বোমা প্রস্তুত প্রভৃতি



আমীরচাঁদ

রাসবিহারী বসু

পূর্ণোদ্যমে চলিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ ছিল রাসবিহারী বসুর পরবর্তী পদক্ষেপ। দেরাদুন হইতে এই ঘটনার পর পলাইয়া গিয়া রাসবিহারী পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু করিলেন। তিনি বাংলাদেশ, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্নাংশের বিপ্লবীদের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে তুরস্ক ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যোগদান করিলে পাঞ্জাবের মুসলমান সম্প্রদায় স্বভাবতই ব্রিটিশ-বিরোধী হইয়া উঠিলেন। মৌলবী ওবেদুল্লার নেতৃত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণের জন্য তিনি সচেষ্ট হন। এদিকে পাঞ্জাব হইতে যে-সকল লোক আমেরিকায় অর্থ উপায়ের উদ্দেশ্যে গিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রতি আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের অমানুষিক অত্যাচার ও অপমানজনক ব্যবহার তাঁহাদিগকে সংগঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। স্বাধীন জাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা না করিতে পারিলে বিদেশীদের নিকট মর্যাদালাভ সম্ভব নহে বিবেচনা করিয়া আমেরিকার প্রবাসী পাঞ্জাবীরা গদর পার্টি (Ghadar Party) নামে একটি রাজনৈতিক সমিতি স্থাপন করেন। স্বদেশী আন্দোলনের সংবাদ তাঁহাদের নিকট পৌঁছিলে তাঁহাদের অন্তরে উৎসাহ-উদ্দীপনা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইবার জন্য তাঁহারা আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হইলে সেই সুযোগে ব্রিটিশ শাসন উচ্ছেদ করিবার জন্য তাঁহারা পাঞ্জাবে সশস্ত্র বিপ্লব সংঘটনের জন্য সচেষ্ট হন। কানাডা, ম্যানিলা, হংকং এবং অন্যান্য অঞ্চলে প্রবাসী ভারতীয়দের নিকট হইতে অর্থসংগ্রহ করিয়া তাঁহারা কয়েক হাজার স্বেচ্ছাসেবক পাঞ্জাবে প্রেরণ করেন। ইঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ব্রিটিশদের উৎখাত করা। গদর পার্টির কর্মসূচী এবং ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা পাঞ্জাবীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সেনাবাহিনীর

আমেরিকায় গদর পার্টির প্রতিষ্ঠা

পাঞ্জাবে গদর পার্টির কর্মসূচী

মধ্যেও বিপ্লব ছড়াইয়া দিবার চেষ্টারও কোন ত্রুটি বিপ্লবীরা করেন নাই। রাজনৈতিক ডাকাতির মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ শুরু হয়। এইভাবে যখন পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানে ব্রিটিশ-বিরোধী বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতেছে সেই সময়ে লাহোরের বিপ্লবীরা ধরা পড়েন। লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলা শুরু হয়। এই মামলার শুনানীর কালে বিপ্লবীরা কিভাবে সেনাবাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, কি কি পরিকল্পনা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সম্পর্কে বহু তথ্য প্রকাশ পায়। তাহা হইতে পাঞ্জাবে এক ব্যাপক বিপ্লবের যে প্রস্তুতি অনেকটা অগ্রসর হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

এদিকে রাসবিহারী বসু সমগ্র উত্তর ভারতে এক সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতি চালাইয়া যাইতেছিলেন। গদর পার্টি (গদর অর্থ হইল বিদ্রোহ) প্রেরিত বিপ্লবী স্বেচ্ছাসেবকদের সাহায্যে লাহোর, আম্বলা, মীরাট, রাওলপিণ্ডি প্রভৃতি স্থানের সামরিক শিবিরের মধ্যেও গোপনে বিপ্লবের প্রভাব ছড়াইয়া দেওয়া হয়। সেই সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। স্থির হইল ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র উত্তর ভারতে এক সশস্ত্র বিদ্রোহ শুরু হইবে। ইহাতে ভারতীয় সৈনিকদের অনেকে যোগদান করিবে। সংযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া, বন্দীদের কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া ফরাসী বিপ্লবের অনুকরণে পাঞ্জাবের শাসনব্যবস্থা হস্তগত করা হইবে। কিন্তু বিপ্লবীদের একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় বিপ্লবের পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকারের নিকট ফাঁস হইয়া গেলে বিপ্লবিগণ ধরা পড়েন। রাসবিহারী বসুকে গ্রেপ্তার করা অবশ্য সম্ভব হয় নাই। তিনি ভারত ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ধৃত বিপ্লবিগণ শাস্তিভোগ করেন।

রাসবিহারী বসু কর্তৃক বিপ্লবের প্রস্তুতি : পরিকল্পনা ফাঁস

এইভাবে বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবের বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রথম পর্যায়ের অবসান ঘটে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটিলে বিপ্লবী কার্যকলাপ সাময়িকভাবে স্তিমিত হইয়া পড়ে। অবশ্য গোপনে বিপ্লবীদের প্রস্তুতি তখনও চলিতে থাকে।

বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রথম পর্যায়ের অবসান

পঞ্চম অধ্যায়

ন‍ূতন নেতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

(New Leader : M. K. Gandhi)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে ব্রিটেনের মিত্র হিসাবে যুদ্ধে জড়াইলেন। ভারতীয় সৈন্য, ভারতীয় অর্থ যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত হইতে লাগিল। ভারতীয়দের বাধ্যতামূলকভাবে যুদ্ধে সৈনিক হিসাবে যোগদান করান হইল। ব্রিটিশ সরকার ভারতের বাহিরে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে ভারতীয় সৈনিকদের যুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবর্ষকে মিত্রপক্ষে যোগদানে বাধ্যকরণ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ভারতের জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হইয়া উঠিল।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের শক্তি সঞ্চয় : হোমরুল লীগ

ছয় বৎসর ব্রহ্মদেশের মান্দালয়ে কারাবাসের পর বালগঙ্গাধর তিলক ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে ফিরিয়া আসিয়া ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হোমরুল লীগ নামে একটি স্বায়ত্তশাসন সঙ্ঘ স্থাপন করিলেন। অ্যানি বেসান্তও একটি পৃথক হোমরুল লীগ স্থাপন করিলেন। এই দুইটি সঙ্ঘেরই উদ্দেশ্য ছিল ভারতের স্বায়ত্তশাসন আদায় করিবার জন্য আন্দোলন করা।

চরমপন্থীদের কংগ্রেসে পুনঃপ্রবেশ

এদিকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে নরমপন্থী (Moderates) ও চরমপন্থীদের (Extremists) মধ্যে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছিল তাহা দূর হইয়া গেল। চরমপন্থীরা কংগ্রেসে পুনরায় প্রবেশ করিলেন। সেই সময় হইতে কংগ্রেসে নরমপন্থীদের স্থলে চরমপন্থীদের প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

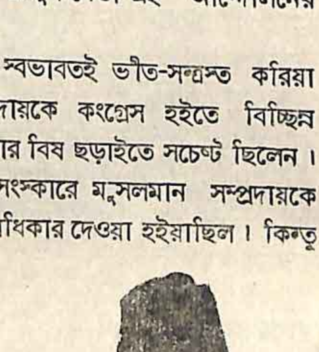
লক্ষ্মৌ চুক্তি (১৯১৬) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের যুগ্ম দাবি

ঐ বৎসরই (১৯১৬) কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্মৌ চুক্তি স্বাক্ষরিত হইলে এই দুই রাজনৈতিক সংস্থা যুগ্মভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট (১) আইনসভার অধিকাংশ সদস্যকে নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রহণ করিতে, (২) আইনসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে, এবং (৩) গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের কার্যনির্বাহক সভার (Executive Committee) অন্তত অর্ধেক সদস্য ভারতীয়দের মধ্য হইতে গ্রহণ করিবার দাবি জানায়। সঙ্গে সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন বা হোমরুল আন্দোলনেরও তীব্রতা বৃদ্ধি পাইতে থাকে। মোতিলাল নেহরু, চিত্তরঞ্জন দাশ প্রমুখ নেতা এই আন্দোলনের সমর্থন করেন।

কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের ঐক্য ব্রিটিশ সরকারকে স্বভাবতই ভীত-সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল। ব্রিটিশ সরকার প্রথম হইতেই মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেস হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে এবং সেজন্য সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে সচেষ্ট ছিলেন।

কংগ্রেস-মুসলিম লীগ ঐক্যে ব্রিটিশ সরকারের ভীতি

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মোরলি-মিণ্টো সংস্কারে মুসলমান সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু মৌলানা আবুল কালাম আজাদ 'অল্-হিলাল' নামক দেশাত্মবোধক সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের পথ প্রস্তুতে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মৌ চুক্তি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্য স্থাপিত হইলে এবং তিলক ও অ্যানি বেসান্তের হোমরুল লীগ কংগ্রেস-মুসলিম লীগের সমর্থনে দাঁড়াইলে ব্রিটিশ সরকার প্রমাদ গণিলেন, ফলে সরকার দমনমূলক অত্যাচার শুরু করিলেন।



মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

দমনমূলক অত্যাচার

সংবাদপত্রে সেই সময়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সমর্থনে লেখা প্রকাশিত হইলে সরকার 'অল্-হিলাল', 'কমরেড্', 'হামদদ'

প্রভৃতি পত্রিকা নিষিদ্ধ করিলেন। মাদ্রাজে হোমরুল আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিলে অ্যানি বেসান্তকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার পত্রিকা 'নিউ ইণ্ডিয়া' বাজেয়াপ্ত করা হইল। ইহাতে দেশের সর্বত্র ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার উচ্চারিত হইল। হোমরুল আন্দোলনের অন্যতম নেতা বালগঙ্গাধর তিলক গ্রেপ্তার এবং বিচারের প্রহসনের পর বিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। তিলককে ব্রিটিশ সরকার এক অনমনীয় শত্রু বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাঁহার উপর দমনমূলক অত্যাচার-অবিচার ভারতীয়দের মধ্যে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা যেমন বৃদ্ধি করিল তেমনি ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ঘৃণা শতগুণে বাড়াইয়া দিল। তাঁহার হোমরুল আন্দোলনও জনপ্রিয় হইয়া উঠিল। পরিস্থিতি ক্রমেই ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে যাইতেছে দেখিয়া ব্রিটিশ সরকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিলেন। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব (Secretary of State for India) মণ্টাগু ঘোষণা করিলেন যে, ব্রিটিশ সরকারের আদর্শ হইল ক্রমপর্যায়ে ভারতবাসীকে ভারতের শাসনব্যবস্থায় স্থান দিয়া ভারতে স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা চালু করা।

ভারত-সচিব মণ্টাগুর ঘোষণা (১৯১৭)

মণ্টাগুর ঘোষণার ফলে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এবং গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধ প্রচেষ্টায় সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ধারণা ছিল যে, ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধাবসানে ভারতবাসীকে রাজনৈতিক দিক্ দিয়া ব্রিটিশদের সমপর্যায়ে স্থাপন করিবেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইলে পর ভারত-সচিব (Secretary of State for India) মণ্টাগু এবং তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ড (১৯১৬-২১) ভারতের শাসনব্যবস্থা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে তদন্ত করিয়া রিপোর্ট দাখিল করিলেন। তাঁহাদের তদন্ত রিপোর্ট মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট (Montague-Chelmsford Report) নামে খ্যাত। উহার ভিত্তিতে মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার আইন (১৯১৯) অনুসারে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা এই সংস্কার আইনে ভাগ করিয়া দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের উপর দেশরক্ষা, রেলপথ, বৈদেশিক সম্পর্ক, পোস্ট ও টেলিগ্রাফ, মুদ্রাব্যবস্থা, শুল্ক, সরকারী ঋণ প্রভৃতি সর্ব-ভারতীয় বিষয়গুলির দায়িত্ব দেওয়া হইল। আর প্রাদেশিক সরকারের উপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, পুলিশ, রাজস্ব, শ্রমিক, শিক্ষা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, কৃষি, হাসপাতাল প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্ব রহিল। প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বকে আবার হস্তান্তরিত (Transferred) এবং সংরক্ষিত (Reserved)—এই দুই ভাগে ভাগ করা হইল। হস্তান্তরিত বিষয়গুলি—যথা, বিচার, শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি বিষয়ের ভার ভারতীয় প্রতিনিধিদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অপরাপর যাবতীয় বিষয়—যথা, আইন-শৃঙ্খলা, পুলিশ, রাজস্ব প্রভৃতি গভর্ণর ও তাঁহার কার্যনির্বাহক পরিষদের (Executive Council) উপর ন্যস্ত করা হইল। ভাইস্‌রয়ের কার্যনির্বাহক পরিষদে এবং প্রাদেশিক গভর্ণরদের কার্যনির্বাহক পরিষদে কয়েকজন ভারতীয়কে গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্রীয় আইনসভাকে দুই কক্ষযুক্ত

মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্ট

মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার (১৯১৯)

এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলিকে এক কক্ষযুক্ত আইনসভায় পরিণত করা হয়। এই সংস্কার আইন অনুসারে প্রাদেশিক সরকারের শাসনকার্যাদিকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছিল বলিয়া এই সংস্কার আইন দ্বারা প্রবর্তিত শাসনব্যবস্থা 'দ্বৈতশাসন' (Diarchy) নামে পরিচিত। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলির স্বাধীন ক্ষমতা ছিল, বলা চলে না। কারণ, কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় এবং প্রাদেশিক আইনসভা কর্তৃক গৃহীত আইন গভর্ণর বাতিল করিয়া দিতে পারিতেন। এই দ্বৈত শাসনের প্রধান ত্রুটি ছিল এই যে, প্রকৃত শাসনকার্যের যাবতীয় ক্ষমতা ব্রিটিশ সরকারের হাতে রহিয়া গিয়াছিল আর যে-সকল বিষয়ের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম ছিল সেগুলি ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছিল।

দ্বৈত শাসনব্যবস্থা

গণতান্ত্রিকতার দিক্ দিয়া ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মণ্টাগু-চেমস্‌ফোর্ড সংস্কার কতক উন্নতিবিধান করিলেও ভারতীয়দের জাতীয়তাবাদী আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ভারতবাসী ব্রিটিশ সরকারকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিল। তাহাদের আশা ছিল যুদ্ধাবসানে শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর প্রতি কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিবেন। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। যুদ্ধের ফলে এক দিকে যেমন খাদ্যাভাব, মূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি দেখা দিলে ভারতবাসীর দুর্দশা বৃদ্ধি পাইল অপর দিকে তেমনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কারের অনুদারতায় তাহাদের মধ্যে দারুণ হতাশা ও ক্ষোভ দেখা দিল। ভারতবাসীদের মধ্যে সংস্কার দাবি আরও জোরাল হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে পরিস্থিতি যখন জটিল হইয়া উঠিয়াছে তখন ব্রিটিশ সরকার কোন প্রকার শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তন করা দূরের কথা, কঠোর দমননীতির আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দেই রাওল্যাট এ্যাক্ট পাশ করিয়া বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে সরকার যে বিশেষ ক্ষমতাবলে যে-কোন ব্যক্তিকে দমনমূলক শাস্তি দিতে পারিতেন সেই ক্ষমতা বজায় রাখিতে চাহিলেন। বিনাবিচারে যে-কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা, সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা, যথেচ্ছভাবে দণ্ডদান করা বা ভারতীয়দিগকে দেশ হইতে নির্বাসিত করা প্রভৃতি ক্ষমতা সরকার আইনত গ্রহণ করিলেন। এই আইনের প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র আন্দোলন শুরু হইল।

ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা অবহেলিত

সংস্কার দাবির অধিকতর শক্তি সঞ্চয়

ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি : রাওল্যাট এ্যাক্ট

মহাত্মা গান্ধী গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে রাওল্যাট আইনে সম্মতি না দিতে অনুরোধ জানাইলেন। কিন্তু তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া চেমস্‌ফোর্ড এই আইনে নিজ স্বাক্ষর দিয়া উহা বলবৎ করিলেন। ইহাতে মহাত্মা গান্ধী মর্মাহত হইলেন এবং এই আইন অমান্য করিবার জন্য দেশবাসীকে সত্যাগ্রহ করিতে আহ্বান জানাইলেন। শান্ত ও নিরস্ত্রভাবে এবং সত্যের ভিত্তিতে অন্যায়ের প্রতিরোধকে মহাত্মা গান্ধী নাম দিলেন 'সত্যাগ্রহ'। শক্তিশালী, অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ব্রিটিশ সরকারের সহিত যুঝিবার জন্য নিরস্ত্র ভারতবাসীকে মহাত্মা গান্ধী এক নূতন পথ

মহাত্মা গান্ধীর প্রতিবাদ

সত্যাগ্রহের আহ্বান

এবং নূতন শক্তির সন্ধান দিলেন। তাঁহার আহ্বানে অগণিত ভারতবাসী সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করিল। দেশের নানা স্থানে বিক্ষোভ প্রদর্শন, প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমন করিতে বলপ্রয়োগ করিলে বহু লোক হতাহত হইল। অমৃতসরের জালিনওয়ালা বাগে এক প্রতিবাদ সভায় জেনারেল ডায়ার সাহেবের আদেশে দশ মিনিট ধরিয়া ১৬০০ গুলিবর্ষণ করা হইলে প্রায় এক হাজার (সরকারী হিসাবে ৩৭৯) নিরস্ত্র নর-নারী প্রাণ হারাইলেন, আহত হইলেন অসংখ্য জন। ব্রিটিশ দমননীতি বর্বরতার নিম্নতম পর্যায়ে পৌঁছিল। জালিনওয়ালা বাগের বর্বর হত্যাকাণ্ডের অবশ্যম্ভাবী ফল হিসাবে ভারতের সর্বত্র ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ঘৃণা এবং প্রতিশোধের মনোভাব জাগ্রত হইল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বর্বরতার প্রতিবাদস্বরূপ ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' (Knight) অর্থাৎ 'স্যার্' (Sir) উপাধি ঘৃণাভরে ত্যাগ করিলেন। ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করিল।

জালিনওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড



জেনারেল ডায়ার

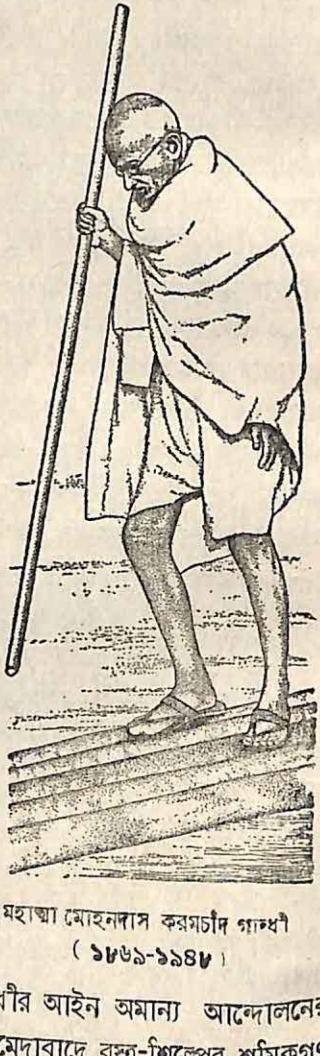
মহাত্মা গান্ধী: প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভারতের জাতীয় আন্দোলন মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর নেতৃত্বে এক নূতন পথে চালিত হইল। এই সময় হইতে স্বাধীনতা লাভের পূর্বাবধি ভারতের জাতীয় আন্দোলন তাঁহার নেতৃত্বেই পরিচালিত হইয়াছিল। তাঁহার যোগীসুলভ জীবনযাত্রা, আপামর জনসাধারণের প্রতি তাঁহার সমান সহানুভূতি ভারতবাসীর অন্তরে তাঁহাকে এক শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। ভারতবাসীর নিকট তিনি 'মহাত্মা গান্ধী' নামে পরিচিত হন।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী—মহাত্মা গান্ধীতে পরিণত

ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষা পাশ করিবার পর গান্ধীজী ভারতে আসিয়া আইন ব্যবসায় শুরু করেন। কিন্তু পর বৎসরই (১৮৯২) দক্ষিণ আফ্রিকায় আইন ব্যবসায়ের জন্য চলিয়া যান। সেই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় বহুসংখ্যক ভারতীয় বসবাস করিত। তাহাদের অনেকের বড় বড় বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায়দের উপর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার ও নির্যাতন-মূলক ব্যবহার মহাত্মা গান্ধীকে তাঁহার জীবনাদর্শ ও কর্মসূচী নূতনভাবে গঠন করিতে বাধ্য করে। ভারতীয়দের প্রতি শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতন এবং শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায় ব্যক্তিদের মধ্যে কৃত্রিম পার্থক্য তাঁহার মানবতাবোধকে আহত করে। তিনি নিজেও শ্বেতাঙ্গদের হস্তে একাধিকবার নির্যাতন ভোগ করেন। এই কৃত্রিম পার্থক্যের উপর নির্ভর করিয়া সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কৃষ্ণকায়দের পশুর স্তরে রাখিয়া

আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ সত্যাগ্রহ

তাহাদের উপর শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতন মহাত্মা গান্ধীকে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নামিতে বাধ্য করে। তিনি সত্যাগ্রহ অর্থাৎ হিংসার আশ্রয় না লইয়া বিরোধী পক্ষের সহিত অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর নূতন ধরনের আন্দোলন সর্বত্র এক আলোড়নের সৃষ্টি করিল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আর্ত ও পীড়িতের সেবার কাজও চালাইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর শ্বেতাঙ্গদের অত্যাচার-বিরোধী আন্দোলন তাঁহাকে ভারতীয়দের অন্তরে এক শ্রদ্ধার আসন দান করে।



মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী
(১৮৬৯-১৯৪৮)

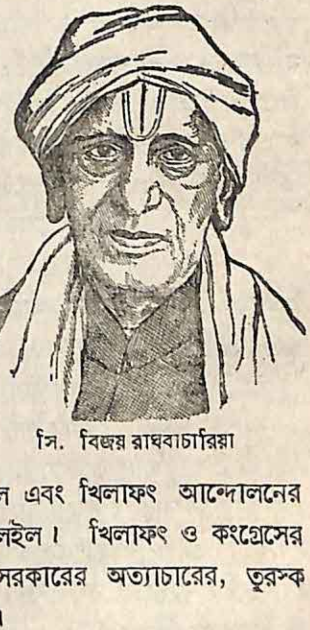
১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী দেশে ফিরিয়া আসিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করিবার জন্য ভারতবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন সত্য কিন্তু সেই সময়েও তিনি ব্রিটিশদের অন্যায়-অবিচার বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতে ত্রুটি করেন নাই। কৃত্রিম নীল প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কৃত হইবার পর হইতে ভারতবর্ষে নীল চাষ একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বিহারের কোন কোন অঞ্চলে তখনও নীল চাষ অল্প-বিস্তর চলিতেছিল। নীল চাষের আনুষঙ্গিক নীলকর সাহেবদের অত্যাচারও তেমনি চালু ছিল। চম্পারণ নামক স্থানে নীলকর সাহেবদের অমানুষিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত হইয়াছিল (১৯১৭-১৮)। সরকার মহাত্মা গান্ধীকে চম্পারণ হইতে বহিষ্কারের আদেশ দিলে তিনি এই আদেশ অমান্য করিলেন। এজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু আদালতে হাজির করিবার পর তাঁহাকে কোন প্রকার শাস্তি না দিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এইভাবে মহাত্মা গান্ধীর আইন অমান্য আন্দোলনের দৃষ্টান্ত ভারতবাসীকে উৎসাহিত করিয়া তোলে। আমেদাবাদে বস্ত্র-শিল্পের শ্রমিকগণ তাহাদের বেতন বৃদ্ধি দাবি করিয়া মালিকদের নিকট হইতে কোন প্রকার সহানুভূতি না পাইলে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে তাহারা ধর্মঘট শুরু করে। তাহাতেও কোন কাজ না হইলে মহাত্মা গান্ধী নিজে শ্রমিকদের দাবির সমর্থনে অনশন শুরু করিলেন এবং

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক কৃষক-শ্রমিক সকলকে জাতীয় আন্দোলনের সামিল হইবার পথ প্রস্তুত

শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের দাবি আদায় করিতে সমর্থ হইলেন। কৃষকদের উপর জমিদারদের অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধেও গান্ধীজী কৃষকদের পক্ষ সমর্থন করেন। এইভাবে মহাত্মা গান্ধী শ্রমিক, কৃষক সকলের জাতীয় আন্দোলনের সামিল হইবার পথ প্রস্তুত করেন।

জালিনওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ড মহাত্মা গান্ধী ঘোষিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের শক্তি আরও বাড়াইয়া দিল। দেশের সর্বত্র ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এক দারুণ ঘৃণা ও উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। সেই সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের প্রতি ব্রিটেন ও উহার মিত্রদেশগুলির ব্যবহার পৃথিবীর মুসলমান মাত্রেরই বিরক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল। ইসলাম ধর্মের অধিকর্তা তুরস্কের খলিফার সাম্রাজ্য ব্যবচ্ছেদে ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি নামে আলি ভ্রাতৃদ্বয় ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করেন। এই প্রতিবাদ আন্দোলন খিলাফৎ আন্দোলন নামে পরিচিত। ভারতের মুসলমান সম্প্রদায়কে জাতীয় আন্দোলনের সামিল করিবার ইহা এক সুবর্ণ সুযোগ বিবেচনা করিয়া মহাত্মা গান্ধী খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে যুক্ত করিতে চাহিলেন। সি. বিজয় রাঘবাচারিয়ার সভাপতিত্বে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের (Non-violent Non-co-operation Movement) নূতন কর্মসূচী গ্রহণ করিল এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত এই আন্দোলনকে যুক্ত করিবার নীতি মানিয়া লইল। খিলাফৎ ও কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের আদর্শ ছিল পাঞ্জাবে ব্রিটিশ সরকারের অত্যাচারের, তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি অবিচারের প্রতিকার এবং স্বরাজ স্থাপন।

খিলাফৎ আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০)



সি. বিজয় রাঘবাচারিয়া

গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের ধারণা: সত্যাগ্রহ অর্থাৎ অহিংস উপায়ে অসহযোগ ও আইন অমান্য মহাত্মা গান্ধীর পূর্বেও ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক সত্যাগ্রহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং এ-বিষয়ে তাঁহার ধারণা ইহাকে এক নূতন চরিত্রদান করিয়াছিল। শান্ত ও নিরস্ত্রভাবে এবং সত্যের উপর ভিত্তি করিয়া অন্যায়ের প্রতিবাদকে গান্ধীজী নাম দিয়াছিলেন সত্যাগ্রহ। সত্যাগ্রহের প্রয়োগ পদ্ধতি ছিল দুই প্রকার—যথা, অহিংস অসহযোগ এবং আইন অমান্য। অর্থাৎ, প্রতিপক্ষ বা অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে কোন প্রকার হিংসার আশ্রয় না লইয়া তাহার সহিত সর্বপ্রকার সহযোগিতা হইতে বিরত থাকা; প্রতিপক্ষ সরকার হইলে আইন অমান্য করা। আদর্শের প্রতি অচলা ভক্তি, সংকল্পের দৃঢ়তা, মানসিক বল এবং নৈতিক শক্তি হইল সত্যাগ্রহীর

সত্যাগ্রহ—অহিংস-অসহযোগ, আইন অমান্য

বৈশিষ্ট্য। সত্যাগ্রহী কোন প্রকার নির্যাতনকে ভয় করে না, যে-কোন ত্যাগ স্বীকারে, এমন কি জীবন বিসর্জন দিতেও সত্যাগ্রহী সর্বদা প্রস্তুত। সত্যাগ্রহীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য হইল প্রতিপক্ষের অন্তরে নীতিবোধকে জাগাইয়া তুলিয়া তাহার মন জয় করা এবং তাহার কার্যপন্থার পরিবর্তন সাধন করা। স্বভাবতই দুর্বলচেতা লোকের পক্ষে সত্যাগ্রহ অবলম্বন সহজ ছিল না। মূলত সত্যাগ্রহ নৈতিক ও মানসিক বলে বলীয়ানের পদ্ধতি। মহাত্মা গান্ধী সর্বশক্তিমান ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে নিরস্ত্র ভারতবাসীর হস্তে সত্যাগ্রহ নামক এক অমোঘ অস্ত্র দিয়াছিলেন। অহিংস-অসহযোগ ও আইন অমান্যের মাধ্যমে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে পরিচালিত করিয়াছিলেন।

সত্যাগ্রহীর বৈশিষ্ট্য

খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে সংযুক্ত করিয়া গান্ধীজী হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ চেষ্টায় ভারতে অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দিতে চাহিলেন। তাঁহার এই পরিকল্পনা ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। ঐ বৎসরই (১৯২০) নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব পুনরায় অনুমোদিত হইলে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলন এক নূতন পথে চলিল। খিলাফৎ ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং। সৌকৎ আলি ও মহম্মদ আলি নামে দুই ভ্রাতা মহাত্মা গান্ধীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন। মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সমগ্র দেশে এক অভূতপূর্ব সাড়া পড়িল। অহিংসভাবে সত্য ও ন্যায়ের উপর ভিত্তি করিয়া আন্দোলন চালান ছিল মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য ও আদর্শ। এজন্য তিনি ভারতবাসীকে চাকরি ছাড়িয়া দিতে, স্কুল, কলেজ, আইনসভা, বিচারালয় সবকিছু ত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দিবার আহ্বান জানাইলেন। বহু উকিল-মোক্তার, ব্যারিস্টার, ছাত্র, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সরকারী কর্মচারী, শিল্প-শ্রমিক এই আহ্বানে সাড়া দিয়া অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, কারখানা ছাড়িয়া দিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করিলেন। আইনসভাও বর্জন করা হইল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সরকারী খেতাব বর্জন এবং সরকারী চাকরি বর্জনের ক্ষেত্রে খুব বেশী সাড়া পাওয়া যায় নাই। তথাপি সরকারী চাকরি বর্জনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই অসহযোগ আন্দোলনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। সুভাষচন্দ্র বসু ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি. এস. পরীক্ষায় কৃতকার্য হইয়াও ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে চাকরি ত্যাগ করিয়া, অনুরূপ ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ সরকারী টাঁকশালের এক অত্যুচ্চ পদ ত্যাগ করিয়া আন্দোলনে যোগ দিয়াছিলেন।

কংগ্রেস-খিলাফৎ যুগ্ম আন্দোলন

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব : অভূতপূর্ব সাড়া

সুভাষচন্দ্র বসু ও ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের সরকারী পদ ত্যাগ

দেশের সর্বত্র বিলাতী দ্রব্য বর্জনের এবং সরকারের সহিত অসহযোগিতার আন্দোলন পূর্ণোদ্যমে চলিল। বিলাতী কাপড় ও বিলাতী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া বহ্নি-উৎসব

করা হইতে লাগিল। সমগ্র ভারতবর্ষে যখন এই আন্দোলনের ফলে এক ব্যাপক উত্তেজনার স্‌ষ্টি হইয়াছে সেই সময় (১৯২১) ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন প্রশমিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী প্রিন্স অব্‌ ওয়েলস্‌কে ভারতবর্ষে পাঠাইলেন। রাজপ্‌ত্রের আগমন উপলক্ষে ভারতীয়দের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনার স্‌ষ্টি হইবে, রাজপ্‌ত্র তথা ব্রিটিশরাজের প্রতি তাহাদের আন্‌গত্য ফিরিয়া আসিবে এই ছিল ব্রিটিশ সরকারের ধারণা। কিন্তু ফল হইল বিপরীত। তাঁহার আগমনের দিনে ভারতবর্ষে হরতাল পালিত হইল। রাজপ্‌ত্র জনশ্‌ন্য রাস্তাঘাট দেখিতে পাইলেন। ইহা অসহযোগ আন্দোলনের এক উল্লেখযোগ্য সাফল্য বলিয়া বিবেচিত হইল। বোম্বাই শহরে অবশ্য হরতাল-বিরোধী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান এবং পার্সী সম্প্রদায়ের লোকদের সহিত হরতালের সমর্থকদের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। ইওরোপীয়দের এবং এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও পার্সীদের যথেচ্ছ আক্রমণে বহ্‌ হিন্দ্‌ ও ম্‌সলমান পথচারী আহত হইলে সংঘর্ষ খণ্ডয্‌দ্ধে পরিণত হইতে চলিল। ব্রিটিশ সরকারকে প্‌লিশ ও সৈনিকদের সাহায্যে ইহা দমন করিতে হইয়াছিল। ফলে প্‌লিশ ও সৈনিকদের গ্‌লিতে ৫৩ জন ম্‌ত্যু-ম্‌খে পতিত হয় এবং চারিশত লোক আহত হয়। বোম্বাই ভিন্ন অপরাপর সকল অঞ্চলেই হরতাল শান্তিপ্‌র্ণভাবেই পালিত হইয়াছিল। ইংরেজী পত্রিকা-গ্‌লি স্বভাবতই অসহযোগ আন্দোলনের বির্‌দ্ধে বিষোদ্গার করিতে লাগিল। ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস ও খিলাফতের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগ্‌লি বেআইনী ঘোষণা করিলেন। এক সপ্তাহ পর সভাসমিতি সবকিছ্‌ নিষিদ্ধ করা হইল। বস্তুত, প্রিন্স অব্‌ ওয়েলসের আগমন উপলক্ষে যে হরতাল পালিত হইয়াছিল ইহার পর হইতে অসহযোগ আন্দোলন বলপ্রয়োগে দমন করিতে ব্রিটিশ সরকার দ্‌ঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। বাংলা, পাঞ্জাব, বিহার, আসাম প্রভৃতি যে-সকল অঞ্চলে অসহযোগ আন্দোলন অধিকতর তীব্র আকার ধারণ করিয়াছিল, সেই সকল অঞ্চলে সংবাদ-পত্র, আন্দোলনের নেতৃব্‌ন্দ প্রভৃতির উপর সরকারী দমননীতির কঠোর প্রয়োগ করা হইতে লাগিল। কলিকাতায় চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে আইন অমান্য আন্দোলন শ্‌র্‌ হইল। স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী বেআইনী ঘোষিত হইয়াছিল; কিন্তু চিত্তরঞ্জন পাঁচজন করিয়া স্বেচ্ছাসেবকের ছোট ছোট দলকে খদ্দর বিক্রয়ের জন্য বাহির করিতে লাগিলেন। জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ স্‌ষ্টির

প্রিন্স অব্‌ ওয়েলসের ভারত সফর : সর্ব-ভারতে হরতাল

প্‌লিশ ও মিলিটারির গ্‌লিতে ৫৩ জনের ম্‌ত্যু

ব্রিটিশ সরকারের দমনম্‌লক ব্যবস্থা গ্রহণ



চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫)

জন্য প্রথমে তিনি নিজ স্ত্রী বাসন্তী দেবী ও পুত্র চিররঞ্জনকে আইন অমান্য করিতে প্রেরণ করিলেন। চিররঞ্জন গ্রেপ্তার হইলে স্বেচ্ছাসেবক সংখ্যা অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরদিন বাসন্তী দেবীর গ্রেপ্তার সমগ্র বাংলাদেশে এমন উত্তেজনার সৃষ্টি করিল যে, মধ্যরাত্রেই সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু ইহাতে আন্দোলন স্তিমিত হইল না। হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবক আইন অমান্য করিয়া গ্রেপ্তার বরণ করিতে লাগিল। কয়েক দিনের মধ্যে কলিকাতার সেণ্ট্রাল জেল ও প্রেসিডেন্সী জেল স্বেচ্ছাসেবকে ভরিয়া গেল। জেলখানার সম্প্রসারণের জন্য সাময়িকভাবে শিবির স্থাপন করা হইল।

চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে কলিকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন

অসংখ্য স্বেচ্ছাসেবকের কারাবরণ

সেগুলিও অল্প দিনের মধ্যে ভরিয়া গেল। সরকার প্রমাদ গণিলেন। স্বেচ্ছাসেবকদের অনেককে তাঁহারা মুক্তি দিলেন, কিন্তু স্বেচ্ছাসেবকগণ জেলখানা ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হইলে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি উপস্থিত হইল। সরকার তখন স্বেচ্ছাসেবকদের আর গ্রেপ্তার না করিয়া লাঠি, ব্যাটন প্রভৃতি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিতে লাগিলেন। বাংলার গভর্ণর চিত্তরঞ্জনের সহিত আপোস করিতে চাহিলেন। কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃক ঘোষিত আন্দোলন তিনি আপোসের মাধ্যমে বন্ধ করিতে পারিবেন না জানাইলেন। ইহার পর আন্দোলনকে আরও জোরদার করিবার উদ্দেশ্যে চিত্তরঞ্জন নিজে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে আইন অমান্য করিতে বাহির হইলেন। তাঁহাকে এবং সেই সময়ে কলিকাতায় কংগ্রেস ও খিলাফৎ-এর যে-সকল নেতা উপস্থিত ছিলেন সকলকেই গ্রেপ্তার করা হইল। ক্রমে এই দমনমূলক ব্যবস্থা ভারতের অপরাপর প্রদেশেও সমানভাবে অনুসরণ করা হইল। মোতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ বহু কংগ্রেসী নেতাকে কারারুদ্ধ করা হইল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারের দমননীতি যতই কঠোর হইতে লাগিল আন্দোলন ততই শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল। দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, গণ্যমান্য ব্যক্তি, আইনসভার সদস্য সকলেই সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ করিলেন।

সরকার কর্তৃক আপোসের চেষ্টা ব্যর্থ

মোতিলাল নেহরু, লালা লাজপৎ রায় প্রমুখ নেতা কারারুদ্ধ

এদিকে প্রায় চল্লিশ হাজার সত্যাগ্রহীকে সরকার জেলে বন্দী করিয়াছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন তাহাতে ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিবার সুযোগ পাইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে গুজরাটের বারদোলি জেলায় সরকারের রাজস্ব না দিয়া আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিতে মনস্থ করিলেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলাদেশে আইন অমান্য আন্দোলন ইতিপূর্বেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। এইভাবে অসহযোগ আন্দোলন যখন আইন অমান্য আন্দোলনে রূপান্তরিত হইতে চলিয়াছে এবং অসহযোগ আন্দোলন সর্বাধিক শক্তি সঞ্চয় করিয়া এক চরম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে এবং পুলিশের লাঠি, বন্দুকের গুলি, সর্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিয়া ভারতবাসী যখন ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে মাতিয়া

বারদোলি আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তুতি

উঠিয়াছে এমন সময় গোরক্ষপুর জেলার চৌরিচৌরা নামক স্থানে আন্দোলন হিংসাত্মক হইয়া উঠিল। সেইখানে আন্দোলনকারিগণ পুলিশ থানায় অগ্নিসংযোগ করিলে ২২ জন পুলিশ প্রাণ হারাইল। মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন হিংসার পথ ধরিয়াছে দেখিয়া উহা থামাইয়া দিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় এইভাবে শেষ হইল (১৯২২)।

চৌরিচৌরা ঘটনা : মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আন্দোলন প্রত্যাহৃত

মহাত্মা গান্ধীর এইরূপ আকস্মিকভাবে আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশ সমগ্র ভারতে এক হতাশার সঞ্চার করিল। সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহ্‌রু প্রমুখ নেতা মহাত্মা গান্ধীর এই আদেশে অত্যন্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। মহাত্মা গান্ধীর কঠোর সমালোচনাও অনেকে করিতে ছাড়িলেন না। দেশের জনগণ যখন এক গভীর উৎসাহ-উদ্দীপনা লইয়া আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে ও আন্দোলন যখন চরম পর্যায়ে উপস্থিত হইয়াছে এবং ব্রিটিশ সরকার যখন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতেছেন সেই সময়ে আন্দোলন স্থগিত করিবার অর্থ ছিল জাতীয় আন্দোলনকে অনেকখানি পিছাইয়া দেওয়া, জাতির উৎসাহ-উদ্দীপনাকে বিনাশ করা। কিন্তু গান্ধীজীর যুক্তি ছিল নৈতিকতা এবং আন্দোলনের ভবিষ্যতের দিক্ দিয়া। তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, নীতি এবং আদর্শ ভ্রষ্ট হইলে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে সাফল্যের পথে লইয়া যাওয়া সম্ভব হইবে না। ইহা হইতেও অধিকতর দৃঢ় যুক্তি ছিল এই যে, নিরস্ত্র ভারতবাসী আন্দোলনের ক্ষেত্রে যদি হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করে তাহা হইলে অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা অসম্ভব হইবে। একবার যদি আন্দোলন অহিংসার পথ ত্যাগ করে তাহা হইলে সেই আন্দোলন আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। যাহা হউক, মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলন বন্ধ করায় কংগ্রেসীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিলে সেই সুযোগ ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করিলেন। মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হইল এবং তাঁহাকে ছয় বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল।

আন্দোলন প্রত্যাহৃত হওয়ায় অসন্তোষ

মহাত্মা গান্ধীর সপক্ষে যুক্তি

অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম পর্যায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল একথা আপাত-দৃষ্টিতে মনে হওয়া স্বাভাবিক। অন্তত স্বরাজের আদর্শ পূরণে এই আন্দোলন সমর্থ হয় নাই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আন্দোলনের সাফল্য (১) ভারতবাসীর মধ্যে রাজ-নৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতায়, (২) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার প্রতি ভারতবাসীর অনাস্থার মনোভাবে, (৩) ভারতীয়গণকে রাজনৈতিক এবং অপরাপর যাবতীয় অভাব-অভিযোগ দূর করিতে নিজেদের শক্তির উপর দাঁড়াইতে হইবে একথা উপলব্ধিতে, (৪) কংগ্রেসই একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাহার মাধ্যমে স্বরাজ অর্জন করা সম্ভব এই বিশ্বাসে, এবং (৫) ব্রিটিশ অত্যাচার যতই কঠোর হউক না কেন জনসাধারণ তাহাতে ভীত বা দমিত হইবে না এই দৃঢ় মনোবৃত্তি সৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এজন্য

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা ও সাফল্যের বিচার

এই আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছিল বলা ভুল হইবে। এই আন্দোলন ছিল সর্বপ্রথম জনসাধারণের আন্দোলন। এদিকে কামাল আতাতুর্ক 'ইয়ং টার্ক' (Young Turk) বা 'তরুণ তুর্কী' দল গঠন করিয়া তুরস্কের সুলতানকে ক্ষমতাচ্যুত করিলেন। ফলে খিলাফৎ আন্দোলনের আর কোন অর্থ রহিল না। খিলাফৎ আন্দোলনেরও অবসান ঘটিল।



কামাল আতাতুর্ক

কংগ্রেস বিভক্ত : স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভব : চিত্তরঞ্জন দাশ যখন জেলে ছিলেন সেই সময় হইতেই তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইন অনুসারে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের এবং আইনসভায় নির্বাচিত হইয়া ভিতর হইতে সরকারের বিরোধিতা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন। মহাত্মা গান্ধী কাউন্সিল অর্থাৎ আইনসভায় প্রবেশের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার যুক্তি ছিল এই যে, কংগ্রেস আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাইবার কোন আশা নাই এবং যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে আইনসভার অভ্যন্তরে থাকিয়া শাসনকার্যে অচলাবস্থা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে না। ইহা ভিন্ন সরকার ভিটো (Veto) প্রয়োগ করিয়া আইনসভার বিরোধিতার যাহা কিছু অসুবিধা দূর করিতে পারিবেন। আর আইনসভা বর্জন নীতি ত্যাগ করিয়া আইনসভায় প্রবেশ করিলে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হইয়াছে একথাও স্বীকার করিয়া লওয়া হইবে। তদুপরি গণ্যমান্য নেতাদের অনেকেই কারাদণ্ড ভোগ করিবার ফলে তাঁহারা আইনসভায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে পারিবেন না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন এই সকল যুক্তির পাল্টা যুক্তি প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করিলেন না। কাউন্সিল বা আইনসভা বর্জন যদিও কংগ্রেসী নীতি বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল তথাপি কংগ্রেসের নরমপন্থীরা কাউন্সিল বর্জন করেন নাই। সুতরাং বর্জনের মাধ্যমে আইনসভা অচল করিবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল। আর বয়কট আন্দোলনে তখন আর তেমন উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল না। সেজন্য নির্বাচনে অধিকসংখ্যক ভারতীয় ভোট দিতে প্রস্তুত থাকিবে। ফলে অপরাপর দলের পক্ষে কংগ্রেসের বর্জন নীতি সুবিধাজনক হইয়া উঠিবে। বরঞ্চ আইনসভার সদস্য হিসাবে সরকারের সমালোচনা করিয়া, সরকারের কাজে বাধার সৃষ্টি করিয়া সরকারের দমননীতি বন্ধ করিতে, যাহাদিগকে জেলে আটক রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে মুক্তি দিতে চাপ সৃষ্টি করা সহজতর হইবে।

কংগ্রেসের অভ্যন্তরে কাউন্সিলে অর্থাৎ আইনসভায় প্রবেশ লইয়া বিরোধ

উভয় পক্ষের যুক্তি

কিন্তু মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার অন্ধ অনুসরণকারী নেতৃবৃন্দ—চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী প্রভৃতি আইনসভায় প্রবেশের যুক্তি মানিলেন না। গান্ধীজী তখনও

কারাগারে রহিয়াছেন। যাহা হউক, চিত্তরঞ্জন দাশ, মোতিলাল নেহ্‌রু, সত্যমূর্তী, হাকিম আজমল খান, বিঠলভাই প্যাটেল, এন. সি. কেলকার, জয়াকার প্রভৃতি যাঁহারা আইনসভায় প্রবেশের পক্ষে ছিলেন তাঁহারা 'স্বরাজ্য পার্টি' নাম দিয়া কংগ্রেসের মধ্যেই একটি পৃথক দল গঠন করিলেন। এই দলের নেতৃত্ব চিত্তরঞ্জন দাশ গ্রহণ করিলেন। বোম্বাইয়ে বিঠলভাই প্যাটেল, উত্তর ভারতে মোতিলাল নেহ্‌রু, বাংলাদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও দক্ষিণ ভারতে চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য পার্টিকে এক শক্তিশালী দলে পরিণত করিলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আইনসভায় যোগদানের বিরোধী দল এবং স্বরাজ্য পার্টির মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। ঐ বৎসরই (১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯২৩) দিল্লীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি হিসাবে আবুল কালাম আজাদ কাউন্সিলে প্রবেশের পক্ষে যুক্তি দেখাইলেন। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে কোন প্রকার প্রচার না করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ফলে কাউন্সিলে প্রবেশের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের যে নিষেধাজ্ঞা ছিল তাহা বাতিল হইয়া গেল। ইহা চিত্তরঞ্জন দাশ এবং মোতিলাল নেহ্‌রুর শক্তিশালী নেতৃত্বেরই সাফল্য বলিয়া বিবেচিত হইল।

কংগ্রেসে বিভেদ : স্বরাজ্য পার্টি গঠন



চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী

কাউন্সিল প্রবেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা বাতিল : চিত্তরঞ্জন ও মোতিলালের নেতৃত্বের সাফল্য



বিঠলভাই প্যাটেল

হোমরুল লীগ ও হোমরুল আন্দোলন : এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আদর্শগত পার্থক্যের ভিত্তিতে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে মতানৈক্য এবং বিভেদ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হোমরুল লীগের সৃষ্টি করিয়াছিল। অ্যানি বেসান্ত কংগ্রেস কর্তৃক আয়র্লাণ্ডের হোমরুল আন্দোলনের অনুকরণে স্বরাজ বা হোমরুল (Home Rule) দাবি আদায়ের জন্য হোমরুল লীগ স্থাপনের প্রস্তাব কংগ্রেসে উত্থাপন (১৯১৫) করিয়া ব্যর্থকাম হন। এদিকে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের বিরোধ তখনও মিটে নাই। সুতরাং তিলক কংগ্রেসের বাহিরে থাকিয়াই ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে হোমরুল লীগ স্থাপন করেন। পাঁচ মাস পর অ্যানি বেসান্ত পৃথক একটি হোমরুল লীগ প্রতিষ্ঠা করিলে এই দুই লীগ বা সঙ্ঘ পরস্পর যোগাযোগ রাখিয়া হোমরুল আন্দোলন চালাইতে

থাকে। ঐ বৎসরই (১৯১৬) নরমপন্থী-চরমপন্থীদের বিরোধের অবসান ঘটিলে তিলক এবং অপরাপর চরমপন্থী নেতা কংগ্রেসে ফিরিয়া আসেন। কিন্তু হোমরুল আন্দোলন তিলক ও অ্যানি বেসান্ত—দুই কংগ্রেসীর নেতৃত্বেই চলিতে থাকে। লক্ষ্ণৌ চুক্তির পর যখন কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যুগ্মভাবে আন্দোলনে অবতীর্ণ হয় সেই সময়ে বোম্বাইয়ে তিলক এবং মাদ্রাজে অ্যানি বেসান্ত হোমরুল আন্দোলনকে অত্যন্ত শক্তিশালী করিয়া তোলেন। স্বরাজ প্রত্যেক জাতির এবং প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মগত অধিকার এই ধারণা তিলকের বিখ্যাত উক্তির—'স্বরাজ আমার জন্মগত অধিকার'—মাধ্যমে সমগ্র ভারতে প্রসারলাভ করিয়াছিল।

স্বরাজ বা হোমরুল আন্দোলনের তীব্রতা

আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টির কার্যকলাপ: ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইলে বাংলাদেশে স্বরাজ্য পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, মধ্যপ্রদেশে স্বরাজ্য পার্টি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ (অধুনা উত্তরপ্রদেশ), আসাম প্রভৃতি প্রাদেশিক আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টি নিরঙ্কুশ বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাইলেও যথেষ্ট সংখ্যায় আসন দখল করিতে সমর্থ হয়। অপরাপর প্রদেশে অবশ্য স্বরাজ্য পার্টির অতি অল্পসংখ্যক সদস্য নির্বাচিত হইতে সমর্থ হন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় নির্বাচিত ১০৫টি আসনের মধ্যে ৪৮টি স্বরাজ্য পার্টি লাভ করিতে সমর্থ হয়। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র নেতৃত্বে ২৪ জন নির্বাচিত হন। ইঁহারা 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' নাম গ্রহণ করিয়া একটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে স্বরাজ্য পার্টির সহিত যুগ্মভাবে ব্রিটিশ সরকারের নিকট হইতে জাতীয় দাবি আদায় করিবার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ্য পার্টির নেতৃত্ব করেন মোতিলাল নেহরু।

স্বরাজ্য পার্টি ও জিন্নাহ্‌র ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের যুগ্ম কার্যসূচী

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বা স্বতন্ত্র দলের সহায়তায় সরকারী বহু প্রস্তাব, এমন কি সরকারী বাজেট স্বরাজ্য পার্টি বাতিল করিতে সমর্থ হয়। মধ্যপ্রদেশেও অনুরূপ পরিস্থিতি উপস্থিত হয়। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন দাশের নেতৃত্বে স্বরাজ্য পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে বহু প্রস্তাব পাশ করিতে এবং সরকারী প্রস্তাব বাতিল করিতে সমর্থ হয়।


মহম্মদ আলি জিন্নাহ্

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ও তাঁহার স্বতন্ত্র দল স্বরাজ্য পার্টির সহিত পূর্বেকার যুগ্ম কার্যসূচীর পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত কোন্ বিষয়ে স্বরাজ্য পার্টিকে সমর্থন করিবে, কোন্ বিষয়ে করিবে না তাহা স্থির করিবে, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে স্বরাজ্য পার্টি ও স্বতন্ত্র দলের ঐক্য বিনষ্ট হয়। ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে আইনসভা

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট দলের মত পরিবর্তন

বর্জনের প্রস্তাব গৃহীত হইলে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় আইনসভা হইতে স্বরাজ্য পার্টির সদস্যগণ বাহির হইয়া আসেন। এদিকে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যুতে এবং সরকার কর্তৃক কোন প্রকার সংস্কার চালু করিতে রাজী না হওয়ায় কংগ্রেস এবং স্বরাজ্য পার্টির মধ্যে ব্যবধান দূর হইয়া গেল। অনেকেই মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগের নীতিতে ফিরিয়া গেলেন। স্বরাজ্য পার্টির একাংশ, স্বতন্ত্র দল প্রভৃতি অবশ্য আইনসভায় সরকারের সহিত প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তার নীতি গ্রহণ করিয়া আইনসভার সদস্য রহিয়া গেলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু : সরকারের উদাসীনতা : অসহযোগের পথে কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তন

এইভাবে স্বরাজ্য পার্টি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। স্বরাজ্য পার্টি ব্রিটিশ সরকার হইতে উল্লেখযোগ্য কোন সংস্কার আদায় করিতে সমর্থ না হইলেও শাসনব্যবস্থার অংশ হিসাবে থাকিয়াও কিভাবে সরকারের বিরোধিতা করা সম্ভব সেই দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছিল। ভারতের পার্লামেণ্টারী গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে এই শিক্ষার মূল্য নেহাৎ কম ছিল না।

স্বরাজ্য পার্টি বিচ্ছিন্ন

স্বরাজ্য পার্টির অবদান

বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পুনরভ্যুত্থান : প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে সমগ্র উত্তর ভারতে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি এক সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হইলে বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রথম পর্যায়ের সমাপ্তি ঘটিয়াছিল। বহু বিপ্লবীকে ভারত রক্ষা আইনের বলে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছিল। কিন্তু বিপ্লবী সন্ত্রাসের মূল তখন দেশের গভীরে চলিয়া গিয়াছিল এবং উহার বাহ্য প্রকাশ না থাকিলেও লোকচক্ষুর অন্তরালে বিপ্লবী কার্যকলাপ গোপনে চলিতেছিল। যুদ্ধাবসানে বিপ্লবীদিগকে রাজকীয় ঘোষণা দ্বারা ক্ষমা করা হয় এবং মুক্তি দেওয়া হয়। ফলে পুনরায় বিপ্লবের প্রস্তুতি চলিতে থাকে। অবশ্য বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদীরা দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে লাগিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে সরকারী অত্যাচার তাঁহারা দুঃখ এবং ক্ষোভের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করিলেন। চৌরিচৌরার ঘটনার পর মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহার করিয়া লইলে বাংলার বিপ্লবীরা চট্টগ্রামে গোপনে মিলিত হইয়া পুনরায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কর্মসূচী প্রস্তুত করেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়।

বিপ্লবী সন্ত্রাসের দ্বিতীয় পর্যায় ১৯২৩ হইতে শুরু

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ দিকে 'লাল বাংলা' (Red Bengal) প্রচারপত্র বাংলাদেশের সর্বত্র বিতরণ করা হয়। ইহাতে অত্যাচারী পুলিশ কর্মচারীদের হত্যার কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়। দ্বিতীয়বার এই প্রচারপত্রে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিকট বিপ্লবী সন্ত্রাসের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টি পুনরায় নূতন শক্তি লইয়া পুনর্গঠিত হয়। চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে এক বিপ্লবী সমিতি স্থাপিত হইলে চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্নাংশে উহার শাখা বিস্তৃত হয়। তারপর শুরু হয় সশস্ত্র ডাকাতির

'লাল বাংলা' প্রচারপত্র

অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর পার্টির পুনরুজ্জীবন

মাধ্যমে অর্থ সংস্থান করা। এদিকে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস্ টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা চলিতে থাকে। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে গোপীনাথ সাহা মিঃ ডে নামে জনৈক সাহেবকে চার্লস্ টেগার্ট মনে করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করেন। এজন্য গোপীনাথের ফাঁসী হয়। বিচারালয়ে যখন ফাঁসীর হুকুম দেওয়া হয় তখন গোপীনাথ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার রক্তের প্রতিটি কণা ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে বিপ্লবের আগুন ছড়াইয়া দিবে। ঐ বৎসর মার্চ মাসে দক্ষিণেশ্বরে বোমা তৈয়ারের এক গোপন কারখানা আবিষ্কৃত হইলে এবং কয়েক মাসের মধ্যে আরও একটি কারখানা আবিষ্কৃত হইলে সরকার সুভাষচন্দ্র বসু-সহ মোট ১৮৭ জনকে আটক করিলেন। সরকার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন করিবার উদ্দেশ্যে অত্যাচার শুরু করিলেন, পক্ষান্তরে বিপ্লবীরা গোয়েন্দাদিগকে হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের চেষ্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিফল হইল বটে, কিন্তু আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিণ্টেনডেণ্ট আটক বিপ্লবীদের পরিদর্শন করিতে গেলে প্রমোদ চৌধুরী তাঁহাকে লোহার ডাণ্ডা মারিয়া হত্যা করেন।

মিঃ ডে হত্যা

আলিপুর জেলে সুপারিণ্টেনডেণ্টকে হত্যা



শচীন্দ্রনাথ সান্যাল প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী (?—১৯২৬) গোপীনাথ সাহা (?—১৯২৪)

যুক্তপ্রদেশেও (অধুনা উত্তরপ্রদেশ) শচীন্দ্র সান্যাল, যোগেশ চট্টোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, সতীশচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি প্রবাসী বাঙালী যুবক বিপ্লবী সংগঠন গড়িয়া তোলেন। যুক্তপ্রদেশের সর্বত্র উহার শাখা বিস্তৃত হয়। এই সংগঠনের নাম দেওয়া হয় 'হিন্দুস্তান রিপাব্লিকান এ্যাসোসিয়েশন' (১৯২৪)। বিপ্লবী সন্ত্রাসের মাধ্যমে ভারতে এক প্রজাতান্ত্রিক যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করা ছিল এই সংগঠনের উদ্দেশ্য। মাদ্রাজ, বিহার, পাঞ্জাব ও দিল্লীতে এই বিপ্লবী সংগঠনের শাখা বিস্তৃত হয়। রাজনৈতিক ডাকাতি, বিদেশী সরকারী কর্মচারী হত্যা, সরকারী অর্থ লুঠ করা প্রভৃতি কাজ এই বিপ্লবী সংস্থা শুরু করে। রেলগাড়ী হইতে সরকারী অর্থ ডাকাতির জন্য অনেক বিপ্লবী ধরা পড়িলে দীর্ঘকাল তাঁহাদের বিচার চলে। ইহা 'কাকোরি ষড়যন্ত্র' মামলা নামে পরিচিত। বিচারে চারিজনের ফাঁসীর হুকুম হয়। অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। রামপ্রসাদ, রোশনলাল,

বাংলার বাহিরে বিপ্লবী কার্যকলাপ ; যুক্তপ্রদেশে বিপ্লবী কার্যকলাপ

'কাকোরি ষড়যন্ত্র' মামলা

আশফাক্-উল্লা ফাঁসীর মঞ্চে উঠিয়া ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁহারা প্রাণ দান করিতেছেন কিন্তু তাঁহাদের প্রাণদণ্ড দিয়া স্বাধীনতা আন্দোলনকে থামান যাইবে না, একথা ঘোষণা করিয়া গিয়াছিলেন।


আশফাক্-উল্লা

বিপ্লবীদের কারামুক্তি (১৯২৮)

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কিছুকাল বিপ্লবী কার্যকলাপ বন্ধ থাকিলে পর বৎসর সরকার সকল বিপ্লবীকে মুক্তি দেন। মুক্তিলাভ করিয়া কারাগার হইতে বাহির হইলে দেশের সর্বত্র বিপ্লবীদিগকে অভূতপূর্ব সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। জনসাধারণের এই উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া বিপ্লবীরা জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে দেশের বিভিন্নাংশে বহু রাজনৈতিক সংগঠন স্থাপন করেন। তাঁহারা কংগ্রেসের স্বরাজ অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকারের অধীনে স্বায়ত্তশাসন লাভের নীতির পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহারা চাহিলেন পূর্ণ স্বাধীনতা। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে তাঁহাদের মুখপাত্র হইলেন জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র।

পূর্ণ স্বাধীনতালাভ বিপ্লবীদের আদর্শ

এদিকে বিপ্লবী কার্যকলাপও চলিতে লাগিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় আইন-সভায় যখন ভারতের স্বার্থবিরোধী বাণিজ্য বিলের আলোচনা চলিতেছিল সেই সময় ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত সেখানে বোমা নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। লাহোরেও বিপ্লবী কার্যকলাপ পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল। কিন্তু তাহা ফাঁস হইয়া গেলে লাহোর ষড়যন্ত্রের মামলায় বহু বিপ্লবীর শাস্তি হয়। ঐ বৎসরই (১৯২৯) কলিকাতায় বিপ্লবীদের গোপন সভায় চট্টগ্রাম, ময়মনসিংহ ও বরিশালের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের কার্যসূচী গ্রহণ করা হইল। এই কার্যসূচী রূপায়ণে চট্টগ্রামে সূর্য সেন সামরিক শিক্ষায় নিজ দলবলকে শিখাইয়া তুলিলেন এবং ভারতীয় প্রজাতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিলেন। এই ঘোষণা-পত্রে সরকারের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই প্রজাতান্ত্রিক সেনাবাহিনীর ব্রিটিশ বিতাড়নের কার্যে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল সূর্য সেনের পরিকল্পনা অনুযায়ী অনন্ত সিংহ এবং গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের পুলিশ অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হইল। টেলিগ্রাফ-টেলিফোন লাইন কাটিয়া দিয়া চট্টগ্রাম শহরকে বাংলাদেশের অপরাপর অংশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন


ভগৎ সিং

বিপ্লবী প্রস্তুতি

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন

সরকার গঠন করা হইল। সূর্য সেন হইলেন এই সরকারের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট। এদিকে সরকার বাহির হইতে সৈন্য আনাইয়া বিপ্লবীদের মোকাবিলা করিতে প্রস্তুত হইলেন। এমতাবস্থায় বিপ্লবীরা জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করিলেন (২২শে এপ্রিল, ১৯৩০)। বিপ্লবীদের এগারজন এবং সরকারী পক্ষে মোট ৬৪ জন প্রাণ হারাইয়াছিল। পরদিন অধিক সংখ্যক সৈন্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে ইহা নিশ্চিত ভাবিয়া বিপ্লবীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া গেলেন। এইরূপ একটি দলের সহিত কর্ণফুলী নদীতীরে এবং নদীবক্ষে সশস্ত্র পুলিশের রীতিমত যুদ্ধ হইল। ছয়জন বিপ্লবীর মৃত্যু হইল, দুইজন ধরা পড়িলেন। এইভাবে আরও একটি দল কয়েক মাস পর চন্দননগরে ধরা পড়িবার পূর্বে পুলিশের সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া একজন প্রাণ হারাইয়াছিলেন এবং অন্যেরা ধরা পড়িয়াছিলেন। বিপ্লবীদের 'মাষ্টারদা' সূর্য সেনকে তখনও ধরা সম্ভব হইল না। পরে অবশ্য তিনি ধরা পড়িলেন। বিচারে তাঁহার ফাঁসীর হুকুম হইল। লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, উপেন্দ্র ভট্টাচার্য প্রভৃতির যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হইল।

সূর্য সেনের ফাঁসী : অপরাপর অনেকের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড



'মাষ্টারদা' সূর্য সেন (১৮৯৩-১৯৩৪)

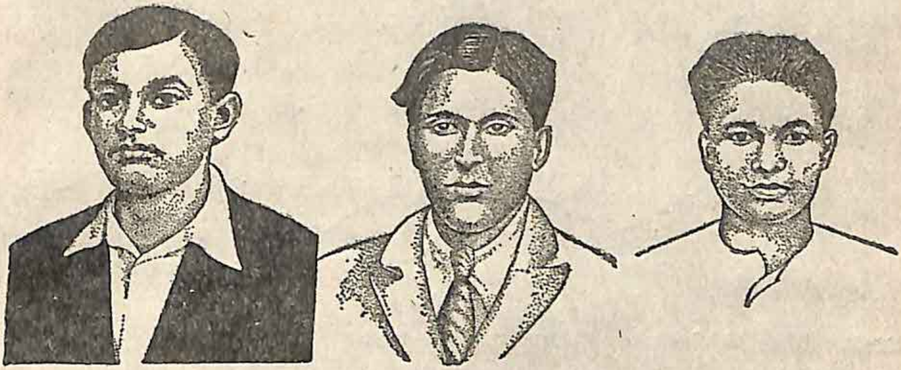
চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন সমগ্র বাংলাদেশে বিপ্লবের এক নেশার সৃষ্টি করিয়াছিল। বিপ্লবীদের আক্রমণে সেই সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ব্রিটিশ শাসকগণ প্রাণ হারাইয়াছিলেন। বিপ্লবীরা তখন জীবনের বদলে জীবন, রক্তের বদলে রক্ত লইতে বদ্ধপরিকর। ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবী সন্ত্রাস দমনের জন্য যতই আইনের কঠোরতা এবং পুলিশের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন, বিপ্লবীরা ততই মরিয়া হইয়া উঠিলেন। বিপ্লবীদের মধ্যে সেই সময় বাঙালী তরুণীদের যোগদান ছিল এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে তরুণ বিপ্লবীদের উৎসাহ বৃদ্ধি

এইবার শুরু হইল বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ঘাঁটি রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের চেষ্টা। বিনয় বসু ছিলেন ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র। ঢাকার পুলিশ কর্তৃপক্ষ লোম্যান ও হাডসন সাহেব সেই সময়ে বিপ্লবীদের সমূলে উৎখাত করিবার জন্য উঠিয়াপড়িয়া লাগিয়াছিলেন। সন্দেহবশে গ্রেপ্তার করিয়া ছাত্রদের উপর অকথ্য অত্যাচার করিতে তাঁহারা ছিলেন উৎসাহী। বিনয় এই অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন। সুযোগ তাঁহার সম্মুখে আপনা হইতেই উপস্থিত হইল। জনৈক পদস্থ পুলিশ কর্মচারী অসুস্থ অবস্থায় ঢাকা মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইলে লোম্যান ও হাডসন

বিনয় বসু কর্তৃক লোম্যান ও হাডসনের উপর আক্রমণ : লোম্যানের মৃত্যু

সাহেব তাঁহাকে দেখিতে আসিলে বিনয় উভয়কেই গুলি করিলেন। লোম্যানের মৃত্যু হইল, কিন্তু আহত হাডসন শেষ পর্যন্ত প্রাণে বাঁচিলেন। বিনয়কে গ্রেপ্তারের শত চেষ্টা করিয়া পুলিশ ব্যর্থ হইল। পুলিশ ও গোয়েন্দাদের চোখে ধূলা দিয়া তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণের জন্য যে তিনজন সাহসী তরুণ বিপ্লবীকে নির্বাচন করা হইল তাঁহাদের মধ্যে বিনয় বসু ছিলেন অন্যতম।



বিনয় বসু (১৯০৮-৩০) বাদল (সুধীর) গুপ্ত (১৯১২-৩০) দীনেশ গুপ্ত (১৯১১-৩১)

অপর দুইজন ছিলেন বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর সাহেবী পোশাক পরিহিত বিনয়, বাদল ও দীনেশ রাইটার্স বিল্ডিংয়ে প্রবেশ করিয়া কারা বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল সিম্পসন সাহেবকে গুলি করিলেন। সিম্পসন নিজের চেয়ারেই এলাইয়া পড়িলেন। তিনি জেলে আটক বিপ্লবীদের উপর অত্যাচারে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নেলসন সাহেব গুলির শব্দ শুনিয়া রিভলভার-সহ বাহির হইয়া আসিলেন কিন্তু তিনিও গুলিবিদ্ধ হইলেন। ইতিমধ্যে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সাহেব রাইটার্স বিল্ডিং পুলিশ দিয়া ঘিরিয়া ফেলিলে বিনয়-বাদল-দীনেশ এক কামরায় গিয়া আত্মহত্যার ব্যবস্থা করিলেন। বাদল গুপ্তের নিকট আর গুলি অবশিষ্ট না থাকায় তিনি বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। বিনয় ও দীনেশ নিজ নিজ রিভলভার হইতে নিজেদের গুলি করিলেন। আহত অবস্থায় মেডিক্যাল কলেজে বিনয়ের মৃত্যু হইল, সুস্থ হইয়া উঠিলে বিচারে দীনেশকে ফাঁসী দেওয়া হইল।

রাইটার্স বিল্ডিং আক্রমণ: বিনয়-বাদল-দীনেশ

বিপ্লবীদের অন্যতম কর্মকেন্দ্র ছিল মেদিনীপুর, ব্রিটিশ অত্যাচারও স্বভাবতই সেখানে ছিল মাত্রাহীন। জেলাশাসক পেডি ছিলেন অত্যাচারের প্রতীক। বিমল দাশগুপ্ত পেডিকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। কানাই ভট্টাচার্য বিচারক গার্লিককে তাঁহার এজলাসে প্রকাশ্য দিবালোকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। দীনেশের ফাঁসীর হুকুম বিচারক গার্লিকই দিয়াছিলেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে হিজলী জেলে বিপ্লবী বন্দীদের উপর গুলি করিলে দুইজন মারা যান এবং অনেকে আহত হন। এজন্য পেডি

পেডি হত্যা

গার্লিক হত্যা

ভিলিয়ার্সের উপর আক্রমণ

হত্যাকারী বিমল দাশগুপ্ত ইওরোপীয়ান এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ভিলিয়ার্সকে গুলি করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ বৎসরই শান্তি ও সুনীতি নামে দুইটি অল্পবয়স্কা বালিকা কুমিল্লার জেলাশাসক স্টিভেনশনকে গুলি করিয়া হত্যা করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে (১৯৩২) গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে বীণা দাশ গুলি


প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য (১৯১৩-৩৩)


অনাথবন্ধু পাঁজা (?—১৯৩৩)


মৃগেন দত্ত (?—১৯৩৩)

স্ট্যানলি জ্যাকসনের উপর আক্রমণ

ডগল্যাস হত্যা

বার্জ হত্যা

করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় স্ট্যানলি জ্যাকসন রক্ষা পান। ঐ বৎসরই প্রভাংশু পাল ও প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ডগল্যাসকে গুলি করিয়া হত্যা করেন। পরবর্তী জেলাশাসক বার্জ সাহেবকেও অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন দত্ত গুলি করিয়া হত্যা করেন (১৯৩৩)। উভয়েই অবশ্য বার্জের দেহরক্ষীর গুলিতে ঘটনাস্থলে প্রাণ হারান।

বিপ্লবীদের জীবনদানের শিক্ষা

এইভাবে ১৯৩০ হইতে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বহু তরুণ ব্রিটিশ অত্যাচারী কর্মচারীদের হত্যা করিয়া বা হত্যার চেষ্টা করিয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছিলেন। বাঙালী আত্মমর্যাদাহীন জাতি নহে এবং ব্রিটিশদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে ও পরাধীনতার শৃংখল ভাঙ্গিতে তাঁহারা মৃত্যুকে হাসিমুখে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত একথাই তাঁহারা জীবন দিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাধীনতা আন্দোলনের নূতন পর্ব

(New Phase in the Freedom Movement)

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু, স্বরাজ্য পার্টি কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারকে সংস্কার প্রবর্তনে বাধ্য করিতে অসামর্থ্য প্রভৃতি কারণে স্বরাজ্য পার্টি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ভারতের জাতীয় আন্দোলন যখন এই সকল কারণে অনেকটা স্তিমিত হইয়া পড়িয়াছে সেই সময়ে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক সাইমন কমিশন নিয়োগের ঘোষণা পুনরায় জাতীয় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিল।

জাতীয় আন্দোলন স্তিমিত

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কার আইনের একটি শর্ত ছিল এই যে, দশ বৎসর অতিক্রান্ত হইলে সেই সংস্কার অনুযায়ী ভারতের শাসনব্যবস্থা কতদূর সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহা তদন্ত করিয়া দেখা হইবে। সেই অনুসারে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তদন্ত হইবার কথা। কিন্তু ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে সেজন্য ব্রিটিশ সরকার ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসেই স্যার্ জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিযুক্ত করিলেন। স্যার্ জন সাইমন-সহ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের মোট সাতজন সদস্য লইয়া এই কমিশন গঠন করা হইল। কোন ভারতীয় প্রতিনিধিকে ইহাতে গ্রহণ করা হইল না।

সাইমন কমিশন



স্যার্ জন সাইমন

সাইমন কমিশন নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন পুনরায় গতিশীল হইয়া উঠিল। কোন ভারতীয় প্রতিনিধি না লইয়া গঠিত কমিশন ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন ইহা ভারতবাসী জাতীয় অপমান বলিয়াই গ্রহণ করিল। ইহা ভিন্ন, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয়দের প্রতিনিধি সভার মাধ্যমে শাসনতন্ত্র বা সংবিধান রচনার পক্ষপাতী ছিল। বিদেশীরা আসিয়া ভারতবাসী স্বরাজের জন্য উপযুক্ত কি না সে-বিষয়ে তদন্ত করিয়া তাহাদের সুপারিশ পার্লামেণ্টকে জানাইবে ইহা কংগ্রেসের নিকট গ্রহণযোগ্য হইল না। কংগ্রেস এজন্য সাইমন কমিশন বর্জন করিবার এবং কমিশনের সম্মুখে উপস্থিত না হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। ভারতের অপরাপর সকল রাজনৈতিক দলও সাইমন কমিশন বর্জনের সিদ্ধান্ত লইল। কংগ্রেস সাইমন কমিশনের

সাইমন কমিশন বর্জন : হরতাল ও বিক্ষোভ

জাতীয় আন্দোলনের শক্তি সঞ্চয়

সদস্যগণ ভারতে পদার্পণ করিবার দিন সমগ্র ভারতে কাল পতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের কার্যসূচী গ্রহণ করিল। কমিশনের সহিত সর্বপ্রকার অসহযোগ হইল এই কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা ফেব্রুয়ারি সাইমন কমিশন ভারতে উপস্থিত হইলে ভারতের সর্বত্র হরতাল ও বিক্ষোভ শুরু হইল। এইভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলন পুনরায় শক্তি সঞ্চয় করিল।



মোতিলাল নেহরু

এদিকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে ভারতের জন্য একটি সংবিধান রচনার ভার মোতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে একটি কমিটির উপর দেওয়া হইয়াছিল। পরবৎসর ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে এক সর্ব-দলীয় কন্ফারেন্সে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান কিরূপ হওয়া উচিত সে-বিষয়ে আলাপ-আলোচনার পর নেহরু রিপোর্ট প্রস্তুত হইল। মোতিলাল নেহরুর নামানুসারে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান সম্পর্কে রিপোর্টের নামকরণ হইল নেহরু রিপোর্ট। এই রিপোর্টে কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ ডোমিনিয়নের (Dominion) শাসনব্যবস্থার অনুরূপ ভারতেও স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্' (Dominion Status) বা ডোমিনিয়নের সমমর্যাদা দাবি করা হইল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মাদ্রাজ অধিবেশনে (১৯২৭) পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ কংগ্রেসের মূল আদর্শ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। পরবৎসর অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কলিকাতা অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু ও সুভাষচন্দ্র বসু পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি খুবই জোরালোভাবে উত্থাপন করিলেন। কংগ্রেসের তরুণ সদস্য সকলেই জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের সমর্থন করিলে মহাত্মা গান্ধী একটি মাঝামাঝি ব্যবস্থা করিলেন। স্থির হইল যে, ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট যদি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন স্টেটাস্' অর্থাৎ কানাডা, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ডোমিনিয়নগুলি যে-সকল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও স্বায়ত্তশাসনাধিকার ভোগ করে তাহা দিতে রাজী হন তাহা হইলে ভারতবাসী তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবে। এই সময়-সীমার মধ্যে ভারতের দাবি মানা না হইলে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন শুরু করিবে এবং আইন অমান্য আন্দোলন হিসাবে রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য ভারতবাসীকে নির্দেশ দিবে এই কথাও ঘোষণা করা হইল।

নেহরু রিপোর্ট

ডোমিনিয়ন স্টেটাস্ দাবি

জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্রের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি

গান্ধীজীর আপোস প্রস্তাব

এদিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুসলমানদের পক্ষে কতকগুলি দাবি উপস্থাপিত করেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের সর্ব-দলীয় কন্ফারেন্স তাঁহার এই সকল দাবি অগ্রাহ্য

করিলে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি সর্ব-ভারতীয় মুসলিম কন্‌ফারেন্সে তিনি একটি প্রচারপত্র বণ্টন করেন। এই প্রচারপত্রে মুসলমানদের জন্য যে-সকল দাবি উত্থাপন করিয়াছিলেন সেগুলির উপর ভিত্তি করিয়া জিন্নাহ্‌ ঐ বৎসরই তাঁহার 'চৌদ্দ দফা দাবি' প্রস্তুত করেন। এগুলিতে (১) ভারতবর্ষে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা চালু করিতে হইবে; (২) এই যুক্তরাষ্ট্রে রাজ্য মাত্রেরই সমান অধিকার থাকিবে; (৩) প্রত্যেক নির্বাচিত সংস্থায় মুসলমান সম্প্রদায়কে উপযুক্ত সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ দিতে হইবে; (৪) কেন্দ্রীয় আইনসভার অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মুসলমানদের মধ্য হইতে লইতে হইবে; (৫) সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা চালু করিতে হইবে, তবে কোন সম্প্রদায় ইচ্ছা করিলে এই ব্যবস্থা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে পারিবে; (৬) ভারতীয় প্রদেশগুলির পুনর্গঠন করিতে হইবে, কিন্তু এই পুনর্গঠনের ফলে বাংলাদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে মুসলমান অধিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাহাতে ব্যাহত না হয় সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৭) ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকিবে; (৮) কোন আইনসভায় কোন একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবর্গ যদি কোন আইন বা প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং তাঁহাদের সংখ্যা যদি আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হয় তাহা হইলে এ আইন বা প্রস্তাব পাশ করা চলিবে না; (৯) সিন্ধু অঞ্চলকে একটি পৃথক প্রদেশ হিসাবে গঠন করিতে হইবে; (১০) মুসলমান সম্প্রদায় হইতে উপযুক্ত সংখ্যক সরকারী কর্মচারী গ্রহণ করিতে হইবে; (১১) মুসলমানদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা, সাহিত্য প্রভৃতি সংরক্ষিত করিতে হইবে এবং উহার উন্নয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে; (১২) প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় অন্তত এক-তৃতীয়াংশ মন্ত্রিসংখ্যা মুসলমানদের মধ্য হইতে গ্রহণ করিতে হইবে; (১৩) প্রাদেশিক আইন-সভার মত গ্রহণ না করিয়া শাসনতন্ত্রের কোন পরিবর্তন করা চলিবে না; এবং (১৪) উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানেও শাসনতান্ত্রিক সংস্কার চালু করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, জিন্নাহ্‌-এর উপরি-উক্ত চৌদ্দ দফা দাবি গণতান্ত্রিক নীতি-বিরোধী ছিল। ঐ সময় হইতেই মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌ সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগাইতে থাকেন এবং উগ্র সাম্প্রদায়িকতার সমর্থক দলের নেতায় পরিণত হন।

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌-এর 'চৌদ্দ দফা দাবি'

লর্ড আরউইন ছিলেন সেই সময়ে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় (১৯২৬-৩১)। তিনি এক ঘোষণা দ্বারা ভারতবাসীকে জানাইলেন যে, ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নীত করাই ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য এবং সাইমন কমিশনের রিপোর্ট দাখিল হইলে পর লণ্ডনে এ-বিষয়ে এক গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হইবে। লর্ড আরউইনের এই ঘোষণা ইংলণ্ডে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিল। ব্রিটিশ জাতি ভারতবাসীকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস্‌ দিতে অর্থাৎ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিতেও সম্মত ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের নিকট কোন কিছু প্রত্যাশা করা বৃথা বিবেচনা করিয়া ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটাস্‌ দাবি পরিত্যাগ

লাহোর কংগ্রেস (১৯২৯): পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি

করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করিল। ইহার প্রয়োজনও ছিল, কারণ সাইমন কমিশনের ভারত আগমনকে কেন্দ্র করিয়া যে তীব্র জাতীয়তা-বোধ পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল তাহা কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয়তার ফলে বিপ্লবী সন্ত্রাসে প্রকাশ পাইতেছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে অক্টোবর সাইমন কমিশন বর্জন উপলক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে লালা লাজপৎ রায়ের মস্তকে পুলিশ আঘাত করিলে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং পরের মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। ইহার প্রতিশোধ লাহোরের বিপ্লবীরা গ্রহণ করিলেন সহকারী পুলিশ সুপারিণ্টেনডেণ্ট মিঃ সণ্ডার্সকে হত্যা করিয়া। এইভাবে পাঞ্জাব কেন, বাংলাদেশ, মাদ্রাজ, বিহার, দিল্লী—ভারতের বিভিন্নাংশে বিপ্লবী সন্ত্রাসমূলক কাজ শুরু হইয়া গিয়াছিল। জেলখানার রাজনৈতিক বন্দীদের উপর সরকারী অত্যাচারের প্রতিবাদে লাহোর ষড়যন্ত্রে কারারুদ্ধ বন্দীরা অনশন শুরু করিলে শেষ পর্যন্ত বাঙালী যুবক যতীন দাশ লাহোর জেলে মারা গেলেন। দেশের সর্বত্র যুবসমাজ তখন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। এরূপ পরিস্থিতিতে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি এবং আন্দোলনের প্রস্তুতি অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ভিন্ন, জওহরলাল নেহ্‌রু ও সুভাষচন্দ্র বসু 'স্বাধীনতা সংঘ' বা 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' স্থাপন করিয়া প্রচারের মাধ্যমে ভারতবাসীদের মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জনপ্রিয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। লাহোর অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলনের বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় নাই (১৯২৯)। এ-বিষয়ে পূর্ণ দায়িত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপর ন্যস্ত করা হইয়াছিল।



লর্ড আরউইন



যতীন দাশ (১৯০৪-২৯)

স্বাধীনতা দিবস : ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি (Working Committee) ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা ভারতবাসীর মধ্যে জনপ্রিয় করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে ২৬শে জানুয়ারি দিনটি ভারতের 'স্বাধীনতা দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা দিবসে ভারতবাসীকে একটি শপথ গ্রহণের ব্যবস্থাও স্থির হয়। এই শপথ বাক্য মহাত্মা গান্ধী নিজে রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে বলা হইল : "আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবাসী তথা যে-কোন জাতির স্বাধীনতা হইল সহজাত অধিকার। ভারতবাসীর নিজ শ্রমের ফলভোগ করিবার, জীবনধারণের সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সুযোগ ভোগ করিবার এবং

স্বাধীনতা দিবসের শপথ বাক্য

উন্নততর জীবনযাপন করিবার অধিকার আছে। কোন সরকার এই সকল অধিকার হরণ করিলে অথবা তাহাদের উপর অত্যাচার করিলে ভারতবাসীর সেই সরকারকে পরিবর্তন করিবার বা ক্ষমতাচ্যুত করিবার অধিকার আছে। যেহেতু ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীকে শোষণ করিয়া রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভারতের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে সেহেতু, আমরা বিশ্বাস করি যে, ভারতবর্ষকে ব্রিটিশদের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করিতে হইবে।"

ঐ বৎসরই ২৬শে জানুয়ারি দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত স্বাধীনতা দিবস পালন করা হইল। ইহার পর হইতে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রতি বৎসর ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস পালিত হইয়াছিল। এই দিবসটি পালন করা এবং শপথ বাক্য পাঠ করার মধ্যে ভারতবাসী প্রতি বৎসর দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করিবার সুযোগ পাইত। ২৬শে জানুয়ারি ছিল সেই কারণে দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের দিন, দেশসেবার অঙ্গীকার গ্রহণের দিন। স্বাধীনতা সম্পর্কে জাতির মনে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করিতে এবং উহা বদ্ধমূল করিতে এই দিবসের গুরুত্ব ছিল অত্যধিক। স্বাধীনতা লাভের পর নূতন সংবিধান রচিত হইলে ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি অর্থাৎ পূর্বেকার স্বাধীনতা দিবসকে প্রজাতন্ত্র দিবস হিসাবে ঘোষণা করা হইল। ঐ দিন ভারতের নূতন সংবিধান অনুসারে ভারত এক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে রূপান্তরিত হইল। এইভাবে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যে দিনটিকে স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালন করা হইতেছিল সেই দিনটিকে ভারত-ইতিহাসে এবং ভারতবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় করিয়া রাখা হইয়াছে।

স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্ব

স্বাধীনতার পর ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে পরিণত

আইন অমান্য আন্দোলন : ডাণ্ডি অভিযান : ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিল এবং পরবৎসর লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর উপর আইন অমান্য আন্দোলনের যে পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছিল সেই অনুযায়ী মহাত্মা গান্ধী ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ৭৯ জন নারী ও পুরুষ সত্যাগ্রহী লইয়া তাঁহার বিখ্যাত ডাণ্ডি বা দাণ্ডী অভিযান শুরু করিলেন। দীর্ঘ ৩৮০ কিলোমিটার পথ মোট ২৪ দিনে পায়ে হাঁটিয়া মহাত্মা গান্ধী সত্যাগ্রহীদের লইয়া ৫ই এপ্রিল গুজরাট প্রদেশের ডাণ্ডি বা দাণ্ডী নামক স্থানে পৌঁছিলেন। পরদিন ৬ই এপ্রিল সমুদ্রতীর হইতে লবণ সংগ্রহ করিয়া লবণ আইন অমান্য করিলেন। ভারতবাসীর পক্ষে সমুদ্র জল হইতে লবণ প্রস্তুত করা বে-আইনী ছিল। এইভাবে লবণ আইন ভঙ্গ করা হইলে ভারতের সর্বত্র এক দারুণ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। দেশের যে যে স্থানে লবণ প্রস্তুত করিবার সুযোগ ছিল সেই সকল স্থানে সত্যাগ্রহীরা লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন অমান্য করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলার কাঁথি ও চব্বিশ পরগণার মহিষবাথানে লবণ প্রস্তুত শুরু হয়। সরকারী আদেশ অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিয়াও আইন অমান্য আন্দোলন চালান হইল। এইভাবে আইন অমান্য

লবণ সত্যাগ্রহ

আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অসহযোগ আন্দোলনও চলিতে থাকে। বিলাতী পণ্যদ্রব্য বর্জন, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট, অফিস-আদালতে পিকেটিং সবকিছু মিলিয়া আইন অমান্য আন্দোলন এক প্রবল আন্দোলনে পরিণত হইল। এদিকে মহাত্মা গান্ধী সুরাট জেলায় ধর্‌সানা নামক স্থানের লবণ কারখানা ও গুদাম দখল করিবেন স্থির করিলেন। তিনি গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয়কে চিঠি লিখিয়া লবণ কর বাতিল এবং ভারতবাসীর পক্ষে লবণ প্রস্তুতের আইনগত বাধা দূর করিতে অনুরোধ জানাইলেন। অন্যথায় তিনি ধর্‌সানা লবণ কারখানা ও গুদাম দখল করিবেন একথাও জানাইলেন। কিন্তু গান্ধীজী ধর্‌সানা অভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্বেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল। আব্বাস তৈয়বজী গান্ধীর স্থলে লবণ সত্যাগ্রহ পরিচালনার ভার লইলে তাঁহাকেও গ্রেপ্তার করা হইল। ইহার পর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু। তিনি ২৫০০ সত্যাগ্রহী লইয়া ধর্‌সানা লবণ কারখানা ও গুদাম দখল করিবার জন্য অভিযান চালাইলেন। ওখালদা লবণ গুদাম দখলের জন্যও একাধিকবার চেষ্টা করা হইল। কিন্তু পুলিশ সত্যাগ্রহীদিগকে নির্মমভাবে আঘাত করিয়া এবং গ্রেপ্তার করিয়া লবণ কারখানা ও গুদাম রক্ষা করিল। সরোজিনী নাইডুকেও গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করা হইল।

ধর্‌সানা ঘটনা : গান্ধীজীর গ্রেপ্তার


সরোজিনী নাইডু

আইন অমান্য ও অহিংস অসহযোগ আন্দোলন যখন এক প্রবল আন্দোলনে পরিণত হইতে লাগিল সরকারী দমনমূলক অত্যাচার এবং আইনকানুনের কঠোরতাও তত বৃদ্ধি পাইল। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, দিল্লী, মেদিনীপুর প্রভৃতি স্থানে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক অত্যাচার করা হইল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মীরাটে এক জনসভায় লবণ আইন অমান্য করিবার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করিলে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

আইন অমান্য আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলন এক প্রবল আন্দোলনে পরিণত

সরকারী অত্যাচার

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের আফগান নেতা খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ ছিলেন 'খোদা-ই-খিদ্‌মৎগার' অর্থাৎ ঈশ্বরের সেবক নামক একটি দলের নেতা। খোদা-ই-খিদ্‌মৎগারগণ লাল রঙের পোশাক ব্যবহার করিত বলিয়া ইহারা 'লাল কোর্তা' (Red shirts) নামেও পরিচিত ছিল। খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন

কংগ্রেসে যোগদান করেন (১৯৩১)। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা নীতি ও অসহযোগ আন্দোলনে গভীর বিশ্বাসী হইয়া উঠেন। দৈহিক শক্তিতে অসাধারণ শক্তিশালী দুর্ধর্ষ পাঠান জাতি হিংসাত্মক কাজে কখনও পশ্চাৎপদ ছিল না। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষভাব দীর্ঘকাল যাবৎ তাহাদের মধ্যে ছিল। কিন্তু অহিংসায় বিশ্বাসী খান গফ্ফর খাঁর ব্যক্তিত্বের প্রভাবে দুর্ধর্ষ পাঠান জাতিও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অহিংসার পথ গ্রহণ করিল। তাঁহার নেতৃত্বে সমগ্র সীমান্ত প্রদেশে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন চলিতে লাগিল। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, আইন অমান্য করিয়া সভাসমিতি ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠানের ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আইন অমান্য আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করিল। পেশোয়ারে সরকার সামরিক বাহিনীর সাহায্যে আন্দোলন দমন করিতে গিয়া গুলি চালাইলেন। বহুসংখ্যক সত্যাগ্রহী হতাহত হইল। খান আব্দুল গফ্ফর খাঁর গভীর জাতীয়তাবোধ, অহিংস নীতিতে তাঁহার অকৃত্রিম বিশ্বাস এবং আইন অমান্য আন্দোলনে তাঁহার অসাধারণ সাফল্য তাঁহাকে ভারতবাসীর অন্তরে এক শ্রদ্ধার আসন দান করিয়াছে। ভারতবাসী তাঁহাকে 'সীমান্ত গান্ধী' নাম দিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছে।

খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ



খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ

সরকারী অত্যাচার

পাঞ্জাবে সত্যাগ্রহ আন্দোলন অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করিলে সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের অত্যাচার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়। লাহোরে পাঞ্জাবের গভর্ণরের উপর গুলি করিবার চেষ্টা হইলে পাঞ্জাবের সর্বত্র পুলিশ অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। পাঞ্জাবের সত্যাগ্রহে মুসলমান রমণীগণও অংশগ্রহণ করিয়া কারাবরণ করিয়াছিলেন।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাব ভিন্ন বিহারের বিভিন্ন শহরে, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ এবং ভারতের অপরাপর প্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয় এবং পুলিশের অত্যাচারও চরম নির্মমতায় পরিণত হয়। বিহারের পাটনা, ভাগলপুর, মুঙ্গের প্রভৃতি শহরে সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশ ও মিলিটারির অত্যাচার মাত্রা ছাড়াইয়া যায়।

বিহার, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ ও অপরাপর অঞ্চল

বাংলাদেশের সর্বত্র আইন অমান্য আন্দোলন তীব্রতা ধারণ করিলে সরকারী দমননীতিও অত্যন্ত কঠোর আকার ধারণ করে। বাংলার মেদিনীপুর জেলায় লবণ আইন অমান্যকারীদের উপর পুলিশের গুলি, নারী সত্যাগ্রহীদের উপর অকথ্য অত্যাচার, তাঁহাদের প্রতি অশোভন আচরণ,

বাংলাদেশ: মেদিনীপুর

সত্যাগ্রহীদের ঘর-বাড়ীতে আগুন লাগান প্রভৃতি মেদিনীপুরকে আইন অমান্য আন্দোলনের ইতিহাসে এক অত্যুচ্চ আসনে স্থাপন করিয়াছে।

৯০ হাজার কংগ্রেসী সত্যাগ্রহী ও নেতৃবৃন্দ কারারুদ্ধ

আইন অমান্য আন্দোলনে প্রায় ৯০ হাজার সত্যাগ্রহী কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন নেতাদের মধ্যে গান্ধীজী, মোতিলাল নেহরু, জওহরলাল ও তাঁহার স্ত্রী কমলা নেহরু, সুভাষচন্দ্র, আবুল কালাম আজাদ, আব্বাস তৈয়বজী, খান আব্দুল গফ্ফর খাঁ, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতি অনেককেই আন্দোলনে যোগদান করিবার অভিযোগে কারাগারে বন্দী করা হইয়াছিল। এইভাবে আইন অমান্য আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষে এক অপ্রতিহত গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিল।

জন সাইমন কমিশনের রিপোর্ট দাখিল (মে, ১৯৩০)

এদিকে ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে স্যার্ জন সাইমন তাঁহার রিপোর্টে ভারতবর্ষে দায়িত্বমূলক শাসনব্যবস্থা স্থাপন, ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, সরকারী মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য নিয়োগ বাতিল করিবার সুপারিশ করেন। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ প্রাধান্য রাখা এবং ভবিষ্যতে ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপনের কথাও সাইমন কমিশন রিপোর্টে উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ সরকার ঐ বৎসরই (১৯৩০) লণ্ডনে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি লইয়া এক গোলটেবিল বৈঠক (Round Table Conference) আহ্বান করিলেন। কংগ্রেস হইতে কোন প্রতিনিধি এই বৈঠকে যোগ দিলেন না।

গোলটেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন (১৯৩০): গোলটেবিলের প্রথম অধিবেশনে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভিন্ন অপরাপর রাজনৈতিক দল এবং দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিগণ যোগদান করিলেন। এই সকল নেতার মধ্যে তেজবাহাদুর সপ্রু, জয়াকার, মহম্মদ আলি জিন্নাহ্, ডক্টর আম্বেদকার প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ডের প্রস্তাব

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড সাইমন কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে (১) ভারতে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন, (২) প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দান, এবং (৩) কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ প্রাধান্য বজায় রাখিয়া কতক পরিমাণে দায়িত্বশীল সরকার গঠন—এই তিনটি প্রস্তাবের উপর গোলটেবিলের বৈঠকে উপস্থিত সদস্যদের আলোচনা আহ্বান করিলেন। দীর্ঘ বিতর্কের পর সদস্যগণ মোটামুটিভাবে এই সকল প্রস্তাব মানিয়া লইলেন এবং এ-বিষয়েও তাঁহারা একমত হইলেন যে, ভারতের শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের উপর এযাবৎ যে অধিকার ও দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল সেগুলির সবই ভারতের হস্তে একসঙ্গে ত্যাগ করা উচিত হইবে না। এজন্য কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় কিছুকালের জন্য গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্রয়ের উপর দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় সম্পর্ক (Defence and Foreign Relations) পূর্ণমাত্রায় ন্যস্ত থাকিবে। কিন্তু জটিলতা দেখা দিল মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করিলে। জিন্নাহ্ তাঁহার চৌদ্দ দফা দাবিরও উল্লেখ করিতে ছাড়িলেন না। এদিকে

পৃথক নির্বাচনের দাবি

আম্বেদকারও অনুন্নত সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করিয়া বসিলেন। যাহা হউক, কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যোগদান না করায় এই সকল আলোচনার গুরুত্ব তেমন রহিল না। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রীও এই আশা প্রকাশ করিলেন যে, জাতীয় কংগ্রেস গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয়ের অনুরোধে সাড়া দিয়া গোলটেবিল বৈঠকের পরবর্তী অধিবেশনে যোগদান করিয়া ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে সহযোগিতা করিবেন। এক প্রকার বাধ্য হইয়াই সরকার মহাত্মা গান্ধীকে বিনা শর্তে মুক্তি দিলেন। কারামুক্তির পর গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইসরয় লর্ড আরউইন (১৯২৬-৩১) মহাত্মা গান্ধীর সহিত এক চুক্তি স্বাক্ষর করিলেন। ইহা 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি' (Gandhi-Irwin Pact) নামে পরিচিত (১৯৩১)। এই চুক্তির শর্তে সরকার হিংসাত্মক কার্যের অভিযোগে আটক সত্যাগ্রহী ভিন্ন অপর সকলকে মুক্তি দিতে এবং দমনমূলক আইন ও অর্ডিন্যান্স বাতিল করিতে স্বীকৃত হইলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদানকারীদের মধ্যে যাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দিতেও সরকার রাজী হইলেন। পক্ষান্তরে, গান্ধীজী আইন অমান্য স্থগিত রাখিতে এবং লণ্ডনে গোলটেবিলের দ্বিতীয় অধিবেশনে যোগদানে স্বীকৃত হইলেন।

গান্ধী-আরউইন চুক্তি (১৯৩১)

গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৯৩১): ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের কংগ্রেস অধিবেশনে গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুমোদিত হইলে ঐ বৎসরই সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিলেন। ইতিমধ্যে ইংলণ্ডে শ্রমিক দলের সরকারের স্থলে এক জাতীয় সরকার গঠিত হইয়াছে। র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী থাকিলেও রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধি সংখ্যাই তাঁহার মন্ত্রিসভায় বেশি ছিল। ভারত-সচিব ছিলেন রক্ষণশীল দলের স্যামুয়েল হোর (Samuel Hoare)। এই অধিবেশনের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ভারতে প্রবর্তন সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধী অনতিবিলম্বে এবং পূর্ণমাত্রায় দায়িত্বশীল অর্থাৎ ভারতীয় প্রতিনিধিগণ দ্বারা ভারতীয়দের নিকট দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রে এবং প্রদেশে প্রবর্তনের দাবি করিলেন। গভর্ণর-জেনারেলের হস্তে কোন বিশেষ ক্ষমতা ন্যস্ত করিবার প্রয়োজন নাই একথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা —দুই প্রধান বিষয়

মহাত্মা গান্ধীর দাবি

এদিকে মুসলমান, হিন্দুদের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খ্রীষ্টানদের একাংশ এবং ইওরোপীয় ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ নিজেদের মধ্যে চুক্তিবদ্ধ হইয়া সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে নির্বাচন দাবি করিলেন। হিন্দু ও শিখ প্রতিনিধিগণ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। গান্ধীজী যুক্তি দেখাইলেন যে, ভারতের জন্য সংবিধান রচনার ব্যবস্থা করা-ই হইল প্রধান কাজ। সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন হইলে বিচারকদের লইয়া

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন দাবি

ট্রাইব্যুনাল গঠন করা যাইতে পারিবে। কিন্তু সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন লইয়া এমন জটিলতার সৃষ্টি হইল যে, মহাত্মা গান্ধীর শত চেষ্টায়ও কোন প্রকার সমাধানে উপস্থিত হওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত হতাশ হইয়া মহাত্মা গান্ধী শূন্য হস্তে দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

বৈঠকের ব্যর্থতা

গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন (১৯৩২): ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে গোলটেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনও বসিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী বা কংগ্রেসের কোন প্রতিনিধি ইহাতে যোগ না দিলে একপ্রকার ভাঙ্গাহাটের ন্যায়ই এই অধিবেশন সামান্য কয়েকজন প্রতিনিধি লইয়া অনুষ্ঠিত হইল। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ স্বভাবতই এই অধিবেশনে সম্ভব হইল না।

ভাঙ্গাহাট অধিবেশন

আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩২-৩৪): দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক হইতে মহাত্মা গান্ধী হতাশ হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিলে তিনি লক্ষ্য করিলেন যে, সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার প্রবর্তনে অনিচ্ছার ফলে এক দারুণ উত্তেজনা দেখা দিয়াছে। তদুপরি প্রথম আইন অমান্য আন্দোলনের কালে পুলিশী অত্যাচারের যে তদন্ত গান্ধী-আরউইন চুক্তি অনুসারে করিবার কথা ছিল তাহা প্রহসনে পরিণত হইয়াছে। উত্তরপ্রদেশে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সরকার কৃষকদের সহিত কোনপ্রকার আলোচনা না করিয়া বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করিতে আরম্ভ করিলে কংগ্রেসের নির্দেশে তাহারা পুনরায় রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। এজন্য জওহরলাল নেহ্‌রু ও পুরুষোত্তম-দাস টেণ্ডনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে 'লাল কোর্তা'দের অর্থাৎ খোদা-ই-খিদ্‌মৎগারদের সংগঠন বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। খান আব্দুল গফ্‌ফর খাঁ ও তাঁহার ভ্রাতা খান সাহেব এবং অসংখ্য লাল কোর্তাকে জেলে আটক করা হইয়াছে। বাংলাদেশে বিপ্লবী সন্ত্রাস পুনরায় শুরু হওয়ায় সরকারী দমন নীতি সহ্যের সকল সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছে। যুক্তপ্রদেশ, বাংলাদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সর্বত্র পুলিশী তাণ্ডবে এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর ভারতে পৌঁছিয়া পরদিনই এই সকল অত্যাচারের বিরুদ্ধে নূতন ভাইস্‌রয় লর্ড উইলিংডনের (১৯৩১-৩৬) নিকট প্রতিবাদ জানাইলেন এবং এ-বিষয়ে তাঁহার সহিত আলোচনা করিতে চাহিলেন। কিন্তু উভয় পক্ষে চিঠি, টেলিগ্রামের আদানপ্রদানের পর শেষ পর্যন্ত লর্ড উইলিংডন মহাত্মা গান্ধীর সহিত সাক্ষাৎ করিতেও রাজী হইলেন না। বস্তুত, ইহাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, গান্ধী-আরউইন চুক্তির ফলে ব্রিটিশ সরকারের মর্যাদায় যে আঘাত লাগিয়াছিল তাহার পূর্ণমাত্রায় প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য পরবর্তী গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় লর্ড উইলিংডন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীর প্রত্যাবর্তনের কালে রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ভাইস্‌রয় লর্ড উইলিংডনের অনমনীয় নীতি

এইরূপ পরিস্থিতিতে আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হইল। আইন অমান্য আন্দোলন ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সরকার গান্ধীজী এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে কারারুদ্ধ করিলেন। অপরাপর কংগ্রেসী নেতাদেরও আটক করা হইল। কংগ্রেসকে বেআইনী ঘোষণা করিয়া কংগ্রেসের তহবিল বাজেয়াপ্ত, কংগ্রেস অফিস বন্ধ করিয়া দিয়া কংগ্রেসী আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে দমনের চেষ্টা সরকার শুরু করিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশ, মিলিটারির অত্যাচার, অগণিত কংগ্রেস কর্মীকে বিনা বিচারে কারাগারে নিক্ষেপ, লাঠি ও গুলি চালনা, স্ত্রীজাতির সম্মানহরণ, বিস্তীর্ণ এলাকার উপর পাইকারী জরিমানা ধার্যকরণ প্রভৃতি কার্যের ফলে দেশের সর্বত্র এক সন্ত্রাসের শাসন কায়েম হইল। জেলের অভ্যন্তরে সত্যাগ্রহীদের উপর অমানুষিক নির্যাতন করিতেও সরকার দ্বিধাবোধ করিলেন না। অত্যাচার, নিপীড়ন, পুলিশ ও সেনাবাহিনীর অকথ্য অত্যাচার উপেক্ষা করিয়া লক্ষ লক্ষ নারী ও পুরুষ আইন অমান্য আন্দোলন চালাইয়া যাইতে লাগিল।

দ্বিতীয় আইন অমান্য আন্দোলন ও সরকারী দমন নীতি

ইতিমধ্যে (১৯৩২) প্রধান মন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (Communal Award) প্রবর্তন করিলেন। অর্থাৎ মুসলমান, খ্রীষ্টান এবং হিন্দুদের মধ্যে অনুন্নত সম্প্রদায়, শিখ, এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়কে পৃথকভাবে, নিজ নিজ প্রতিনিধি আইনসভায় নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইল। এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারতের জাতীয় ঐক্য বিনাশ করিতে চাহিলেন। হিন্দুদের মধ্যেও যাহাতে বিভেদ সৃষ্টি হয় সেজন্য অনুন্নত হিন্দু সম্প্রদায়কে পৃথক নির্বাচনের অধিকার দিয়া ইংরেজগণ তাহাদের কূট বুদ্ধির পরিচয় দিল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ শেষ পর্যন্ত হিন্দু সমাজকেও বিভক্ত করিতে চলিয়াছে দেখিয়া মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রতিবাদে আমরণ অনশন শুরু করিলেন। শেষ পর্যন্ত অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতা ডক্টর আম্বেদকার ও গান্ধীজীর মধ্যে 'পুনা চুক্তি' (Poona Pact) নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল। ইহাতে অনুন্নত সম্প্রদায়কে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা অনুযায়ী যতটি সদস্যপদ দেওয়া হইয়াছিল তাহার দ্বিগুণ সংখ্যক সদস্যপদ তাহাদিগকে দিতে স্বীকৃত হইয়া হিন্দুদের পৃথক ভোটের ব্যবস্থা নাকচ করিলেন। বাধ্য হইয়া ব্রিটিশ সরকার সমগ্র হিন্দুজাতির যৌথ নির্বাচনের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলেন। এইভাবে গান্ধীজী হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ বন্ধ করিলেন।

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা (১৯৩২)

পুনা চুক্তি

পুনা চুক্তির পরও আইন অমান্য আন্দোলন কিছুকাল চলিতে লাগিল। কিন্তু ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে তারিখে মহাত্মা গান্ধী আত্মশুদ্ধির জন্য একুশ দিনের অনশন শুরু করিলেন এবং কংগ্রেসের সভাপতি অর্থাৎ প্রেসিডেণ্টকে আইন অমান্য আন্দোলন সাময়িকভাবে প্রত্যাহার করিয়া লইতে অনুরোধ করিলেন। এইভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার করা হইলে ভারতবাসী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইল, কিন্তু অনশনরত মহাত্মা গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে এই ক্ষোভ দেখাইল না।

সাময়িকভাবে আন্দোলন প্রত্যাহার

ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধী মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট হইতে তিনি ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করিলেন। এজন্য তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এক বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হইল। কিন্তু তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া পর পর বহু কংগ্রেসী নেতা ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করিয়া কারাবরণ করিলেন। কারারুদ্ধ অবস্থায় মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতা দূর করিবার আন্দোলন চালাইতে চাহিলে সরকার তাহাতে বাধা দান করেন। এজন্য তিনি অনশন শুরু করিলে ক্রমেই তাঁহার অবস্থা খারাপের দিকে যাইতে থাকে। এমতাবস্থায় আগস্ট মাসে (২৩ তারিখ) সরকার তাঁহাকে বিনা শর্তে মুক্তি দেন। গান্ধীজী ইহার পর হরিজনদের অবস্থার উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে জানুয়ারি মাসে বিহারে এক প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প হইলে সকলের দৃষ্টি সেই দিকে পতিত হইলে আইন অমান্য আন্দোলন আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল।

গান্ধীজীর ব্যক্তিগত আইন অমান্য আন্দোলন

আন্দোলনের অবসান

তথাপি জওহরলাল নেহরু এবং ভিয়েনায় অবস্থানরত বিঠলভাই প্যাটেল ও সুভাষচন্দ্র বসু মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক আকস্মিকভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই আন্দোলনে প্রায় এক লক্ষ কুড়ি হাজার সত্যাগ্রহীকে বন্দী করা হইয়াছিল। সরকারী অত্যাচার বর্বরতার নীচতম পর্যায়ে পৌঁছিয়াছিল। স্ত্রীলোকের সম্ভ্রমহানি, জনতার উপর ঝাঁকে ঝাঁকে গুলিবর্ষণ, জেলখানার অভ্যন্তরে নির্যাতন, সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ, যাহা কিছু ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতায় প্রয়োগ করা সম্ভব হইয়াছিল তাহা সবই করিতে সরকার ত্রুটি করেন নাই। অথচ আকস্মিকভাবে এই আন্দোলন বন্ধ করিবার ফলে এই বিরাট আত্মত্যাগ বিফলতায় পর্যবসিত হইয়াছে এই ধারণা সর্বত্র জন্মিল। মহাত্মা গান্ধীর দিক হইতে এই আন্দোলন বন্ধ করিবার মূল যুক্তি ছিল সরকারী নির্যাতনের কষ্ট হইতে ভারতবাসীকে রক্ষা করা। লর্ড উইলিংডনের আমলে ব্রিটিশ অত্যাচার ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় রচনা করিয়াছিল। ইতিপূর্বে কোন আন্দোলনে নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীর উপর এইরূপ অত্যাচার করা হয় নাই। ইহা ভিন্ন সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষক্রিয়া ভারতবাসীর ঐক্য বিনষ্ট করিতে চলিয়াছিল। এই সবকিছু মিলিয়া মহাত্মা গান্ধীকে ব্রিটিশ সরকারের মানবতাবোধ সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করিয়াছিল। সেনাপতির দায়িত্বই হইল পরিস্থিতি বিবেচনায় পশ্চাদপসরণ করিয়া নিজ বাহিনীকে রক্ষা করা। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের দায়িত্ববোধই তাঁহাকে এই আন্দোলন বন্ধ করিতে বাধ্য করিয়াছিল বলিলে ভুল হইবে না। যদিও অনেকে অন্তরের সহিত ইহা সমর্থন করিতে পারে নাই।

আন্দোলন প্রত্যাহারের যুক্তি

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইন : সাইমন কমিশনের সুপারিশ এবং গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনার ভিত্তিতে যে খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল উহা হইতে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইন (Government of India Act, 1935)

রচিত হইল। এই আইনের দ্বারা (১) ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি লইয়া একটি যুক্ত-রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপন করা হয়। (২) প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়। প্রাদেশিক সরকার নির্বাচিত আইনসভার নিকট কৃতকার্যের জন্য দায়ী থাকিবেন এই নীতি স্বীকৃত হয়। এই প্রধান দুইটি নীতি ভিন্ন (৩) ভারত-সচিবের (Secretary of State for India) পদটি উঠাইয়া দেওয়া হয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইনের শর্তাদি

(৪) দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিবে কি না সেই প্রশ্নের মীমাংসা দেশীয় রাজ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হয়। (৫) পররাষ্ট্র সম্পর্ক, দেশরক্ষা ও খ্রীষ্টধর্মসংক্রান্ত বিষয়গুলি পরিচালনার ভার গভর্ণর-জেনারেলের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। এই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর কেন্দ্রীয় আইনসভাকে কোন ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। এই সকল কাজের জন্য গভর্ণর-জেনারেল ইংলণ্ডের ব্রিটিশ সরকারের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৬) গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণরদিগকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে আইন-সভার মতামত নাকচ করিয়া নিজেদের বিবেচনা অনুসারে কাজ করিতে পারিবেন, এবং সেইরূপ কাজের জন্য তাঁহারা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকিবেন। (৭) আইনসভার কার্যকাল পাঁচ বৎসর করা হয়।

ভারত আইনের (১৯৩৫) শর্তাদি লক্ষ্য করিলে একথা স্পষ্টভাবে বুঝিতে পারা যায় যে, এগুলি ভারতীয়দের হস্তে শাসনক্ষমতা পূর্ণমাত্রায় না দিয়া ভারতকে ব্রিটিশ সরকারের অধীনে রাখিবার ব্যবস্থাই করিয়াছিল। কেবলমাত্র স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা কতক পরিমাণে বৃদ্ধি করা হইয়াছিল, শাসনকার্যের প্রকৃত ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণরদের হস্তে রাখা হইয়াছিল।



লর্ড লিনলিথগাও

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত আইন পাশ করা হইলেও কংগ্রেসের আপত্তির জন্য উহা কার্যকরী করা সম্ভব হইল না।

লর্ড লিনলিথগাও-এর প্রতিশ্রুতি

কংগ্রেসের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল এই যে, ইহাতে গভর্ণর-জেনারেল ও গভর্ণরদের হস্তে আইনসভা ও মন্ত্রিসভার কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ এবং নাকচ করিবার ক্ষমতা দিয়া গণতান্ত্রিক নীতির বিরোধিতা করা হইয়াছিল। অবশেষে তদানীন্তন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড লিনলিথগাও (Lord Linlithgow) মন্ত্রিসভা ও আইনসভার দৈনন্দিন কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করিবেন না প্রতিশ্রুতি দিলে কংগ্রেস ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সংস্কারের কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অংশটি কার্যকরী করিতে স্বীকৃত হইল।

কংগ্রেসের সাফল্য ও সরকার গঠন: ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপে হতাশা ও পদত্যাগ: ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল তাহাতে কংগ্রেস

তখনকার মোট এগারটি প্রদেশের সাতটিতে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এগুলিতে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করে। সিন্ধু ও আসামে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না হইলেও দল হিসাবে কংগ্রেসের সদস্যসংখ্যা ছিল সর্বাধিক। এই দুই প্রদেশে কংগ্রেসের নেতৃত্বে যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। মোট এগারটি প্রদেশের মধ্যে কেবল বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগের সদস্যসংখ্যা বেশি ছিল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ বাংলা ও পাঞ্জাব এবং ভারতের অপরাপর প্রদেশে কংগ্রেস-মুসলিম লীগ যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করিলেন। বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের আদর্শ গ্রহণ করিলে যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস স্বীকৃত হইবে জানাইল। অপরাপর প্রদেশে মুসলিম লীগের সহিত যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাবে কংগ্রেস স্বীকৃত হইবার কোন কারণই ছিল না। মুসলিম লীগ কংগ্রেসী আদর্শ গ্রহণ না করিলে বাংলা ও পাঞ্জাবে যুগ্ম মন্ত্রিসভা গঠনে কংগ্রেস সাহায্য করিল না। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এই দুই প্রদেশেও মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিলেন না। তিনি কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির বিরুদ্ধে বিষোদ্গীরণ শুরু করিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি এবং তাঁহার মুসলিম লীগের সদস্যগণ ভারতের সর্বত্র সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে মনোনিবেশ করিলেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের সাফল্য

মহম্মদ আলি জিন্নাহের হতাশা : সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি

এদিকে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার কার্যদক্ষতায় সর্বত্র কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা শতগুণে বৃদ্ধি পাইল। সেই সময়ে কংগ্রেসে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে একটি বাম-পন্থী দলের উদ্ভব ঘটিল। সুভাষচন্দ্রের জনপ্রিয়তা এত বেশি ছিল যে, গান্ধীজী, রাজাজী, প্যাটেল প্রমুখ দক্ষিণ-পন্থী নেতার মনোনীত প্রার্থী পট্টভি সীতারামিয়াকে অসংখ্য ভোটে পরাজিত করিয়া সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতিরূপে জয়লাভ করিলেন। কিন্তু ত্রিপুরী কংগ্রেসে দক্ষিণ-পন্থীদের সহিত তাঁহার মতানৈক্য তীব্র আকার ধারণ করিলে শেষ পর্যন্ত সুভাষচন্দ্রকে পদত্যাগ করিতে হইল। তিনি কংগ্রেস হইতে বাহির হইয়া গিয়া 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি বাম-পন্থী দল গঠন করিলেন। ঐ বৎসরই (১৯৩৯) ভারত-সরকার কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার সহিত আলোচনা না করিয়াই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি-ইতালির বিরুদ্ধে ভারতবর্ষকেও জড়াইলেন। এই যুদ্ধে সাহায্য দান করিবার পূর্বে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধের আদর্শ কি এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান সেই যুদ্ধের আদর্শ কি না, সে-বিষয়ে জানিতে চাহিলে ব্রিটিশ সরকার কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না। লর্ড লিনলিথগাও (১৯৩৬-৪৩) মাত্র এইটুকু আশ্বাস দিলেন যে যুদ্ধ চলা কালে ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া একটি মন্ত্রণা পরিষদ গঠিত হইবে এবং উহার মতামত লইয়া সরকার যুদ্ধ পরিচালনা এবং যুদ্ধসংক্রান্ত পরিস্থিতি ও সমস্যার মোকাবিলা করিবেন। ভারতের

সুভাষচন্দ্র বসুর সহিত দক্ষিণ-পন্থী কংগ্রেসী সদস্যদের মতানৈক্য

সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ এবং ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারত-সরকারের যোগদান—কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পদত্যাগ

স্বাধীনতা সম্পর্কে একটি কথাও এই ঘোষণায় বলা হইল না। ইহাতে কংগ্রেস অত্যন্ত হতাশ হইল। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা এমতাবস্থায় পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পদত্যাগ মহম্মদ আলি জিন্নাহ্কে অত্যন্ত উৎফুল্ল করিয়া তুলিল। তিনি কংগ্রেসের এই পদত্যাগকে এক নিষ্কৃতি দিবস (Day of Deliverance) পালনের মাধ্যমে স্বাগত জানাইলেন এবং সেই সুযোগে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভা গঠিত হইল।

কংগ্রেস মন্ত্রিসভার কার্যকালে মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায় অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের কাল্পনিক অভিযোগ করিয়া চলিতেছিলেন। এই ব্যাপারে ভারতের তদানীন্তন উচ্চতম বিচারালয় ফেডারেল কোর্টের (Federal Court) প্রধান বিচারপতি স্যার্ মরিস গয়ারের সভাপতিত্বে নিরপেক্ষ তদন্ত হউক একথা কংগ্রেস হইতে প্রস্তাব করা হইলে জিন্নাহ্ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন না। জিন্নাহের কাল্পনিক অভিযোগগুলির প্রত্যুত্তরে কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান নেতা আবুল কালাম আজাদ এই সকল অভিযোগ 'সম্পূর্ণ মিথ্যা' এই কথা স্পষ্টভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন। কংগ্রেস মন্ত্রিসভার আমলে মুসলমান তথা কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি কোন অবিচার করা হয় নাই একথাও তিনি ঘোষণা করিয়াছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অপরাপর নেতার সহিত পুরোভাগে থাকিয়া, এবং দেশসেবার ও জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অভিযোগে ব্রিটিশ কারাগারে তাঁহাকে বন্দী করা হইয়াছিল। সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা হইতে উর্ধ্বে থাকিয়া, এবং কংগ্রেসের নীতি নির্ধারণে চিত্তরঞ্জন দাশ, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহ্রু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতির সহিত একযোগে কাজ করিয়া মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়া আছেন।

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মানি ইঙ্গ-ফরাসী মিত্রশক্তিকে সর্বত্র পরাজিত করিয়া চলিয়াছে সেই সময়ে কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধে সাহায্য-সহায়তা দানে প্রস্তুত হইল। কিন্তু ইহার শর্ত ছিল এই যে, ব্রিটিশ সরকার অন্তত সাময়িকভাবে একটি জাতীয় (কেন্দ্রীয়) মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন। কিন্তু লর্ড লিনলিথগাও জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠনে স্বীকৃত হইলেন না। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই আগস্ট একটি ঘোষণায় তিনি একথা জানাইলেন যে, যুদ্ধ অবসানে ভারতের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধানসভা আহূত হইবে। ইহা ভিন্ন, তিনি অনতিবিলম্বে তাঁহার কার্য-নির্বাহক সভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিতে এবং ভারতের সর্বাংশের প্রতিনিধি লইয়া একটি যুদ্ধ-মন্ত্রণা সভা গঠন করিতে রাজী হইলেন। একমাত্র কংগ্রেসের হস্তে তিনি শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবেন না একথাও জানাইলেন। ইহার অন্য অর্থ ছিল এই যে মুসলিম লীগকে তিনি বাদ দিয়া কিছু করিবেন না। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ এই ঘোষণায় অত্যধিক উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন।

কংগ্রেস কর্তৃক জাতীয় মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি

লর্ড লিনলিথগাও-এর আগস্ট ঘোষণা

ভারতে হিন্দু ও মুসলমান দুই জাতি এই তত্ত্ব মহম্মদ আলি জিন্নাহের নিজস্ব উদ্ভাবন নহে। স্যার্ সৈয়দ আহ্‌মদ খান ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মীরাটে এক বক্তৃতায় সর্বপ্রথম বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু ও মুসলমান কেবল দুইটি পৃথক জাতি-ই নহে, ইহারা পরস্পর সংঘর্ষেও লিপ্ত বটে। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে কবি ও রাজনীতিক মহম্মদ ইক্‌বাল মুসলমানদের জন্য পৃথক রাষ্ট্রের প্রস্তাব করেন। গোলটেবিল বৈঠকের সময় ক্যাম্‌ব্রিজে পাঠরত রহমৎ আলি পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করেন, কিন্তু দায়িত্বশীল মুসলমান নেতৃবৃন্দ ইহা ছাত্রদের অপরিণত বুদ্ধিপ্রসূত পরিকল্পনা বলিয়া আখ্যাত করেন এবং উহা প্রত্যাখ্যান করেন। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দেও এই প্রশ্ন উঠিলে ইহাকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ দ্বি-জাতিতত্ত্ব ও পাকিস্তান দাবি পুনরুজ্জীবিত করেন। তিনি ঘোষণা করিলেন (জানুয়ারি, ১৯৪০) যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দুইটি পৃথক জাতি। তাহাদের পার্থক্য কেবল ধর্মগত নহে, জাতিগতও বটে। এই কারণে তিনি মুসলমানদের জন্য 'পাকিস্তান' নামে একটি পৃথক রাষ্ট্র-গঠনের দাবি উত্থাপন করিলেন।

মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর 'দুই-জাতি মতবাদ' (Two-Nation Theory)

প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ জিন্নাহ্-এর এই 'দুই-জাতি মতবাদ' সমর্থন করিলেন না। কিন্তু জিন্নাহ্ জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে চাহিলেন না। মুসলিম লীগ ভারতীয় মুসলমানদের একমাত্র মুখপাত্র এই দাবি তিনি করিতে লাগিলেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ 'পাকিস্তান দাবি'র প্রস্তাব গ্রহণ করিল। সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তিসম্পন্ন মুসলিম লীগের সদস্যবর্গ জিন্নাহ্-এর এই ভারতীয় ঐক্য-বিরোধী প্রস্তাব সহজেই গ্রহণ করিয়া সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াইতে লাগিল। হিন্দু-মুসলমানদের মতানৈক্যের অজুহাতে ব্রিটিশ সরকার ভারত ছাড়িয়া যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে স্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিয়া গেলে সাম্প্রদায়িকতার বিষ আপনা হইতেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেস-মুসলিম লীগ অনৈক্যের সুযোগ গ্রহণ করিয়া টিকিয়া রহিলেন। মহাত্মা গান্ধী পুনরায় ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করিলেন।

লীগের লাহোর অধিবেশন—'পাকিস্তান দাবি' (১৯৪০)

মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ

সপ্তম অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া

(Impact of the Second World War)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সাহায্য-সহায়তা দানের শর্ত হিসাবে কংগ্রেস অবিলম্বে একটি জাতীয় সরকার (National Government) গঠন এবং ভারতের স্বাধীনতা ও ভারতীয় প্রতিনিধি লইয়া একটি সংবিধানসভা স্থাপনের প্রতিশ্রুতি ব্রিটিশ সরকারের নিকট দাবি করিয়াছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসের এই সকল শর্ত মানিতে রাজী হইলেন না। এদিকে মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ও তাঁহার মুসলিম লীগ কংগ্রেসের দাবির ব্যাপারে একমত না হওয়ায় গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগাও একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইলেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলির পদত্যাগের সুযোগে মুসলিম লীগ কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে। তদুপরি জিন্নাহ্ ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানগণ দুইটি পৃথক জাতি, এই মতবাদ (Two-Nation Theory) চালু করিলে ব্রিটিশ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী বিভেদনীতি আরও শক্তি সঞ্চয় করিল, তাঁহারা আরও আশ্বস্ত হইলেন।

কংগ্রেসের সাহায্যের শর্ত ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক প্রত্যাখ্যান

কিন্তু এই স্বস্তির ভাব দীর্ঘস্থায়ী হইল না। জাপানের জার্মানি-ইতালির পক্ষে যোগদান আকস্মিকভাবে যুদ্ধ পরিস্থিতির এক ভয়াবহ পরিবর্তন ঘটাইল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধে যোগদান করিয়া দ্রুতগতিতে সিঙ্গাপুর ও মালয় দখল করিয়া ব্রহ্মদেশের সীমার অভ্যন্তরে পোঁছিলে ব্রিটিশ সরকারের টনক নড়িল। একথা স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, জাপান ভারতবর্ষও আক্রমণ করিবে। জাপানের যুদ্ধে যোগদানের কয়েকদিন পূর্বে (৩রা ডিসেম্বর, ১৯৪১) সরকার জওহরলাল নেহরু, মৌলানা আজাদ প্রমুখ নেতা-সহ সত্যাগ্রহীদের মুক্তি দিয়াছিলেন। জাপান যুদ্ধে যোগদানের সঙ্গে সঙ্গে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড লিনলিথগাও ভারতবাসীর নিকট একটি প্রকাশ্য আবেদনে একটি ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার কথা উল্লেখ করিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। কংগ্রেস স্পষ্টভাবে জানাইল যে, একমাত্র স্বাধীন ভারত দেশের প্রতিরক্ষার এবং বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারিবে। অর্থাৎ ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটিশের সহিত যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতার একমাত্র শর্ত, একথা কংগ্রেস জানাইল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে জাপান রেঙ্গুন দখল করিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সহিত আপসের প্রয়োজন বোধ করিলেন।

জাপানের যুদ্ধে যোগদান : ব্রিটিশ সরকারের নীতি পরিবর্তন

ক্রীপস্ মিশন বা দৌত্য (Cripps Mission): ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী উইন্স্টন্ চার্চিল (Winston Churchill) ঘোষণা করিলেন (১১ই মার্চ, ১৯৪২) যে, ভারতবাসীর ঐক্যবদ্ধ সাহায্যের মাধ্যমে জাপানী আক্রমণ রোধের ব্যবস্থা

উদ্ভাবনের জন্য ব্যক্তিগতভাবে আলাপ-আলোচনা করিতে স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে (Sir Stafford Cripps) ভারতবর্ষে প্রেরণ করা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা স্থির করিয়াছেন। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ক্রীপস্ মিশন প্রেরণের পশ্চাতে মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টেরও চাপ ছিল। কিছুকাল পূর্ব হইতেই মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব কর্ডেল হাল (Cordell Hull) ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য ব্রিটিশ সরকারের সহিত আলোচনা চালাইতেছিলেন।* তদানীন্তন চীনের রাষ্ট্রপ্রধান

ব্রিটিশ সরকারের উপর মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের চাপ



রুজভেল্ট



চিয়াং কাই-শেক্



উইন্‌স্টন্ চার্চিল

জেনারেলেসিমো চিয়াং কাই-শেক্‌ও (Generalissimo Chiang Kai-shek) ভারতের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের নীতি অবিলম্বে পরিবর্তনের প্রয়োজনের কথা মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টকে জানাইয়াছিলেন।

যাহা হউক, মূলত জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর সমর্থন লাভের উদ্দেশ্য লইয়া স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে ভারতে প্রেরণ করা হইল। ক্রীপস্ যে-সকল প্রস্তাব ভারতীয় নেতৃবর্গের সম্মুখে বিবেচনার জন্য উপস্থিত করিলেন তাহা ছিল এইরূপ: (১) ভারতে স্বায়ত্তশাসন স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন পর্যায়ে উন্নীত করা হইবে। অর্থাৎ কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন সেই সময়ে যে-সকল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ও মর্যাদা ভোগ করিত তাহা ভারতবর্ষকে দেওয়া হইবে এবং অবিলম্বে গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হইবে। (২) যুদ্ধাবসানে ভারতবাসীর নিজ সংবিধান রচনার জন্য একটি সংবিধানসভা গঠন করা হইবে। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিকে



স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্

* Vide: R. C. Majumdar: *History of the Freedom Movement in India.* Vol. III. pp. 617-18.

নিজ নিজ জনসংখ্যার অনুপাতে সংবিধানসভায় প্রতিনিধি প্রেরণের সুযোগ দেওয়া হইবে। (৩) সংবিধানসভা কর্তৃক গৃহীত সংবিধান ভারতে কার্যকরী করা হইবে, কিন্তু কোন প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য উহা গ্রহণে অস্বীকৃত হইলে সেই প্রদেশ বা দেশীয় রাজ্য নিজস্ব সংবিধান গঠন করিতে পারিবে। ব্রিটিশ সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সেগুলি মানিয়া চলা হইবে, এই প্রতিশ্রুতি সম্বলিত একটি চুক্তি সংবিধানসভা ও ব্রিটিশ সরকারের মধ্যে স্বাক্ষর করিতে হইবে। (৪) প্রাদেশিক আইনসভার নিম্ন কক্ষ অর্থাৎ লেজিস্লেটিভ এ্যাসেম্বলীর (Legislative Assembly) সদস্যগণ সংবিধানসভার প্রতিনিধিদের নির্বাচন করিবেন। (৫) সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতে থাকিবে।

ক্রীপসের প্রস্তাব

স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ একথা স্পষ্টভাবেই জানিতেন যে, তাঁহার প্রস্তাব সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার সাফল্য প্রধানত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকৃত ক্ষেত্রে আলোচনা প্রধানত কংগ্রেসের সহিতই তাঁহাকে করিতে হইল, কারণ কংগ্রেসই ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী দল। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও নেহরু কংগ্রেসের পক্ষে এই আলোচনায় যোগ দিয়াছিলেন। কংগ্রেস চাহিয়াছিল অনতি-বিলম্বে যে সরকার গঠিত হইবে তাহাতে ভারতীয় প্রতিনিধির উপর দেশরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকিবে। ব্রিটিশ সরকার রাজী না হইলে কংগ্রেস ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। এ-বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর মন্তব্যটি প্রণিধান-যোগ্য। তিনি স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্-এর প্রস্তাবকে a post-dated cheque on a crashing bank অর্থাৎ ধ্বংসোন্মুখ ব্যাংকের উপর ভবিষ্যতে ভাঙ্গানো যাইবে এরূপ একখানা চেক্ বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। ক্রীপস্ প্রস্তাবে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধির সর্বাত্মক প্রাধান্য কোন অংশে হ্রাসের চেষ্টা করা হয় নাই। স্বভাবতই কংগ্রেসের নিকট ক্রীপস্ প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হইল না। হিন্দু মহাসভা, শিখ সম্প্রদায়ও এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার কথা প্রস্তাবে উল্লিখিত থাকিলেও, যেহেতু উহাতে পাকিস্তান দাবি স্বীকৃত হয় নাই সেই হেতু মুসলিম লীগ এই প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃত হইল।

কংগ্রেস কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

মুসলিম লীগ কর্তৃক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

এদিকে জাপানী সৈন্য ক্রমেই ভারতের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। ক্রীপস্ মিশনের বিফলতা, বিদেশী আক্রমণের ভীতি সবকিছু মিলিয়া ভারতের সর্বত্র এক নিরাশার সৃষ্টি হইল। ভারতবর্ষ এবং ব্রিটেন উভয়ের নিরাপত্তার দিক্ দিয়া ভারতকে নিজ ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই ব্রিটিশ সরকারের উচিত এরূপ মন্তব্য করিয়া মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ত্যাগ করিয়া যাইতে অনুরোধ করিয়া তাঁহার 'হরিজন' পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ করিলেন (১৯শে এপ্রিল, ১৯৪২)।

ক্রীপস্ দৌত্যের বিফলতার পর কংগ্রেসের পক্ষে ভারতে ব্রিটিশ সরকারের কোনপ্রকার প্রাধান্য বজায় রাখিয়া শাসনতান্ত্রিক কোন সংস্কার গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। স্বভাবতই ব্রিটিশ সরকারের সহিত কোনপ্রকার সহযোগিতা করিবার প্রশ্ন আর রহিল না।

'ভারত ছাড়' আন্দোলন (আগস্ট, ১৯৪২) : মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ব্রিটিশ সরকারকে ভারত ছাড়িয়া যাইতে অনুরোধ সম্বলিত প্রস্তাব (Quit India) গ্রহণ করিল। যুক্তি হিসাবে বলা হইল যে, ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে ভারতকে বিদেশী আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করা সম্ভব নহে। আর জাপানের যুদ্ধ ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে নহে, জাপান ব্রিটিশের শত্রু। ভারতে ব্রিটিশ শাসন বিদ্যমান এজন্যই জাপান ভারত আক্রমণে উদ্যত। ব্রিটেন ভারত ছাড়িয়া গেলে ভারতবাসী জাপানের সঙ্গে একটা মীমাংসা করিয়া লইতে পারিবে। ঐ বৎসরের আগস্ট মাসে (৭ তারিখ) কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা শুরু হইল। ৮ই আগস্ট ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব অনুমোদিত হইলে, পরের দিন প্রাতঃকালে কংগ্রেসী নেতৃবর্গকে কারারুদ্ধ করা হইল। কংগ্রেসকে বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ফলে ভারতের সর্বত্র এক ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দিল। মহাত্মা গান্ধীর 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আদর্শে অনুপ্রাণিত সহস্র সহস্র ভারতবাসী নেতৃহীন অবস্থায় এক দারুণ আন্দোলনের সৃষ্টি করিল। সরকারী সম্পত্তি, রেলপথ, ডাকঘর, তারের লাইন, থানা প্রভৃতি নাশ করিয়া ভারতীয়রা ব্রিটিশ সরকারের প্রতি বিদ্বেষভাব প্রকাশ করিল। আন্দোলন শহর, নগর, গ্রামাঞ্চল সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা অচল করিয়া দেওয়া এবং যোগাযোগ ও সংযোগ ব্যবস্থা বিনাশ করিয়া সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টার ব্যাঘাত সৃষ্টি করাই ছিল এই আন্দোলনের লক্ষ্য। বাংলাদেশের মেদিনীপুর জেলা 'ভারত ছাড়' বা আগস্ট আন্দোলনে এক অভূতপূর্ব আত্মত্যাগ ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়াছিল। আন্দোলন সেখানে প্রকৃত বিপ্লবের রূপ ধারণ করিয়াছিল। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরার জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকিয়া পুলিশের গুলিতে প্রাণদান সমগ্র বাংলাদেশ তথা ভারতে দেশের জন্য চরম আত্মত্যাগের এক অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছিল। অজয় মুখার্জী প্রমুখ কংগ্রেসসেবীর নেতৃত্বে তমলুক মহকুমায় এক জাতীয় সরকার

'ভারত ছাড়' দাবি

আগস্ট আন্দোলন (১৯৪২)

'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' প্রতিজ্ঞা

মেদিনীপুর ও আগস্ট আন্দোলন



মাতঙ্গিনী হাজরা

গঠন করা হইয়াছিল। ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর হইতে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট পর্যন্ত এই সরকার বজায় ছিল। ঐ সময়ে সেই অঞ্চলে কিছুকালের জন্য ব্রিটিশ শাসন বলিয়া কিছু ছিল না। যুক্তপ্রদেশের (অধুনা উত্তর-প্রদেশ) বালিয়া জেলায় আন্দোলন বিদ্রোহের আকার ধারণ করিয়াছিল এবং সাময়িকভাবে সেখানেও স্বাধীনতা ঘোষণা করা হইয়াছিল। বিহারের ভাগলপুর জেলার উত্তরাংশেও অনুরূপ স্বাধীন সরকার স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েক মাস এই স্বাধীন সরকার বজায় ছিল। ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে মরিয়া হইয়া উঠিলেন। পুলিশের অত্যাচার, সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ, অসংখ্য আন্দোলনকারীকে গ্রেপ্তার, স্ত্রীজাতির প্রতি বর্বরতা কোন কিছুই বাদ গেল না। প্রায় দশ হাজার লোক পুলিশ ও মিলিটারির গুলিতে প্রাণ হারাইয়াছিল। অসংখ্য লোককে বন্দী করা হইয়াছিল।

বালিয়া ও ভাগলপুর

ব্রিটিশ অত্যাচার

নেতৃহীনভাবে স্বতঃস্ফূর্ত এই আন্দোলন কোন কোন অঞ্চলে হিংসাশ্রয়ী হইয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে আশ্চর্যের কিছু নাই। মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল ও মৌলানা আজাদ এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের নিন্দা করিলেন, কিন্তু এজন্য কংগ্রেসের কোন দায়িত্ব ছিল না একথাও স্পষ্টভাবে জানাইলেন। অবশ্য আন্দোলন-কালে নানা প্রকার হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছিল বলিয়া মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘ তিন সপ্তাহ অনশন শুরু করিলেন। অনশনকালে তাঁহার জীবনসংশয় দেখা দিল। তাঁহাকে মুক্তি দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া অকৃতকার্য হইলে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধির কার্য-নির্বাহক সভার তিনজন সদস্য পদত্যাগ করিলেন। মহাত্মা গান্ধী অবশ্য এই অনশন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন। সেই সময়ে (১৯৪৩) বাংলাদেশে মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার স্বার্থপর নীতি ও অকর্মণ্যতার ফলে এক দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। কলিকাতার পথে পথে অসংখ্য লোক খাদ্যাভাবে প্রাণ হারাইল। ছিয়াত্তরের (১১৭৬ বঙ্গাব্দ, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ) মন্বন্তরের পর এইরূপ দুর্ভিক্ষ ভারতের কোন অংশে ঘটে নাই।

মহাত্মা গান্ধীর অনশন

বাংলার দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩)

নেতাজী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ* : সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন একজন নির্ভীক বিপ্লবী।

---

* এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে, ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে (১৫ই ডিসেম্বর) সিঙ্গাপুরে ভারতীয় সৈনিক জেনারেল মোহন সিং জাপান কর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈনিকদের লইয়া 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল আর্মি' (Indian National Army) নামে এক সেনাবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। অপরদিকে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু 'ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ' (Indian Independence League) নামে অপর একটি বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুরে পৌঁছিয়া ২৬শে আগষ্ট (১৯৪৩) তারিখে মোহন সিং ও রাসবিহারী বসুর দুইটি সংগঠনকে আরও শক্তিশালী ও সংযুক্ত করিয়া উহার নামকরণ করিলেন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ' এবং তিনি সেই বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক পদ গ্রহণ করিলেন। (*Soldiers' Contributions to Indian Independence*, Mohan Singh, pp. IX, XIII-XV, 74, 243, 245)

দেশসেবায় দুঃসাহসিকতা, নূতন পন্থা উদ্ভাবন প্রভৃতি গুণের সহিত তাঁহার অসাধারণ সংগঠনী শক্তি তাঁহাকে অল্পকালের মধ্যে সমগ্র ভারতের এক জনপ্রিয় নেতা হিসাবে পরিচিত করিয়াছিল। ত্রিপুরী কংগ্রেস অধিবেশনের পর কংগ্রেসের দক্ষিণ-পন্থীদের সহিত মতানৈক্য হেতু তিনি কংগ্রেসের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন এবং 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নূতন দল গঠন করেন। এজন্য কংগ্রেস হইতে তাঁহাকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাকে নিরাপত্তা আইনে বিনা বিচারে আটক করা হয়। কিন্তু জেলে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁহাকে নিজ বাড়ীতে পুলিশ পাহারাধীনে রাখা হয়। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই ব্রিটিশ ও গোয়েন্দাদের চক্ষে ধূলি দিয়া সুভাষচন্দ্র ছদ্মবেশে দেশ হইতে পলায়ন করেন (১৯৪১)। আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তিনি শেষে জার্মানিতে উপস্থিত হন। সুভাষচন্দ্র হিট্‌লারের ফ্যাসীবাদী নীতির অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন, কিন্তু দেশের স্বাধীনতার জন্য হিট্‌লারের সাহায্য গ্রহণেও তিনি দ্বিধাবোধ করেন নাই। জার্মানির সেনা-বাহিনী কর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া একটি স্বাধীন ভারতের সেনাবাহিনী গঠনে তাঁহার প্রস্তাবে হিট্‌লার সম্মত হন। এইভাবে স্বাধীন ভারত সেনাবাহিনী গঠনের প্রথম পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করেন। তারপর তিনি জাপান এবং জাপান হইতে সিঙ্গাপুরে আসেন। সিঙ্গাপুরে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রমুখ ভারতীয়দের সাহায্যে এবং প্রবাসী ভারতীয়দের অর্থ সাহায্যে জাপান কর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈন্যদের লইয়া তিনি তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ বা স্বাধীন ভারত সেনাবাহিনী আনুষ্ঠানিকভাবে গঠন করেন। সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ সরকার বা স্বাধীন ভারত সরকারও তিনি স্থাপন করেন। তাঁহার এই সরকার ও সেনাবাহিনী গঠনে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে ভাই-ভাইয়ের মত তাঁহার পাশে দাঁড়াইল। সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ ও প্রভাবে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সৈনিকগণ তাঁহার আহ্বানে সাড়া দিয়া সাম্প্রদায়িক ঐক্যের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করিল। সুভাষচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসার প্রকাশ হিসাবে তাঁহাকে সকলে সম্বোধন করিল 'নেতাজী'।

ভারত হইতে পলায়ন



নেতাজী সুভাষচন্দ্র

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজাদ হিন্দ সরকার গঠন

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক হিসাবে সুভাষচন্দ্র তাঁহার সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করিলেন। স্ত্রীলোকদের লইয়া 'ঝাঁসীর রাণী' বাহিনী গঠিত হইল। অপরাপর বাহিনীর নাম দেওয়া হইল গান্ধী ব্রিগেড, নেহরু ব্রিগেড

প্রভৃতি। তারপর আজাদ হিন্দ সরকার ব্রিটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক-ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন (অক্টোবর ২৩, ১৯৪৩)। নেতাজী সুভাষ ধ্বনি তুলিলেন 'দিল্লী চলো'। এই ধ্বনি সমগ্র আজাদ হিন্দ বাহিনীতে প্রতিধ্বনিত হইল। দিল্লী দখল করিয়া ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কবলমুক্ত করাই ছিল এই ধ্বনির মর্মার্থ। তারপর শুরু হইল দিল্লী অভিযান। আজাদ হিন্দ ফৌজের আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া মণিপুর অঞ্চলের ব্রিটিশ ও মার্কিন সৈন্য পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল শহর আজাদ হিন্দ বাহিনীর দখলে চলিয়া গেল। স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা ইম্ফলে সেইদিন প্রবল উত্তেজনা ও আনন্দের মধ্যে উড্ডীন করা হইল।

'দিল্লী চলো'

ইম্ফল অধিকার

আসামের সীমার মধ্যে সসৈন্যে প্রবেশ করিয়া নেতাজী কোহিমা শহরটি দখল করিলেন। অন্যদিকে কাছাড় জেলার শিলচরের অনতিদূরে বিষেণপুর নামক স্থানটি আজাদ হিন্দ ফৌজ কর্তৃক অধিকৃত হইল। এইভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনী যখন পর পর সাফল্য অর্জন করিয়া চলিয়াছে সেই সময়ে যুদ্ধ পরিস্থিতি জাপানের বিরুদ্ধে চলিয়া যায়। আমেরিকার প্রবল আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে জাপান ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি অধিকৃত অঞ্চল ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলে খাদ্যাভাব এবং অপরাপর প্রতিকূল অবস্থা নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে পশ্চাদপসরণে বাধ্য করে। জাপানের পরাজয়ের ফলে শেষ পর্যন্ত আজাদ হিন্দ বাহিনীকে অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণ করিতে হয়। ইহার অব্যবহিত পরে (২৩শে আগস্ট, ১৯৪৫) এক বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষের মৃত্যু ঘটিয়াছে বলিয়া প্রচারিত হয়। এই ঘটনার সত্যতা সম্পর্কে অদ্যাবধি কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয় নাই।

কোহিমা ও বিষেণপুর অধিকার

জাপানের পরাজয়: আজাদ হিন্দ ফৌজের আত্মসমর্পণ

আজাদ হিন্দ ফৌজ যুদ্ধের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সমর্থ হয় নাই সত্য, কিন্তু নেতাজী সুভাষ ও তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ তথা ভারতবাসী মাতৃভূমির মুক্তির জন্য কি পরিমাণ আত্মত্যাগ, দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে প্রস্তুত সেই প্রমাণ রাখিয়া গিয়া ভারতের এবং পৃথিবীর জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সৈনিকদের স্বাধীন সংগঠনী শক্তি, তাহাদের দেশাত্মবোধ, সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থাকিবার মনোবল এবং ব্রিটিশ সরকারকে ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়নের সংকল্প—এই সকল পরিচয় তাহারা ব্রিটিশ সরকারকে দিয়া গিয়াছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আজাদ হিন্দ ফৌজের দেশ উদ্ধারের কার্যকলাপের গভীর প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। পর বৎসর ভারতের নৌ-সেনা বিদ্রোহে ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর আর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় রাখিতে পারিবেন না একথা ভালভাবেই বুঝিতে

নেতাজী সুভাষ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপের গুরুত্ব

পারিলেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের কালও যে শেষ হইয়া আসিয়াছে এ-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। এইখানেই আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজী সুভাষের নৈতিক জয়লাভ ঘটিয়াছিল।

নৈতিক জয়লাভ

আজাদ হিন্দ ফৌজ আত্মসমর্পণ করিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর সম্মুখে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের বিচার করিয়া তাঁহাদিগকে শাস্তি দিতে চাহিলেন। ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবর্গের কয়েক জনকে দিল্লীতে বিচার করিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনী ও ভারতবাসীকে ভয় দেখান। দিল্লীর লাল কেল্লায় তাঁহাদের বিচার হইল (১৯৪৫-৪৬)। কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবর্গের সাহায্যে দণ্ডায়মান হইল। মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান, কর্ণেল ধীলন প্রভৃতি বিচারে মুক্তি পাইলেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের অবশ্য কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃবর্গের বিচার

ওয়াভেল পরিকল্পনা: কারামুক্তির পর (৬ই মে, ১৯৪৪) প্রথমেই মহাত্মা গান্ধী জিন্নাহ্-এর সহিত সন্তোষজনক মীমাংসায় উপস্থিত হওয়া যায় কি না সেজন্য শেষ চেষ্টা করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ পাকিস্তান দাবি ত্যাগ করিতে রাজী হইলেন না। এদিকে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-৪৭) ভারতের নূতন সংবিধান প্রস্তুতির পূর্বাবধি একটি জাতীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। লর্ড ওয়াভেল ভারত-উপমহাদেশের ভৌগোলিক পরিস্থিতি এবং ভারতীয়দের মৌলিক ঐক্যের উপর ভিত্তি করিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক উন্নতিবিধানের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিলেন। তিনি যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়াছিলেন তাহার মূল শর্ত ছিল এইরূপ: (১) ভারতের নূতন সংবিধান রচনার পূর্বাবধি ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে লইয়া একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হইবে, (২) গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলে হিন্দু ও মুসলমানদের সংখ্যা সমান সমান থাকিবে, (৩) গভর্ণর-জেনারেল এবং ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ ভিন্ন গভর্ণর-জেনারেলের কাউন্সিলের অপরাপর সকল সদস্য ভারতীয়দের মধ্য হইতে গ্রহণ করা হইবে, এবং (৪) ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বাবধি দেশের প্রতিরক্ষার ভার ব্রিটিশ সেনাপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে।

লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-৪৭)



লর্ড ওয়াভেল

সিমলা কনফারেন্স

এই পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য সিমলায় একটি সর্ব-দলীয় কনফারেন্স আহবান করা হইল। জিন্নাহ্ তাঁহার পাকিস্তান দাবিতে অটল রহিলেন। জিন্নাহ্ পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠন করিয়া উহার কর্ণধার হইতে বদ্ধপরিকর হইলে সিমলা কনফারেন্সও ব্যর্থ হইল।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে ইংলণ্ডে যে সাধারণ নির্বাচন হইয়াছিল তাহাতে শ্রমিক দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিলে ক্লীমেণ্ট এট্‌লী প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

ভারতেও যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল তাহাতে কংগ্রেস কেন্দ্র-সহ সকল প্রদেশেই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে এবং প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচন ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বাংলা ও সিন্ধু প্রদেশ ভিন্ন অপরাপর সকল প্রদেশেই কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হইলে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসই যে ভারতীয়দের প্রকৃত মুখপাত্র একথা বুঝিতে ব্রিটিশ সরকারের আর সন্দেহের অবকাশ রহিল না।

ভারতের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের সংখ্যাগরিষ্ঠতা

রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ওয়াভেল ২৮শে জানুয়ারি (১৯৪৬) ঘোষণা করিলেন যে তিনি ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের লইয়া একটি নূতন কার্য-নির্বাহক পরিষদ গঠন করিবেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব ভারতের সংবিধান সভা (Constituent Assembly) স্থাপন করিবেন।

লর্ড ওয়াভেলের ঘোষণা

এ-বিষয়ে আর অগ্রসর হইবার পূর্বেই বোম্বাইয়ে রাজকীয় ভারতের নৌবাহিনীর (Royal Indian Navy) ভারতীয় কর্মচারীদের এক বিদ্রোহ দেখা দিলে সমগ্র ভারতে এক আলোড়নের সৃষ্টি হইল।

নৌ-সেনা বিদ্রোহ (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬) : ভারতের নাবিক ও নৌ-সেনাদের প্রতি ঊর্ধ্বতন ব্রিটিশ কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার, বেতনের স্বল্পতা, নিম্নমানের খাদ্য সরবরাহ প্রভৃতির প্রতিকারের জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারতীয় নৌ-সেনাগণ ব্রিটিশ সরকারের নিকট আবেদন করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু ইহাতে কোন ফল না হইলে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নৌ-সেনাদের প্রশিক্ষণ স্কুলের নাবিকগণ অনশন শুরু করেন। ইংরেজ নাবিকদের তুলনায় তাঁহাদের মাহিনার স্বল্পতা, অতি জঘন্য খাদ্য সরবরাহ, জাতিগত বৈষম্য এবং উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ কর্মচারীদের ভারতীয়দের প্রতি অপমানজনক উক্তি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদেই নাবিকগণ এই অনশন শুরু করেন। ক্রমে অপরাপর স্থানের নৌ-সেনারাও এই আন্দোলনে যোগদান করেন। ক্রমে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে, নৌ-সেনারা কয়েকটি জাহাজ দখল করিয়া লইয়া রীতিমত নৌ-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ব্রিটিশ পতাকা নামাইয়া সেই স্থলে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হইল। বিদ্রোহের প্রভাব কলিকাতা ও মাদ্রাজ বন্দরেও ছড়াইয়া পড়িল। বোম্বাই ও করাচী বন্দরে নৌ-সেনা বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ ধারণ করিল। ইংরেজ সৈন্যরা বিদ্রোহীদের উপর গুলিবর্ষণ করিলে তাঁহারাও পাল্টা গুলিবর্ষণে দ্বিধা

নৌ-বিদ্রোহের কারণ



বল্লভভাই প্যাটেল

করিলেন না। নৌ-সেনাধ্যক্ষ অ্যাডমিরাল গড্ফ্রে বিদ্রোহীদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে অনুরোধ করিয়া বেতারবার্তা পাঠাইলেন, কিন্তু তাহাতে কোন কাজ হইল না। নৌ-সেনাদের বিদ্রোহে ভারতবাসীদের মধ্যে উত্তেজনা ও উল্লাসের সৃষ্টি হইলে বোম্বাইয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতাল, পুলিশের সহিত খণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতি শুরু হইল। ব্রিটিশ সরকার বলপূর্বক এই বিদ্রোহ দমন করিতে সর্বপ্রকার প্রস্তুতি চালাইলেন। এমতাবস্থায় কংগ্রেস নেতা বল্লভভাই প্যাটেলের চেষ্টায় বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল বটে, কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনায় ব্রিটিশ সরকার তাঁহাদিগকে মুক্তি দিতে বাধ্য হইলেন।

কংগ্রেসের হস্তক্ষেপে বিদ্রোহের অবসান

এই বিদ্রোহ হইতে একথা ব্রিটিশ সরকারের নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। এদিক দিয়া বিচার করিলে নৌ-বিদ্রোহ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সাফল্যের পথে বহুদূর আগাইয়া দিয়াছিল।

নৌ-বিদ্রোহের গুরুত্ব

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের সহিত মীমাংসার চেষ্টা : প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, পরিস্থিতি যখনই খারাপের দিকে গিয়াছে তখনই ব্রিটিশ সরকার ভারতবাসীর সহিত একটা মীমাংসার চেষ্টা করিয়াছেন। জাপানের আক্রমণে রেঙ্গুনের পতনের অব্যবহিত পরে যেমন ব্রিটিশ সরকার ভারতের নেতৃবর্গের সহিত আলাপ-আলোচনার পর একটা মীমাংসায় আসিবার উদ্দেশ্যে স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্‌কে ভারতে প্রেরণ করিয়াছিলেন, তেমনি ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি নৌ-বিদ্রোহ দেখা দিলে পরদিন অর্থাৎ ১৯শে ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেণ্ট এট্লী ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পন্থা উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ক্যাবিনেট পর্যায়ের তিনজন মন্ত্রীকে ভারতে প্রেরণের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই দৌত্য ক্যাবিনেট মিশন (Cabinet Mission) নামে পরিচিত।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেণ্ট এট্লীর ঘোষণা (১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৬)

এই ঘোষণার পূর্ব হইতেই ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সহিত একটা আপোস-মীমাংসায় উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এ-বিষয়ে ক্রীপস্ দৌত্য ও ওয়াভেল পরিকল্পনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু উভয় চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়াছিল।

পূর্বেকার চেষ্টার ব্যর্থতা

ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রিমিশন : বলা বাহুল্য, নৌ-বিদ্রোহ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে ভারতের উপর আর ব্রিটিশ প্রভুত্ব টিকাইয়া রাখা যাইবে না একথা ব্রিটিশ সরকার বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ক্যাবিনেট মিশন প্রেরণের পশ্চাতে ইহাই ছিল মূল কারণ। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ক্লীমেণ্ট এট্লীর ঘোষণা অনুযায়ী লর্ড প্যাথিক ল্যরেন্স, স্যার্ স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ও মিঃ আলেক্জাণ্ডার—এই তিনজন ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রীকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে (২৩ তারিখে) ভারতবর্ষে পাঠানো

ক্যাবিনেট মিশন (১৯৪৬)

হইল। মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ ও মুসলিম লীগের বিরোধিতায় এবারও কোন ঐক্যবদ্ধ দাবি ক্যাবিনেট মিশনের নিকট উপস্থাপিত করা সম্ভব হইল না। যাহা হউক, ক্যাবিনেট মিশন শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান দাবি অগ্রাহ্য করিয়া সর্ব-ভারতীয় একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল।

ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব



প্যাথিক ল্যারেন্স্

হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিকে 'ক' শ্রেণী আর মুসলমানপ্রধান পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশ, সিন্ধু ও বালুচিস্থান 'খ' শ্রেণী এবং বাংলাদেশ ও আসাম প্রদেশকে 'গ' শ্রেণীতে ভাগ করা হইবে। এই তিনটি অঞ্চল নিজ নিজ এলাকার জন্য শাসনতন্ত্র স্থির করিবে। তারপর এই তিনটি শাসনতন্ত্রাধীন অঞ্চল এবং যে-সকল দেশীয় রাজ্য যোগদানে ইচ্ছুক সেগুলি হইতে মোট ২৯৬ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া একটি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান-সভা গঠিত হইবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত থাকিবে এবং প্রাদেশিত সরকার ও দেশীয় রাজগুলির উপর অন্যান্য ক্ষমতা অর্পিত হইবে। নূতন সংবিধান গঠনের কার্য সম্পন্ন হইবার পূর্বাবধি ভারতের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির জাতীয় প্রতিনিধি লইয়া একটি অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয় সরকার (an interim National Government) গঠন করা হইবে। এই ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু তখনকার পরিস্থিতিতে এইরূপ ব্যবস্থা না করিয়া উপায়ান্তরও ছিল না। যাহা হউক, কংগ্রেস অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদানে স্বীকৃত হইল না, কিন্তু সংবিধানসভায় যোগদান করিতে রাজী হইল।

কংগ্রেস কর্তৃক আংশিকভাবে গ্রহণ

মুসলিম লীগ উপরি-উক্ত পরিকল্পনায় পাকিস্তান দাবি একপ্রকার স্বীকৃত হইয়াছে দেখিয়া উহা গ্রহণ করিল এবং অন্তর্বর্তীকালীন সরকারেও যোগদানে স্বীকৃত হইল। কিন্তু কংগ্রেস রাজী না হওয়ায় লর্ড ওয়াভেল অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে স্বীকৃত হইলেন না। মুস্লিম লীগ এককভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের জন্য লর্ড ওয়াভেলকে চাপ দিয়াও যখন কৃতকার্য হইতে পারিল না তখন সংবিধানসভায় যোগদান করিবে না বলিয়া জানাইল। ইহা ভিন্ন, প্রত্যক্ষ আন্দোলন শুরু করিবে বলিয়া হুমকি দেখাইল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হইলে জিন্নাহ্ তাঁহার সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। মুস্লিম লীগের সমর্থকদের নানাভাবে উস্কানি দেওয়া হইতে লাগিল। বাংলাদেশে তখন সুরাবর্দি মন্ত্রিসভা শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছিল। ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬) প্রত্যক্ষ আন্দোলনের (Direct Action) নামে কলিকাতা মহানগরীতে এক ব্যাপক দাঙ্গা ও গুণ্ডাবাজি চলিল। প্রথমে হিন্দুদের উপর একতরফা

মুস্লিম লীগ কর্তৃক গৃহীত

মুস্লিম লীগের বিরক্তি—প্রত্যক্ষ আন্দোলনের হুমকি

আক্রমণ চলিল। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ন হইতে হিন্দুগণ নিজের আত্মরক্ষার ভার নিজ হস্তেই গ্রহণ করিল। কারণ সুরাবর্দি সরকার তখন গুণ্ডাদলের পরোক্ষ সমর্থকে পরিণত হইয়াছে। হিন্দুদের পাল্টা আক্রমণে মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে হতাহত হইল। কলিকাতা মহানগরীর পথে বহু মৃতদেহ পড়িয়া থাকিতে দেখা গেল। বাংলাদেশের তদানীন্তন ব্রিটিশ গভর্ণর এবং ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধির অকর্মণ্যতা ব্রিটিশ নামে কলঙ্ক লেপন করিল। যাহা হউক, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অবসান এইখানেই ঘটিল না। নোয়াখালি, কুমিল্লার সন্নিকটস্থ অঞ্চল প্রভৃতি মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে নির্দোষ হিন্দু নরনারীর উপর মুস্‌লিম লীগ গুণ্ডাদের অমানুষিক বর্বরতা চলিল। ইহার প্রতিক্রিয়া বিহার, উত্তরপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে দেখা দিল। সমগ্র ভারত তখন সাম্প্রদায়িকতার বিষে বিষাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

মুস্‌লিম লীগের প্রত্যক্ষ আন্দোলন—কলিকাতা হত্যাকাণ্ড



জওহরলাল নেহ্‌রু

ইতিমধ্যে (সেপ্টেম্বর, ১৯৪৬) জওহরলাল নেহ্‌রু অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করিয়াছিলেন। জিন্নাহ্‌ ও মুস্‌লিম লীগ ইহাতে যোগদান করে নাই। কিন্তু লর্ড ওয়াভেল (১৯৪৩-৪৭) শেষ পর্যন্ত মুস্‌লিম লীগকে যোগদানে রাজী করাইলেন। অল্পকালের মধ্যেই মুস্‌লিম লীগের যে-সকল সদস্য অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিয়াছিলেন তাঁহারা ও লর্ড ওয়াভেল এক পক্ষে চলিয়া গেলেন। ফলে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের কার্যকলাপ প্রতি পদেই প্রতিহত হইতে লাগিল। এমন সময় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লীমেণ্ট এট্‌লী ঘোষণা করিলেন যে, ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ভারতের দায়িত্বশীল নেতৃবর্গের হস্তে ভারত-শাসনের ভার অর্পণ করিয়া ব্রিটিশ সরকার ভারত ত্যাগ করিবেন। দায়িত্ব-বোধসম্পন্ন নেতৃবর্গ বলিতে প্রধানত কংগ্রেসের নেতৃবর্গকেই যে বুঝানো হইয়াছিল সে-বিষয়ে মুস্‌লিম লীগের কোন সন্দেহের কারণ ছিল না। এই পরিস্থিতিতে মুস্‌লিম লীগ হতাশা-জনিত ক্রোধের বশবর্তী হইয়া পাঞ্জাবে শিখ ও হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাইল। প্রায় ৭৫ লক্ষ হিন্দু ও শিখ নরনারী পাঞ্জাব ত্যাগ করিয়া

পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু কর্তৃক অন্তর্বর্তী সরকার গঠন

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিবার ঘোষণা



ক্লীমেণ্ট এট্‌লী

পাঞ্জাবে মুস্‌লিম লীগের শিখ ও হিন্দু হত্যা

অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হইল। এই পরিস্থিতিতে পাঞ্জাব ও বাংলাদেশের হিন্দুপ্রধান

বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদ দাবি

অঞ্চলগুলির নিরাপত্তার কথা ভাবিয়া হিন্দু এবং শিখগণ বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের ব্যবচ্ছেদ দাবি করিল।

অন্তর্বর্তীকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালক ছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু। সেই সরকারের মুস্‌লিম লীগ সদস্যদের প্রতি লর্ড ওয়াভেল পক্ষপাতিত্ব শুরু করিলে কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভের সৃষ্টি হইল। ফলে লর্ড ওয়াভেলের স্থলে লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেনকে ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া পাঠানো হইল। ভারতীয়দের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরিত করিবার ভারও তাঁহার উপর ন্যস্ত করা হইল।

লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের ঘোষণা



লর্ড মাউণ্টব্যাটেন

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ঐ মাসেই ঘোষণা (Mountbatten Plan) করিলেন যে, মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলি ইচ্ছা করিলে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। কিন্তু তাহা হইলে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবকে হিন্দু ও মুসলমান অঞ্চল হিসাবে বিভক্ত করিতে হইবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট গ্রহণ করিয়া সেগুলি কোন্ রাষ্ট্রে থাকিবে তাহা স্থিরীকৃত হইবে। মুসলমানগণ পাকিস্তান গঠন করিতে চাহিলে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে বিভক্ত করিয়া দুইটি রাষ্ট্র গঠন করিবে, একথাও বলা হইল। মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায়, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও শ্রীহট্ট জেলায় গণভোট গৃহীত হইল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পাকিস্তানের সহিত সংযুক্তির সপক্ষে ভোট দিল। আর তদানীন্তন আসাম মন্ত্রিসভা উপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা অবলম্বন না করার ফলে শ্রীহট্টে গণভোট

'ভারতের স্বাধীনতা আইন'

১৫ই আগস্ট (১৯৪৭) ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের উদ্ভব

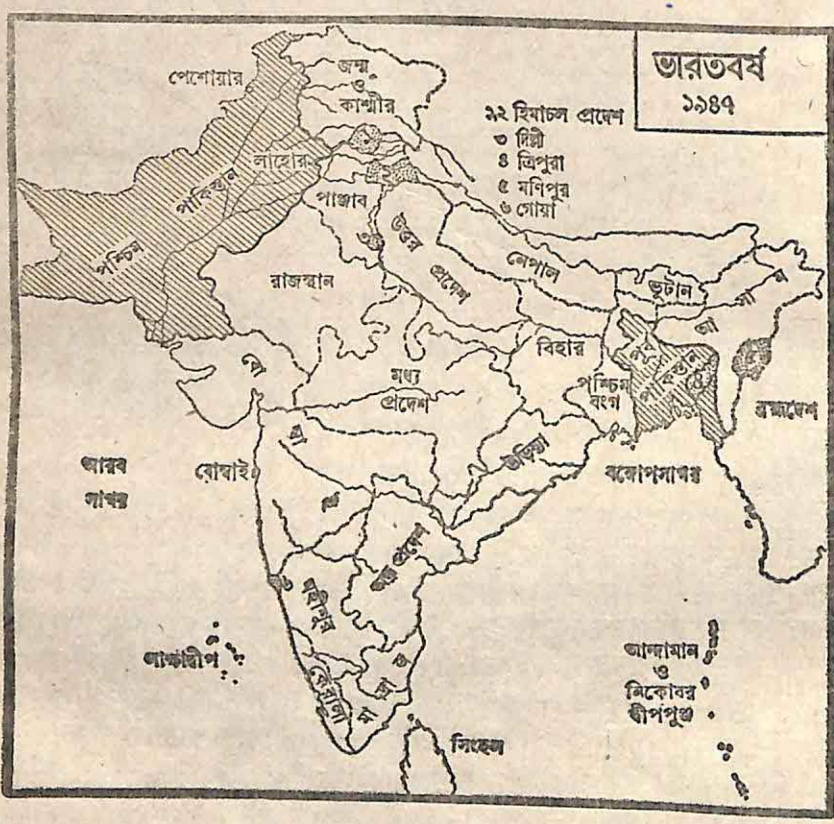
গ্রহণের কালে বহুসংখ্যক জাতীয়তাবাদী মুসলমান ও হিন্দুকে মুস্‌লিম লীগের সমর্থক গুণ্ডাদল ভোটদানে বাধা দিল। ফলে করিমগঞ্জ মহকুমার কতকাংশ বাদে সমগ্র শ্রীহট্ট জেলাও পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হইল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট 'ভারতের স্বাধীনতা আইন' পাশ করিয়া ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত ও পাকিস্তান এই দুইটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করিল।* এইভাবে দীর্ঘ প্রায়

---

* ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (The Indian Independence Act, 1947) অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুইটি ডোমিনিয়নের সৃষ্টি হইয়াছিল বটে, কিন্তু আইনের চক্ষে এই স্বাধীনতা আইন ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধানসভা (Constitutional Assemblies) সার্বভৌম (Sovereign) বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। অতএব, ভারতকে প্রজাতন্ত্র (Republic) হিসাবে আখ্যায়িত করিতে সংবিধানসভার কোন অসুবিধা ছিল না। ভারতীয় স্বাধীনতা আইন পাশের পর হইতে ক্ষমতা-হস্তান্তরের সময় পর্যন্ত কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চালু ছিল।

দুইশত বৎসরের ব্রিটিশ শাসনের পর ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভ করিল, কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য বিনষ্ট করিয়া ভারত ও পাকিস্তান—এই দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উৎপত্তি হইল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ অপকীর্তি হিসাবে ঐক্যবদ্ধ ভারতকে ভারতীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য উপেক্ষা করিয়া দুইটি পৃথক রাষ্ট্রে ভাগ করা হইল। সাম্প্রদায়িকতার যে বিষবৃক্ষ ব্রিটিশ শাসকবর্গ রোপণ করিয়াছিলেন তাহা ভারত ব্যবচ্ছেদে ফলপ্রদান করিল। ভারত ব্যবচ্ছেদের ভিত্তিতে ভারতের দুই খণ্ড—ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করিল।

ব্যবচ্ছেদের ভিত্তিতে স্বাধীনতা লাভ



স্বাধীন ভারত স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী আরও দুই বৎসরের অধিককাল চেষ্টার পর ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতের সংবিধানসভা এক প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান পাশ করিল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি হইতে ভারতের নূতন সংবিধান চালু হইয়াছে। নূতন সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে (Sovereign Democratic Republic)* পরিণত হইল। স্বাধীন

* ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) অনুযায়ী ভারতের নামকরণ করা হইয়াছে "সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র" (Sovereign Socialist Secular Democratic Republic)।

ভারতের সংবিধান অনুযায়ী ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯৫০-৫৫ ; ১৯৫৫-৬২), আর ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ হইয়াছিলেন উপ-রাষ্ট্রপতি। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ডক্টর রাধাকৃষ্ণাণ রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হন। তিনি ছিলেন ভারতের দ্বিতীয় রাষ্ট্রপতি (১৯৬২-৬৭)। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লর্ড মাউণ্টব্যাটেনের কার্যকাল শেষে এবং ভারতের সর্বপ্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের অন্তর্বর্তী কালে চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী ভারতের গভর্ণর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপন (২৬শে জানুয়ারি, ১৯৫০)



ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ

দীর্ঘকাল ব্রিটিশ সরকারের সহিত ভারতের যোগাযোগ ছিল। সেইজন্য ভারত এখনও কমনওয়েলথের সদস্য রহিয়াছে বটে, কিন্তু ভারত ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর আনুগত্যাধীন নহে। স্বাধীন ভারতকে কমনওয়েলথের সভ্য হিসাবে রাখিবার জন্য ব্রিটিশ কমনওয়েলথকে এখন 'কমনওয়েলথ অব ন্যাশন্স' ('Commonwealth of Nations) নামকরণ করা হইয়াছে। কমনওয়েলথের সহিত ভারতের সম্পর্ক সম্পূর্ণ সৌহার্দ্যমূলক। স্বাধীন ভারতের আদর্শ হইল আভ্যন্তরীণ পুনরুজ্জীবন এবং পররাষ্ট্র ক্ষেত্রে শান্তি ও মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলা।

স্বাধীন ভারত ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সদস্য

স্বদেশকথা

[তৃতীয় খণ্ড]

সংবিধান ও নাগরিকতা

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
(Broad Features of the Indian Constitution)

(১) স্বাধীন ভারত

দীর্ঘ প্রায় দুইশত বৎসরের পরাধীনতা মুক্ত হইয়া ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু সেই দিনের স্বাধীনতার আনন্দকে বহুলাংশে ম্লান করিয়া দিয়াছিল মহম্মদ আলি জিন্নাহ্'র দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ-ব্যবচ্ছেদ। ভারতবর্ষকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া ঐ দিন জন্ম লইয়াছিল দুইটি পৃথক রাষ্ট্র—ভারত ও পাকিস্তান। সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা ও সংকীর্ণতার যূপকাষ্ঠে ভারতের ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে বলি দিয়া জিন্নাহ্'র অনমনীয় অহমিকার স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছিল সত্য, কিন্তু ইহাতে তাঁহার দ্বি-জাতি তত্ত্ব প্রমাণিত হওয়া দূরের কথা উহার ভ্রান্তি ও অবাস্তবতাই ধরা পড়িয়াছিল। পাকিস্তানে অসংখ্য হিন্দু এবং ভারতে অসংখ্য মুসলমানের অস্তিত্ব দেশ-ব্যবচ্ছেদের মূল যুক্তিই নস্যাৎ করিয়া দিয়াছিল।

জিন্নাহ্'র দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ-বিভাগ

সিন্ধু প্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বালুচিস্তান, পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, আসাম প্রদেশের শ্রীহট্ট জেলার অধিকাংশ লইয়া গঠিত হইয়াছিল পাকিস্তান। (বর্তমানে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীন 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।) অবশিষ্ট সকল স্থান লইয়া গঠিত হইল ভারত রাষ্ট্র। এইভাবে হিমালয় হইতে কুমারিকা, আসাম হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখণ্ডে দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীরও অধিককালের স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়যুক্ত হইল। অসংখ্য কংগ্রেসসেবী, বিপ্লবী, আজাদ হিন্দ সৈনিক, নৌ-সেনার আত্মবলিদান, এবং সাম্প্রদায়িকতার যূপকাষ্ঠে বলিপ্রদত্ত অসংখ্য নরনারীর রক্ত ও অশ্রুস্নাত স্বাধীনতা-সূর্য ভারতের ভাগ্যাকাশে উদিত হইল। এই স্বাধীনতার শেষ মূল্য দিতে হইল ভারতভূমিকে দ্বি-খণ্ডিত করিয়া।

ভারত ও পাকিস্তান

সংবিধানসভা : সংবিধান রচনা : যে সভা দেশের সংবিধান রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় তাহাকেই সংবিধানসভা নামে আখ্যায়িত করা হইয়া থাকে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রাদেশিক আইনসভার সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া ঐ বৎসরই ডিসেম্বর মাসের ৯ তারিখে ভারতের সংবিধানসভা বসিল।* সেই সময়ে এই সভার নাম ছিল গণপরিষদ। দুই দিন পর (১১ই ডিসেম্বর) বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই সভার সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। আর সংবিধান রচনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিটির (Drafting Committee) সভাপতি হইলেন ডক্টর আম্বেদকর।

গণপরিষদে সংবিধান রচনার কাজ শুরু (ডিসেম্বর ৯, ১৯৪৬)

* জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হইয়া ভারতের সংবিধানসভা গঠনের ধারণ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মুসলিম সদস্যগণ এই সভায় যোগদানে বিরত রহিলেন। গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি লর্ড ওয়াভেলও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার অজুহাতে নানা আপত্তি তুলিলেন। কিন্তু বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিলেন যে, যত বাধাবিপত্তিই থাকুক না কেন, জনসাধারণের আস্থাভাজন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত গণপরিষদ সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম। কোন শক্তিই ইহার কার্যকলাপের উপর হস্তক্ষেপ করিতে বা ইহার সিদ্ধান্তের কোন রদবদল করিতে পারিবে না।

ইহার দুই দিন পর (১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৬) জওহরলাল নেহরু গণপরিষদের উদ্দেশ্য ও আদর্শ বর্ণনা করিয়া একটি প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। এই প্রস্তাবে বলা হইল, গণপরিষদ ভারতকে একটি সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে (Sovereign Democratic Republic) পরিণত করিতে দৃঢ়সংকল্প লইয়া সংবিধান রচনার কাজে ব্রতী হইয়াছে। পূর্বেকার ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশসমূহ, দেশীয় রাজ্য ও অপরাপর অঞ্চল যেগুলি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানে রাজী হইবে তাহাদের লইয়া ভারতের প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র (Republic) গঠিত হইবে। প্রত্যেক অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনাধিকার জাতি-ধর্ম-জন্মস্থান নির্বিশেষে সকল নাগরিকই ন্যায়-বিচার, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার সমানভাবে ভোগ করিবে। আইনের চক্ষে ব্যক্তিমাত্রেরই সমতা, স্বাধীন চিন্তা, স্বমত প্রকাশ, ধর্মপালন, যে-কোন আইনসম্মত বৃত্তি গ্রহণের বা সভা-সমিতিতে যোগদানের অধিকার সকলেরই থাকিবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, অনুন্নত সম্প্রদায়, পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও স্বার্থ রক্ষা করা হইবে। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। এই সকল উদার নীতির উপর গঠিত ভারতের প্রজাতন্ত্র বিশ্বের দরবারে নিজ স্থান অধিকার করিবে এবং পৃথিবীর মানবকল্যাণ ও শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টায় যথাযথ অংশগ্রহণ করিবে। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবে ভারতের সংবিধান কিভাবে রচিত হইবে এবং উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা ছিল।

গণপরিষদে জওহরলালের প্রস্তাবে ভারতের সংবিধানের রূপরেখা বর্ণনা

স্বাধীনতা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গণপরিষদ সংবিধান প্রস্তুতের কাজ আরও ত্বরান্বিত করিতে লাগিল। পাকিস্তানের সংবিধান মহম্মদ আলি জিন্নাহ্‌'র সভাপতিত্বে করাচীতে পৃথক গণপরিষদে রচিত হইতে চলিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর দীর্ঘ তিন বৎসরের অক্লান্ত চেষ্টায় স্বাধীন ভারতের সংবিধান গণপরিষদের সভাপতি বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি নূতন সংবিধান অনুসারে ভারত এক সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্রে পরিণত হইল। এই সংবিধান অনুসারে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয় এবং ইউনিয়ন সরকার অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার অর্থাৎ আঞ্চলিক সরকার এই দুই প্রকার শাসনব্যবস্থার সমন্বয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় ভারত গঠিত হইল।

সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংবিধান ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা গৃহীত

ভারতের জাতীয় পতাকা : ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই ভারতের গণপরিষদ জাতীয় পতাকা কিরূপ হইবে সে-সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু ভারতের জাতীয় পতাকার ক্রমবিকাশের একটি সুন্দর ইতিহাস আছে। ভারতের সর্বপ্রথম জাতীয় পতাকা স্বদেশী আন্দোলনের সময় ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট কলিকাতার পারসীবাগান পার্কে উত্তোলন করা হয়। ইহাতে লাল, হলুদ ও সবুজ রঙের তিন খণ্ড কাপড় সমান্তরালভাবে লাগান ছিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যে তীব্র জাতীয়তাবোধের সঞ্চার হইয়াছিল উহার প্রভাব পাশ্চাত্য দেশে প্রবাসী ভারতীয়দের উপরও বিস্তৃত হয়। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস শহরে প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী কয়েকজন এক সভায় যোগদান করিতে গিয়া লক্ষ্য করিলেন যে, পৃথিবীর সকল দেশেরই জাতীয় পতাকা আছে, নাই শুধু ভারতবর্ষের। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহারা ম্যাডাম কামার নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় পতাকার এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করিলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে গৈরিক, সাদা ও সবুজ এই তিন রঙের তিনটি সমান অংশকে সমান্তরালভাবে সাজাইয়া উপরে গৈরিক অংশে আটটি তারা, মধ্যে সাদা অংশে হিন্দী ভাষায় 'বন্দেমাতরম্' এবং নিম্নে সবুজ অংশের বামদিকে সূর্য এবং দক্ষিণে চাঁদ আঁকা হয়। এই ছিল ভারতের জাতীয় পতাকার সর্বপ্রথম রূপ।

প্যারিস প্রবাসী ভারতীয় কর্তৃক জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা (১৯০৭)



ম্যাডাম ভিকোজী রুস্তম কামার (১৮৬১-১৯৩৬) হস্তে পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে অ্যানি বেসান্ত হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন শুরু করিবার কালে ভারতের একটি জাতীয় পতাকা তৈয়ার করা হয়। ইহাতে চারি খণ্ড লাল ও তিন খণ্ড সবুজ রঙের কাপড়ের ফালি সমান্তরালভাবে সাজান ছিল। উপরের দিকে বামে ব্রিটিশ পতাকা ইউনিয়ন জ্যাকের একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি এবং নিচে সপ্তর্ষি মণ্ডলের আকারে সাজান সাতটি তারা।

হোমরুল আন্দোলনের কালে পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা (১৯১৬)

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী ভারতের জাতীয় পতাকার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কংগ্রেসের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পর বৎসর (১৯২১) তিনি নিজেই উপরে সাদা, মধ্যে সবুজ ও নিচে লাল এরূপ তিন রঙের একটি পতাকা প্রস্তুত করেন। এই পতাকার ব্যাখ্যা দিতে গিয়া গান্ধীজী নিজে

গান্ধীজী পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা (১৯২১)

বলিয়াছিলেন যে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির প্রতীক ছিল সাদা অংশ, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতীক সবুজ অংশ আর সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতীক লাল অংশ। জাতীয় উন্নয়নের চিহ্ন হিসাবে পতাকার উপর চরকার চিহ্ন অঙ্কিত ছিল।

বিশেষ কমিটি কর্তৃক জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা (১৯৩১)

দশ বৎসর পর (১৯৩১) ভারতের জাতীয় পতাকা কিরূপ হওয়া উচিত সেই সম্পর্কে সুপারিশ করিবার জন্য করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশনকালে একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি জাতীয় পতাকা সম্পূর্ণ গৈরিক রঙের হইবে এবং উহার উপরের বাম দিকে চরকার ছাপ থাকিবে—এইরূপ সুপারিশ করেন। কিন্তু এই সুপারিশ অনুমোদিত না হওয়ায় ঐ বৎসরই একখানি তিন রঙের পতাকা জাতীয় পতাকা হিসাবে গৃহীত হয়। এই পতাকার উপর অংশ গৈরিক, মধ্যের অংশ সাদা ও নিচের অংশ সবুজ। ইহার মধ্যস্থলে চরকার একটি ছাপ। কংগ্রেস এই পতাকাকেই জাতীয় পতাকা বলিয়া গ্রহণ করে।

প্রকৃত জাতীয় পতাকার তিন রঙ (১৯৩১)

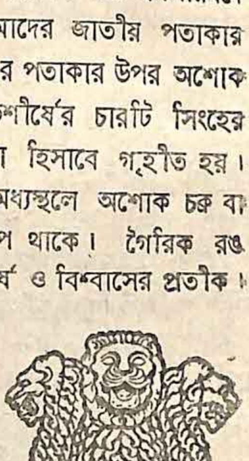
১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ২২শে জুলাই এই পতাকার সামান্য পরিবর্তন করিয়া মধ্যস্থলে চরকার ছাপের পরিবর্তে ভারতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট্ রাজর্ষি অশোকের স্তম্ভশীর্ষের পাদদেশের চক্রটির ছাপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত গণপরিষদে গ্রহণ করা হয়। সেই অনুসারে ইহা আমাদের জাতীয় পতাকার স্থান গ্রহণ করে, আর ঐ রূপ তিন রঙের পতাকার উপর অশোক চক্রের পরিবর্তে অশোকের সারনাথ স্তম্ভশীর্ষের চারটি সিংহের মস্তকের ছাপ ভারত সরকারের পতাকা হিসাবে গৃহীত হয়। কংগ্রেস পতাকায় ঠিক ঐভাবেই তিন রঙ আছে, কিন্তু মধ্যস্থলে অশোক চক্র বা অশোক স্তম্ভশীর্ষের পরিবর্তে চরকার ছাপ থাকে। গৈরিক রঙ ত্যাগ, সাদা রঙ শান্তি এবং সবুজ রঙ শৌর্য ও বিশ্বাসের প্রতীক।

গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে জাতীয় পতাকা

ভারত সরকারের পতাকা

কংগ্রেস পতাকা

ভারতের জাতীয় পতাকার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৩ : ২ অনুপাতে অর্থাৎ যদি ৩ মিটার লম্বা হয় তাহা হইলে ২ মিটার চওড়া এই অনুপাত বজায় রাখিয়া তৈয়ার করিতে হইবে।



সত্যমেব জয়তে

অশোকের স্তম্ভশীর্ষ

ভারতের জাতীয় প্রতীক চিহ্ন: গৌতম বুদ্ধ সারনাথের নিকটে মৃগশিখা বনে সর্বপ্রথম তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে মৌর্য সম্রাট্ অশোক সেই স্থানে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করান। এই স্তম্ভশীর্ষে চারিটি সিংহের প্রতিকৃতির উপর একটি চক্র নির্মিত ছিল। অশোক ইহার নাম দিয়াছিলেন ধর্মচক্র। তিনি ধর্মকে সকল শক্তির উপরে স্থান দিয়াছিলেন। এই চক্রটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে। স্তম্ভশীর্ষটি এবং ধর্মচক্রের ভগ্নাংশেষ সারনাথের সংগ্রহশালায় রাখা হইয়াছে।

অশোক স্তম্ভশীর্ষ

স্তম্ভশীর্ষের পাদদেশে একটি হাতী, একটি ঘোড়া ও একটি ষাঁড়ের প্রতিকৃতি আছে এবং সেগুলির মধ্যবর্তী স্থানে একটি পদ্মের উপর একটি চক্র খোদিত আছে।

স্বাধীন ভারতের সংবিধান যেদিন হইতে কার্যকরী করা হয় (২৬শে জানুয়ারি ১৯৫০) সেই দিন অশোকের সারনাথ স্তম্ভশীর্ষটিকে ভারত সরকার ভারতের জাতীয় প্রতীক (National Emblem) হিসাবে গ্রহণ করেন। এই প্রতীক চিহ্নে অশোকের সারনাথ স্তম্ভশীর্ষের সামান্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ইহাতে চারিটি সিংহের মধ্যে তিনটি দৃষ্ট হয়, চতুর্থটি পশ্চাতে থাকায় দৃষ্টিগোচর হয় না।

অশোকের স্তম্ভশীর্ষের সিংহের প্রতিকৃতি জাতীয় প্রতীক হিসাবে গৃহীত

প্রতীকের পাদদেশের মধ্যস্থলে চক্র এবং উহার দুই পার্শ্বে একটি ষাঁড় ও একটি ঘোড়ার প্রতিকৃতি এবং একেবারে দক্ষিণে একটি চক্রের একাংশ, বামে অপর একটি চক্রের একাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। চক্রের নিচের পদ্ম ইহাতে নাই। ভারতের জাতীয় পতাকায় যে চক্রের ছাপ থাকে উহা সারনাথ অশোকস্তম্ভের পাদদেশের চক্রের ছাপ, সিংহের উপরে যে চক্র ছিল তাহা নহে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জুলাই জাতীয় প্রতীক সম্পর্কে গণপরিষদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাতীয় প্রতীকের অশোকস্তম্ভ শীর্ষের সিংহগুলির নিচে দেবনাগরী অক্ষরে 'সত্যমেব জয়তে' অর্থাৎ সত্যেরই জয় অবশ্যম্ভাবী, একথা লিখা থাকে।

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত : ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর কলিকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সর্বপ্রথম কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' এই গানটি গাওয়া হয়। ইহারও পূর্বে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের অধিবেশনে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' গানটি গাওয়া হয়। স্বাধীনতালাভের পর ভারতের গণপরিষদ ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি অর্থাৎ নূতন সংবিধান চালু হইবার দুই দিন পূর্বে 'জনগণমন' গানটিকে জাতীয় সঙ্গীত (National Anthem) হিসাবে গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।* অবশ্য সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানটিকেও সমমর্যাদায় (National Song) স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

'জনগণমন' ও 'বন্দেমাতরম্' জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে সমমর্যাদায় স্থাপিত (২৪শে জানুয়ারি, ১৯৫০)

ভারতের সংবিধান : প্রস্তাবনা : ভারতের সংবিধানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবিধানগুলির কতক কতক বৈশিষ্ট্য এবং ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইনের (Government of India Act, 1935) বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়।

বিভিন্ন সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের (১৭৮৭) অনুকরণে ভারতের সংবিধানে একটি

* ঐ সময় স্থির হইয়াছিল যে, গানের প্রথম স্তবকের যে পংক্তিতে 'পঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট,......' আছে উহা হইতে 'সিন্ধু' কথাটি উঠাইয়া কামরূপ (আসাম) যোগ করা হইবে। কারণ, সিন্ধুপ্রদেশ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতে উহার স্থান অবাঞ্ছনীয়। কিন্তু অদ্যাবধি গানটি অপরিবর্তিত অবস্থায়ই গীত হইয়া থাকে।

প্রস্তাবনা (Preamble) সংযোগ করা হইয়াছে। কোন আইন বা সংবিধানের প্রস্তাবনায় উহার মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্ণিত থাকে। এই ধরনের প্রস্তাবনায় সংবিধানের ভূমিকা বা উপক্রমণিকার মত, বলা যাইতে পারে। প্রস্তাবনা সংবিধানের অংশ বলিয়া বিবেচিত হয় না তথাপি ইহার গুরুত্ব নেহাত কম নহে। সংবিধানের কোন ধারা বা উপধারার অর্থ বা ব্যাখ্যা সম্পর্কে সন্দেহ দেখা দিলে প্রস্তাবনায় সংবিধানের যে উদ্দেশ্য ও আদর্শ বর্ণিত থাকে তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সেই ধারা বা উপধারার ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনুকরণে সংবিধানের প্রস্তাবনা সংযোজন

১৯৭৬র ৪২তম সংশোধন অনুযায়ী ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে একটি সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এই সংবিধান ভারতীয় নাগরিকদিগকে (১) সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায্য-বিচার ; (২) চিন্তা, স্বমত প্রকাশ, নিজের বিশ্বাস, নিজ ধর্ম অনুসরণ ও ধর্ম প্রচারের স্বাধীনতা ; এবং (৩) সামাজিক সমমর্যাদা, সমপরিমাণ সুযোগ-সুবিধা প্রভৃতি ভোগ করিবার অধিকার স্থাপন করিতে দৃঢ়সংকল্প। এই সকল ভিন্ন, (৪) ব্যক্তি ও ব্যক্তির মধ্যে ভ্রাতৃবোধ, পারস্পরিক মর্যাদা ও শ্রদ্ধাবোধ এবং সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে জাতিগত ঐক্য বৃদ্ধি করিতে প্রয়াসী।

প্রস্তাবনার মূলনীতির উল্লেখ

ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনা বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি ধারণা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে, যথা : প্রথমত, ভারতের জনগণই হইল ভারত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস। কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার মাত্রেরই ক্ষমতা জনসাধারণের উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় নাগরিক মাত্রেই সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমতা, ধর্ম, বৃত্তি, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনুসরণ এবং নিজ মত পোষণ ও প্রকাশের অধিকার সমানভাবে ভোগ করিতে পারিবে। সরকার এই সকল অধিকার সংরক্ষণের জন্য দায়ী থাকিবেন। তৃতীয়ত, এই প্রস্তাবনার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের হাইকোর্ট বা সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ সংবিধানের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিবেন। সংবিধান রচয়িতাগণ কি উদ্দেশ্য লইয়া সংবিধান রচনা করিয়াছিলেন সেই ভাবটি উপলব্ধি করিতে প্রস্তাবনা বিচারপতিগণকে যথেষ্ট সাহায্য করিবে।

প্রস্তাবনার গুরুত্ব

ভারতীয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ : (১) ভারতীয় সংবিধানের সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহার বিশালতা ও জটিলতা। পৃথিবীর কোন লিখিত সংবিধান এত বৃহৎ নহে। ভারতীয় সংবিধানে মোট ৩৯৫টি ধারা এবং আটটি তফসিল বা সিডিউল (Schedule) ছিল। কিন্তু মোট ৪৫ বার (জানুয়ারি, ১৯৮৩ পর্যন্ত) এই সংবিধান সংশোধিত হইবার ফলে কোন কোন ধারার পরিবর্তন, সম্পূর্ণ বিলোপ এবং কোন কোন স্থানে সংযোজন করা হইয়াছে। তফসিলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়া আটের স্থলে নয় হইয়াছে। এই বিশালাকার সংবিধানে ইংলণ্ড, আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, আয়র্লণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন দেশের সংবিধানের কোন কোন বৈশিষ্ট্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

(১) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সংবিধান

(২) এই সংবিধান একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal) সংবিধান। ইহাতে যে-সকল রাজ্য লইয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে সেগুলির ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার যে-সকল বিষয়ে বর্তমানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত : যেমন, দেশরক্ষা, সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী, পররাষ্ট্র বিষয়, সংযোগব্যবস্থা, মুদ্রাব্যবস্থা প্রভৃতি মোট ৯৭টি বিষয়ের একটি তালিকা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে কেন্দ্রীয় তালিকা (Union List) বলা হয়। অনুরূপ রাজ্য সরকারের ক্ষমতা : যথা, রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা, কৃষি, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রভৃতি মোট ৬৬টি বিষয় বর্ণনা করিয়া রাজ্য তালিকা (State List) প্রস্তুত করা হইয়াছে। একটি তৃতীয় তালিকায় কেন্দ্র ও রাজ্যে যুগ্ম ক্ষমতাধীন বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা যুগ্ম তালিকা (Concurrent List) নামে অভিহিত। দেওয়ানী বিচার, দেওয়ানী আইনবিধি, সংবাদপত্র, কারখানা, বৈদ্যুতিক শক্তি, শিক্ষা প্রভৃতি ৪৭টি বিষয় এই তালিকাভুক্ত। এই তিনটি তালিকায় অনুল্লিখিত যাবতীয় বিষয়াদি কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাধীন। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রকে বিশেষ শক্তিশালী রাখা হইয়াছে।

(২) কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন কেন্দ্রীয় তালিকা, রাজ্য তালিকা ও যুগ্ম তালিকা

শক্তিশালী কেন্দ্র

(৩) ভারতের সংবিধান একটি লিখিত এবং অনমনীয় (rigid) সংবিধান। অপরাপর লিখিত সংবিধানের ন্যায়-ই ইহার কতক কতক অংশ পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করিতে হইলে এক বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হয়। আবার অপরাপর অংশ পরিবর্তন সাধারণ আইন যেভাবে পাশ করা যায় ঠিক সেইভাবেই করা সম্ভব। এদিক দিয়া ব্রিটেনের অলিখিত সংবিধানের ন্যায়ই ইহা অত্যন্ত নমনীয় (flexible) এবং সহজে পরিবর্তনীয়।

(৩) একই সঙ্গে অনমনীয় ও নমনীয়

(৪) যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান হইলেও ভারতের সংবিধান একটি পার্লামেণ্টারী সংবিধান। ভারতের মন্ত্রিসভা ইংলণ্ডের মন্ত্রিসভার মতই পার্লামেণ্টের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হইতে নিযুক্ত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কার্যনির্বাহক ক্ষমতা তথাকার আইনসভার উপর নির্ভরশীল নহে, কিন্তু ভারতে কার্যনির্বাহক ক্ষমতা অর্থাৎ মন্ত্রীদের ক্ষমতা পার্লামেণ্টের উপর নির্ভরশীল এবং তাঁহারা নিজেদের কাজের জন্য পার্লামেণ্টের নিকট পৃথকভাবে এবং যুগ্মভাবে দায়ী। ভারতের রাষ্ট্রপতি ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মতই নামেমাত্র সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। বস্তুত, মন্ত্রিসভাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। এ-বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্ট হইতে ভারতের রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেণ্টের ক্ষমতা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপের। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতেও ক্রমপর্যায়ে রাজ্য তথা কেন্দ্রের অনুকরণে পার্লামেণ্টারী ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হইতেছে।

(৪) পার্লামেণ্টারী ধরনের শাসনব্যবস্থা

(৫) ভারতের সংবিধানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল নাগরিকদের মৌলিক অধিকার। ভারতীয় নাগরিক মাত্রেরই কতকগুলি মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ

করিয়া তাহাদিগকে গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগের সুযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সকল অধিকার নিরঙ্কুশ অধিকার নহে। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে এগুলিকে হ্রাস করা যাইতে পারে বা স্থগিত রাখা যাইতে পারে।

(৫) নাগরিকগণের মৌলিক অধিকার

(৬) এই সংবিধানের অপর এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল ইহার ধর্ম-নিরপেক্ষতা। ভারতবাসীর ধর্মপালন, ধর্ম প্রচারের অবাধ অধিকার আছে। রাষ্ট্র এ-বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করে না। ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিক ও নাগরিকে কোন প্রভেদ এই সংবিধান স্বীকার করে না। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীষ্টান নির্বিশেষে যে-কোন ধর্মের লোক যোগ্যতা থাকিলে ভারতের সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ, রাষ্ট্রপতির পদ পর্যন্ত লাভ করিতে পারিবে। ভারত একটি অ-সাম্প্রদায়িক (Non-Communal) রাষ্ট্র।*

(৬) ধর্ম-নিরপেক্ষতা

(৭) ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতি (Directive Principles) সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। রাষ্ট্র শাসনে শাসকবর্গ এই সকল নীতির উপর সর্বদা লক্ষ্য রাখিয়া চলিবেন। এই সকল নির্দেশমূলক নীতি অনুসরণ এবং কার্যকর করিবার মধ্যে ভারতীয় রাষ্ট্রকে একটি প্রকৃত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে (Welfare State) রূপান্তরিত করা সম্ভব হইবে।

(৭) নির্দেশমূলক নীতির সংযোজন

(৮) সংবিধানে ভারতীয় রাষ্ট্রকে যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে গঠন করা হইলেও জাতীয় প্রয়োজনে বা জাতীয় বিপদে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্ত্রে বর্ণিত উপায়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া সমগ্র ভারতকে এককেন্দ্রিক (Unitary) রাষ্ট্রে পরিণত করিতে পারিবেন।

(৮) প্রয়োজনে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করিবার সুযোগ

(৯) সর্বশেষে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ভারতীয় সংবিধান ভারতের সুপ্রীম কোর্টকে যেমন সর্বোচ্চ বিচার ক্ষমতা দিয়াছে, তেমনি সংবিধান-সংক্রান্ত বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারেরও চূড়ান্ত ক্ষমতা দিয়াছে। পৃথিবীর সকল দেশের সর্বোচ্চ বিচারালয়গুলির মধ্যে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের ক্ষমতা সর্বাধিক।

(৯) পৃথিবীর সর্বাধিক ক্ষমতাশালী সুপ্রীম্ কোর্ট

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, (১০) সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) দ্বারা ভারতীয় নাগরিকের কতকগুলি মৌলিক কর্তব্য নির্ধারিত হইয়াছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র : কেন্দ্রীয় সরকার : ভারতের সংবিধানে ভারত রাষ্ট্রকে একটি 'রাজ্যসংঘ' বা 'রাজ্যগুলির ইউনিয়ন' (Union of States) রূপে গঠন করা হইয়াছে। এই ইউনিয়ন (Union) বা 'সংঘ' বহুত্বের মধ্যে একতার পরিচায়ক। স্বাধীনতার পূর্বেকার প্রদেশগুলি এবং অপরাপর অঞ্চল যাহা লইয়া ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে সেগুলিকে 'অঙ্গরাজ্য' (Constituent States) বলা হয়। অঙ্গরাজ্যগুলিকে সাধারণত 'রাজ্য'

ভারত ইউনিয়ন ও অঙ্গরাজ্যসমূহ

* প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ভারতকে "ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র" অপেক্ষা "অ-সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র" আখ্যা দেওয়া অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়াছিলেন।

বলিয়াই বর্ণনা করা হয়, যেমন 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' (the State of West Bengal)। ভারত ইউনিয়ন বা ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মোট বাইশটি অঙ্গরাজ্য এবং নয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া গঠিত। যুক্তরাষ্ট্র দুইভাবে গঠিত হইতে পারে। কয়েকটি স্বাধীন দেশ একই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট নিজ নিজ সার্বভৌম অধিকার ন্যস্ত করিয়া নিজ নিজ এলাকায় স্বায়ত্তশাসন ভোগ করিলে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তি হইতে পারে। এই প্রকার যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি ইচ্ছা হইলে যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া যাইতে পারে। কার্যত না হইলেও আইনত এই অধিকার স্বীকৃত। এই ধরনের যুক্তরাষ্ট্র হইল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আবার একই দেশের বিভিন্ন অংশকে নিজ নিজ অঞ্চলে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সার্বভৌম ক্ষমতা, পররাষ্ট্র বিভাগ, দেশরক্ষা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ অধিকারগুলি রাখিলে যুক্তরাষ্ট্রের উৎপত্তি হইতে পারে। এই শেষোক্ত ধরনের যুক্তরাষ্ট্র হইল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র। এই ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলির যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করিয়া যাইবার অধিকার স্বীকৃত নহে।

দুই প্রকার যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা

ভারতের সংবিধান যখন গণপরিষদে পাশ করা হয় (নভেম্বর ২৬, ১৯৪৯) তখন ব্রিটিশ আমলের প্রদেশ, দেশীয় রাজ্য এবং অপরাপর অঞ্চলগুলিকে 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ'—এই চারি পর্যায়ে ভাগ করা হইয়াছিল এবং এই পর্যায়ভেদে রাজ্যগুলির শাসনতান্ত্রিক ক্ষমতা ও ব্যবস্থার তারতম্য ছিল। 'ক' পর্যায়ে ব্রিটিশ আমলের গভর্ণর-শাসিত প্রদেশগুলি ; 'খ' পর্যায়ে জম্মু ও কাশ্মীর, হায়দরাবাদ প্রভৃতির ন্যায় বৃহদাকার দেশীয় রাজ্য এবং মধ্যভারত ও রাজস্থানের ন্যায় রাজ্যসংঘ ; 'গ' পর্যায়ে ব্রিটিশ শাসনকালের চীফ্ কমিশনার-শাসিত অঞ্চল ও ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্যসমূহ ; 'ঘ' পর্যায়ে ছিল কেবলমাত্র আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন (States Re-organisation Commission, SRC) নিয়োগ করিয়া উহার সুপারিশক্রমে স্বাধীন ভারতের পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং জনসাধারণের দাবির প্রতি শ্রদ্ধাবশত ভারতীয় অঙ্গরাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাস করেন। প্রথমে যদিও ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্বিন্যাসের কথা বলা হইয়াছিল তথাপি কার্যক্ষেত্রে তাহা করা সম্ভব হয় নাই। যাহা হউক, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের (SRC) সুপারিশ অনুসারে রাজ্য পুনর্গঠন আইন পাশ করিয়া পূর্বেকার 'ক' 'খ' 'গ' 'ঘ' চারি প্রকার রাজ্যের ক্ষেত্রে কেবল দুই প্রকার রাজ্য : যথা, অঙ্গরাজ্য (Constituent States) এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল বা ইউনিয়ন অঞ্চল গঠন করা হয়। এগুলির মধ্যে ১৪টি অঙ্গরাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ছিল। এইভাবে পূর্বেকার চারি প্রকার রাজ্যের মধ্যে যে ধরনের পার্থক্য ছিল তাহা লোপ পায়। অঙ্গরাজ্যগুলির সব কয়টি একই পর্যায়ে স্থাপিত হয়। পরবর্তী কালে অবশ্য এই পুনর্গঠনের আবার পরিবর্তন করা হইতে থাকে। ফলে বর্তমানে অঙ্গরাজ্যগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া বাইশটি হইয়াছে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে নয়টি। বাইশটি অঙ্গরাজ্য হইল : (১) অন্ধ্রপ্রদেশ, (২) আসাম, (৩) উড়িষ্যা,

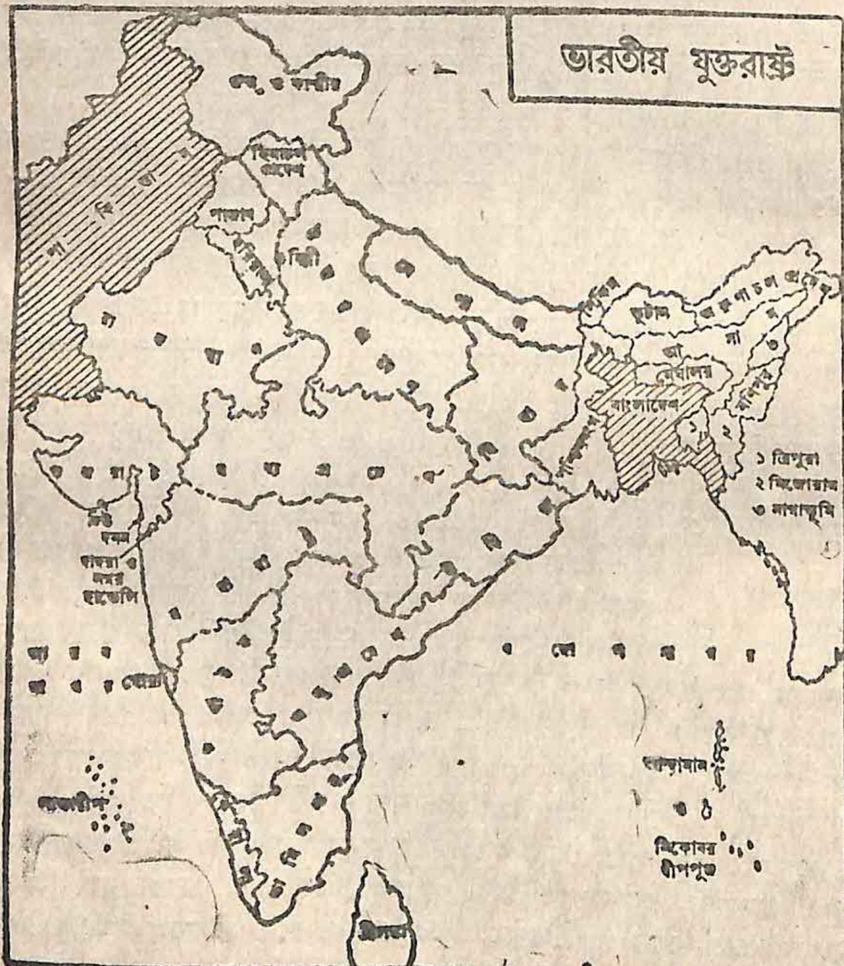
অঙ্গরাজ্যগুলির পুনর্বিন্যাস

বর্তমান অঙ্গরাজ্য-সমূহ (২২)

(৪) উত্তরপ্রদেশ, (৫) কেরালা, (৬) গুজরাট, (৭) জম্মু ও কাশ্মীর, (৮) নাগাভূমি, (৯) পশ্চিমবঙ্গ, (১০) বিহার, (১১) পাঞ্জাব, (১২) হরিয়ানা, (১৩) কর্ণাটক, (১৪) মহারাষ্ট্র, (১৫) তামিলনাড়ু, (১৬) রাজস্থান, (১৭) ত্রিপুরা, (১৮) মণিপুর, (১৯) হিমাচল প্রদেশ, (২০) মেঘালয়, (২১) মধ্যপ্রদেশ এবং (২২) সিকিম।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলসমূহ (৯)

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি হইল : (১) আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, (২) লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদ্বীপ দ্বীপপুঞ্জ (অধুনা এই সব কয়টির নাম হইয়াছে লাক্ষাদ্বীপ), (৩) দিল্লী, (৪) চণ্ডীগড়, (৫) দাদরা ও নগর হাভেলি, (৬) গোয়া-দমন-দিউ, (৭) অরুণাচল প্রদেশ, (৮) মিজোরাম এবং (৯) পণ্ডিচেরি।



রাজ্য পুনর্গঠন আইন (১৯৫৬) অনুসারে প্রতিবেশী অঙ্গরাজ্যসমূহের এবং ইউনিয়ন অঞ্চলগুলির পারস্পরিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সীমানাসংক্রান্ত, সাধারণ সমস্যাসমূহের বিচারবিবেচনা ও সমাধানের জন্য উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম ও মধ্য—এই কয়টি আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়। (১) উত্তরাঞ্চলে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, জম্মু ও কাশ্মীর, দিল্লী, চণ্ডীগড় ও হিমাচলপ্রদেশ ; (২) পূর্বাঞ্চলে পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, বিহার ও উড়িষ্যা ; (৩) দক্ষিণাঞ্চলে অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, কেরালা ও পাণ্ডিচেরি। (৪) পশ্চিমাঞ্চলে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, গোয়া-দমন-দিউ এবং দাদরা ও নগর হাভেলি। (৫) মধ্যাঞ্চলে উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ আছে। (৬) ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাভূমি, ত্রিপুরা ও মিজোরাম লইয়া উত্তর-পূর্ব পরিষদ নামে অপর একটি পরিষদ গঠিত হইয়াছে।

কেন্দ্রীয় বা ইউনিয়ন সরকার এবং রাজ্য সরকার—এই দুই প্রকার শাসনের সমন্বয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত হইয়া থাকে।

ইউনিয়ন বা কেন্দ্রীয় সরকার : ভারতীয় সংবিধান ভারতের ইউনিয়ন বা কেন্দ্রে এবং রাজ্যগুলিতে পার্লামেণ্টারী শাসন অর্থাৎ দায়িত্বশীল শাসন স্থাপন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা একজন রাষ্ট্রপতি, একজন উপরাষ্ট্রপতি এবং একটি মন্ত্রিসভা লইয়া গঠিত।

দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা

রাষ্ট্রপতি : সমগ্র ভারত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চে রাষ্ট্রপতির স্থান। ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনকর্তা রূপে স্থাপন করা হইয়াছে। তিনি জাতির প্রতীক স্বরূপ। আইনত তিনিই সর্বোচ্চ শাসক এবং সামরিক বিভাগগুলির সর্বাধিনায়ক। কিন্তু শাসনকার্যে রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শ ও সাহায্যদানের জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকিবে এবং এই মন্ত্রিসভার সর্বোচ্চে থাকিবেন প্রধান মন্ত্রী। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে (১৯৭৬) সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি তাঁহার কর্তব্যকার্য সম্পাদনে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪৪তম সংশোধনে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রপতি মন্ত্রি-পরিষদের সুপারিশ পুনর্বিবেচনার জন্য মন্ত্রি-পরিষদের নিকট ফেরত পাঠাইতে পারেন কিন্তু পুনর্বিবেচনার পর যে-পরামর্শ মন্ত্রি-পরিষদ দিবে তাহা রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করিতে বাধ্য থাকিবেন। এদিক দিয়া নামে রাষ্ট্রপতি হইলেও তিনি ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর ন্যায়ই মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়া থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির ন্যায় সরাসরি কার্যনির্বাহের ক্ষমতা ভারতের রাষ্ট্রপতির নাই। পদমর্যাদায় তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ হইলেও ভারতের রাষ্ট্রপতির প্রকৃত শাসনক্ষমতা নাই। এই কারণে মন্ত্রিসভার কার্যাদির জন্য তাঁহার কোন দায়িত্ব স্বভাবতই নাই।

রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী—প্রকৃত কার্যক্ষমতা মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত

নির্বাচনের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদ পূরণ করা হয়। তবে এক বিশেষ পদ্ধতিতে তিনি নির্বাচিত হন। জনসাধারণের সরাসরি ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন না। পরোক্ষ নির্বাচনের (Indirect Election) মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের

জন্য একটি নির্বাচকমণ্ডলী বা 'ইলেক্টরেল কলেজ' (Electoral College) গঠন করা হয়। এই নির্বাচকমণ্ডলী বা ইলেক্টরেল কলেজ কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যগণ লইয়া গঠিত হয়। কিন্তু এই নির্বাচকমণ্ডলীকে এক বিশেষ পদ্ধতিতে ভোট দিতে হয়। এই পদ্ধতিকে একক হস্তান্তর-যোগ্য আনুপাতিক ভোটদান (proportional representation by means of the single transferable vote) বলা হয়। এই নির্বাচন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল। ইহাতে যতজন রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থী হইবেন প্রতি ভোটদাতার ততটি ভোট থাকে। ভোটদাতা গোপন ভোটপত্রে প্রার্থীদের নামের পাশে তাঁহার পছন্দ ক্রমপর্যায়ে বুঝাইয়া দিবার জন্য ১, ২, ৩, এইরূপ সংখ্যা বসাইবেন। অর্থাৎ যে প্রার্থীকে তিনি সর্বাপেক্ষা বেশি পছন্দ করেন তাঁহার নামের পাশে ১, তারপর যাঁহাদের তিনি পছন্দ করেন তাঁহাদের নামের পাশে ২, ৩, এইভাবে ভোটপত্রে লিখিবেন। ভোটার কাহাকে সর্বাংক পছন্দ করেন তাহা ভোটপত্রে ১ লিখিয়া জানাইতেই হইবে, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পছন্দ তিনি নাও জানাইতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচন পদ্ধতি

এইভাবে রাষ্ট্রপতির পদপ্রার্থিগণ প্রত্যেকে যতগুলি প্রথম পছন্দের ভোট পাইয়াছেন তাহা যোগ দেওয়া হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেকের নামের পাশে ১ যতগুলি ভোটপত্রে আছে তাহা যোগ করা হইবে। তারপর যোগফলকে ২ দিয়া ভাগ করিয়া যে ভাগফল পাওয়া যাইবে তাহার সঙ্গে ১ যোগ করা হইবে। এইভাবে যে সংখ্যা দাঁড়াইবে সেই সংখ্যা (কোটা, Quota) যাঁহার হইবে তিনিই নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছেন বুঝিতে হইবে।*

---

* ভোটপ্রদান পদ্ধতির কল্পিত উদাহরণ :

মোট তিনজন প্রার্থী X, Y, Z নিম্নলিখিত প্রথম পছন্দের ভোট পাইয়াছেন :

X—১,৭০,৫০০
Y—১,০০,২০০
Z— ৬০,৩০০
৩,৩১,০০০

মোট ১ম পছন্দের ভোট ৩,৩১,০০০÷২=১,৬৫,৫০০+১=১,৬৫,৫০১ ভোট অবশ্যই পাইতে হইবে। ইহাকে কোটা (Quota) বলে। এই ভোট যিনি পাইবেন তিনিই জয়ী হইবেন। এখানে X জয়ী হইয়াছেন। কিন্তু যদি ভোটের সংখ্যা নিম্নলিখিত রূপ হইত, যেমন :

X—১,৬০,৫০০
Y—১,০০,২০০
Z— ৭০,৩০০

৩,৩১,০০০÷২=১,৬৫,৫০০+১=১,৬৫,৫০১ তাহা হইলে কেহই জয়ী হইতেন না। এইরূপ পরিস্থিতিতে সর্বাপেক্ষা কম সংখ্যক ভোট যিনি পাইয়াছেন অর্থাৎ Z-এর ভোটপত্রে X ও Y যতগুলি ২য় পছন্দের ভোট পাইয়াছেন সেই ভোট তাঁহাদের মোট ভোটের সহিত যোগ দিতে হইবে, যেমন :

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল হইল পাঁচ বৎসর। তিনি পুনরায় নির্বাচনপ্রার্থী হইতে কোন বাধা নাই। পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিতে পারিবেন। সংবিধান-বিরোধী কার্যকলাপ বা কোন প্রকার অসদাচরণের অভিযোগে তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়া প্রস্তাব পার্লামেণ্টের যে-কোন কক্ষে আনা যাইতে পারে। এজন্য যে কক্ষে অভিযোগ আনা হইবে সেই কক্ষের সদস্যসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ সদস্য ১৪ দিনের নোটিশ দিয়া অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবেন। যে কক্ষে প্রস্তাব আনা হইবে উহাতে মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সেই প্রস্তাব গৃহীত হইলে অপর কক্ষ সেই অভিযোগের তদন্ত করিবেন। অভিযোগ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইলে সেই কক্ষে অর্থাৎ তদন্তকারী কক্ষে মোট সদস্যসংখ্যার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ প্রস্তাব গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতি ভোটে পদচ্যুত হইবেন। অবশ্য তদন্তকালে রাষ্ট্রপতি আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাইবেন।

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল

রাষ্ট্রপতির অপসারণ

রাষ্ট্রপতির কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বেই পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে হইবে। কিন্তু মৃত্যু, পদত্যাগ বা অসদাচরণের জন্য পদচ্যুতির ফলে রাষ্ট্রপতিপদ শূন্য হইলে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করিতে হইবে

রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হইতে হইলে প্রার্থীর কতকগুলি যোগ্যতা অবশ্যই থাকিতে হইবে। (১) তিনি ভারতের নাগরিক হইবেন। (২) তাঁহার বয়স অন্তত ৩৫ বৎসর হইতে হইবে। (৩) নির্বাচনপ্রার্থী হইবার কালে তিনি কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট বা রাজ্য আইনসভার সদস্যপদে, কোন সরকারী বা বেসরকারী পদে অর্থাৎ অর্থ লাভ হয় এরূপ কোন পদে অধিষ্ঠিত থাকিতে পারিবেন না। (৪) তাঁহার নির্বাচনপ্রার্থী হইবার আইনত যোগ্যতা থাকা চাই।

রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর যোগ্যতা

রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার পর কার্যভার গ্রহণ করিবার পূর্বে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মুখে তাঁহাকে ভগবানের নামে শপথ করিয়া দেশের সংবিধান, আইনকানুন অনুযায়ী এবং জনসাধারণের স্বার্থে রাষ্ট্রপতির কার্য সম্পাদন করিবেন এই অঙ্গীকার করিতে হয়।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা : পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, আইনত শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হস্তে ন্যস্ত। কিন্তু তিনি মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শাসনকার্য রাষ্ট্রপতির নামেই পরিচালিত হয়, কিন্তু

X—১,৬০,৫০০ ১ম পছন্দের ভোট+ ২,৩০০ ২য় পছন্দের ভোট=১,৬২,৮০০

Y—১,০০,২০০ ১ম পছন্দের ভোট+৬৮,০০০ ২য় পছন্দের ভোট=১,৬৮,২০০।

অবশ্য প্রাপ্তব্য ভোটের সংখ্যা হইল ১,৬৫,৫০১। এই ক্ষেত্রে Y সেই ভোট পাইয়াছেন। Y নির্বাচিত হইবেন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভি. ভি. গিরি দ্বিতীয় পছন্দের ভোটপত্রের ফলাফল দ্বারা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এইভাবে প্রয়োজনবোধে দ্বিতীয় পছন্দের ভোট যোগ দিয়া অবশ্য প্রাপ্তব্য ভোটসংখ্যা যতক্ষণ না পাওয়া গিয়াছে ততক্ষণ প্রার্থীদের মধ্য হইতে যাঁহাদের ভোট কম তাঁহাদিগকে এক এক করিয়া বাদ দিতে হইবে।

কার্যত সকল ক্ষমতা মন্ত্রিসভার উপর ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি শোভাবর্ধনকারী নিয়মতান্ত্রিক সর্বোচ্চ শাসক মাত্র। তাঁহার ক্ষমতাকে (১) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (২) আইন প্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা, (৪) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা ও (৫) জরুরী ক্ষমতা—এই পাঁচটি ভাগে ভাগ করিয়া আলোচনা করা যাইতে পারে।

(১) **শাসনসংক্রান্ত বা কার্যনির্বাহক ক্ষমতা**: রাষ্ট্রপতি শাসনপরিচালন বিভাগের সর্বাধিনায়ক। তাঁহার নামে সকল শাসনকার্য পরিচালিত হয়। তিনি পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ অর্থাৎ লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে প্রধান মন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে মন্ত্রিসভার অপরাপর মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। মন্ত্রিসভা সংবিধান ভঙ্গ করিলে রাষ্ট্রপতি উহাকে পদচ্যুত করিয়া লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। রাজ্যগুলির গভর্ণর বা রাজ্যপালগণ, সুপ্রীম কোর্ট ও বিভিন্ন হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, ভারতের কম্প্‌ট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল, মুখ্য নির্বাচন-কমিশনার, ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যগণ, অ্যাটর্নি-জেনারেল, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হন।

কার্যনির্বাহক ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতির পরিচয়পত্র (credentials) লইয়া ভারতীয় রাষ্ট্রদূতগণ যেমন বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট উপস্থিত হন অনুরূপ বিদেশী রাষ্ট্রদূতগণ ভারতের রাষ্ট্রপতির নিকট নিজ নিজ রাষ্ট্রপ্রধানের পরিচয়পত্র-সহ নিজেদের পরিচিত করেন। বিদেশী রাষ্ট্রপ্রধানগণ ভারতে আসিলে রাষ্ট্রপতিই তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

রাষ্ট্রদূত নিয়োগ ও বিদেশী রাষ্ট্রদূত গ্রহণের ক্ষমতা

রাষ্ট্রপতি আইনত ভারতের স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সর্বাধ্যক্ষ। কিন্তু এই সকল ক্ষমতা তিনি নিজ দায়িত্বে প্রয়োগ করিতে পারেন না। মন্ত্রিসভা ও পার্লামেণ্ট এই সকল ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। যুদ্ধ ঘোষণা বা শান্তি স্থাপন রাষ্ট্রপতি নিজ দায়িত্বে করিতে পারেন না।

স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলির সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা, শান্তিরক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কার্যবিধি (regulations) রাষ্ট্রপতিই প্রণয়ন করিতে পারেন। অন্যান্য কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সংরক্ষিত ক্ষমতা (reserved powers) রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী হয়।

অঙ্গরাজ্যসমূহের মধ্যে সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা ব্যাপারে সমতা ও সহযোগিতার জন্য রাষ্ট্রপতি একটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করিতে পারেন।

জরুরী অবস্থায় অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের প্রশাসন ব্যাপারে যে-কোন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করিতে পারেন।

(২) **আইন প্রণয়নসংক্রান্ত ক্ষমতা**: রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন ব্যতীত কোন আইন বলবৎ হইতে পারে না। রাষ্ট্রপতি কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ পার্লামেণ্ট আহবান করিতে, মুলতবী রাখিতে বা পার্লামেণ্টের নিম্নকক্ষ লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের ব্যবস্থা করিতে

পারেন। পার্লামেণ্টে রাষ্ট্রপতি তাঁহার উদ্বোধনী বক্তৃতায় সরকারী কার্যের আলোচনা করেন এবং আহূত অধিবেশনের উদ্দেশ্য জ্ঞাত করাইয়া থাকেন।

লোকসভা আহবান, স্থগিত ও ভাঙ্গিয়া দিবার ক্ষমতা

পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষ কর্তৃক কোন আইনের বিল পাশ করা হইলে পর উহা রাষ্ট্রপতির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করা হয়। তিনি বিল অনুমোদন করিতে বা না করিতেও পারেন। অর্থবিল অবশ্য পার্লামেণ্ট কর্তৃক পাশ হইলে রাষ্ট্রপতি অনুমোদন না করিয়া পারেন না। অন্যান্য বিল তিনি পার্লামেণ্টের নিকট পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠাইতে পারেন। কেবল রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভা কর্তৃক কোন বিল পাশ হইলে উহা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সেইরূপ ক্ষেত্রে আইনের প্রস্তাব অনুমোদন করিতে বা না করিতেও পারেন।

বিল অনুমোদনের ক্ষমতা

অর্ডিন্যান্স বা সাময়িক জরুরী বা হুকুম আইন-প্রণয়ন ক্ষমতা

পার্লামেণ্টের যখন অধিবেশন থাকে না সেই সময়ে কোন আইন পাশ করিবার প্রয়োজন হইলে রাষ্ট্রপতি সাময়িক জরুরী বা হুকুম আইন (ordinance) পাশ করিতে পারেন। অবশ্য পার্লামেণ্টের অধিবেশন শুরু হইবার ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই জরুরী আইন পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে উহা বাতিল হইয়া যায়। রাষ্ট্রপতি লোকসভায় অনধিক দুইজন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সদস্য এবং রাজ্যসভায় ১২ জন সদস্য মনোনীত করিতে পারেন।

পার্লামেণ্টে ও রাজ্য আইনসভায় নির্বাচিত হইবার অযোগ্যতা

কোন্ ব্যক্তি পার্লামেণ্ট বা রাজ্য আইনসভার সদস্যপদে নির্বাচিত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে অথবা দুর্নীতির জন্য নির্বাচনে প্রার্থী হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে উহা কতকালের জন্য হইবে তাহা রাষ্ট্রপতি ভারতের নির্বাচন কমিশনের (Election Commission) সহিত পরামর্শক্রমে স্থির করিবেন।

(৩) **অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা**: নূতন আর্থিক বৎসর শুরু হইবার পূর্বে আগামী বৎসরের সরকারী ব্যয়বরাদ্দ করিবার জন্য রাষ্ট্রপতির সুপারিশ প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ভিন্ন নূতন আর্থিক বৎসরের বাজেট লোকসভায় উত্থাপন করা যায় না। আকস্মিক প্রয়োজনে ব্যয় করিবার প্রয়োজন দেখা দিলে রাষ্ট্রপতি তাঁহার অধীন 'অনিশ্চিত ব্যয় তহবিল' (Contingency Fund) হইতে ব্যয়ের অনুমতি দিতে পারেন। এজন্য পার্লামেণ্টের পূর্ব-অনুমোদন প্রয়োজন হয় না।

বাজেট পেশের সুপারিশ

অনিশ্চিত ব্যয় তহবিল হইতে ব্যয়বরাদ্দ

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মধ্যে রাজস্ব কি অনুপাতে বণ্টন করা হইবে তাহা নির্ধারণের জন্য রাষ্ট্রপতি প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি অর্থ কমিশন (Finance Commission) নিয়োগ করেন। এই অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুসারে রাজস্ব বণ্টনের আদেশ রাষ্ট্রপতি দিয়া থাকেন। সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) অনুসারে ভারতীয় ইউনিয়ন ও অঙ্গরাজ্যসমূহের হিসাবপত্র কিভাবে রাখা হইবে সে-বিষয়ে রাষ্ট্রপতি কম্প্ট্রোলার ও অডিটর-জেনারেলের

অর্থ কমিশন নিয়োগ

(Comptroller and Auditor-General) পরামর্শক্রমে স্থির নির্দেশ দিবেন। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪৪তম সংশোধনে ইহাকে পরিবর্তন করিয়া বলা হইয়াছে যে ইউনিয়ন ও রাজ্যের হিসাব রক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন কম্পট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল। অবশ্য সেজন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

(৪) **বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতি দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ডাজ্ঞা মকুফ করিতে, স্থগিত রাখিতে, হ্রাস করিতে অথবা এক দণ্ডের পরিবর্তে অপর দণ্ড দিতে পারেন। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রপতি এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন। কোন বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজন-বোধে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের বিচারকদের অভিমত চাহিতে পারিবেন। এরূপ অভিমত সুপ্রীম কোর্ট রাষ্ট্রপতিকে জানাইতে বাধ্য।

দণ্ডাদেশ মকুফ, হ্রাস, স্থগিত, পরিবর্তন

(৫) **জরুরী ক্ষমতা :** রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার সংবিধানে সন্নিবিষ্ট আছে। প্রথমত, যুদ্ধ, বৈদেশিক আক্রমণ বা যুদ্ধের আশঙ্কা বা আক্রমণের অথবা আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আশঙ্কার ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য রাষ্ট্রপতি জরুরী পরিস্থিতি (Emergency) ঘোষণা করিতে পারেন। এইরূপ জরুরী পরিস্থিতি ঘোষণা করিলে অঙ্গরাজ্যগুলির শাসন এবং আইন প্রণয়ন ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত হইবে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা এককেন্দ্রিক (unitary) শাসনব্যবস্থায় পরিণত হইবে। এইরূপ জরুরী পরিস্থিতিতে ভারতীয় নাগরিকদের বাক্-স্বাধীনতা, সমবেত হইবার অধিকার প্রভৃতি মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রপতি হ্রাস বা স্থগিত রাখিতে পারিবেন। ৪৪তম সংশোধনে (১৯৭৮) বলা হইয়াছে যে, জীবনের নিরাপত্তা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অধিকারকে স্থগিত রাখা চলিবে না। সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে রাষ্ট্রপতিকে সমগ্র ভারতের অথবা ভারতের যে-কোন একটি অঞ্চলের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

জরুরী পরিস্থিতি ঘোষণা

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি রাজ্যপালের রিপোর্টে অথবা অন্যভাবে স্থিরনিশ্চিত হন যে, কোন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা দ্বারা সেই রাজ্যের শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন। এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি রাজ্য বিধানসভার ক্ষমতা পার্লামেণ্টের হস্তে ন্যস্ত করিতে পারেন। এমতাবস্থায় পার্লামেণ্ট রাজ্য আইনসভার কার্যাদি সম্পন্ন করিবে। রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির নির্দেশক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন।

রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থায় ক্ষমতা অধিগ্রহণ

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপতি যদি এ-বিষয়ে নিশ্চিত হন যে, ভারতে এরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটিয়াছে যে সমগ্র দেশ বা দেশের কোন অংশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হইতে চলিতেছে বা আর্থিক স্থায়িত্ব বিনাশপ্রাপ্ত হইতে যাইতেছে, সেরূপ ক্ষেত্রে তিনি অর্থনৈতিক জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিতে পারিবেন। এইরূপ ঘোষণা করিলে অর্থব্যয়সংক্রান্ত বাধানিষেধ

অর্থনৈতিক জরুরী পরিস্থিতি ঘোষণা

তিনি আরোপ করিতে এবং ব্যয়হ্রাস করিবার নির্দেশ দিতে পারিবেন। সরকারী কর্মচারীদের বেতনহ্রাসও করিতে পারা যাইবে।

উপরাষ্ট্রপতি : ভারতীয় সংবিধানে একজন উপরাষ্ট্রপতি (Vice-President) নিয়োগের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শাসনসংক্রান্ত কোন ক্ষমতা সংবিধানে উপরাষ্ট্রপতিকে দেওয়া হয় নাই। রাষ্ট্রপতির ন্যায়-ই তাঁহাকে অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে। তাঁহার বয়স অন্তত ৩৫ বৎসর হওয়া চাই। রাজ্যসভার সদস্যপদপ্রার্থী হইতে হইলে যে যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন সেই যোগ্যতা উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর থাকিতে হইবে। উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনপ্রার্থী হইবার কালে কোন চাকরি বা কোন প্রকার অর্থাগম হয় সেরূপ কাজে নিযুক্ত থাকা চলে না। পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যুক্ত অধিবেশনে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। তাঁহার কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বৎসর। উপরাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করিবার জন্য রাজ্যসভার মোট সদস্যসংখ্যার অধিকাংশ দ্বারা প্রস্তাব গৃহীত হইলে এবং লোকসভা ঐ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেই তিনি পদচ্যুত হন।

যোগ্যতা

উপরাষ্ট্রপতি নিজ পদাধিকারবলে (*ex-officio*) রাজ্যসভার সভাপতিরূপে (Chairman) কাজ করেন। পদত্যাগ, ইম্পীচমেন্টের ফলে পদচ্যুতি অথবা মৃত্যুর ফলে রাষ্ট্রপতির পদ যদি শূন্য হয় তাহা হইলে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবার পূর্বাবধি উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কর্তব্যকার্য করিয়া থাকেন। উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিরূপে কর্তব্য সম্পাদনকালে রাষ্ট্রপতির যাবতীয় ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করিবেন বটে কিন্তু পদমর্যাদার দিক্ দিয়া তিনি রাষ্ট্রপতি হিসাবে কার্যরত উপরাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি উভয়েই মারা গেলে অথবা অসুস্থতা হেতু কর্তব্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতিপদে নিযুক্ত হইবেন।

কর্তব্যকার্য

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা : পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থার নিয়ম অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদানের জন্য একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হয়। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪২তম সংশোধনে বলা হইয়াছে মন্ত্রিসভার পরামর্শানুসারে রাষ্ট্রপতি কার্য করিতে বাধ্য থাকিবেন। ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) অনুসারে রাষ্ট্রপতি একবারের জন্য মন্ত্রিপরিষদকে উহার সুপারিশকে পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিতে পারেন তবে পুনর্বিবেচনার পর যে পরামর্শ মন্ত্রি-পরিষদ দিবে তাহা রাষ্ট্রপতি মানিয়া লইতে বাধ্য থাকিবেন। সুতরাং এই মন্ত্রিসভার হস্তেই প্রকৃত শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতি সাধারণ নির্বাচনের পর লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করেন। এই সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অধিকসংখ্যক সদস্যের সমর্থনপ্রাপ্ত দলের নেতাই প্রধান মন্ত্রিপদ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার সুপারিশক্রমে মন্ত্রিসভার অপরাপর মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। প্রধান মন্ত্রী ইচ্ছা করিলে রাজ্যসভা বা লোকসভার সদস্য নহেন এরূপ যে-কোন ব্যক্তিকে মন্ত্রী নিয়োগের জন্য

লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন : তাঁহার সুপারিশক্রমে অপরাপর মন্ত্রী নিযুক্ত হন

সুপারিশ করিতে পারেন। এই ধরনের মন্ত্রীকে ছয় মাসের মধ্যে পার্লামেণ্টের যে-কোন একটি সভার সভ্য নির্বাচিত হইতে হইবে, নতুবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়।

পার্লামেণ্টারী রীতি অনুসারে মন্ত্রিসভা উহার কাজকর্মের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রী পৃথকভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে পার্লামেণ্টের নিকট দায়ী থাকেন। কোন মন্ত্রীর কার্যকলাপে পার্লামেণ্টের সদস্যগণ অসন্তুষ্ট হইলে তাঁহার বিরুদ্ধে লোকসভায় অধিকাংশ ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ অনাস্থা প্রস্তাব গৃহীত হইলে মন্ত্রিসভার যৌথ দায়িত্ব নীতি অনুসারে সমগ্র মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিসভার কার্যাদির সমালোচনা পার্লামেণ্টের সদস্যগণ করিতে পারেন। মন্ত্রিসভার পশ্চাতে লোকসভার অধিকাংশ সদস্যের সমর্থন যতদিন থাকিবে ততদিন উহা ক্ষমতায় আসীন থাকিতে পারিবে। এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। আইনত রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন মন্ত্রিসভার পশ্চাতে থাকিলে তাহা তিনি করেন না, কারণ পুনরায় ঐ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকেই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহবান করিতে হইবে। কিন্তু মন্ত্রিসভা সংবিধান-বিরোধী কাজ করিলে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারেন এবং নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন।

ব্যক্তিগত ও যৌথ দায়িত্ব

সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে মন্ত্রিসভার পদচ্যুতি

মন্ত্রিসভার যে-সকল মন্ত্রীর উপর গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে তাঁহাদিগকে লইয়া একটি 'ক্যাবিনেট' (Cabinet) গঠন করা হয়। অপরাপর মন্ত্রী এই ক্যাবিনেটের সভায় উপস্থিত থাকেন না। ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রিগণ ভিন্ন কয়েকজন মন্ত্রী থাকেন যাঁহারা ক্যাবিনেট পর্যায়ের মন্ত্রিগণের কার্যে সাহায্য করেন। ইঁহারা রাষ্ট্রমন্ত্রী (Ministers of State) এবং উপমন্ত্রী (Deputy Ministers) নামে অভিহিত হন। প্রধান মন্ত্রীর সহিত মতানৈক্য ঘটিলে মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয়। তিনি পদত্যাগ না করিলে প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং পদত্যাগ করিয়া মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় অপর মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন এবং উহা হইতে এই মন্ত্রীকে সহজেই বাদ দিতে পারেন। প্রধান মন্ত্রী মন্ত্রিসভার মূল স্তম্ভ। সাধারণত এইরূপ ঘটনা ঘটে না। মন্ত্রিসভার প্রত্যেক মন্ত্রী এক একটি দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত থাকেন। কে কোন্ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত থাকিবেন তাহা প্রধান মন্ত্রী স্থির করেন।

বিভিন্ন পর্যায়ের মন্ত্রী লইয়া মন্ত্রিসভা গঠিত

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানের ৪২তম সংশোধনের পূর্বে রাষ্ট্রপতি মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকসভাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারিতেন। কিন্তু ৪২তম সংশোধনের পর রাষ্ট্রপতি তাঁহার কর্তব্যকার্য সম্পাদন করিতে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করিতে বাধ্য।

প্রধান মন্ত্রী : ভারতীয় সংবিধান অনুসারে একজন প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতিকে পরামর্শদান ও শাসনকার্যে সহায়তা করিবেন। পার্লামেণ্টারী

অর্থাৎ দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থায় প্রধান মন্ত্রীই হইলেন শাসনকার্যের প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী। প্রধান মন্ত্রী লোকসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ বা অধিক-সংখ্যক সদস্য দ্বারা সমর্থিত দলের নেতা এবং সেই কারণে তাঁহাকে লোভসভার নেতা (Leader of the House of the People) বলা হয়।

প্রধান মন্ত্রী প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী

প্রধান মন্ত্রী অপরাপর মন্ত্রীকে নির্বাচন করেন। অর্থাৎ তাঁহার পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি অপরাপর মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। কোন্ মন্ত্রী কোন্ দপ্তর পরিচালনা করিবেন তাহা প্রধান মন্ত্রী স্থির করেন। তিনি যে-কোন মন্ত্রীকে মন্ত্রিসভা হইতে বাদ দিতে পারেন। মন্ত্রিসভার অধিবেশনে অর্থাৎ সভায় প্রধান মন্ত্রী সভাপতিত্ব করেন। পার্লামেণ্ট আহ্বান, মুলতবী রাখা বা লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের পরামর্শ তিনি দিতে পারেন। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত প্রধান মন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানাইবেন এবং রাষ্ট্রপতি কোন বিষয় সম্পর্কে জানিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে সে-বিষয়ে জানাইবেন। মন্ত্রিসভা এবং রাষ্ট্রপতির মধ্যে প্রধান মন্ত্রীই হইলেন যোগসূত্র। প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। তেমনি একজন মন্ত্রী অথবা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব লোভসভায় গৃহীত হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। ইহাই হইল যৌথ দায়িত্ব এবং পার্লামেণ্টারী শাসন পদ্ধতির রীতি।

প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও কর্তব্যকার্য

পার্লামেণ্ট : ভারতীয় সংবিধান অনুসারে ভারতের পার্লামেণ্ট বা কেন্দ্রীয় আইনসভা রাষ্ট্রপতি এবং দুই কক্ষ (Chambers) লইয়া গঠিত হইবে। ঊর্ধ্বকক্ষের নাম রাজ্যসভা (Council of States) আর নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা (House of the People)।

রাজ্যসভা : ভারতীয় পার্লামেণ্টের ঊর্ধ্বকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভা ২৫০ জনের অনধিক সংখ্যক সদস্য লইয়া গঠিত হইবে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে ১২ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতি কার্যে অবদান আছে এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত হইবেন। সংবিধান অনুসারে অবশিষ্ট অনধিক ২৩৮ জন সদস্য অঙ্গরাজ্য ও ইউনিয়ন অঞ্চল হইতে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি। এই পরোক্ষ নির্বাচন বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভাগুলির নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক একক হস্তান্তরযোগ্য আনুপাতিক ভোটদানের পদ্ধতি অনুসারে (in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote) নির্ধারিত হয়। বর্তমান রাজ্যসভার মোট সদস্যসংখ্যা ২৪৪ জন। ইঁহাদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি-মনোনীত ১২ জন সদস্য রহিয়াছেন। রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গের ১৬, সিকিমের ১ এবং ত্রিপুরার ১ জন সদস্য আছেন।

রাজ্যসভার গঠন

রাজ্যসভার সদস্যপদ প্রার্থীকে ভারতের নাগরিক এবং অন্তত ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যগণ রাজ্যসভার সদস্যদিগকে পরোক্ষ

নির্বাচনে নির্বাচিত করেন। কোন্ রাজ্য বা কোন্ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কতজন সদস্য রাজ্যসভায় নির্বাচিত হইবেন তাহা নির্দিষ্ট থাকে। ভারতের উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার সভাপতি (Chairman) পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। রাজ্যসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সহকারী সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচন করেন। কার্যরত উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদে আসীন হইলে রাজ্যসভার অধিবেশন পরিচালনা করেন সহকারী সভাপতি।

রাজ্যসভার সদস্যপদ প্রার্থীর যোগ্যতা

রাজ্যসভা একটি স্থায়ী পরিষদ। ইহা কখনও ভাঙ্গিয়া দিবার প্রয়োজন হয় না। প্রতি দুই বৎসর অন্তর সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অবসর গ্রহণ করেন এবং সেই স্থলে নূতন সদস্য নির্বাচিত হন। রাজ্যসভায় অর্থবিল ভিন্ন অপর যে-কোন বিল বা আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা চলে। রাজ্যসভা কোন বিল পাশ করিতে, পরিবর্তন করিতে বা উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে। অর্থবিল নিম্নকক্ষ ভিন্ন উর্ধ্বকক্ষে উত্থাপন করা নিষিদ্ধ। অর্থবিল রাজ্যসভা কর্তৃক পাশ করা না-করায় কিছু আসিয়া যায় না। পাশ না করিলেও অর্থবিল বলবৎ হইবে। অন্যান্য বিল রাজ্যসভা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে বা বিলটির সংশোধন সম্পর্কে দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ ঘটিতে পারে অথবা কিছু না করিয়া রাজ্যসভা ছয় মাসের অধিককাল বিলটিকে ধরিয়া রাখিতে পারে। এ-অবস্থায় রাষ্ট্রপতি দুই কক্ষের সম্মিলিত অধিবেশন আহ্বান করিতে পারেন। এই যুক্ত অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যদের অধিকাংশের ভোটে বিল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। রাষ্ট্রপতিকে অভিযুক্ত করিয়া প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে উভয় কক্ষে গৃহীত হইলে তাঁহাকে পদচ্যুত করা চলে। এদিক্ দিয়া রাজ্যসভার ক্ষমতা লোকসভার সমান।

রাজ্যসভার ক্ষমতা

লোকসভা বা নিম্নকক্ষ : ভারতীয় সংবিধানে প্রথমে বলা হইয়াছিল যে, অনধিক ৫২৫ জন (অঙ্গরাজ্যগুলি হইতে প্রত্যক্ষভাবে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত অনধিক ৫০০ এবং ইউনিয়ন অঞ্চলসমূহ হইতে অনধিক ২৫) সদস্য লইয়া লোকসভা গঠিত হইবে। কিন্তু ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩১তম সংশোধন দ্বারা উহা বাড়াইয়া অনধিক ৫৪৫ করা হয় (২২টি অঙ্গরাজ্য হইতে ৫২৫ জন এবং ইউনিয়ন অঞ্চল হইতে ২০ জন প্রতিনিধি)। ৪২তম সংশোধন অনুসারে ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি পর্যন্ত লোকসভার আসন-সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকিবে। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে সপ্তম লোকসভার জন্য মোট সদস্য-সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৫৪৪। ২১ বৎসর বয়স্ক* স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ভারতীয় নাগরিকদের দ্বারা ৫২৫ জন ২২টি অঙ্গরাজ্য হইতে এবং ১৭ জন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল হইতে সপ্তম লোকসভার জন্য আসন বণ্টিত হয়। আর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্য হইতে ২ জনকে ভারতের রাষ্ট্রপতি মনোনীত করেন। নির্বাচনে তপশীলী জাতি ও তপশীলী আদিবাসী (উপজাতি)-দের জন্য সংবিধানের ৪৫তম সংশোধন (১৯৮০) অনুসারে ১৯৯০

লোকসভার গঠন ও কার্যকাল

* পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির নির্বাচনে ভোটদাতার বয়স কিন্তু ১৮ বৎসর করা হইয়াছে।

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আসন সংরক্ষিত আছে। লোকসভায় পশ্চিমবঙ্গের সদস্যসংখ্যা ৪২, সিকিমের ১, আসামের ১৪ এবং ত্রিপুরার ২। রাষ্ট্রপতি প্রধান মন্ত্রীর পরামর্শমত অথবা সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে লোকসভা পূর্বেই ভাঙ্গিয়া না দিলে উহা একবার নির্বাচিত হইলে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) অনুসারে পাঁচ বৎসরের স্থলে ছয় বৎসর কার্যে বহাল থাকিবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) দ্বারা এই মেয়াদকে পুনরায় ৫ বৎসর করা হইয়াছে।

লোকসভার সদস্যপদ প্রার্থীদের যোগ্যতা

লোকসভার সদস্যপদ প্রার্থীদের ভারতীয় নাগরিক হইতে হইবে, তাঁহাদের বয়স অন্তত ২৫ বৎসর হইবে। গুরুতর অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি লোকসভার সদস্যপদ প্রার্থী হইতে পারিবেন না।

স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার

লোকসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি এবং একজন সহকারী সভাপতি নির্বাচন করিবেন। সভাপতিকে 'স্পীকার' (Speaker) এবং সহকারী সভাপতিকে 'ডেপুটি স্পীকার' বলা হয়। স্পীকারের অনুপস্থিতিতে ডেপুটি স্পীকার লোকসভার সভাপতিত্ব করেন। স্পীকার নিরপেক্ষভাবে সভার কার্য পরিচালনা করেন। তিনি কোন প্রস্তাব উত্থাপনের অনুমতি না দিলে বা কোন বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন অবৈধ ঘোষণা করিলে উহা লোকসভায় উত্থাপন করা যায় না। স্বাধীনভাবে স্পীকার যাহাতে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন সেজন্য স্পীকারের ও ডেপুটি স্পীকারের বেতন লোকসভার অনুমোদনসাপেক্ষ নহে। লোকসভার সদস্যগণ অন্তত ১৪ দিনের নোটিশ দিয়া স্পীকারকে পদচ্যুত করিবার প্রস্তাব আনিতে পারেন। ভোটাধিক্যে সেই প্রস্তাব গৃহীত হইলে তাঁহাকে

স্পীকারের ক্ষমতা

পদত্যাগ করিতে হয়। লোকসভার অধিবেশনে নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা, সকল সদস্যকে সমান সুযোগ দেওয়া, কেহ যাহাতে সভার কার্যবিধি লঙ্ঘন না করেন সে-বিষয়ে নজর রাখা স্পীকারের কর্তব্য। কোন সদস্য লোকসভায় মর্যাদাহানিকর ব্যবহার বা উক্তি করিলে স্পীকার তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে, লোকসভা হইতে বহিষ্কার করিয়া দিতে বা সাময়িকভাবে তাঁহাকে লোকসভায় যোগদানে নিষেধ করিতে পারেন। বলা বাহুল্য, স্পীকারের নিরপেক্ষতা ও সভা পরিচালনার দক্ষতার এবং পার্লামেণ্টারী পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানের উপরই লোকসভার সুষ্ঠু কার্যসম্পাদন নির্ভর করে। রাষ্ট্রপতি ও পার্লামেণ্টের মধ্যে যোগসূত্র হইলেন স্পীকার।

আইন প্রণয়নই হইল লোকসভার সর্বপ্রধান এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। কেন্দ্রীয় তালিকায় সন্নিবিষ্ট সকল বিষয় এবং যুগ্ম তালিকায় উল্লিখিত বিষয়াদি সম্পর্কে লোকসভা আইন প্রণয়ন করিয়া থাকে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ের উপর লোকসভা এবং কোন রাজ্যের আইনসভা যদি পরস্পরবিরোধী আইন প্রণয়ন করেন তাহা হইলে লোকসভা কর্তৃক গৃহীত আইনটিই বলবৎ হইবে। রাজ্য আইনসভার সেই আইন কার্যকরী থাকিবে না। কোন জরুরী পরিস্থিতিতে কোন রাজ্যে যদি রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হয় তাহা হইলে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু থাকা কালে রাজ্যের বাজেট

পাশ করা, আইন প্রণয়ন করা প্রভৃতি দায়িত্ব লোকসভার তথা কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত হয়।

লোকসভার আইন প্রণয়ন ক্ষমতা

রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপর আইন প্রণয়ন করিবার জন্য যদি একাধিক রাজ্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করে, অথবা রাজ্যসভা যদি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে লোকসভাকে অনুরোধ জানায় তাহা হইলে রাজ্য তালিকাভুক্ত বিষয়ের উপরও লোকসভা আইন প্রণয়ন করিতে পারে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত অর্ডিন্যান্স (Ordinance) পার্লামেণ্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার ৬ সপ্তাহের মধ্যে লোকসভা কর্তৃক অনুমোদিত না হইলে উহা বাতিল হইয়া যায়। লোকসভার অনুমোদন পাইলেই উহা আইন হিসাবে বলবৎ হইতে পারে।

লোকসভার অর্থবিল-সংক্রান্ত ক্ষমতা

অর্থবিল (বাজেট) লোকসভায় ভিন্ন উত্থাপন করা নিষিদ্ধ। লোকসভা বাৎসরিক আয়-ব্যয়সংক্রান্ত বিল অর্থাৎ বাজেট পাশ করিলে উহা রাজ্যসভা অনুমোদন না দিলেও আইন হিসাবে বলবৎ হয়। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক, অ্যার্টনি-জেনারেল, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, কম্প্‌ট্রোলার ও অডিটর-জেনারেল প্রভৃতির বেতন ও ভাতা কেন্দ্রীয় সরকারের সঞ্চিত তহবিল (Consolidated Fund) হইতে দেওয়া হয়, এজন্য এই অর্থ ব্যয়ে লোকসভার অনুমোদন প্রয়োজন হয় না। লোকসভার অনুমোদন ব্যতীত কর স্থাপন করা বা সরকারের পক্ষে ঋণ গ্রহণ করা সম্ভব নহে। অর্থসংক্রান্ত বিষয়াদিতে লোকসভার ক্ষমতা উহাকে সরকারের সর্বাধিক শক্তিশালী অঙ্গে পরিণত করিয়াছে।

শাসন বিভাগ বা কার্য-নির্বাহক বিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা

সরকারের কার্যকলাপের সমালোচনা করিয়া শাসনসংক্রান্ত কার্যাদির নিয়ন্ত্রণ লোকসভা করিয়া থাকে। মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রশ্নাদি উত্থাপন করিয়া, প্রয়োজনবোধে মন্ত্রী বিশেষের অথবা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া লোকসভার সদস্যগণ শাসনসংক্রান্ত কার্যাদি নিয়ন্ত্রণ করিয়া থাকেন। অধিকাংশ ভোটে অনাস্থার প্রস্তাব যদি কোন মন্ত্রী বিশেষের বিরুদ্ধে বা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে গৃহীত হয় তাহা হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। মন্ত্রিসভার এই দায়িত্বশীলতা পার্লামেণ্টারী শাসন-পদ্ধতির এক অতি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। লোকসভা শাসকবর্গকে এই দায়িত্ব পালনে বাধ্য করেন।

অন্যান্য ক্ষমতা

পার্লামেণ্টের ক্ষমতার মধ্যে কোন কোন ব্যাপারে সংবিধান সংশোধন, এবং রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিগণকে পদচ্যুত করিবার অধিকার আছে। এই ক্ষমতা লোকসভা পার্লামেণ্টের অংশ হিসাবে ভোগ করিয়া থাকে।

রাজ্যপালের নিয়োগ ও যোগ্যতা

রাজ্য সরকার : রাজ্যপাল : কেন্দ্রীয় সরকারের সর্বোচ্চে যেমন রাষ্ট্রপতি, তেমনি রাজ্য শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চে রাজ্যপাল (Governor) অধিষ্ঠিত থাকেন। রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল নিয়োগ করেন। তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। অবশ্য পুনর্নিয়োগে কোন বাধা নাই। রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালকে সংবিধান ভঙ্গের অভিযোগে পদচ্যুত করিতে পারেন। রাজ্যপাল অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক এবং অন্তত ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইবেন। তিনি রাজ্যপাল নিযুক্তকালে পার্লামেণ্ট

বা রাজ্য আইনসভার সদস্য বা অর্থাগম হইতে পারে এরূপ কোন কার্যে নিযুক্ত থাকিতে পারিবেন না।

রাজ্যপাল রাজ্যের শাসনব্যবস্থায় নিয়মতান্ত্রিক শাসক। তিনি রাজ্য মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে শাসনকার্য পরিচালনা করিয়া থাকেন। তিনি রাজ্য আইনসভার নিম্নকক্ষ, অর্থাৎ বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোঅ্যালিশন্ দলের নেতাকে মুখ্য মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং তাঁহার পরামর্শক্রমে অপরাপর মন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন। রাজ্যপাল রাজ্যের এ্যাডভোকেট-জেনারেল, পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্য, পদস্থ সরকারী কর্মচারী প্রভৃতিকে নিযুক্ত করেন।

মুখ্য মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা নিয়োগের ক্ষমতা

রাজ্যপাল রাজ্য আইনসভার অধিবেশন আহ্বান করিতে, অধিবেশনের প্রারম্ভে উভয় কক্ষের সদস্যদিগকে সম্বোধন করিয়া রাজ্য সরকারের কর্মসূচী সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। আইনসভা মুলতবী রাখা বা আইনসভার নিম্নকক্ষ ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। মন্ত্রিসভা যদি সংবিধান ভঙ্গ করেন বা বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারান অথচ পদত্যাগ করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করিতে পারেন।

রাজ্য আইনসভা রাজ্যপালকে লইয়া গঠিত। তাঁহার সম্মতি না পাইলে কোন বিল আইনসভা কর্তৃক গৃহীত হইলেও বলবৎ হইবে না। তিনি এইরূপ গৃহীত বিল অনুমোদন করিতে পারেন, যে কক্ষ হইতে উহা তাঁহার নিকট প্রেরিত হইয়াছে সেই কক্ষে ফিরাইয়া দিতে পারেন অথবা রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন। রাজ্য আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রাজ্যপাল অর্ডিন্যান্স জারি করিতে পারেন। অবশ্য রাজ্য আইনসভার অধিবেশন শুরু হইবার ৬ সপ্তাহের মধ্যে সেই অর্ডিন্যান্স আইনসভার সম্মতি না পাইলে উহা বাতিল হইয়া যায়। রাজ্যপালের সুপারিশ অগ্রে লইয়া বিধানসভায় অর্থবিল পেশ করা চলে। কোন কোন রাজ্যে রাজ্য আইনসভা বিধানপরিষদ (উর্ধ্বকক্ষ) এবং বিধানসভা (নিম্নকক্ষ) লইয়া গঠিত আছে। এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বিধানপরিষদের কয়েকজন সদস্যকে সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, সমাজসেবা প্রভৃতিতে অবদান আছে এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত করিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের উর্ধ্বকক্ষ বিধানপরিষদের বিলোপসাধন করা হইয়াছে। বর্তমানে কেবল বিধানসভা লইয়া পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা গঠিত। রাজ্যপাল কোন কোন ক্ষেত্রে দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ডাদেশ মকুফ করিতে বা হ্রাস করিতে পারেন। রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থার সৃষ্টি হইলে তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সুপারিশ করিয়া রিপোর্ট প্রেরণ করিতে পারেন। রাজ্যের অভ্যন্তরে উপজাতি অঞ্চল থাকিলে রাজ্যপাল সেই অঞ্চলের শাসনব্যবস্থা নিজ ইচ্ছানুসারে পরিচালনা করিতে পারেন, মন্ত্রিসভার পরামর্শ সেক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় না।

রাজ্যপালের আইন-সংক্রান্ত ও অপরাপর ক্ষমতা

রাজ্যের মন্ত্রিসভা : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ-পদ্ধতি, কার্যকলাপের অনুরূপ কার্যকলাপ রাজ্যের শাসনব্যবস্থা রাজ্য মন্ত্রিসভা করিয়া থাকেন। বিধানসভার

সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোঅ্যালিশন্ (coalition) দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্য মন্ত্রী নিয়োগ করেন এবং মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে অপরাপর মন্ত্রীকে তিনি নিয়োগ করেন। মুখ্য মন্ত্রী রাজ্যপাল ও মন্ত্রিসভার মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করেন। মন্ত্রিসভাকে সংবিধানভঙ্গের অভিযোগে রাজ্যপাল পদচ্যুত করিতে পারেন। মন্ত্রিসভার মধ্যে দপ্তর বণ্টন, মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করা প্রভৃতি মুখ্য মন্ত্রীর কর্তব্যকার্য। মন্ত্রিসভার আইনসংক্রান্ত এবং শাসনসংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পর্কে রাজ্যপালকে মুখ্য মন্ত্রী অবহিত রাখেন। রাজ্যপাল কোন বিষয়ে কোন সংবাদ চাহিলে মুখ্য মন্ত্রী তাহা রাজ্যপালকে জানাইতে বাধ্য। রাজ্যপালের নির্দেশে মুখ্য মন্ত্রীকে কোন কোন বিষয় মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করিতে হয়। মন্ত্রিসভার মন্ত্রীদের প্রত্যেকে পৃথকভাবে এবং যৌথভাবে বিধানসভার নিকট তাঁহাদের কার্যের জন্য দায়ী থাকেন। কোন একজন মন্ত্রী অথবা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে পাশ হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। মুখ্য মন্ত্রী যে-কোন মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিতে পারেন। মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন। বিধানসভার সদস্য নহেন এরূপ কোন ব্যক্তি মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইলে তাঁহাকে ছয় মাসের মধ্যে বিধানসভায় নির্বাচিত হইতে হয় নতুবা তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হয়। সংক্ষেপে একথা বলা যাইতে পারে রাজ্যের মুখ্য মন্ত্রী ভারতের প্রধান মন্ত্রীর যেমন একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ তেমনি রাজ্য মন্ত্রিসভাও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

মুখ্য মন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার ক্ষমতা ও কর্তব্যকার্য

রাজ্য আইনসভা : রাজ্য আইনসভা রাজ্যপাল এবং বিধানপরিষদ (Legislative Council) ও বিধানসভা (Legislative Assembly) লইয়া গঠিত হয়। বর্তমানে অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, বিহার, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ব্যতীত বাকী ১৫টি রাজ্যে বিধানপরিষদ নাই। রাজ্য বিধানসভার মোট সদস্যগণের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটপ্রদানকারী সদস্যগণের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে বিধানপরিষদের বিলোপসাধন করা যায়। আবার অনুরূপভাবে উহা গঠন করা চলে। অবশ্য ইহা পার্লামেণ্টের অনুমোদনসাপেক্ষ। উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে পশ্চিমবঙ্গের বিধানপরিষদ বিলুপ্ত হইয়াছে।

বিধানপরিষদ ও বিধানসভা

বিধানপরিষদ (ঊর্ধ্বকক্ষ) : কোন রাজ্যের বিধানপরিষদের সদস্যসংখ্যা ৪০ জনের কম* এবং বিধানসভার সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশের বেশী হইতে পারিবে না। এই পরিষদের সদস্যসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা-পরিষদ প্রভৃতি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্যগণ দ্বারা, এক-তৃতীয়াংশ বিধানসভার সদস্যগণ দ্বারা, এক-দ্বাদশাংশ শিক্ষকগণ দ্বারা, অপর এক-দ্বাদশাংশ গ্র্যাজুয়েটগণ দ্বারা নির্বাচিত হন। অবশিষ্ট কয়েকটি সদস্যপদ রাজ্যপাল কর্তৃক সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি, সমাজসেবা, সমবায় আন্দোলন

বিধানপরিষদের গঠন প্রণালী

* জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যের বিধানপরিষদের বর্তমান আসনসংখ্যা ৩৬।

প্রভৃতিতে অবদান আছে এরূপ ব্যক্তিদের মধ্য হইতে মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করা হয়। বিধানপরিষদের সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি (Chairman) ও একজন সহ-সভাপতি (Deputy Chairman) নির্বাচন করেন। সভাপতি এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতি বিধানপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিধানপরিষদের সদস্যপদ প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক এবং ন্যূনপক্ষে ৩০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে।

বিধানপরিষদের ক্ষমতা ও কার্য

বিধানপরিষদে আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করা যায়। অর্থবিল অবশ্য বিধানসভা ভিন্ন উত্থাপন করা নিষিদ্ধ। বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত আইনের বিল বিধানপরিষদে প্রেরিত হইলে বিধানপরিষদ তাহা পাশ করিতে পারে, পরিবর্তনের জন্য পুনরায় বিধানসভার নিকট প্রেরণ করিতে পারে। অর্থবিল অবশ্য বিধানপরিষদ পাশ না করিলেও রাজ্যপালের সম্মতি লইয়া আইনে পরিণত হয়। বিধানপরিষদের কার্যাদি কতকটা কেন্দ্রের রাজ্যসভারই অনুরূপ।

বিধানপরিষদ স্থায়ী পরিষদ

বিধানপরিষদ একটি স্থায়ী সভা। ইহার এক-তৃতীয়াংশ সদস্য প্রতি দুই বৎসর অন্তর পদত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের শূন্য পদ উপরি-উক্ত পদ্ধতিতে নির্বাচন এবং মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করা হয়।

বিধানসভা (নিম্নকক্ষ): বিধানসভা হইল রাজ্য আইনসভার ক্ষমতাশালী সভা। যে-সকল রাজ্যে বিধানপরিষদ নাই, সেই রাজ্যের বিধানসভাই আইনসভার সকল কাজ করিবার অধিকারপ্রাপ্ত। বিধানসভার সদস্যসংখ্যা ৬০ জনের কম বা ৫০০ জনের অধিক হইবে না। তবে সংবিধানে ব্যবস্থা রহিয়াছে যে, সিকিম ও নাগাভূমির বিধানসভার সদস্যসংখ্যা যথাক্রমে অন্তত ৩০* ও ৪৬ হইবে। ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) অনুসারে অঙ্গরাজ্যগুলির বিধানসভার বর্তমান আসনসংখ্যা ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকিবে। বিধানসভার সদস্যগণ রাজ্যের একুশ বৎসর বয়স্ক নরনারীর ভোটে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। বিধানসভার সদস্যপদ প্রার্থীকে ভারতীয় নাগরিক এবং ন্যূনপক্ষে পঁচিশ বৎসর বয়স্ক হইতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার মোট নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ২৯৪ জন। ইঁহারা প্রাপ্তবয়স্ক** নরনারীর ভোটে নির্বাচিত হইয়াছেন। ইহা ছাড়া রাজ্যপাল অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের একজন সদস্যকে মনোনীত করিতে পারেন। বিধানসভার সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা কোঅ্যালিশন্ (coalition) দলের নেতাকে রাজ্যপাল মুখ্য মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। এই সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন স্পীকার এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে কাজ চালাইবার জন্য একজন ডেপুটি স্পীকার নির্বাচন করেন। স্পীকার বিধানসভার কার্য পরিচালনা করেন। তাঁহার ক্ষমতা ও পদমর্যাদা লোকসভার স্পীকারের অনুরূপ।

বিধানসভার গঠন

বিধানসভা রাজ্য তালিকা এবং যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আইন প্রবর্তন করিতে পারে। যুগ্ম তালিকাভুক্ত কোন বিষয়ে রাজ্যসভা কর্তৃক গৃহীত আইন সেই

* সিকিম বিধানসভার বর্তমান সদস্যসংখ্যা ৩২।

** পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির নির্বাচনে ভোটদাতার বয়স ২১ বৎসরের পরিবর্তে কিন্তু ১৮ বৎসর করা হইয়াছে।

বিষয়ে কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্ট কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের বিরোধী হইলে রাজ্য বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত আইনটি বাতিল হইয়া যাইবে। যে রাজ্যে দুই কক্ষ আছে সেখানে বিধানসভায় আইন পাশ হইলে পর উহা বিধানপরিষদে প্রেরণ করিতে হয়। অর্থবিল সম্পর্কে বিধানসভার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ। অর্থবিল বিধানসভায় ভিন্ন উত্থাপন করা যায় না। বিধানসভায় অর্থবিল পাশ হইলে বিধানপরিষদ উহা পাশ না করিলে কিছু আসিয়া যায় না। উহা রাজ্যপালের সম্মতি লইয়া আইনে পরিণত হয়। কোন কোন বিষয়ে বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত বিল রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য প্রেরণ করেন। এই সম্মতি না পাওয়া গেলে উহা কার্যকরী করা সম্ভব নহে। প্রতি বৎসর আয়-ব্যয়ের বিবরণসহ বাজেট বিধানসভা কর্তৃক পাশ না করিয়া সরকার কোন ব্যয় করিতে পারেন না। অবশ্য রাজ্যপাল, স্পীকার, ডেপুটি স্পীকার, হাইকোর্টের বিচারপতিদের বেতন ও ভাতা বিধানসভার অনুমোদন-সাপেক্ষ নহে। এই ব্যয়গুলি অঙ্গরাজ্যের সঞ্চিত তহবিল হইতে করা হইয়া থাকে।

আইন প্রণয়ন ও অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা

মন্ত্রিসভার শাসনসংক্রান্ত কার্যকলাপের সমালোচনা, সেই সম্পর্কে যে-কোন মন্ত্রীকে জবাবদিহি করা এবং প্রয়োজনবোধে কোন একজন মন্ত্রী বা মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থাসূচক প্রস্তাব পাশ করা রাজ্য বিধানসভার ক্ষমতাভুক্ত। পার্লামেণ্টারী রীতি অনুসারে মন্ত্রিসভা বিধানসভার নিকট শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় কার্যের জন্য দায়ী। বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হয়। বিধানসভার মেয়াদ সংবিধানের ৪২তম সংশোধন অনুসারে পাঁচ বৎসরের স্থলে ছয় বৎসর বহাল থাকিবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) দ্বারা এই মেয়াদকে আবার ৫ বৎসর করা হইয়াছে। এই কার্যকাল শেষ হইবার পূর্বে যে-কোন সময় মুখ্য মন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজ্যপাল বিধানসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া পুনরায় নির্বাচনের আদেশ দিতে পারেন।

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা

ইউনিয়ন অঞ্চল বা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল (Union Territories or Centrally Administered Territories) : ভারতের নয়টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উল্লেখ পূর্বেই করা হইয়াছে। এই সকল অঞ্চলের শাসন পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রপতি একজন করিয়া 'অ্যাডমিনিস্ট্রেটর' (Administrator) নিয়োগ করিয়া থাকেন। অ্যাডমিনিস্ট্রেটর লেফটেনাণ্ট-গভর্ণর বা চীফ্ কমিশনার পদমর্যাদাসম্পন্ন হইতে পারেন। কোন কোন ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যের (State) রাজ্যপালের উপর সন্নিকটস্থ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসনভার রাষ্ট্রপতি ন্যস্ত করিতে পারেন। এরূপ ক্ষেত্রে রাজ্যপাল নিজ বিবেচনা ও বিচারবুদ্ধি অনুযায়ী কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলটির শাসন পরিচালনা করিয়া থাকেন। এজন্য তিনি রাষ্ট্রপতির নিকট সরাসরি দায়ী থাকেন।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শাসন পরিচালনায় রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের যেগুলিতে কোন আইনসভা ও মন্ত্রিসভা নাই—যেমন আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, লাক্ষাদ্বীপ, দাদরা ও নগর হাভেলি—সেগুলির সুষ্ঠু শাসন পরিচালনা, শান্তিরক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় 'রেগুলেশন' (Regula-

tions) বা কার্যবিধি রাষ্ট্রপতি প্রণয়ন করিতে পারেন। যে-সকল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আইনসভা এবং মন্ত্রিসভা আছে—যেমন পাণ্ডিচেরি, মিজোরাম, দিল্লী, গোয়া-দমন-দিউ প্রভৃতি—সেগুলির ক্ষেত্রে যখন কোন আইনগত কারণে আইনসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় বা স্থগিত রাখা হয় তখন রাষ্ট্রপতি সেগুলির জন্য 'রেগুলেশন' প্রণয়ন করিতে পারিবেন। আইনসভা অধিবেশনে না থাকিলে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর জরুরী পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির অনুমতি লইয়া সাময়িক জরুরী আইন অর্থাৎ অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন করিতে পারেন। ইহা ব্যতীত, যে-সকল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে আইনসভা ও মন্ত্রিসভা আছে সেগুলির অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা সংরক্ষিত (reserved) আছে। রাষ্ট্রপতির নিয়ন্ত্রণাধীন এই সকল ক্ষমতা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর প্রয়োগ করিতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির রেগুলেশন প্রণয়ন ক্ষমতা

অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের সংরক্ষিত ক্ষমতা

পার্লামেণ্ট অর্থাৎ ভারতীয় সংসদ প্রয়োজন মনে করিলে আইন প্রবর্তন করিয়া কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে হাইকোর্ট স্থাপন করিতে বা সেই অঞ্চলের কোন আদালতকে হাইকোর্টের মর্যাদা ও ক্ষমতা দিতে পারেন। অথবা অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের ক্ষমতা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রসারিত করিতে পারেন।

পার্লামেন্টের হাইকোর্ট স্থাপনের ক্ষমতা

ভারতের বিচারব্যবস্থা : ভারতের বিচারব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায় রহিয়াছে। নিম্নতম আদালত হইতে ক্রমপর্যায়ে সর্বোচ্চ বিচারালয় সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত বিচারব্যবস্থা রহিয়াছে।

সুপ্রীম কোর্ট : ভারতের সংবিধান প্রবর্তনকালে একজন প্রধান বিচারপতি এবং অনধিক ৭ জন বিচারপতি লইয়া সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হইবে উল্লেখ ছিল। পরে পার্লামেণ্ট আইন প্রণয়ন করিয়া বিচারপতির সংখ্যা বাড়াইয়া লইয়াছে। বর্তমানে ভারতের সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ বিচারালয় একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক ১৭ জন (মোট ১৮ জন) বিচারপতি লইয়া গঠিত। রাষ্ট্রপতি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অপরাপর বিচারপতিকে নিযুক্ত করেন। অবশ্য এ-বিষয়ে তিনি সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্টের বিচারপতিদের পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারেন। প্রধান বিচারপতি ভিন্ন অপরাপর বিচারপতি নিয়োগের তিনি ভারতের প্রধান বিচারপতির পরামর্শ গ্রহণ করেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হইতে হইলে ভারতের নাগরিক হওয়া চাই, আইন বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ, অথবা ভারতের কোন হাইকোর্টে অন্তত দশ বৎসর অ্যাডভোকেট অথবা অন্তত পাঁচ বৎসর কোন হাইকোর্টের বিচারপতি হিসাবে অভিজ্ঞতা থাকা চাই। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিগণ একবার নিযুক্ত হইলে ৬৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকিতে পারিবেন। অবশ্য ৬৫ বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বে তিনি পদত্যাগ করিতে পারিবেন বা অসদাচরণের প্রমাণিত অভিযোগের প্রস্তাব পার্লামেণ্টে গৃহীত হইলে রাষ্ট্রপতি বিচারপতিকে পদচ্যুত করিবেন।

প্রধান বিচারপতি ও অনধিক ১৭ জন অপরাপর বিচারপতি

বিচারপতির যোগ্যতা ও কার্যকাল

সুপ্রীম কোর্ট চারি প্রকার কর্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। এগুলি হইল : (১) মৌলিক বিচারক্ষমতা (Original jurisdiction), (২) আপীল বিচারক্ষমতা

(Appellate jurisdiction), (৩) পরামর্শ দিবার ক্ষমতা এবং (৪) আদেশ বা নির্দেশ বা পরোয়ানা জারির ক্ষমতা। মৌলিক ক্ষমতার দিক্ দিয়া সুপ্রীম কোর্ট (ক) কেন্দ্রীয় সরকার এবং এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে ; (খ) একপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অন্যপক্ষে অপর এক বা একাধিক রাজ্য—এই দুয়ের মধ্যে এবং (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে কোন আইনগত বিরোধ দেখা দিলে তাহার বিচার করেন। সংবিধানের ব্যাখ্যা-সংক্রান্ত বিবাদের বিচার সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে হইতে পারে। এজন্য সুপ্রীম কোর্টকে সংবিধানের বিশ্লেষক ও রক্ষক বলা হয়। আপীল ক্ষমতাবলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের হাইকোর্টের দেওয়ানী, ফৌজদারী ও সংবিধানসংক্রান্ত বিচারের বিরুদ্ধে আপীল সুপ্রীম কোর্ট শুনিয়া থাকেন। সুপ্রীম কোর্টের আপীল শুনিবার ক্ষমতা তিন প্রকারের : যথা, (১) সাংবিধানিক (Constitutional), (২) ফৌজদারী (Criminal) ও (৩) দেওয়ানী (Civil)।

ারি প্রকার ক্ষমতা :

(১) মৌলিক বিচার

(২) আপীল বিচার শুনিবার তিন প্রকার ক্ষমতা

(১) সাংবিধানিক (ক) কোন মামলায় হাইকোর্ট বিচারের পর যদি এই মর্মে সার্টিফিকেট দেন যে, উহাতে সংবিধানসংক্রান্ত বিষয় জড়িত আছে, তাহা হইলে ঐ মামলার আপীল সুপ্রীম কোর্টে করা চলিবে। (খ) হাইকোর্ট সার্টিফিকেট না দিলেও সুপ্রীম কোর্টের নিকট আবেদন করিলে সুপ্রীম কোর্ট যদি মনে করেন যে আবেদনকারীর মামলায় সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত আছে তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্ট আপীলের অনুমতি দিতে পারেন।

সাংবিধানিক

সংবিধানের ৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) অনুসারে সুপ্রীম কোর্ট কোন কেন্দ্রীয় আইনের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্নের বিচার মোট সাতজন বিচারপতি লইয়া গঠিত বেঞ্চের (Bench) মাধ্যমে করিতে পারিত। এবং কেন্দ্রীয় বা রাজ্য আইন অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে হইলে সেই সিদ্ধান্ত বেঞ্চের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ বিচারপতিগণ কর্তৃক সমর্থিত হইতে হইত। সংবিধানের ৪৩তম সংশোধন (১৯৭৭) দ্বারা সুপ্রীম কোর্টের ৪২তম সংশোধন দ্বারা যে-সকল ক্ষমতা হ্রাস করা হইয়াছিল তাহা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং জাতীয় স্বার্থ-বিরোধী কাজকর্মের জন্য ধৃত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে পরোয়ানা (writ) জারি করিবার অধিকার সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হইয়াছে।

(২) ফৌজদারী : (ক) ফৌজদারী মামলায় নিম্ন আদালতের বিচারে আসামী খালাস পাইবার পর আপীলে যদি হাইকোর্ট আসামীকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলে। (খ) ইহা ভিন্ন, হাইকোর্ট যদি নিজ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া উহার নিম্ন আদালত হইতে কোন ফৌজদারী মামলা উঠাইয়া লইয়া নিজে বিচার করেন এবং আসামীর প্রাণদণ্ডাদেশ হয় তাহা হইলে সেই মামলার আপীল সুপ্রীম কোর্টে করা চলে। (গ) কোন ফৌজদারী মামলার বিচারের পর হাইকোর্ট যদি সার্টিফিকেট দেন যে উহা সুপ্রীম কোর্টে বিচার-যোগ্য তাহা হইলে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করা চলিবে।

ফৌজদারী

(৩) দেওয়ানী : দেওয়ানী মামলা বিচারের পর হাইকোর্ট যদি সার্টিফিকেট দেন যে উহাতে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে এবং সে-বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টে বিচার হওয়া উচিত তাহা হইলে দেওয়ানী মামলার আপীল সুপ্রীম কোর্টে করা চলিবে।

দেওয়ানী

রাষ্ট্রপতি আইনসংক্রান্ত কোন বিষয়ে সুপ্রীম কোর্টের অভিমত বা পরামর্শ জানিতে চাহিলে সুপ্রীম কোর্ট তাহা দিয়া থাকেন। নাগরিকের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে সুপ্রীম কোর্ট আদেশ বা নির্দেশ বা পরোয়ানা (writ) জারি করিয়া তাহা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন।

(৩) মতামত ও পরামর্শ-দান আদেশ বা নির্দেশ বা পরোয়ানা জারি

হাইকোর্ট : ভারতীয় সংবিধানে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে একটি করিয়া হাইকোর্ট থাকিবে বলা হইয়াছে। পার্লামেণ্ট ইচ্ছা করিলে একাধিক অঙ্গরাজ্যের জন্য একটি হাইকোর্টের ব্যবস্থা করিতে পারে। পার্লামেণ্ট আবার কোন অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের এলাকা কোন ইউনিয়ন অঞ্চলেও সম্প্রসারিত করিতে পারে। বর্তমানে ভারতের ইউনিয়ন অঞ্চল দিল্লীর জন্য ১টি এবং ২২টি অঙ্গরাজ্যের জন্য ১৭টি হাইকোর্ট আছে। [হাইকোর্টের পরিবর্তে গোয়া-দমন-দিউ-এ একজন জুডিসিয়াল কমিশনারকে নিয়োগ করা হইয়াছে।] ভারতের সকল হাইকোর্টের বিচারপতির সংখ্যা এক নহে। তবে প্রত্যেক হাইকোর্টেই একজন করিয়া প্রধান বিচারপতি এবং কয়েকজন অপরাপর বিচারপতি থাকেন। এই সকল বিচারপতি সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল এবং ভারতের প্রধান বিচারপতির সহিত পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া থাকেন।

বিচারপতির সংখ্যা

হাইকোর্টের বিচারপতি নিযুক্ত হইতে হইলে অন্তত দশ বৎসরের বিচার-অভিজ্ঞতা বা কোন হাইকোর্টে অ্যাডভোকেট হিসাবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকা চাই। বলা বাহুল্য, হাইকোর্টের বিচারপতি অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হইবেন। একবার নিযুক্ত হইলে ৬২ বৎসর বয়স পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারপতি স্বপদে বহাল থাকিতে পারেন। পদত্যাগ বা অসদাচরণের জন্য পার্লামেণ্টের প্রস্তাবক্রমে হাইকোর্টের বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি পদচ্যুত করিতে পারেন।

যোগ্যতা

হাইকোর্টে নিম্ন আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার আপীল করা যাইতে পারে। মৌলিক বিচার ক্ষমতাবলে হাইকোর্ট পঞ্চাশ হাজারের অধিক অর্থ জড়িত দেওয়ানী মকদ্দমা, নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ হইলে উহার বিরুদ্ধে মামলা প্রভৃতি শুনিয়া থাকে। হাইকোর্ট মৌলিক অধিকার রক্ষার উদ্দেশ্যে আদেশ বা নির্দেশ বা পরোয়ানা জারি করিতে পারে। যে-সকল নিম্নতন আদালত হইতে হাইকোর্টে আপীল করা যায় সেই সকল আদালতের তত্ত্বাবধান হাইকোর্ট করিয়া থাকে।

ক্ষমতা ও কর্তব্যকার্য

৪২তম সংশোধন (১৯৭৬) অনুসারে সংবিধানের ২২৬ ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন করা হইয়াছিল। ইহার ফলে কোন হাইকোর্ট কেন্দ্র কর্তৃক প্রবর্তিত কোন আইনের সংবিধানগত বৈধতার বিচার করিতে পারিত না। এবং রাজ্য কর্তৃক প্রবর্তিত আইনের সাংবিধানিক বৈধতার প্রশ্নের বিচার নির্দিষ্ট সংখ্যক বিচারপতি লইয়া

গঠিত বেঞ্চ (Bench) করিতে পারিত। সংবিধানের ৪৩তম সংশোধন (১৯৭৭) দ্বারা ৪২তম সংশোধনের ফলে হাইকোর্টের যে-সকল ক্ষমতা হ্রাস করা হইয়াছিল উহার কতকাংশ ফিরাইয়া দেওয়া হয় এবং হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা পুনরায় বিচার করিতে পারিত। ৪২তম সংশোধনের ফলে হাইকোর্টের অপরাপর যে-সকল ক্ষমতা হ্রাস করা হইয়াছিল তাহার প্রায় সবকিছুই ৪৪তম সংশোধন (১৯৭৮) দ্বারা ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

নিম্ন বিচারালয়: হাইকোর্টের অধীনে জেলাজজের আদালত, সাব্‌জজ আদালত, মুন্সেফী আদালত প্রভৃতি ক্রমপর্যায়ে নানাপ্রকার বিচারালয় আছে। জেলাজজ দেওয়ানী এবং ফৌজদারী বা দায়রা (Sessions) বিচারের ক্ষমতাপ্রাপ্ত। তাঁহার অধীনে সাব্‌জজদের দেওয়ানী বিচারক্ষমতা আছে। কোন কোন সাব্‌জজের উপর দায়রা বিচারের ক্ষমতাও দেওয়া হয়। সাব্‌জজ আদালত হইতে জেলাজজের আদালতে আপীল করা চলে। সাব্‌জজ আদালতের নিম্নে হইল মুন্সেফী আদালত। এই আদালতে কেবলমাত্র দেওয়ানী বিচার করা হয়। ফৌজদারী বিচার কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি প্রেসিডেন্সী এলাকায় প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ও অপরাপর প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট করিয়া থাকেন। জেলা ও মহকুমায় যথাক্রমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট প্রভৃতি ফৌজদারী বিচার করিয়া থাকেন। ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতানুযায়ী তাঁহাদিগকে প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী ও তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত করা হইয়া থাকে। এই সকল ম্যাজিস্ট্রেট ছোট ছোট মামলার বিচার করিয়া থাকেন। কলিকাতায় সিটি সিভিল কোর্ট কলিকাতাস্থ বিভিন্ন এলাকার দেওয়ানী বিচার করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন ধরনের নিম্ন আদালত

গ্রামাঞ্চলে ন্যায় পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত আদালত একটি বা কয়েকটি গ্রামের ছোট ছোট মামলা-মকদ্দমার বিচার করিয়া থাকেন। এইভাবে নিচ হইতে উপর পর্যন্ত সকল বিচারালয় লইয়া ভারতীয় বিচারব্যবস্থা গঠিত।

(২) নির্বাচকমণ্ডলী : নির্দেশমূলক নীতি

নির্বাচকমণ্ডলী: জনসাধারণের ভোটে আইনসভা নির্বাচন করা আধুনিক কালে সকল রাষ্ট্রেই স্বীকৃত। প্রত্যেক রাষ্ট্রের নির্বাচন অধিকার অর্থাৎ জনসাধারণের ভোটদানের অধিকার সেই রাষ্ট্রের আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণত স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে আইনসভা নির্বাচন করিবার রীতি বর্তমানে স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। ভারতের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় একুশ বৎসর বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই ভোটদানের অধিকার আছে।* দেশের যাবতীয় ভোটাধিকার-প্রাপ্ত নরনারী লইয়া নির্বাচকমণ্ডলী (Electorate) গঠিত। এই নির্বাচকমণ্ডলী অবশ্য দেশের যাবতীয় প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোট দেন না। ইহা সম্ভবও নহে। এজন্য নির্বাচকমণ্ডলীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া নির্বাচন অঞ্চল (Constituency) গঠন করা হইয়াছে। লোকসভার সদস্য নির্বাচন এবং নিজ রাজ্যের বিধানসভায় প্রতিনিধি নির্বাচনে এই

নির্বাচকমণ্ডলী

* পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির নির্বাচনে ভোটদাতার বয়স কিন্তু ১৮ বৎসর করা হইয়াছে।

সকল নির্বাচন অঞ্চলের ভোটদাতাগণ ভোট দিয়া থাকেন। মোটামুটি এক লক্ষ জনসংখ্যার জন্য বিধানসভায় একটি আসন দেওয়া হয়। সেইরূপ সংখ্যার লোকের বসবাসের অঞ্চলকে রাজ্য বিধানসভার এক-একটি ভৌগোলিক নির্বাচন অঞ্চল হিসাবে নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। পাঁচ লক্ষ হইতে সাড়ে সাত লক্ষ পর্যন্ত জনসংখ্যার বসবাসের অঞ্চল লইয়া লোকসভার একজন সদস্য নির্বাচন অঞ্চল গঠন করা হইয়াছে। এইভাবে দেশের নির্বাচকমণ্ডলীকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করিয়া প্রত্যেক ভোটদাতাকে লোকসভার একজন সদস্য এবং রাজ্য বিধানসভার একজন সদস্য নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। একজন ভোটদাতা একটি কেন্দ্রীয় অর্থাৎ লোকসভার নির্বাচন অঞ্চল এবং একটি রাজ্য বিধানসভার নির্বাচন অঞ্চলের বাহিরে ভোট দিতে পারে না। অর্থাৎ, লোকসভার সদস্য নির্বাচনে একটি ভোট এবং বিধানসভার নির্বাচনে একটি ভোট প্রত্যেক ভোটদাতা দিতে পারেন।

নির্বাচন অঞ্চল

রাষ্ট্র পরিচালনাসংক্রান্ত নির্দেশমূলক নীতি : ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারসমূহের শাসনকার্যাদির ব্যাপারে ভারতীয় সংবিধানে কতকগুলি নির্দেশমূলক নীতি সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। ভারত-রাষ্ট্রকে একটি জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Welfare State) হিসাবে গড়িয়া তোলাই হইল ভারতীয় সংবিধানের উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য যাহাতে রাষ্ট্রকার্যাদি পরিচালিত হয় সেজন্য কতকগুলি নির্দেশ সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল নির্দেশ কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকার যদি অনুসরণ নাও করেন তাহা হইলে কোন ভারতীয় নাগরিক বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারিবেন না। তথাপি এই সকল নীতি অত্যন্ত পবিত্র, রাষ্ট্রকর্তব্যের নীতি হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। এগুলি অনুসরণ করিয়া চলা হইবে এই আশা লইয়া সংবিধান-রচয়িতাগণ নির্দেশমূলক নীতি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

উদ্দেশ্য

(১) নির্দেশমূলক নীতিতে বলা হইয়াছে যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ন্যায্য-বিচার (justice) প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারত-রাষ্ট্রকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্র রূপে গড়িয়া তুলিতে হইবে। (২) জাতীয় সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের মাধ্যমে ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য হ্রাস করা, স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই সম-পরিমাণ কাজের জন্য সম-পরিমাণ পারিশ্রমিক যাহাতে পায় সেই ব্যবস্থা করা, শিশু ও যুবকদের শোষণের হাত হইতে রক্ষা করা, বৃদ্ধদের পেনশন দান করা, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে যাহাতে অর্থ কেন্দ্রীভূত না হয় সেজন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন প্রভৃতি করিতে হইবে। (৩) শ্রমিক মাত্রই যাহাতে জীবনযাপনের উপযুক্ত মজুরি পায়, উপযুক্ত পরিমাণ অবসর পায়, সেজন্য তাহাদিগকে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা দানের ব্যবস্থা করিতে হইবে। (৪) সকলের জন্য কর্মসংস্থান, বেকার, পীড়িত, বৃদ্ধ বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের রাষ্ট্র হইতে অর্থসাহায্য দান করিতে হইবে। (৫) কুটির শিল্পের উন্নতিসাধন, সংবিধান চালু হইবার দশ বৎসরের মধ্যে চৌদ্দ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকার অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক

বিভিন্ন নীতির ব্যাখ্যা

শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এখনও অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় নাই। (৬) অনুন্নত ও তপশীলভুক্ত সম্প্রদায়গুলির শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক উন্নয়নের চেষ্টা করিতে হইবে। (৭) ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির সংরক্ষণ, বিচারকার্য ও শাসনকার্যের পৃথকীকরণ এবং সকল নাগরিকের ক্ষেত্রে একই ধরনের আইন প্রয়োগ করিতে হইবে। (৮) আন্তর্জাতিক শান্তি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্মান ও সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদের মীমাংসার চেষ্টা করিতে হইবে। (৯) রাষ্ট্র গ্রাম-পঞ্চায়েত স্থাপন করিয়া সেগুলি যাহাতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে কাজ করিতে পারে সেই ক্ষমতা দান করিবে। (১০) সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে ভারতীয় শিশুগণ যাহাতে সুস্থ, স্বাধীন এবং মর্যাদাপূর্ণভাবে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করে সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। শোষণ এবং নৈতিক অবনতি হইতে শিশু ও যুবক-যুবতীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। তদুপরি সরকার এমন বিচারব্যবস্থা চালু করিবেন যাহাতে ন্যায্য-বিচার সকল নাগরিকই সমভাবে পাইতে পারে এবং বিশেষভাবে, দারিদ্র্য যাহাতে ন্যায্য-বিচার লাভে অসুবিধার সৃষ্টি না করে সেজন্য বিনাব্যয়ে গরীব নাগরিকরা যাহাতে আইনের সাহায্য পাইতে পারে সেইরূপ আইন প্রবর্তন করিতে হইবে।

আদর্শ স্মরণ রাখিয়া রাষ্ট্রকার্য সম্পাদন

এই সকল নির্দেশের মাধ্যমে ভারত-রাষ্ট্রের সম্মুখে কতকগুলি আদর্শ তুলিয়া ধরা হইয়াছে। শাসনকার্য ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সকল আদর্শ পূরণের কথা স্মরণ রাখিয়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার-গুলিকে চলিতে হইবে এবং ভারতকে একটি জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে পরিণত করিতে হইবে।

নির্দেশমূলক নীতি কার্যকরী করিবার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত কোন আইন নাগরিকদের সমতার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার এই কয়টি মৌলিক অধিকারের বিরোধী হইলেও উহা কোন বিচারালয় অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করিতে পারিবে না।

নির্দেশমূলক নীতি ও মৌলিক অধিকারের পার্থক্য

এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, মৌলিক অধিকার কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হইলে নাগরিক বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী হইতে পারে কিন্তু নির্দেশমূলক নীতি লঙ্ঘিত হইলে আদালতে বিচারপ্রার্থী হওয়া যায় না। নির্দেশমূলক নীতি নাগরিকদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনে রাষ্ট্রকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, নাগরিকদের কোন অধিকার দেওয়া হয় নাই। মৌলিক অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত নাগরিক অধিকার।

(৩) ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ

ভারতীয় সংবিধানে ভারতের নাগরিকদের কতকগুলি অধিকারকে মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক হিসাবে ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠ পরিস্ফুরণের ও উন্নতির জন্য যে-সকল অধিকার ভোগ করা একান্ত প্রয়োজন সেই সকল অধিকার ভারতীয় সংবিধানে মৌলিক অধিকার বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। কেন্দ্রীয়

বা রাজ্য সরকার অথবা অপর কেহ এই সকল অধিকার ক্ষুণ্ণ করিলে সংবিধানে বর্ণিত উপায়ে সরাসরি সুপ্রীম কোর্টে বা হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থী হওয়া চলে। কেবল জরুরী পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা মৌলিক অধিকার স্থগিত রাখা বা হ্রাস করা যাইতে পারে। নিম্নলিখিত অধিকারগুলি মৌলিক অধিকার বলিয়া স্বীকৃত।*

গুরুত্ব

(ক) **সমতার অধিকার :** ভারতীয় নাগরিকমাত্রেই সম-মর্যাদা ও সম-অধিকারের অধিকারী। স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম, জন্মস্থান নির্বিশেষে ভারতীয় নাগরিক সকলেই আইনের চক্ষে সমান বলিয়া বিবেচিত হইবে। সরকারী চাকরিতে যোগ্যতা থাকিলে সকলেই সমান সুযোগ পাইবে।

সম-মর্যাদা ও আইনের চক্ষে সমতা

(খ) **ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার :** ভারতীয় নাগরিকের স্বমত প্রকাশের, সভা-সমিতিতে শান্তিপূর্ণ ও অস্ত্রশস্ত্রবিহীনভাবে সমবেত হইবার, ভারতের যে-কোন স্থানে যাতায়াতের, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় বা ভোগদখলের স্বাধীনতা আছে। যে-কোন আইনসম্মত পেশা অবলম্বন, আইনগত কারণ ভিন্ন গ্রেপ্তার না হইবার স্বাধীনতা, বা গ্রেপ্তার হইলে গ্রেপ্তারের কারণ জানিবার স্বাধীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার স্বাধীনতা ভোগের অধিকার ভারতীয় নাগরিকের আছে। অবশ্য রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধন হইতে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যে নিবারণমূলক আটক (Preventive Detention) বা রাষ্ট্রদ্রোহিতার জন্য গ্রেপ্তার বা আটক করিলে এই সব স্বাধীনতার অধিকার দাবি করা চলিবে না।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা

(গ) **ধর্মপালন ও ধর্মমত প্রচারের অধিকার :** ভারতীয় নাগরিকমাত্রেই নিজ নিজ ধর্ম অনুসরণ বা অপরের ধর্মে আঘাত না দিয়া নিজ ধর্মমত প্রচারের স্বাধীনতা ভোগ করিবে। ধর্ম ব্যাপারে ভারতীয় রাষ্ট্র সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ।

ধর্ম

(ঘ) **শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার :** প্রত্যেক নাগরিকই রাষ্ট্রীয় বা রাষ্ট্র হইতে সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের, নিজ ভাষার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার ও নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা করিয়া চলিবার অধিকার ভোগ করিবে।

শিক্ষা, ভাষা ও সংস্কৃতি

(ঙ) **শোষণমুক্ত থাকিবার অধিকার :** বিনা পারিশ্রমিকে কাহাকেও কাজ করান, বলপূর্বক কাহারো দ্বারা কাজ করাইয়া লওয়া, চৌদ্দ বৎসর বয়সের নিচে কোন বালক-বালিকাকে কোন কারখানা, খনি বা বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা নিষিদ্ধ। মানুষকে পণ্য হিসাবে কোন প্রকার ব্যবসায় করা চলিবে না।

শোষণমুক্তি

* ১৯৭৮ সালে সংবিধানের ৪৪তম সংশোধন দ্বারা সম্পত্তির অধিকার সংবিধানের মৌলিক অধিকারের অধ্যায় হইতে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। এই অধিকার এখন আর মৌলিক অধিকার হিসাবে পরিগণিত হইবে না। সাধারণ বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা এই অধিকার নিয়ন্ত্রিত হইবে। সংবিধানের অন্যত্র উল্লেখ করা হইয়াছে যে, কাহাকেও আইন ব্যতীত অর্থাৎ বেআইনীভাবে সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না।

(চ) **সংবিধানে বর্ণিত উপায়ে প্রতিকারলাভের অধিকার :** ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার কোনভাবে ক্ষুণ্ণ হইলে সুপ্রীম কোর্টে বা হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থী হইলে সুপ্রীম কোর্ট বা হাইকোর্ট 'হ্যাবিয়াস কর্পাস' (*habeas corpus*), 'সার্টিওরারি' (*certiorari*), 'ম্যাণ্ডেমাস' (*mandamus*), 'কুয়োওয়ারেণ্টো' (*quo-warranto*) প্রভৃতি আদেশ বা নির্দেশ বা পরোয়ানা জারি করিয়া নাগরিকের মৌলিক অধিকার রক্ষা করিবেন। প্রসংগত উল্লেখযোগ্য যে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে নির্দেশ ছিল, সুপ্রীম কোর্ট রাজ্য আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারিত না। পক্ষান্তরে হাইকোর্ট কেন্দ্রীয় আইনের বৈধতা বিচার করিতে পারিত না।

সুপ্রীম কোর্ট ও হাইকোর্ট কর্তৃক অধিকার রক্ষা

(৪) ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যসমূহ

সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে ভারতীয় নাগরিকদের কয়েকটি মৌলিক কর্তব্য সন্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। এইগুলি নিম্নলিখিত রূপ : (১) ভারতীয় নাগরিককে ভারতীয় সংবিধান এবং উহার আদর্শ ও উহাতে সন্নিবিষ্ট যাবতীয় সংস্থার প্রতি, ভারতের জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি আনুগত্য ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে। (২) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কালে যে-সকল সুমহান আদর্শ ও উদ্দেশ্য আন্দোলনের প্রেরণা দান করিয়াছিল সেগুলি পোষণ করিতে হইবে। (৩) ভারত-রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা এবং সংহতি ধারণ ও সংরক্ষণ ভারতীয় নাগরিকমাত্রেরই কর্তব্য। (৪) প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দেশরক্ষা ও দেশসেবার জন্য বিনা দ্বিধায় অগ্রসর হইতে হইবে। (৫) ধর্ম, জাতি, ভাষা, আঞ্চলিক ও দলগত বৈষম্য এবং বৈচিত্র্যের উর্ধ্বে থাকিয়া ভারতীয়দের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও ঐক্য গড়িয়া তুলিতে হইবে। (৬) ভারতীয় মিশ্র-সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও উহা রক্ষা করিতে হইবে। (৭) জাতীয় পরিবেশ, জাতীয় বনসম্পদ, নদী, হ্রদ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং সকল প্রাণীর প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করিতে হইবে। (৮) বৈজ্ঞানিক, মানবিক ও অনুসন্ধিৎসার মনোবৃত্তি এবং সংস্কারমূলক কাজের আগ্রহ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। (৯) হিংসা পরিহার এবং জাতীয় সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইবে। (১০) জাতীয় জীবনের প্রতি স্তরে চরম উৎকর্ষ সাধন, ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে কার্য সম্পাদনে যথাযোগ্য প্রযত্ন গ্রহণ করিতে হইবে যাহাতে জাতি হিসাবে ভারতবাসী উচ্চতর প্রচেষ্টা ও সাফল্যলাভে সমর্থ হয়।

নাগরিকের মৌলিক কর্তব্যসমূহ

দ্বিতীয় অধ্যায়

নাগরিকতা : নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য
(Citizenship : Rights and Duties of Citizenship)

নাগরিকতা : সংকীর্ণ অর্থে নগরে বসবাসকারী ব্যক্তিকেই নাগরিক বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিতে নাগরিক শব্দটি এইরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। রাষ্ট্রের যে-সকল নর-নারী রাজনৈতিক অধিকার-সহ সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সকল প্রকার অধিকার ভোগ করে তাহারাই নাগরিক নামে অভিহিত হয়। ব্যাপকভাবে ব্যবহার করিতে গেলে দেশের বাসিন্দা সকলকেই আমরা নাগরিক আখ্যা দিয়া থাকি কিন্তু দেশের অধিকাংশ লোকই রাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিতে নাগরিক নহে। যেমন, দেশে বহু লোক থাকে যাহাদের বয়স কম, বিকৃত মস্তিষ্ক বলিয়া অথবা কোন আইনগত কারণে ভোট দিবার অধিকার ভোগ করে না। এরূপ ব্যক্তির সংখ্যাই দেশে বেশি। সাধারণ আলাপ-আলোচনায় তাহাদিগকে নাগরিক বলিয়া উল্লেখ করিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহারা নাগরিক নহে। নাগরিক দেশের রাজনৈতিক ও অপরাপর যাবতীয় অধিকার যেমন ভোগ করে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার ও কতকগুলি কর্তব্যও তাহাদিগকে পালন করিতে হয়। নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইতে হইলে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করা একান্ত প্রয়োজন। কোন বিদেশী ভারতে বাস করিলে সে সকল প্রকার সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে কিন্তু সে ভারতের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন বা রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে না। এজন্য তাহাকে নাগরিক আখ্যা দেওয়া চলে না।

নাগরিক বলিতে কি বুঝায়

নাগরিকতা অর্জনের তিনটি বিশেষ পদ্ধতি আছে: (১) নাগরিকের সন্তান পিতার নাগরিকতা লাভ করে। জন্মের ভিত্তিতে এইরূপ নাগরিকতা লাভ সকল দেশেই স্বীকৃত। (২) কোন কোন দেশে আবার জন্মস্থানের উপরও নাগরিকতা নির্ভর করে। ইংলণ্ডের কোন নাগরিকের সন্তান যে দেশেই জন্মগ্রহণ করুক না কেন সে ইংলণ্ডের নাগরিকতা লাভ করিবে। আবার বিদেশী যে-কোন ব্যক্তির সন্তান যদি ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করে তাহা হইলে সেই সন্তান ইংলণ্ডের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবে। ইংলণ্ডের কোন জাহাজে জন্মিলেও এই নীতি অনুসরণ করা হয়। (৩) দীর্ঘকাল কোন দেশে কোন বিদেশী ব্যক্তি যদি বসবাস করে, সেই দেশের ভাষা যদি সে আয়ত্ত করে এবং সম্পত্তি অর্জন করে তাহা হইলে আবেদন করিয়া সে যে বিদেশী রাষ্ট্রে বাস করিতেছে উহার নাগরিক হইতে পারিবে। অবশ্য তাহাকে তাহার নিজ দেশের মূল নাগরিকত্ব ত্যাগ করিতে হইবে। উপরি-উক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার নাগরিকদিগকে স্বাভাবিক নাগরিক (Natural Citizens) আর তৃতীয় প্রকার নাগরিককে অর্থাৎ এইরূপ বিদেশীকে স্বাভাবিক নাগরিকে রূপান্তরিত নাগরিক (Naturalised Citizen) বলা হয়।

নাগরিকতা লাভ

স্বাভাবিক (Natural) ও স্বাভাবিকে রূপান্তরিত (Naturalised) নাগরিক

নাগরিকতা যেমন অর্জন করা যায় তেমনি নাগরিকতার বিলোপও ঘটিতে পারে। কোন স্ত্রীলোক অপর দেশের নাগরিককে বিবাহ করিলে নিজ স্বামীর নাগরিকতা লাভ করেন। নিজ দেশের নাগরিকতা তাঁহার লোপ পায়। কোন নাগরিক যদি বিদেশী রাষ্ট্রের নাগরিকতা গ্রহণ করে তাহা হইলে তাহার নিজ দেশের মূল নাগরিকতা লোপ পায়। কোন প্রকার হীন অপরাধে দণ্ডিত ব্যক্তি বা আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বলিয়া ঘোষিত ব্যক্তির নাগরিকতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। সামরিক বাহিনীতে কাজ করিবার কালে অথবা যুদ্ধের কালে পলাতক সৈনিকের নাগরিকতা বিলুপ্ত হয়। নিজ দেশ হইতে দীর্ঘকাল অনুপস্থিতিও নাগরিকতা বিলুপ্তির কারণ হইতে পারে।

নাগরিকতা বিলুপ্তির কারণ

নাগরিক অধিকার নাগরিকের কতকগুলি অধিকার থাকে। দেশের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতির উপর অবশ্য এই সকল অধিকারের তারতম্য ঘটে। গণতান্ত্রিক দেশগুলির নাগরিকদের অধিকার নিম্নলিখিত রূপের। এগুলিকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অধিকার—এই তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে।

সামাজিক অধিকার: (১) নাগরিকের জীবনধারণের অধিকার আছে। নাগরিক যদি জীবনধারণেরই নিরঙ্কুশ অধিকার ভোগের সুযোগ না পায় তাহা হইলে তাহার আর অন্যান্য অধিকার ভোগের সুযোগ কোথায়? এজন্য জীবনধারণের অধিকারই হইল নাগরিকের প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। রাষ্ট্র তাহার এই অধিকার ভোগে সর্বপ্রকার সাহায্য করিবে এবং তাহার অধিকার রক্ষা করিবে।

জীবনধারণের অধিকার

(২) নাগরিকের ইচ্ছামত চলাফেরা করিবার অধিকার আছে। তাহার জীবন-যাত্রার সুবিধার জন্য এই স্বাধীনতা তাহার একান্ত প্রয়োজন। এজন্য কোন আইনগত কারণ ভিন্ন নাগরিকের ব্যক্তি-স্বাধীনতার অধিকার ক্ষুন্ন করা চলে না। রাষ্ট্র যদি বিনা কারণে কোন ব্যক্তিকে আটক করে তাহা হইলে বিচারালয়ে 'হ্যাবিয়াস কর্পাস' (*habeas corpus*), পরোয়ানা প্রার্থনা করিয়া সে মুক্তিলাভ করিতে পারে। অবশ্য রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে ও জরুরী পরিস্থিতিতে এই অধিকার সীমিত করা চলে।

স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার

(৩) নাগরিকমাত্রেই নিজ ইচ্ছামত আইনগত যে-কোন কাজ বা বৃত্তি গ্রহণ করিতে পারে। যে-কোন আইনসম্মত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারে, ধর্মপালন ও অপরের ধর্মে আঘাত না দিয়া নিজ ধর্ম প্রচার করিতে পারে। বৈধ উপায়ে সম্পত্তি অর্জন ও উহা ভোগদখল করিবার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে।

যে-কোন বৃত্তি গ্রহণের অধিকার

(৪) নাগরিক স্বমত প্রকাশের অধিকার ভোগ করে। এজন্য তাহার বাক্-স্বাধীনতা, কোন কিছু লিখিয়া প্রকাশের স্বাধীনতা বা সংবাদ-পত্রের মাধ্যমে নিজ মতামত ব্যক্ত করিবার স্বাধীনতা, নিজ ইচ্ছামত চিন্তার স্বাধীনতা, সভাসমিতিতে বক্তৃতা দানের স্বাধীনতা ভোগ করে। এইভাবে

স্বমত প্রকাশের অধিকার

আত্মপ্রকাশের সুযোগ ও অধিকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। এই সকল অধিকার গণতান্ত্রিক শাসনের সাফল্যের জন্য অত্যধিক প্রয়োজন।

পরিবার পালনের অধিকার

(৫) নিজ পরিবার পরিজন লইয়া বসবাস, নিজের এবং পরিবারের সকলের নৈতিক ও চারিত্রিক নিষ্কলুষতা বজায় রাখিবার অধিকার নাগরিক মাত্রেরই আছে।

শিক্ষার অধিকার

(৬) সকল সভ্যদেশেই শিক্ষালাভের অবাধ অধিকার নাগরিক মাত্রেরই আছে। নাগরিকতার সার্থক প্রকাশ শিক্ষার বিকাশের মাধ্যমেই সম্ভব। শিক্ষিত নাগরিক নিজ বিচার-বিবেচনার প্রয়োগে সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা গড়িয়া তুলিবার এক শক্তিশালী উপাদান। শিক্ষার অধিকার সেজন্য গণতান্ত্রিক দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।

ভোটদানের অধিকার

রাজনৈতিক অধিকার : (১) নির্বাচনে ভোট দান করা নাগরিকের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্ত্রী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার স্বীকৃত। অবশ্য প্রাপ্ত বয়স কত, তাহা রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে তারতম্য হইতে পারে। ভারতীয় নাগরিকের ভোটাধিকার লাভের ন্যূনতম বয়স হইল একুশ। [পশ্চিমবঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটি, করপোরেশন ও পঞ্চায়েত সমিতিগুলির নির্বাচনে ভোটাধিকারের বয়স ২১ বৎসরের পরিবর্তে কিন্তু ১৮ বৎসর করা হইয়াছে।]

নির্বাচনপ্রার্থী হইবার অধিকার

(২) ভোটদান ভিন্ন কোন নির্বাচনে প্রার্থী হইবার অধিকারও অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। আইনসভায় বা স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সদস্য নির্বাচনে আইনগত কারণে কোন নাগরিকের কোন বাধা না থাকিলে নির্বাচনপ্রার্থী হইবার অধিকার আছে।

সরকারী চাকরি করিবার অধিকার

(৩) যোগ্যতা থাকিলে যে-কোন নাগরিক সরকারী কাজ লইতে পারে। এ-বিষয়ে জাতি-ধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে যোগ্যতা থাকিলে সকলের অধিকার সমান।

সরকারী কাজের গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার

(৪) সরকারের কার্যকলাপের আলোচনা করা, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার মাধ্যমে নূতন পথের ইঙ্গিত দেওয়া নাগরিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। গণতান্ত্রিক দেশে এই অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে জনমত গঠন করিয়া সরকারকে জনমতের অনুকূলে কাজ করিতে বাধ্য করা হয়।

নৈতিক অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত নহে

নৈতিক অধিকার : নৈতিক অধিকার রাষ্ট্র রক্ষা করে না। এই সকল অধিকার নাগরিকের নৈতিক জ্ঞানের উপর নির্ভর করে। অপরকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে সে আমাকে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া সত্য জবাব দিবে ইহাই আশা করা যায়। কিন্তু সে যদি মিথ্যা বলে তাহা হইলে সেজন্য আইনের আশ্রয় গ্রহণ করা চলে না। এজন্য নৈতিক

অধিকার রাষ্ট্র রক্ষা করে না। সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার রাষ্ট্র যেমন ভোগ করিবার অধিকার দেয় তেমনি সেগুলির রক্ষার দায়িত্বও গ্রহণ করে।

কর্তব্য : কর্তব্য ভিন্ন কোন অধিকার ভোগ সম্ভব নহে। রাষ্ট্রের নিকট হইতে আমরা নানাবিধ অধিকার লাভ করি, রাষ্ট্র সেগুলি যাহাতে রক্ষা করে সেজন্য প্রয়োজন-বোধে আমরা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, কিন্তু সেজন্য রাষ্ট্রের প্রতি আমাদের কতক কর্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। এই সকল কর্তব্যের মধ্যে প্রধান হইল : (১) রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য রাখিয়া চলা নাগরিক মাত্রেরই কর্তব্য। রাষ্ট্রের উন্নতিসাধনে, বহিরাক্রমণ হইতে রাষ্ট্রকে রক্ষা করা, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার ব্যাপারে নাগরিক রাষ্ট্রকে সাহায্য দান করিবে। নাগরিক নিজ সম্পত্তি ও জীবন পর্যন্ত দেশরক্ষা ও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য দান করিতে প্রস্তুত থাকিলেই দেশ শক্তিশালী হইতে ও মর্যাদালাভ করিতে সমর্থ হয়।

রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য

(২) দেশের আইন-কানুন মানিয়া চলা ; নিজের অধিকার ভোগ করিতে গিয়া অপরের অধিকার ক্ষুন্ন না করা নাগরিক মাত্রেরই কর্তব্য।

আইন-কানুন মানিয়া চলা

(৩) নির্বাচনে নিজ বিচারবুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া ভোট দেওয়া নাগরিকের কর্তব্য। নাগরিক স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত না হইয়া শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে নির্বাচনে সমর্থন করিয়া জয়যুক্ত করিলে যে সরকার গঠন করা সম্ভব হইবে সেই সরকার স্বভাবতই শাসনকার্য পরিচালনা যোগ্যতার সঙ্গে করিতে পারিবে। অন্যথায় অকর্মণ্য ও অপদার্থ লোকের হাতে শাসনকার্য চলিয়া যাইবে।

নির্বাচনে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে ভোট দেওয়া

(৪) রাষ্ট্র-পরিচালনার ব্যয় রাজস্ব আয় ও কর হইতে যে অর্থাগম হয় তাহা দ্বারা সংকুলান করা হয়। এজন্য নাগরিকমাত্রেরই কর্তব্য যথাসময়ে সরকারের প্রাপ্য কর মিটাইয়া দেওয়া। এই কর দেশের নাগরিকদের স্বার্থে ব্যয়িত হয়। সেজন্য কর ফাঁকি দিলে বা সময়মত কর না দিলে দেশের লোকেরই অসুবিধা ও ক্ষতি হয়।

করদান

(৫) নাগরিক সমাজের উন্নতির কথা স্মরণ রাখিয়া সমাজের কল্যাণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। নিজ স্বার্থসিদ্ধি করিতে গিয়া সমাজের ক্ষতিসাধন, সমাজের আদর্শ লঙ্ঘন প্রভৃতি কাজ হইতে বিরত থাকিবে। সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে নাগরিক সমাজের উন্নতির মধ্য দিয়া নিজেও উন্নতি ঘটাইতে পারিবে। এজন্য সংকীর্ণ স্বার্থপরতা, অসহিষ্ণুতা ত্যাগ করিয়া আত্মত্যাগ সমাজসেবার আদর্শে সুনাগরিকমাত্রেই উদ্বুদ্ধ হইবে।

সমাজসেবা

পরিশিষ্ট

১। গভর্ণর-জেনারেল ও ভাইস্‌রয় (মহারাণীর ঘোষণাপত্র অনুসারে নিযুক্ত, ১৮৫৮ খ্রীঃ)

লর্ড ক্যানিং	১৮৫৮-৬২
লর্ড (প্রথম) এল্‌গিন	১৮৬২-৬৩
স্যার্‌ রবার্ট নেপিয়ার	১৮৬৩
স্যার্‌ ডেনিসন	১৮৬৩-৬৪
স্যার্‌ জন্‌ ল্যরেন্স্‌	১৮৬৪-৬৯
আর্ল অব মেয়ো	১৮৬৯-৭২
স্যার্‌ জন্‌ স্ট্র্যাচী	১৮৭২
লর্ড নেপিয়ার	১৮৭২
লর্ড নর্থব্রুক্‌	১৮৭২-৭৬
লর্ড লিটন	১৮৭৬-৮০
লর্ড রিপণ	১৮৮০-৮৪
লর্ড ডাফরিণ	১৮৮৪-৮৮
লর্ড ল্যান্সডাউন	১৮৮৮-৯৪
লর্ড (দ্বিতীয়) এল্‌গিন	১৮৯৪-৯৯
লর্ড কার্জন	১৮৯৯-১৯০৫
লর্ড (দ্বিতীয়) মিণ্টো	১৯০৫-১০
লর্ড হার্ডিঞ্জ	১৯১০-১৬
লর্ড চেম্‌সফোর্ড	১৯১৬-২১
লর্ড রীডিং	১৯২১-২৬
লর্ড আর্‌উইন	১৯২৬-৩১
লর্ড উইলিংডন্‌	১৯৩১-৩৬
লর্ড লিন্‌লিথগাও*	১৯৩৬-৪৩
লর্ড ওয়াভেল	১৯৪৩-৪৭
লর্ড মাউণ্টব্যাটেন	১৯৪৭

২। ভারতের গভর্ণর-জেনারেল (স্বাধীন ভারতের সংবিধান অনুসারে)

লর্ড মাউণ্টব্যাটেন	১৯৪৭-৪৮
চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী	১৯৪৮-৫০

* ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত আইন (Government of India Act, 1935) অনুসারে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে মার্চ হইতে গভর্ণর-জেনারেল ও রাজ-প্রতিনিধি।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতিগণ

[প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫১-৫২)

সংবিধানসভা ভারতের অস্থায়ী পার্লামেণ্টে রূপান্তরিত (২৬-১-১৯৫০) (Constituent Assembly converted into the Provisional Parliament of India)]

ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ (অস্থায়ী) ১৯৫০-১৯৫২

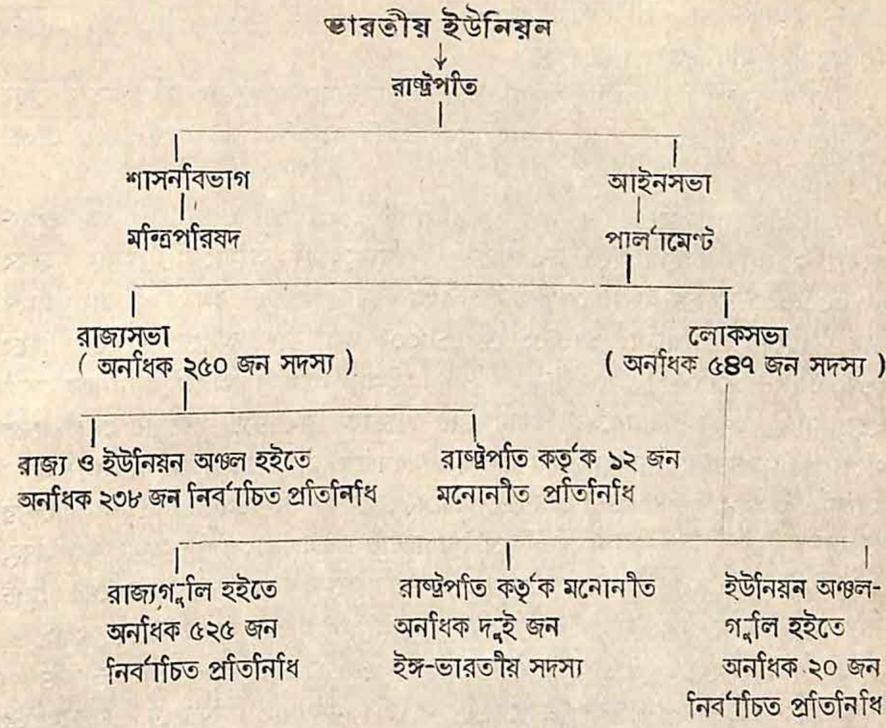
[প্রথম লোকসভা গঠন (১৩-৫-১৯৫২)]

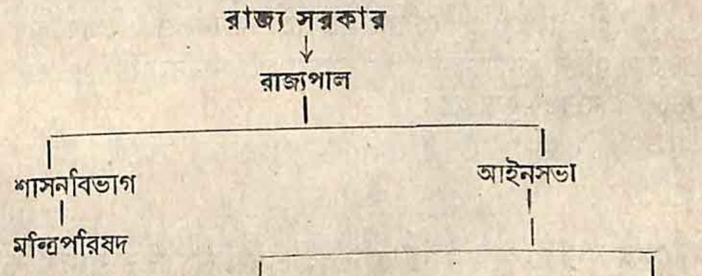
১. ডক্টর রাজেন্দ্র প্রসাদ ১২-৫-১৯৫২—১২-৫-১৯৫৭
২. ,, ,, ,, (পুনর্নির্বাচিত) ১৩-৫-১৯৫৭ - ১২-৫-১৯৬২ (মৃত্যু)
৩. ,, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ১৩-৫-১৯৬২—১২-৫-১৯৬৭
৪. ,, জাকির হুসেন ১২-৫-১৯৬৭—৩-৫-১৯৬৯ (মৃত্যু)
৫. বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি (অস্থায়ী) ৩-৫-১৯৬৯—২০-৭-১৯৬৯
৬. মহম্মদ হেদায়েৎ উল্লাহ্ (অস্থায়ী, ভারতের প্রধান বিচারপতিপদ হইতে) ২০-৭-১৯৬৯—২৪-৮-১৯৬৯
৭ বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি ২৪-৮-১৯৬৯—২৩-৮-১৯৭৪
৮ ফকরুদ্দিন আলি আহমেদ ২৪-৮-১৯৭৪—১১-২-১৯৭৭ (মৃত্যু)
৯. বি. ডি. জাত্তি (অস্থায়ী) ১১-২-১৯৭৭—২৪-৭-১৯৭৭
১০. নীলম সঞ্জীব রেড্ডি ২৫-৭-১৯৭৭—২৪-৭-১৯৮২
১১. জ্ঞানী জৈল সিং ২৫-৭-১৯৮২—

ইহা ব্যতীত ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সোবিয়েত ইউনিয়ন পরিভ্রমণে গেলে এবং ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে রাষ্ট্রপতি প্রসাদ গুরুতরভাবে অসুস্থ হইলে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন। আবার রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ ১৯৬৪-এর ফেব্রুয়ারী মাসে এবং ১৯৬৫-এর মার্চ মাসে ইংল্যাণ্ড পরিভ্রমণে গেলে তৎকালীন উপরাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হুসেন অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজ করেন। আর জ্ঞানী জৈল সিং ১৯৮২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে নিজ চিকিৎসার জন্য গেলে উপরাষ্ট্রপতি মহম্মদ হেদায়েৎ উল্লাহ্ অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে কাজকর্ম পরিচালনা করেন।

ভারতের উপরাষ্ট্রপতিগণ

১. ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণাণ ১৯৫২-৬২
২. ডক্টর জাকির হুসেন ১৯৬২-৬৭
৩. বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি ১৯৬৭-৬৯
৪. জি. এস. পাঠক ১৯৬৯-৭৪
৫. বি ডি. জাত্তি ১৯৭৪-৭৯
৬. মহম্মদ হেদায়েৎ উল্লাহ্ ১৯৭৯-





ভারতের রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন-পদ্ধতি সম্পর্কে মূল নীতি

পরোক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য একটি 'ইলেক্টরেল কলেজ' গঠিত হয়। এই 'কলেজ' কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণ এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যগণ লইয়া গঠিত।

রাষ্ট্রপতির নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ভোটপ্রদানের অধিকারের আনুপাতিক মান নির্দিষ্ট রাখা হয়। যদিও বিভিন্ন রাজ্যে ভোটসংখ্যা জনসংখ্যার অনুপাতে বেশী বা কম হইতে বাধ্য, তবুও বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের বিধানসভাগুলির

প্রদেয় ভোটসংখ্যা ও পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের প্রদেয় ভোটসংখ্যার মধ্যে আনুপাতিক মান একই রাখিতে হয়।

নির্বাচন-পদ্ধতি : রাজ্য বিধানসভার ও পার্লামেণ্টের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের প্রদত্ত ভোটদানের সংখ্যাগত মূল্য নির্ধারণের একটি কাল্পনিক উদাহরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

ধরা যাক্, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা পাঁচ কোটি এবং বিধানসভার নির্বাচিত সদস্য-সংখ্যা ২৯৪। তাহা হইলে সংবিধানের নিয়মানুযায়ী আমাদের হিসাব হইবে ৫০,০০০,০০০ ÷ ২৯৪ = ১৭০,০৬৮$\frac{৮}{২৯৪}$। এখন $\frac{৮}{২৯৪}$ হইল $\frac{১}{২}$এর কম ; সুতরাং ভগ্নাংশ বাদ যাইবে। ভাগফল ১৭০,০৬৮কে ১০০০ দিয়া ভাগ করিলে ভাগফল হইবে (১৭০,০৬৮ ÷ ১০০০ =) ১৭০$\frac{৬৮}{১০০০}$। $\frac{৬৮}{১০০০}$ হইল $\frac{১}{২}$ অপেক্ষা কম ; সুতরাং এক যোগ হইবে না। এখন পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটদানের সংখ্যাগত মূল্য ১৭০ ; তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মোট ভোটদানের সংখ্যাগত মূল্য হইবে ১৭০ × ২৯৪ = ৪৯,৯৮০। অনুরূপভাবে পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যগণের নির্ণেয় ভোটদানের মোট সংখ্যাগত মূল্য, ধরা যাক্, ৬০৪,১২০। এই সংখ্যাই হইবে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যগণের মোট সংখ্যাগত ভোটমূল্য। উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা, ধরা যাক্, (৫৪২ + ২৩২) = ৭৭৪। তাহা হইলে প্রত্যেক সদস্যের সংখ্যাগত ভোটমূল্য (৬০৪,১২০ ÷ ৭৭৪ =) ৭৮০$\frac{৪০০}{৭৭৪}$। যেহেতু $\frac{৪০০}{৭৭৪}$ হইল $\frac{১}{২}$এর বেশী ; অতএব রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যাগত ভোটমূল্য (৭৮০ + ১ =) ৭৮১। এইরূপ হিসাবের সাহায্যে জনসংখ্যার অনুপাতে বিধানসভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটপ্রদানের সহিত পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটপ্রদানের আনুপাতিক সমীকরণ করা হয়।

ভারতের খসড়া সংবিধান রচনার ভারপ্রাপ্ত কমিটির নির্দেশিত পদ্ধতি এইরূপ ছিল।

ভারতের রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতির পদাধিকারের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য

রাষ্ট্রপতি	**উপরাষ্ট্রপতি**
নির্বাচন—	
পার্লামেণ্টের রাজ্যসভা ও লোকসভার এবং রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচিত সদস্যগণ লইয়া গঠিত একটি 'ইলেক্টরেল কলেজ' দ্বারা নির্বাচিত।	পার্লামেণ্টের রাজ্যসভা ও লোকসভার সদস্যগণ লইয়া গঠিত একটি 'ইলেক্টরেল কলেজ' দ্বারা নির্বাচিত।

রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপতি একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটদান পদ্ধতি অনুসারে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে নির্বাচিত হন।

রাষ্ট্রপতি	উপরাষ্ট্রপতি
নির্বাচিত হইবার জন্য যোগ্যতা—	
(ক) অবশ্যই ভারতের নাগরিক হইতে হইবে।	(ক) অবশ্যই ভারতের নাগরিক হইতে হইবে।
(খ) ন্যূনপক্ষে ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইবেন।	(খ) ন্যূনপক্ষে ৩৫ বৎসর বয়স্ক হইবেন।
(গ) লোকসভার সদস্য হইবার যোগ্যতা-সম্পন্ন হইবেন।	(গ) ভারতের রাজ্য আইনসভার সদস্য হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন হইবেন।

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী উভয়কেই রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, রাজ্যের গভর্ণর অথবা রাজ্যের বা কেন্দ্রের মন্ত্রী ব্যতীত ভারত সরকার বা রাজ্য সরকারের অধীনে অথবা কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কোন সংস্থার অধীনে কোন লাভজনক পদে আসীন থাকা চলিবে না।

কার্যকলাপ—

রাষ্ট্রপতি	উপরাষ্ট্রপতি
কর্মভার গ্রহণের দিন হইতে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে আসীন থাকিবেন—যদি না ইতঃমধ্যে তিনি লিখিতভাবে উপরাষ্ট্রপতির নিকট পদ-ত্যাগ পত্র দাখিল করেন অথবা তাঁহাকে ইন্‌পিচ্‌মেণ্ট-এর মাধ্যমে অপসারিত করা হয়।	কর্মভার গ্রহণের দিন হইতে পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে আসীন থাকিবেন—যদি না তিনি রাষ্ট্র-পতির নিকট পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন অথবা তাঁহার অপসারণের জন্য রাজ্যসভার অধিকাংশ সদস্যের গৃহীত প্রস্তাব লোক-সভার দ্বারা সমর্থিত হয়।

রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি উভয়েই একাধিক বার নির্বাচিত হইতে পারেন।

বেতনক্রম—

রাষ্ট্রপতি	উপরাষ্ট্রপতি
প্রতি মাসে দশ হাজার টাকা।	রাজ্যসভার সভাপতি হিসাবে প্রতি মাসে ২,২৫০ টাকা; তবে রাষ্ট্রপতির বিদেশ ভ্রমণ, অসুস্থতার জন্য কর্মে অপারগ বা মৃত্যু হইলে সংবিধান অনুসারে উপরাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতির কর্তব্যকার্য সম্পাদন করিলে প্রতি মাসে ১০,০০০ টাকা পাইয়া থাকেন।

কর্তব্যকার্য—

রাষ্ট্রপতি	উপরাষ্ট্রপতি
রাষ্ট্রপতির উপর ভারত ইউনিয়নের শাসনক্ষমতা অর্পিত। তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পরামর্শক্রমে এই শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করেন।	উপরাষ্ট্রপতি হিসাবে তাঁহার কোন শাসনক্ষমতা নাই। রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করাই তাঁহার কর্তব্যকার্য। তবে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হইলে নূতন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত উপরাষ্ট্রপতি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাষ্ট্রপতির কর্তব্যকার্য পরিচালনা করেন।

ভারতের প্রধান মন্ত্রিগণ

1. পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (কংগ্রেস) ২৬-১-১৯50—২৭-৫-১৯৬৪ (মৃত্যু)
2. গুলজারিলাল নন্দ (সাময়িক) „ ২৭-৫-১৯৬৪— ৮-৬-১৯৬৪
3. লাল বাহাদুর শাস্ত্রী „ ৯-৬-১৯৬৪—১১-১-১৯৬৬ (মৃত্যু)
4. গুলজারিলাল নন্দ (সাময়িক) „ ১১-১-১৯৬৬—২৩-১-১৯৬৬
5. শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী „ ২৪-১-১৯৬৬—২৩-৩-১৯৭৭
6. মোরারজী দেশাই (জনতা) ২৪-৩-১৯৭৭— ২৭-৭-১৯৭৯
7. চৌধুরী চরণ সিং (জনতা (এস), পরে লোকদল) ২৮-৭-১৯৭৯—১৪-১-১৯৮০
৪. শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী (কংগ্রেস (ই)) ১৫-১-১৯৮০—

ভারতের উপপ্রধান মন্ত্রিগণ

উপপ্রধান মন্ত্রীর পদ ভারতীয় সংবিধানের ব্যতিক্রম। তবে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধীজীর পরামর্শ অনুসারে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে প্রথম উপপ্রধান মন্ত্রী করা হইয়াছিল। সর্দার প্যাটেলের মৃত্যুর (১৯50) পর আর কেহ দীর্ঘ কয়েক বৎসর উপপ্রধান মন্ত্রীর পদে ছিলেন না। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে মোরারজী দেশাই দ্বিতীয় উপপ্রধান মন্ত্রী হন এবং ১৯৬৯ পর্যন্ত ঐ পদে আসীন থাকেন। কেন্দ্রে জনতা দলের মোরারজী দেশাই-র প্রধান মন্ত্রিত্বের শেষ দিকে ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চৌধুরী চরণ সিং ও জগজীবন রাম উভয়েই উপপ্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইহার পর যশোবন্ত চ্যবন প্রধান মন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং-এর তদারকী মন্ত্রিপরিষদের উপপ্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

'উপপ্রধান মন্ত্রী প্রধান মন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং অস্থায়ী প্রধান মন্ত্রী হিসাবে প্রধান মন্ত্রীর কর্তব্যকার্য সম্পাদন করেন।

ভারতের বিচার ব্যবস্থার কাঠামো

- সুপ্রীম কোর্ট (প্রধান ধর্মাধিকরণ)
  - রাজ্যের হাইকোর্ট
    - জেলাজর্জ আদালত ও দায়রা (sessions) জজের আদালত
    - মেট্রোপলিটান শহরের আদালত
  - ইউনিয়ন অঞ্চলের বিচার বিভাগীয় (judicial) কমিশনারের আদালত (গোয়া, দমন ও দিউ-এ যেমন আছে)

রাজ্যের বিচারব্যবস্থার কাঠামো

- হাইকোর্ট (মহাধর্মাধিকরণ)
  - জেলা আদালত ও দায়রা জজের আদালত
    - দেওয়ানী সাব্‌জজের আদালত
      - মুন্সেফ আদালত
      - ন্যায় পঞ্চায়েত
    - (প্রেসিডেন্সী) ছোট আদালত (Small Causes Court)
    - ফৌজদারী জেলা জজের আদালত
      - ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত
        - বেতনভোগী বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত
        - অবৈতনিক বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত
      - পঞ্চায়েত আদালত বা ন্যায় পঞ্চায়েত

মেট্রোপলিটান শহরের আদালত

- হাইকোর্ট
  - প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত
  - (প্রেসিডেন্সী) ছোট আদালত (Small Causes Court)
  - দেওয়ানী আদালত
    - নগর দেওয়ানী আদালত
  - ফৌজদারী আদালত
    - নগর দায়রা জজের আদালত
      - মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত

প্রথম সাধারণ নির্বাচন (১৯৫১-৫২) হইতে ভারতের লোকসভা

২৬-১-১৯৫০ তারিখে	ভারতের সংবিধানসভা (Constituent Assembly) ভারতের অস্থায়ী পার্লামেণ্ট হিসাবে পরিগণিত হয়।
১৩-৫-১৯৫২ তারিখে	ভারতের ১ম লোকসভা গঠিত হয়।
১০-৫-১৯৫৭ ,,	,, ২য় ,, ,,
১৬-৪-১৯৬২ ,,	,, ৩য় ,, ,,
১৬-৩-১৯৬৭ ,,	,, ৪র্থ ,, ,,
২৭-১২-১৯৭০ তারিখে	তৎকালীন প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি **ইন্দিরা** গান্ধীর পরামর্শক্রমে রাষ্ট্রপতি **৪র্থ** লোকসভার আয়ুষ্কালের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৯৭১ (মার্চ)এ অন্তর্বর্তী নির্বাচনের পর

২৩-৩-১৯৭১ তারিখে	ভারতের ৫ম লোকসভা গঠিত হয়।

[১৯৭৫-এর জুন মাসে ভারতের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আভ্যন্তরীণ জরুরী **অবস্থা** ঘোষিত হয়। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে সংবিধানের ৪২তম সংশোধন দ্বারা লোকসভার আয়ুষ্কাল পাঁচ বৎসরের স্থলে ছয় বৎসর কার্যে বহাল থাকিবে স্থির হইয়াছিল। কিন্তু কেন্দ্রে জনতা সরকারের শাসনকালে ১৯৭৮এ ৪৪তম সংশোধন দ্বারা লোকসভার আয়ুষ্কাল পুনরায় পাঁচ বৎসর করা হয়।]

২৫-৩-১৯৭৭ তারিখে	ভারতের ৬ষ্ঠ লোকসভা গঠিত হয়।
৯-১-১৯৮০ তারিখে	ভারতের ৭ম লোকসভা গঠিত হয়।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ভারতীয় ইউনিয়নের গঠন (১৯৪৭)

'ক' শ্রেণীর রাজ্য	'খ' শ্রেণীর রাজ্য	'গ' শ্রেণীর রাজ্য	'ঘ' শ্রেণীর রাজ্য
১. আসাম	১. হায়দরাবাদ	১ আজমীড়	১. আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ
২. বিহার	২. জম্মু ও কাশ্মীর	২. ভূপাল	২. কোন অধিকৃত অঞ্চল (যদি থাকে) (Acquired Territories —if any)
৩. বোম্বাই	৩. মধ্য-ভারত	৩ কোচবিহার	
৪. মধ্যপ্রদেশ	৪. মহীশূর	৪ কুর্গ	
৫. মাদ্রাজ	৫. পাতিয়ালা ও পূর্ব পাঞ্জাব	৫ বিলাসপুর	
৬. উড়িষ্যা			
৭. পাঞ্জাব			
৮. যুক্তপ্রদেশ (উত্তর প্রদেশ)			
৯. পশ্চিমবঙ্গ			

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালগণ

১. চক্রবর্তী রাজাগোপাল আচারী
২. হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৩. কৈলাসনাথ কাটজু
৪. পদ্মজা নাইডু
৫. ধর্মবীর
৬. এ. এল্. ডায়াস
৭. ত্রিভুবন নারায়ণ সিংহ
৮. ভৈরবদত্ত পাণ্ডে

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রিগণ

১. ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৯৪৭—১৯৪৮)
২. ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় (১৯৪৮—১৯৬২ [মৃত্যু])
৩. প্রফুল্লচন্দ্র সেন (১৯৬২ –১৯৬৭)
৪. অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬৭)
৫. ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ (১৯৬৭—১৯৬৮)
৬. অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৬৭—১৯৭০)
৭. অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৭১)
৮. সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় (১৯৭২—১৯৭৭)
৯. জ্যোতি বসু (১৯৭৭—১৯৮২)
১০. জ্যোতি বসু (১৯৮২—

ভারতের হাইকোর্টগুলির নাম, এলাকা ও অবস্থিতি

	নাম	এলাকা	কোর্টের অবস্থিতি
১.	কলিকাতা	পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	কলিকাতা
২.	গোহাটী	ত্রিপুরা, আসাম, মণিপুর, মেঘালয়, নাগাভূমি, অরুণাচল প্রদেশ ও মিজোরাম	গোহাটী (আগরতলা, ইম্ফল ও কোহিমায় বেঞ্চ আছে।)
৩.	উড়িষ্যা	উড়িষ্যা	কটক
৪.	পাটনা	বিহার	পাটনা (রাঁচীতে বেঞ্চ আছে।)
৫.	সিকিম	সিকিম	গ্যাংটক
৬.	এলাহাবাদ	উত্তরপ্রদেশ	এলাহাবাদ (লক্ষ্মৌ-এ বেঞ্চ আছে।)
৭.	দিল্লী	দিল্লী	দিল্লী
৮.	গুজরাট	গুজরাট	আমেদাবাদ
৯.	হিমাচল প্রদেশ	হিমাচল প্রদেশ	সিমলা
১০.	পাঞ্জাব ও হরিয়ানা	পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও চণ্ডীগড়	চণ্ডীগড়
১১.	রাজস্থান	রাজস্থান	যোধপুর (জয়পুরে বেঞ্চ আছে।)
১২.	মাদ্রাজ	তামিলনাডু ও পণ্ডিচেরী	মাদ্রাজ
১৩.	কর্ণাটক	কর্ণাটক	ব্যাঙ্গালোর
১৪.	কেরালা	কেরালা ও লাক্ষাদ্বীপ	এর্ণাকুলাম
১৫.	মধ্যপ্রদেশ	মধ্যপ্রদেশ	জবলপুর (গোয়ালিওর ও ইন্দোরে বেঞ্চ আছে।)
১৬.	জম্মু ও কাশ্মীর	জম্মু ও কাশ্মীর	শ্রীনগর ও জম্মু
১৭.	বোম্বাই	মহারাষ্ট্র এবং দাদরা ও নগর-হাভেলি	বোম্বাই (নাগপুরে বেঞ্চ আছে।)
১৮.	অন্ধ্রপ্রদেশ	অন্ধ্রপ্রদেশ	হায়দরাবাদ

মডেল প্রশ্নাবলী

দ্বিতীয় খণ্ড

স্বদেশকথা : জাতীয় আন্দোলন

প্রথম অধ্যায়

A

Essay type :

1. Discuss the effects of the impact of Western Contact on India and the Indians.
   ভারত ও ভারতবাসীর উপর পাশ্চাত্য দেশের সহিত সংস্পর্শের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।
2. Trace the steps for the introduction and spread of the English education in India. What were its effects ?
   ভারতে ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্তন ও বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা কর। ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল ?
3. What were the factors that contributed to the awakening of nationalism among the Indians ?
   ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে কোন্ কোন্ বিষয়ের অবদান ছিল ?
4. Why were the Indians willing to form responsible government for the country ?
   দায়িত্বশীল সরকার গঠনের জন্য ভারতীয়দের আগ্রহের কারণ কি ছিল ?

Short-answer type :

1. What were the contributions of Raja Rammohan Roy, David Hare, Lord Macaulay to the introduction and spread of Western education in India ?
   ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারের জন্য রাজা রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার ও লর্ড ম্যাকলের অবদান কি ছিল ?
2. Assess the importance of the influence of Vivekananda in the national awakening of the Indians.
   ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ উন্মেষে বিবেকানন্দের অবদানের গুরুত্ব কতদূর ছিল তাহা নির্ধারণ কর।
3. How did Bankim Chandra contribute to the growth of the spirit of nationalism among the Indians ?
   ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের প্রসারে বঙ্কিমচন্দ্র কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ?
4. Discuss the role of the Indian Press in the spread of national feeling among the Indians.
   ভারতীয়দের জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধিতে ভারতীয় সংবাদপত্রের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা কর।
5. How did the exploitation of the Indians educated unemployment, neglect of agriculture, improvement in communication system contribute to the national unity and national feeling among the Indians ?
   অর্থনৈতিক শোষণ, শিক্ষিত বেকারি, কৃষিব্যবস্থার প্রতি উদাসীনতা, সংযোগব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি কিভাবে ভারতীয়দের ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ বাড়াইয়া দিয়াছিল ?

Objective type :

1. (a) Who first realised that introduction of Western education and science was necessary for building up modern India ?

Tick off the correct answer :

Alexander Duff ☐
Lord Macaulay ☐
Raja Rammohan Roy ☐
David Hare ☐

আধুনিক ভারত গড়িয়া তুলিতে ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও বিজ্ঞানের প্রসার একান্ত প্রয়োজন একথা সর্বপ্রথম কে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ?

শুদ্ধ উত্তরটিতে ✓ চিহ্ন দাও :

আলেকজাণ্ডার ডাফ্ ☐
লর্ড ম্যাকলে ☐
রাজা রামমোহন রায় ☐
ডেভিড হেয়ার ☐

(b) Fill in the gaps ;

— was the forerunner of Indian Renaissance.
— and — founded the Presidency College of Calcutta in 1817.
— supported introduction of Western Education through English language.
— supported continuation of the oriental system of education.

শূন্য স্থান পূরণ কর :

— ছিলেন ভারতের নবজাগরণের অগ্রদূত।
— এবং — ১৮১৭ সালে কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজ স্থাপন করেন।
— ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন।
— ছিলেন প্রাচ্য ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার পক্ষপাতী।

(c) Tick off the correct answer :

Asiatic Society was founded in 1784 by :

Princep ☐
Lord Bentinck ☐
William Jones ☐
Vivian D'Rosio ☐

✓ চিহ্ন দ্বারা শুদ্ধ উত্তরটি নির্ণয় কর :

১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করিয়াছিলেন :

প্রিন্সেপ ☐
লর্ড বেণ্টিঙ্ক ☐
উইলিয়াম জোন্স ☐
ভিভিয়ান ডি'রোজিও ☐

(d) Name the book and its author that had contributed largely to the awakening of nationalism in India.

Mark the correct answer :

Hindu Patriot of Harish Mukherjee ☐
Krishna Charitra of Bankim Chandra ☐
Anandamath of Bankim Chandra ☐

ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষে অত্যধিক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক ও উহার রচয়িতার নাম কর :

শুদ্ধ উত্তরটি √ দাগ দিয়া বুঝাও :

হিন্দু পেট্রিয়ট :	হরিশ মুখার্জী	☐
কৃষ্ণচরিত্র :	বঙ্কিমচন্দ্র	☐
আনন্দমঠ :	বঙ্কিমচন্দ্র	☐

B

Essay type :

1. **Give, in brief, the history of the different political Associations from Landholders' Society to Home Rule League.**
   জমি-মালিক সমিতি হইতে আরম্ভ করিয়া হোমরুল লীগ পর্যন্ত বিভিন্ন রাজনৈতিক সংস্থার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।
2. **What were aims and contribution of the British Indian Association and Indian Association ?**
   ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ও ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও অবদান কি ছিল ?

Short-answer type :

1. **Why should Raja Rammohan Roy be regarded as the forerunner of the Indian political movement ?**
   রাজা রামমোহন রায়কে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের পথিকৃৎ বলা যাইবে কেন.
2. **Write short notes on :**
   (i) **Landholders' Society.**
   (ii) **Bengal British Indian Society.**
   (iii) **British Indian Association.**
   (iv) **Indian Association.**
   সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :
   (i) জমি-মালিক সমিতি।
   (ii) বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি।
   (iii) ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন।
   (iv) ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন।

Objective type :

1. Who established British Indian Society ?
   Tick off the correct answer :

William Jones	☐
William Adam	☐
William Anderson	☐

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি কে স্থাপন করিয়াছিলেন ?

শুদ্ধ উত্তরটি √ চিহ্ন দিয়া বুঝাও :

উইলিয়াম জোন্স্	☐
উইলিয়াম এ্যাডাম	☐
উইলিয়াম এ্যাণ্ডারসন	☐

2. Fill in the gaps :
   (i) — and — formed into British Indian Association in 1851.
   (ii) Political agitation was first transformed into national movement by — .
   (iii) Indian Association was founded by — in 1876.
   (iv) Two different Home Rule Leagues were founded by — and — .

   শূন্য স্থান পূরণ কর :
   (i) — ও — ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন স্থাপন করিয়াছিলেন।
   (ii) রাজনৈতিক আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত করিয়াছিলেন — ।
   (iii) ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ১৮৭৬ সালে — কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।
   (iv) — ও — দুইটি ভিন্ন হোমরুল-লীগ স্থাপন করিয়াছিলেন।

C

Essay type :

1. Give in brief the story of the repression of the Indigo-Cultivators by the English Indigo planters.

   নীলকর সাহেবরা নীলচাষীদের উপর যে অত্যাচার চালাইয়াছিল তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

2. How did the Indians react against the Vernacular Press Act and Arms Act ?

   দেশীয় সংবাদপত্র আইন ও অস্ত্র আইনের প্রবর্তনের ফলে ভারতবাসীর মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছিল ?

Short-answer type :

1. Write a note on Ilbert Bill controversy. What were its lessons ?

   ইলবার্ট বিল বিতর্ক সম্পর্কে টীকা লিখ। ইহার শিক্ষা কি ছিল ?

2. Assess the importance of the Indian National Conference to the Indian National Movement.

   ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ভারতের জাতীয় সম্মেলন (ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল কনফারেন্সের) গুরুত্ব নির্ণয় কর।

Objective type :

1. Who were the two brothers that gave the practical leadership in the Indigo Agitation ?

   Tick off the correct answer :

   Satyacharan Biswas ☐
   Haricharan Biswas ☐
   Bishnucharan Biswas ☐
   Nilambar Biswas ☐
   Digambar Biswas ☐
   Ambar Biswas ☐

   নীল বিদ্রোহে কোন্ দুই ভাই নেতৃত্ব দান করিয়াছিলেন ?
   শুদ্ধ উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া বুঝাও :

   সত্যচরণ বিশ্বাস ☐
   হরিচরণ বিশ্বাস ☐
   বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস ☐
   নীলাম্বর বিশ্বাস ☐
   দিগম্বর বিশ্বাস ☐
   অম্বর বিশ্বাস ☐

2. Fill in the gaps :
   (i) — Agitation was the first organised agitation against the British.
   (ii) Vernacular Press Act was passed under Governor General Lord — .
   (iii) — of 1883 was the forerunner of the Indian National Congress founded in 1885.

   শূন্যস্থান পূরণ কর :
   (i) — আন্দোলন ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম সংঘবদ্ধ আন্দোলন।
   (ii) দেশীয় সংবাদপত্র আইন গভর্ণর-জেনারেল লর্ড — পাশ করিয়াছিলেন।
   (iii) ১৮৮৩ সালের — ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রদূত ছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

Essay type :

1. Give the history of the foundation of the Indian National Congress.
   ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বিবৃত কর।
2. Describe the activities of the Indian National Congress from its foundation (1885) till 1905.
   প্রতিষ্ঠার (১৮৮৫) পর হইতে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের কার্যকলাপ বর্ণনা কর।

Short-answer type :

1. Do you agree with the view that Mr. Allan Octavian Hume was the founder of the Indian National Congress ?
   মিঃ এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা এই মতবাদ কি তুমি সমর্থন কর ?
2. Assess the contribution of Surendranath's Indian National Conference to the foundation of the Indian National Congress.
   সুরেন্দ্রনাথের ভারতের জাতীয় কনফারেন্স ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় কতদূর সহায়ক ছিল তাহা নির্ণয় কর।
3. What were the aims and objectives of Indian National Congress at the time of its foundation ?
   ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকালে উহার আদর্শ ও উদ্দেশ্য কি ছিল ?
4. What were the provisions of the Indian Councils Act of 1892 ?
   ১৮৯২ সালের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস এ্যাক্ট-এর শর্তাদি কি ছিল ?

Objective type :

1. Who was the President of the first session of the Indian National Congress (1885) ?
   Tick off the correct answer :
   - Dadabhai Naoroji ☐
   - W. C. Bonnerjea ☐
   - Surendranath Banerjee ☐
   - Allan Octavian Hume ☐

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের (১৮৮৫) সভাপতি কে ছিলেন ?
শুদ্ধ উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া বুঝাও :

দাদাভাই নৌরোজী ☐
ডব্লু. সি. বনার্জী ☐
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ☐
এ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ☐

2. Name the three leaders who were particularly against the policy of mendicancy followed by the National Congress.
Tick off the correct names :

Surendranath Banerjee ☐
Aravinda Ghosh ☐
Narendranath Sen ☐
Bipinchandra Pal ☐
Firozshah Mehta ☐
Bal Gangadhar Tilak ☐
Gopalkrishna Gokhale ☐

জাতীয় কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন নীতির বিরোধিতা যে তিনজন প্রধান নেতা করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ✓ দাগ কাটিয়া নির্দেশ কর :

সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ☐
অরবিন্দ ঘোষ ☐
নরেন্দ্রনাথ সেন ☐
বিপিনচন্দ্র পাল ☐
ফিরোজশাহ মেহতা ☐
বালগঙ্গাধর তিলক ☐
গোপালকৃষ্ণ গোখলে ☐

তৃতীয় অধ্যায়

Essay type :

1. What was the real motive behind the Partition of Bengal, 1905 ? What were its reactions ?
বঙ্গব্যবচ্ছেদের (১৯০৫) পশ্চাতে প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল ? ইহার প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল ?
2. Discuss the gradual expansion of the Boycott and Swadeshi movement as a reaction to the Partition of Bengal, 1905.
বঙ্গব্যবচ্ছেদের (১৯০৫) প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রসার কিভাবে ঘটিয়াছিল তাহা আলোচনা করিয়া বুঝাও।
3. Trace the story of the National Education Movement as a part of Swadeshi movement.
স্বদেশী আন্দোলনের অংশ হিসাবে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের বিবরণ দাও।

Short-answer type :

1. What were the actual divisions of areas contemplated in the Bengal Partition of 1905 ?
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনায় বাংলাদেশের কোন্ কোন্ অংশ ভাগ করা অর্থাৎ পৃথক করা হইয়াছিল ?

2. 'Boycott and Swadeshi were the two weapons of anti-partition agitation' —Explain.

'বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের বয়কট ও স্বদেশী ছিল দুইটি অস্ত্র'—একথায় অর্থ বুঝাইয়া বল।

3. What were the contributions of National Songs to the spread of the Swadeshi movement ?

স্বদেশী আন্দোলন প্রসারে স্বদেশী সঙ্গীতের অবদান কি ছিল ?

4. What were the economic objectives of the Boycott movement ?

বয়কট আন্দোলনের অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য কি ছিল ?

Objective type :

1. What was the name of the new province that was sought to be created by Bengal Partition ?

Tick off the correct answer :

Dacca and Assam ☐
Assam and Bengal ☐
Eastern Bengal and Assam ☐

বঙ্গভঙ্গ দ্বারা যে নূতন প্রদেশ গঠন করা হইয়াছিল তাহার নাম কি ছিল ?

শুদ্ধ উত্তরটি √ দাগ দিয়া বুঝাইয়া দাও :

ঢাকা ও আসাম ☐
আসাম ও বেঙ্গল ☐
ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ও আসাম ☐

2. What was Rakhibandhan ?

Tick off the correct answer :

A Bengali Religious ceremony observed by the Hindus ☐
A social custom of Bengal ☐
A token of brotherly relations introduced by Rabindranath on 16th October, 1905 ☐

রাখীবন্ধন উৎসব কি ছিল ?

শুদ্ধ উত্তরটি √ দাগ কাটিয়া দেখাও :

বাঙালী হিন্দুদের এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান ☐
বাংলাদেশের এক সামাজিক নীতি ☐
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক ভ্রাতৃবোধের প্রতীক ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর অনুষ্ঠিত ☐

3. When was the National Council of Education established ?

Mark out the correct answer :

16th October, 1905 ☐
16th November, 1905 ☐
16th August, 1905 ☐
16th November, 1906 ☐

জাতীয় শিক্ষাপরিষদ কখন স্থাপিত হইয়াছিল ?

শুদ্ধ উত্তরটি √ দাগ কাটিয়া দেখাও :

১৬ই অক্টোবর, ১৯০৫ ☐
১৬ই নভেম্বর, ১৯০৫ ☐
১৬ই আগষ্ট, ১৯০৫ ☐
১৬ই নভেম্বর ১৯০৬ ☐

চতুর্থ অধ্যায়

Essay type :

1. Trace the circumstances leading to the growth of millitant nationalism in India.

   কি ঘটনা প্রবাহে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হইয়াছিল তাহার বিবরণ দাও।

2. What were the causes that were responsible for the split in the Congress and its division into Moderates and Extremists ?

   জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে ভাঙন এবং নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলে কংগ্রেসীদের পৃথক হইয়া পড়ার কারণ কি ছিল ?

3. Assess the contributions of Bal Gangadhar Tilak, Aravinda Ghosh, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai to the cause of nationalism.

   জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল ও লালা লাজপৎ রায়ের অবদান নির্ণয় কর।

4. Give, in brief, the history of the Revolutionary Struggle in Bengal, Maharashtra and the Punjab.

   বাংলা, মহারাষ্ট্র ও পাঞ্জাবে বিপ্লবী সংগ্রামের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখ।

Short-answer type :

1. What were the ideological differences between the Extremists and the Moderates ?

   চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের আদর্শগত পার্থক্য কি কি ছিল ?

2. What were the arguments of Lord Curzon for the Partition of Bengal ? Were they valid ?

   বঙ্গভঙ্গের জন্য লর্ড কার্জনের যুক্তিগুলি কি ছিল ? সেগুলি কি যুক্তিযুক্ত ?

3. Assess the contributions of Bal Gangadhar Tilak to the growth of militant nationalism in India.

   ভারতে সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের প্রসারে বালগঙ্গাধর তিলকের অবদান নির্ণয় কর।

4. In what ways did Aravinda Ghosh contribute to militant nationalism in India and particularly in Bengal ?

   ভারতে বিশেষভাবে, বাংলাদেশে সংগ্রামী জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে অরবিন্দ ঘোষের অবদান কি কি ছিল ?

5. Assess the influence of Bipin Chandra Pal's oratory on the Boycott and the Swadeshi Movement.

   বয়কট ও স্বদেশী আন্দোলনে বিপিনচন্দ্র পালের বাগ্মিতার প্রভাব নির্ধারণ কর।

6. Write a note on the career and contributions of Lala Lajpat Rai.

   লালা লাজপৎ রায়ের কর্মজীবন ও অবদান সম্পর্কে টীকা লিখ।

Objective type :

1. What was Anushilon Samity ?

   Mark out the correct answer :

   A social organisation ☐
   A cultural association ☐
   A revolutionary Society of Bengal ☐
   A political party ☐

অনুশীলন সমিতি কি ছিল ?
শুদ্ধ উত্তরটি ✓ দাগ দাও :

- একটি সামাজিক সংস্থা ☐
- একটি সাংস্কৃতিক সমিতি ☐
- বাংলাদেশের একটি বিপ্লবী সমিতি ☐
- একটি রাজনৈতিক দল ☐

2. When was the Partition of Bengal annulled ?
Mark out the correct answer :

- 1919 ☐
- 1921 ☐
- 1911 ☐
- 1914 ☐
- 1907 ☐

বঙ্গভঙ্গ কখন রদ হইয়াছিল ?
শুদ্ধ উত্তরটি ✓ দাগ কাটিয়া বুঝাও :

- ১৯১৯ ☐
- ১৯২১ ☐
- ১৯১১ ☐
- ১৯১৪ ☐
- ১৯০৭ ☐

3. Why was Khudiram hanged ?
Tick off the correct answer :

- For killing Kingsford ☐
- For attempting to kill Kennedy ☐
- For killing Mrs. Kennedy and her daughter by mistake ☐

ক্ষুদিরামের ফাঁসি কেন হইয়াছিল ?
শুদ্ধ উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া বুঝাও :

- কিংসফোর্ডকে হত্যা করার জন্য ☐
- কেনেডিকে হত্যার চেষ্টার জন্য ☐
- ভুলক্রমে শ্রীমতী কেনেডি ও তাঁর কন্যাকে হত্যার জন্য ☐

4. Who killed Naren Gosain within the Alipur Central Jail ?
Tick off the correct answer :

- Abinash Bhattacharji and Barin Ghose ☐
- Kanai Datta and Satyen Basu ☐
- Ullaskar Datta and Abinash Bhattacharji ☐
- Satyen Basu and Barin Ghose ☐
- Kanai Datta and Abinash Bhattacharji ☐

কে নরেন গোঁসাইকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে হত্যা করিয়াছিল ?
শুদ্ধ উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া বুঝাও :

অবিনাশ ভট্টাচার্য ও বারীন ঘোষ ☐
কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু ☐
উল্লাসকর দত্ত ও অবিনাশ ভট্টাচার্য ☐
সত্যেন বসু ও বারীন ঘোষ ☐
কানাই দত্ত ও অবিনাশ ভট্টাচার্য ☐

5. **Who initiated Shivaji utsab ?**
Mark out the correct answer :

Lala Lajpat Rai ☐
Rashbehari Bose ☐
Rabindranath Tagore ☐
Bal-Gangadhar Tilak ☐

শিবাজী উৎসবের কে উদ্যোক্তা ছিলেন ?
সঠিক উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া বুঝাও :

লালা লাজপৎ রায় ☐
রাসবিহারী বসু ☐
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ☐
বালগঙ্গাধর তিলক ☐

পঞ্চম অধ্যায়

Essay type :

1. Describe the role of Mahatma Gandhi in the Indian Freedom movement from 1915 to 1922.
১৯১৫ হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধী কি অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার বিবরণ দাও।
2. Trace the circumstances leading to the Montagu-Chelmsford reforms of 1919.
১৯১৯ সালের মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার কি ঘটনা প্রবাহে গৃহীত হইয়াছিল তাহার বিবরণ দাও।
3. Explain Mahatma Gandhi's concept of Satyagraha.
মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের ধারণার ব্যাখ্যা কর।
4. Trace the story of the rise of Swarajya Party. Who were its prominent leaders ?
স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভবের ইতিহাস দাও। এই দলের প্রধান নেতৃবৃন্দ কে কে ছিলেন ?
5. What were the reasons behind the revival of revolutionary terrorism from 1923 ?
১৯২৩ সাল হইতে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদের পুনরুত্থানের কারণ কি ছিল ?

Short-answer type :

1. What were the reactions of the Lucknow Pact of 1916 upon the British Government ?
ব্রিটিশ সরকারের উপর ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তির প্রতিক্রিয়া কি হইয়াছিল ?

2. Explain the objectives of the Chelmsford Declaration of 1917.
১৯১৭ সালের চেমসফোর্ড ঘোষণার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর।
3. To what extent did the Reform of 1919 satisfy Indian political aspirations?
১৯১৯ সালের সংস্কার ভারতীয়দের রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা কতদুর পরিতৃপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল?
4. What was Mahatma Gandhi's motive in combining Congress movement with Khilafat movement?
খিলাফৎ আন্দোলনের সহিত কংগ্রেসের আন্দোলনকে সংযুক্তির পশ্চাতে মহাত্মা গান্ধীর উদ্দেশ্য কি ছিল?
5. Write a note on Jalinwalla Bagh massacre.
জালিনওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ডের উপর টীকা লিখ।

Objective type :

1. By what Act in 1919, did the British Government seek to gag the Indian Press, to extern the Indians and punish political offenders at will?
Tick off the correct answer:

Arms Act ☐
Rowlatt Act ☐
Press Act ☐

১৯১৯ সালে ব্রিটিশ সরকার কোন্ আইন পাশ করিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করিতে, ভারতীয়দের দেশ হইতে বহিষ্কার করিতে এবং যথেচ্ছভাবে শাস্তি দিতে চাহিয়াছিল?
শুদ্ধ উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া বুঝাও:

অস্ত্র আইন ☐
রাওলাট আইন ☐
সংবাদপত্র আইন ☐

2. Fill in the gaps;
(i) The Reform Act of 1919 established — in India.
(ii) Under orders of General — 1600 rounds were fired on unarmed people in Jalinwalla Bagh.
(iii) Rabindranath gave up the British title of — in protest against Jalinwalla Bagh massacre.
(iv) The visit of — in 1921 was greeted with all-out Hartal in India.

শূন্য স্থান পূরণ কর:
(i) ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন — ভারতে স্থাপন করিয়াছিল।
(ii) জেনারেল — এর আদেশে নিরস্ত্র নর-নারীর উপর জালিনওয়ালা বাগে ১৬০০ গুলি করা হইয়াছিল।
(iii) জালিনওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ ব্রিটিশ সরকার প্রদত্ত — উপাধি বর্জন করেন।
(iv) ১৯২১ সালে — ভারত সফরকালে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হইয়াছিল।

3. Tick off the correct answer;
Leader of the Swarajya Party in Bengal was

Matilal Nehru ☐
Bipin Chandra Pal ☐
Chittaranjan Das ☐
Vital Bhai Patel ☐

শুদ্ধ উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া বুঝাও :
বাংলাদেশে স্বরাজ্যপার্টির নেতা ছিলেন

মোতিলাল নেহ্‌রু ☐
বিপিনচন্দ্র পাল ☐
চিত্তরঞ্জন দাশ ☐
বিঠলভাই প্যাটেল ☐

4. **Mark out the correct answer :**
Who was Surya Sen ?

A poet ☐
A Revolutionary ☐
Leader of Chittagong armoury raid ☐

সঠিক উত্তরটি ✓ দাগ কাটিয়া দেখাও :
সূর্য সেন কে ছিলেন ?

একজন কবি ☐
একজন বিপ্লবী ☐
চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের নেতা ☐

5. **Who made an armed attack on Mr. Simpson within the Writers' Buildings** on December 8, 1930 ?
Mark out the correct answer :

Prafulla Chaki, Kshudiram and Satyen ☐
Jatin, Kanai and Dines ☐
Benoy, Satyen and Badal ☐
Benoy, Badal, Dines ☐
Badal, Kanai and Dines ☐

১৯৩০ সালের ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতা রাইটার্স বিল্ডিং-এ সিম্পসনের উপর সশস্ত্র আক্রমণ কারা করিয়াছিল ?
সঠিক উত্তরটি ✓ দাগ কাটিয়া দেখাও :

প্রফুল্ল চাকি, ক্ষুদিরাম ও সত্যেন ☐
যতীন, কানাই ও দীনেশ ☐
বিনয়, সত্যেন ও বাদল ☐
বিনয়, বাদল, দীনেশ ☐
বাদল, কানাই ও দীনেশ ☐

ষষ্ঠ অধ্যায়

Essay type :

1. **Describe the story of the Civil Disobedience Movement that began in 1930 in pursuance of the decision of the Lahore Congress (1929).**
১৯২৯ সালে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের ইতিহাস বর্ণনা কর।
2. **Explain the significance of the Independence Day, 26th January 1930.**
১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারি স্বাধীনতা দিবস হিসাবে পালনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
3. **Trace the history of the First (1930), Second (1931) and Third (1932) Round Table Conferences. What were the results ?**

প্রথম (১৯৩০), দ্বিতীয় (১৯৩১) ও তৃতীয় (১৯৩২) সালের গোল টেবিল বৈঠকের ইতিহাস বর্ণনা কর। এগুলির ফলাফল কি হইয়াছিল ?

4. What was Simon Commission? Why was it appointed? Why did the National Congress boycott it?
   সাইমন কমিশন কি? উহা কেন নিযুক্ত হইয়াছিল? ভারতের জাতীয় কংগ্রেস উহা বয়কট করিয়াছিল কেন?
5. Discuss the second phase (1932-34) of the Civil Disobedience Movement.
   ১৯৩২-৩৪ সাল পর্যন্ত আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের আলোচনা কর।

Short-answer type:

1. Write a note on Simon Commission, 1925.
   সাইমন কমিশনের (১৯২৫) উপর টীকা লিখ।
2. What led to the acceptance of Full Independence as the goal by Lahore Congress in 1929?
   ১৯২৯ সালে লাহোর অধিবেশনে কংগ্রেস কর্তৃক পূর্ণ স্বাধীনতা উহার আদর্শ হিসাবে গ্রহণের পশ্চাতে কারণ কি ছিল?
3. What were Jinnah's Fourteen Demands?
   জিন্নাহ্-এর চৌদ্দ দফা দাবি কি ছিল?
4. Discuss the importance of 26th January as the Independence Day.
   স্বাধীনতা দিবস হিসাবে ২৬শে জানুয়ারির গুরুত্ব কি ছিল?
5. Write a note on Dandee March by Mahatma Gandhi.
   মহাত্মা গান্ধী কর্তৃক ডাণ্ডি বা দাণ্ডী অভিযান সম্পর্কে টীকা লিখ।
6. Discuss the significance of Gandhi-Irwin Pact of 1931.
   ১৯৩১ সালের গান্ধী-আরউইন চুক্তির তাৎপর্য আলোচনা কর।
7. Critically examine the Communal Award of 1932.
   ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা সম্পর্কে সমালোচনামূলক বিচার কর।
8. What was the significance of Poona Pact? Why was it necessary?
   পুনা চুক্তির তাৎপর্য কি? এই চুক্তির প্রয়োজনীয়তা কি ছিল?
9. Write a note on the Government of India Act, 1935.
   ১৯৩৫ সালের ভারত আইন সম্পর্কে টীকা লিখ।
10. What led to Subhaschandra Bose's leaving the Indian National Congress?
    ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ সুভাষচন্দ্রকে কেন করিতে হইয়াছিল?
11. Examine the Two-Nation Theory of Muhammad Ali Jinnah and Demand for Pakistan.
    মহম্মদ আলি জিন্নাহ্-এর দুই-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান দাবি বিচার কর।

Objective type:

1. Fill in the gaps:
   (i) Indian National Congress boycotted — as there was not a single Indian member in it.
   (ii) Khan Abdul Gaffar Khan is also known as —.

   শূন্য স্থান পূরণ কর:
   (i) কোন ভারতীয়কে সদস্যরূপে ইহাতে গ্রহণ করা হয় নাই বলিয়া ভারতের জাতীয় কংগ্রেস— বর্জন করিয়াছিল।
   (ii) খান আবদুল গফফর খাঁ — রূপেও পরিচিত।

সপ্তম অধ্যায়

Essay type :

1. Trace the circumstances leading to the appointment of Cripps Mission, What were its proposals ?
যে ঘটনা প্রবাহে ক্রীপস মিশন নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার বিবরণ দাও। ইহার প্রস্তাব কি ছিল ?
2. Give the history of the 'Quit India' Movement.
'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ইতিহাস দাও।
3. What do you know of Netaji Subhaschandra Bose's Azad Hind Faus ?
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর আজাদ হিন্দ্ ফৌজ সম্পর্কে কি জান ?
4. Discuss the attempts made by the Cabinet Mission to solve the problem of Indian Independence.
ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশন কিভাবে ভারতের স্বাধীনতার সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিয়াছিল সে-বিষয়ে আলোচনা কর।

Short-answer type :

1. Discuss the importance of Netaji Subhaschandra and Azad Hind Fauz to the cause of Indian Independence.
ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে নেতাজী সুভাষচন্দ্র ও তাঁহার আজাদ হিন্দ্ ফৌজের গুরুত্ব আলোচনা কর।
2. What was the significance of the revolt of the Indian navy ?
ভারতের নৌ-সেনা বিদ্রোহের তাৎপর্য কি ছিল ?
3. Describe Lord Mountbatten's Declaration of June, 1947.
১৯৪৭ সালের জুন মাসে লর্ড মাউন্টব্যাটেনের ঘোষণা বিবৃত কর।

Objective type :

1. Who described Cripps proposals as "a post-dated cheque on a creasing bank" ?
Mark the correct answer :

Abul Kalam Azad ☐
Mahatma Gandhi ☐
Pandit Jawaharlal Nehru ☐
Sardar Ballav Bhai Patel ☐

ক্রীপস্-এর প্রস্তাবকে "ধ্বংসোন্মুখ ব্যাঙ্কের উপর ভবিষ্যতে ভাঙ্গাইতে পারা যাইবে এরূপ একখানা চেক" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন কে ?
সঠিক উত্তরটি ✓ দাগ দিয়া বুঝাও :

আবুল কালাম আজাদ ☐
মহাত্মা গান্ধী ☐
পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু ☐
সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল ☐

2. What was the name of the lady who died by police bullet as she was bravely leading a procession in Tamluk in 1942 movement with the National Flag in hand.

Mark out the correct answer :

Nalini Hazra ☐
Matangi Hazra ☐
Matangini.Hazra ☐
Kumudini Hazra ☐

তমলুকে ১৯৪২ সালের আন্দোলনে জাতীয় পতাকা হস্তে শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করিবার কালে পুলিশের গুলিতে যে মহিলার মৃত্যু ঘটিয়াছিল তাঁহার নাম কি ?
সঠিক উত্তরটিতে ✓ দাগ দাও :

নলিনী হাজরা ☐
মাতঙ্গী হাজরা ☐
মাতঙ্গিনী হাজরা ☐
কুমুদিনী হাজর ☐

তৃতীয় খণ্ড

স্বদেশকথা : সংবিধান ও নাগরিকতা

প্রথম অধ্যায়

Essay type :

1. Describe the activities of the Indian Constituent Assembly.
   ভারতের সংবিধানসভার কার্যাবলী আলোচনা কর।
2. Give, in brief, the story of the adoption of the Indian National Flag.
   ভারতের জাতীয় পতাকা গ্রহণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দাও।
3. Discuss the Preamble to the Indian Constitution.
   ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনা সম্পর্কে আলোচনা কর।
4. Discuss the salient features of the Indian Constitution.
   ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা কর।
5. Describe the Central and the State administration in India.
   ভারতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য শাসনের বর্ণনা দাও।
6. Describe the powers and functions of the Indian President.
   ভারতের রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাদির বিবরণ দাও।
7. Give the composition and functions of the Union Ministry.
   কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার গঠন ও কার্যকলাপের বিবরণ দাও।
8. What are the composition and functions of the *Lok Sabha* ?
   লোকসভার গঠন ও কার্যকলাপ কি ?
9. Give the powers and functions of the Governor of an Indian State.
   ভারতের কোন রাজ্যের রাজ্যপালের ক্ষমতা ও কার্যের বিবরণ দাও।
10. What are the composition and functions of the State Legislature ?
    রাজ্য আইনসভার গঠন ও কার্যকলাপ কিরূপ ?
11. Describe the Judicial System of India.
    ভারতের বিচারব্যবস্থার বর্ণনা দাও।
12. What are the Fundamental Rights of an Indian Citizen ?
    ভারতের নাগরিকের মৌলিক অধিকার কি কি ?
13. How is a bill passed in the Indian Parliament ?
    ভারতীয় সংসদে কিভাবে আইন প্রণয়ন করা হয় ?

Short-answer type :

1. Explain the significance of the Indian National Emblem.
   ভারতের জাতীয় প্রতীক চিহ্নের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।
2. Write a note on Indian National Song.
   ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের উপর একটি টীকা লিখ।

3. What is the importance of the Preamble to the Indian Constitution?
ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার গুরুত্ব কি?
4. How is the Indian President elected?
ভারতের প্রেসিডেন্ট কিভাবে নির্বাচিত হন?
5. What are the special powers of the President of India?
ভারতের রাষ্ট্রপতির বিশেষ ক্ষমতা কি কি?
6. Describe the powers and functions of the Prime Minister of India.
ভারতের প্রধান মন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও।
7. Describe the composition and functions of the Supreme Court of India.
ভারতের সুপ্রীম কোর্টের গঠন ও কার্যাদি বর্ণনা কর।
8. Discuss the Directive Principles of the Indian Constitution.
ভারতের সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতির আলোচনা কর।

Objective type:

1. Fill in the gaps:
   (i) According to the Constitution of India is a —.
   (ii) Introduction setting forth the aims of the constitution is called its —.
   (iii) There are — states and — centrally administered territories in India.

   শূন্য স্থান পূরণ কর:
   (i) ভারতের সংবিধান অনুসারে ভারত একটি —।
   (ii) সংবিধানের ভূমিকায় উহার উদ্দেশ্য বর্ণনাকে সংবিধানের — বলে।
   (iii) ভারতে মোট — অঙ্গরাজ্য ও — কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

Essay type:

1. Define citizenship. How is citizenship acquired and how it may be lost?
নাগরিকতার সংজ্ঞা দাও। নাগরিকতা লাভ কি কি ভাবে করা যায়? নাগরিকতা কি কারণে বিলুপ্ত হইতে পারে?
2. What are the different kinds of rights enjoyed by a citizen?
নাগরিক কি কি বিভিন্ন অধিকার ভোগ করিয়া থাকে?

Short-answer type:

1. Distinguish between Political and Social rights of a citizen.
নাগরিকের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের পার্থক্য বুঝাইয়া লিখ।
2. Are the moral rights protected by the State? Illustrate your answer.
নাগরিকের নৈতিক অধিকার কি রাষ্ট্র রক্ষা করে? উদাহরণসহ উত্তর দাও।
3. What are the duties of a citizen?
নাগরিকের কর্তব্য কি কি?
4. 'There is no right without duty.'—Explain.
'কর্তব্য বাদ দিয়া কোন অধিকার সম্ভব নহে।'—ব্যাখ্যা কর।

Objective type :

1. **Fill in the gaps :**

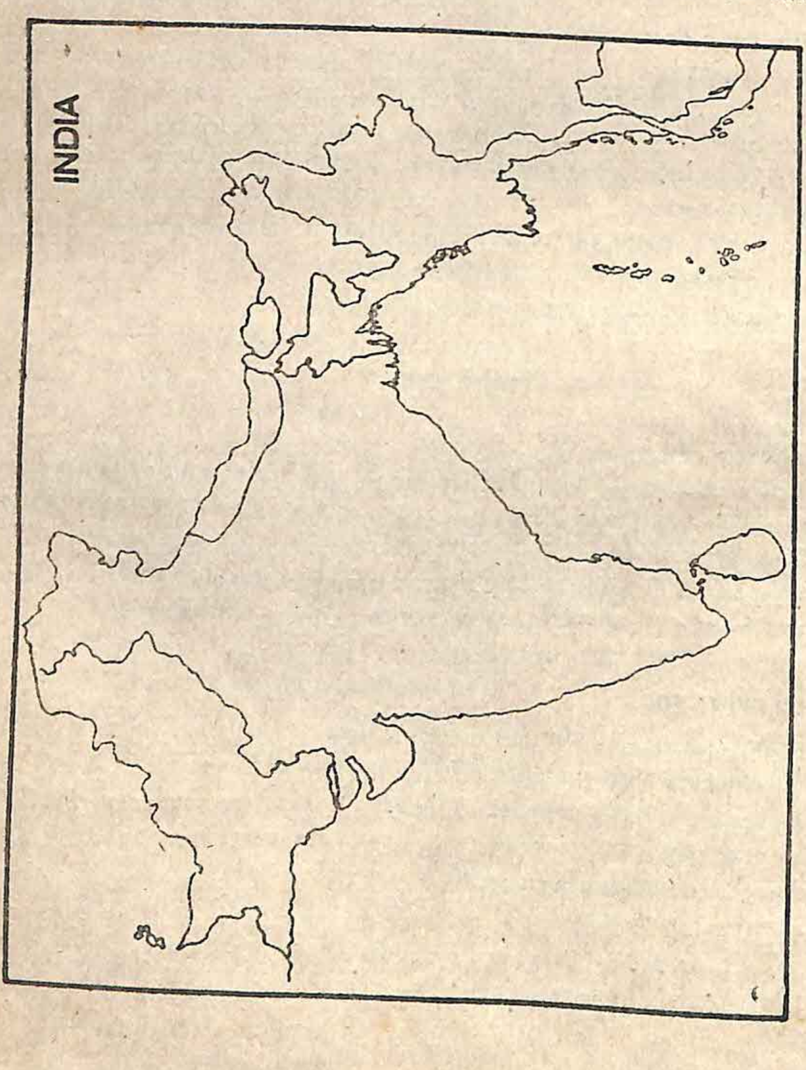
(i) Citizens are of two types — citizens and — citizens.
(ii) If the State imprisons any citizen without any cause he may apply for the writ of — .
(iii) — rights are not protected by the State.

শূন্য স্থান পূরণ কর :

(i) নাগরিকত্ব দুই প্রকারের — নাগরিক ও — নাগরিক।
(ii) রাষ্ট্র কোন কারণ না দর্শাইয়া কাহাকেও আটক করিলে আদালতে — পরোয়ানার জন্য আবেদন করা যাইতে পারে।
(iii) — অধিকার রাষ্ট্র কর্তৃক সংরক্ষিত নহে।

যে-সকল প্রশ্ন উপরে দেওয়া হইল, বলা বাহুল্য সেগুলি কেবল উদাহরণ হিসাবেই বিবেচ্য। শ্রদ্ধেয়/শ্রদ্ধেয়া শিক্ষক/শিক্ষিকা আরও সুন্দরভাবে এবং আরও বহুসংখ্যক প্রশ্ন প্রস্তুত করিয়া লইতে পারিবেন।

গ্রন্থকার



ভারতবর্ষের রেখা-মানচিত্র [অনুশীলনের জন্য]

মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

India and Her People (History)

1977

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও :—

ক-বিভাগ—যে কোন ৭টি

(ক) রাজতরঙ্গিণীর রচয়িতা কে ? (খ) হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কোন্ পরিব্রাজক এদেশে আসিয়াছিলেন ? (গ) কণিষ্কের প্রচলিত অব্দকে কেন শকাব্দ বলা হয় ? (ঘ) দিল্লী সুলতানি কখন শুরু হইয়াছিল ? (ঙ) খানুয়ার যুদ্ধে বাবরের শত্রুপক্ষ কে ছিল ? (চ) ব্রহ্মজিৎ গৌড় কে ছিলেন ? (ছ) ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কত খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করে ? (জ) কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ কোন্ গভর্ণর-জেনারেলের আমলে স্থাপিত হয় ? কাহাকে 'ভারতের প্রথম আধুনিক মানুষ' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে ?

খ-বিভাগ—যে কোন ১টি

(ক) 'আনন্দমঠ' কে রচনা করেন ? (খ) সীমান্ত গান্ধীর অনুচরদের কি বলা হইত ?

গ-বিভাগ—যে কোন ১টি

(ক) ভারতের জাতীয় সংগীত কাহার দ্বারা রচিত ? (খ) রাজ্যসভায় কে সভাপতিত্ব করেন ?

অথবা, প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা-মানচিত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলির যে কোন নয়টির অবস্থান নির্ণয় কর :—

(ক) মহেঞ্জোদড়ো ; (খ) গৌড় ; (গ) প্রয়াগ ; (ঘ) চিতোর ; (ঙ) কনৌজ ; (চ) পাণিপথ ; (ছ) পুনা ; (জ) সোমনাথ ; (ঝ) দেবগিরি ; (ঞ) কাঞ্চি ; (ট) শ্রীরঙ্গপত্তম্ ; (ঠ) ঝাঁসী।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(ক) (১) ভারতের বাহিরে কোন্ কোন্ দেশে অশোক দূত পাঠাইয়াছিলেন ?

(২) নানক কে ছিলেন ? তিনি কি প্রচার করেন ?

(খ) (১) খিলাফৎ আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল ?

(২) ২৬শে জানুয়ারির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

৩। ক-বিভাগ—যে কোন ৩টি

(ক) ইতিহাসের উপাদান কাহাকে বলে ? প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় যে কোন একটি উপাদান সম্বন্ধে আলোচনা কর।

(খ) অশোক কখন সিংহাসনে আরোহণ করেন ? তিনি কেন দিগ্বিজয়ের নীতি পরিহার করিয়াছিলেন ? তাঁহাকে 'মহামতি' বলা হয় কেন ?

(গ) শের শাহ্ ভূমি-রাজস্বের কিরূপ ব্যবস্থা করেন ? তাঁহার অন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার উল্লেখ কর।

(ঘ) মুঘল যুগে ভারতে আগত তিনজন ইওরোপীয় পর্যটকের নাম কর। এই পর্যটকদের বিবরণ হইতে সেই যুগের ভারতের অবস্থার কি পরিচয় পাওয়া যায় ?

(ঙ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের প্রথম সূত্রপাত কোথায় হইয়াছিল ? ঐ বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী দুইজন নেতার নাম কর। ইহার ব্যর্থতার কারণ নির্ণয় কর।

খ-বিভাগ—যে কোন ২টি

(চ) কোন্ ভাইসরয়ের আমলে ইলবার্ট বিল আন্দোলন হইয়াছিল ? এই আন্দোলনে ভারতের নেতা কে ছিলেন ? ভারতের জাতীয় আন্দোলনে ইহার গুরুত্ব নির্ণয় কর।

(ছ) জাতীয় কংগ্রেস কখন স্থাপিত হয় ? উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় কংগ্রেসের দুইজন নেতার নাম লিখ এবং তাঁহাদের মধ্যে যে কোন একজনের অবদান সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(জ) 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন কখন আরম্ভ হয় ? ইহার লক্ষ্য কি ছিল ? ইহার কি পরিণতি হয় ?

গ-বিভাগ—যে কোন ১টি

(ঝ) ভারতের নূতন সংবিধান কখন প্রবর্তিত হয় ? জাতীয় সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যগুলির উল্লেখ কর।

(ঞ) ভারতের নিয়মতান্ত্রিক প্রধান কে ? তাঁহার যে কোন পাঁচটি ক্ষমতার উল্লেখ কর। কোন্ কোন্ অবস্থায় তিনি তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন ?

৪। 'স্বদেশী' আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল ? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইহার প্রভাব আলোচনা কর।

অথবা, ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনে মহারাষ্ট্রের ভূমিকা আলোচনা কর। এই প্রসংগে দামোদর সাভারকরের অবদান বিবৃত কর।

1978

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও :—

ক-বিভাগ—যে কোন **সাতটি**

(ক) 'ইণ্ডিকা'র রচয়িতা কে ? (খ) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে কোন্ পরিব্রাজক এদেশে আসিয়াছিলেন ? (গ) 'মাৎস্য-ন্যায়' কাহাকে বলে ? (ঘ) প্রথম পাণিপথের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হইয়াছিল ? (ঙ) শিখগণের প্রথম গুরু কে ছিলেন ? (চ) কোন্ গভর্ণর-জেনারেলের সময় ভারতে 'সিপাহী বিদ্রোহ' হয় ? (ছ) আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? (জ) 'চরমপন্থী' দল কখন ও কোন্ অধিবেশনে কংগ্রেস ত্যাগ করেন ? (ঝ) 'ভারত ছাড়' আন্দোলন কে আরম্ভ করেন ?

খ-বিভাগ—যে কোন **একটি**

(ঞ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচিত যে কোন একটি পুস্তকের নাম কর। (ট) 'সীমান্ত গান্ধী' কাহাকে বলা হয় ?

গ-বিভাগ—যে কোন **একটি**

(ঠ) ভারতের নূতন সংবিধান কখন প্রবর্তিত হয় ? (ড) ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি কে ছিলেন ?

অথবা, প্রদত্ত ভারতবর্ষের মানচিত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলির যে কোন নয়টির অবস্থান নির্ণয় কর :—

(ক) তক্ষশিলা ; (খ) পাটলিপুত্র ; (গ) থানেশ্বর ; (ঘ) কাশী ; (ঙ) দেবগিরি ; (চ) কামরূপ; (ছ) আগ্রা ; (জ) পুনা (ঝ) কাঞ্চি ; (ঞ) কোঙ্কন ; (ট) সাতারা ; (ঠ) অমৃতসর।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(ক) (১) জৈনধর্মের একজন প্রধান প্রচারকের নাম কর। তিনি কি প্রচার করেন?

(২) মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'খামখেয়ালী সুলতান' বলিয়া কাহাকে অভিহিত করা হয়? তাঁহার কার্যাবলী সম্পর্কে তুমি কি ধারণা পোষণ কর?

(খ) (১) জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যা কখন এবং কাহার আদেশে অনুষ্ঠিত হয়? এই হত্যাকাণ্ডের ফল কি হয়?

(২) বাংলাদেশের সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে সূর্য সেন, অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষের নাম স্মরণীয় কেন?

(গ) ভারতীয় সংবিধানে কি কি মৌলিক অধিকারের কথা লিপিবদ্ধ আছে?

ক-বিভাগ

৩। যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও :—

(ক) আর্যগণ কোন্ সময় ভারতে আসে? বেদ ও উপনিষদ হইতে আমরা কি জানিতে পারি?

(খ) প্রাচীনকালে বহির্জগতের সহিত ভারতবর্ষের যোগাযোগ কিভাবে স্থাপিত হইয়াছিল? এই প্রসংগে মধ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির প্রসার সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

(গ) আকবরের রাজত্বকালে দুইজন ঐতিহাসিকের নাম কর। কি কি কারণে আকবর ইতিহাসে এত প্রসিদ্ধ সংক্ষেপে বল।

(ঘ) ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি সম্পর্কে যাহা জান লিখ। তুমি কি মনে কর যে ঔরঙ্গজেবের ধর্মনীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করিয়াছিল?

(ঙ) ইংরাজদের অর্থনৈতিক শোষণ সম্পর্কে কি জান? এই শোষণের ফলে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনে কিভাবে চরম বিপর্যয় ঘটিয়াছিল তাহা বিবৃত কর।

(চ) ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের নৌ-বিদ্রোহের কারণ কি? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল?

খ-বিভাগ—যে কোন **দুইটি**

(ছ) ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 'আবেদন ও দরখাস্ত' নীতির বিরুদ্ধে কিভাবে এবং কোন্ সময় হইতে অসন্তোষ ধূমায়িত হয়? ইহার ফলাফল কি হইয়াছিল?

(জ) 'ক্রীপ্‌স্ প্রস্তাব' সম্পর্কে কি জান? ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল কেন?

(ঝ) ১৯৪৭ সালে ইংরাজ সরকার কর্তৃক ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে কি জান? এই প্রসংগে 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

গ-বিভাগ (যে কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(ঞ) ভারতের সংবিধানে বর্ণিত নির্দেশাত্মক নীতিগুলি কি? এই নীতিগুলির তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

(ট) ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন? কি পরিস্থিতিতে তিনি তাঁহার জরুরী বিষয়ক ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারেন?

৪। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কি পরিস্থিতিতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উৎপত্তি হয়? এই আন্দোলনের ফল কি হইয়াছিল?

অথবা, ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব সংগঠনে পাঞ্জাবের ভূমিকা এবং এই প্রসংগে লালা হরদয়ালের অবদান আলোচনা কর।

1979

১। দুই এক কথায় উত্তর দাও :—

'ক' বিভাগ (যে কোন **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(ক) বিম্বিসার কে ছিলেন? (খ) মৌর্যবংশের প্রথম নৃপতি কে ছিলেন? (গ) এলাহাবাদ-প্রশস্তি কে রচনা করেন? (ঘ) মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে কোন্ পরিব্রাজক ভারতে আসিয়াছিলেন? (ঙ) ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যে পর্তুগীজ নাবিক কালিকটে পৌছিয়াছিলেন তাঁহার নাম কি? (চ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে সংঘটিত হইয়াছিল? (ছ) পুরন্দরের সন্ধি কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল? (জ) কত খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়? (ঝ) চিলিয়ানওয়ালার যুদ্ধে ডালহৌসীর শত্রুপক্ষ কে ছিল?

'খ' বিভাগ (যে কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(ঞ) ভারতবর্ষের রাজনীতিতে সর্বপ্রথম কে দ্বিজাতি তত্ত্বের অবতারণা করেন? (ট) 'ফরোয়ার্ড ব্লক' কে গঠন করেন?

'গ' বিভাগ (যে কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(ঠ) ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষের সভায় কে সভাপতিত্ব করেন? (ড) ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের শাসন বিভাগের প্রধান কে?

অথবা, প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত যে কোন **নয়টির** অবস্থান নির্দেশ কর :—

তক্ষশিলা, পাটলিপুত্র, মথুরা, থানেশ্বর, দেবগিরি, কামরূপ, আজমীঢ়, কোঙ্কন, সোমনাথ, সাঁচী, গোয়া, মাদ্রাজ।

নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

'ক' বিভাগ (যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

২। (ক) হূণ কাহারা?

(খ) শিখগণ কিরূপে সামরিক সম্প্রদায়ে পরিণত হয় লিখ। (গ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কি?

'খ' বিভাগ (যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(ঘ) 'অস্ত্র আইন' (১৮৭৮) কে প্রবর্তন করেন? এই আইনের উদ্দেশ্য কি ছিল?

(ঙ) নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়) কে ছিলেন? বাংলাদেশের বিপ্লবী সংগ্রামে তাঁহার ভূমিকা কি ছিল?

(চ) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কোন্ তিন তরুণ বিপ্লবী কলিকাতা রাইটার্স-বিল্ডিং অভিযান করিয়াছিলেন?

(ছ) মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাব (১৯৪৭) কি ছিল?

'গ' বিভাগ (যে কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(জ) কিভাবে নাগরিকতা বিলুপ্ত হয় লিখ।

(ঝ) মহাধর্মাধিকরণের গঠন বর্ণনা কর।

৩। 'ক' বিভাগ (যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(ক) সিন্ধু-সভ্যতার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

(খ) পুষ্যভূতি বংশীয় হর্ষবর্ধনের সময় কনৌজের উত্থান বর্ণনা কর।

(গ) মধ্য ও আধুনিক যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রধান উপাদানগুলির বিবরণ দাও।

(ঘ) ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? তাঁহার কৃতিত্ব বর্ণনা কর।

(ঙ) 'ভক্তিবাদ' কি বুঝাইয়া বল। রামানন্দ ও চৈতন্যদেব সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

(চ) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণগুলি আলোচনা কর। এই বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলি উল্লেখ কর।

'খ' বিভাগ (যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(ছ) ভারতে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রসারের কারণগুলি নির্দেশ কর।

(জ) 'অসহযোগ আন্দোলন' ও 'খিলাফৎ আন্দোলন' কেন যৌথভাবে পরিচালিত হইয়াছিল ? খিলাফৎ আন্দোলনের পরিণতি কি হয় ?

(ঝ) 'হোমরুল' আন্দোলন সম্পর্কে কি জান ? এই আন্দোলনের ফলাফল সংক্ষেপে আলোচনা কর।

'গ' বিভাগ (যে কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(ঞ) ভারতীয় শাসনতন্ত্রে প্রস্তাবনার সারাংশ ও ব্যাখ্যা লিখ।

(ট) ভারতে রাজ্য আইনসভার গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর।

৪। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

অথবা, আজাদ হিন্দ ফৌজের কার্যকলাপ বিবৃত কর।

1980

১। দুই-এক কথায় উত্তর দাও :

'ক' বিভাগ (যে কোন **সাতটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(ক) মিনান্দার কে ছিলেন ? (খ) কণিষ্কের রাজধানী কোথায় ছিল ? (গ) 'শিলাদিত্য' উপাধি কে গ্রহণ করিয়াছিলেন ? (ঘ) কোন্ সুলতানের সময়ে তৈমুরলঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন ? (ঙ) সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন ? (চ) হলদিঘাটের যুদ্ধ কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (ছ) সগৌলির সন্ধি (১৮১৬) কাহাদের মধ্যে হইয়াছিল ? (জ) কোন্ গভর্ণর-জেনারেলের সময়ে সিন্ধুপ্রদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয় ? (ঝ) ভারতের কোন্ গভর্ণর-জেনারেল স্বত্ববিলোপ নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন ?

'খ' বিভাগ (যে কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(ঞ) নীল বিদ্রোহের যে কোন একজন নেতার নাম কর।

(ট) বাঙলার বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত সমিতির নাম বল।

'গ' বিভাগ (যে কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও)

(ঠ) ভারতীয় পার্লামেন্টের উচ্চ কক্ষকে কি বলা হয় ?

(ড) ভারতের সর্বোচ্চ বিচারালয় কোন্‌টি ?

অথবা, প্রদত্ত ভারতবর্ষের রেখা-মানচিত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত যে কোন নয়টির অবস্থান নির্দেশ কর :

মথুরা, শ্রাবস্তী, পৈঠান, গৌড়, মুলতান, সিন্ধুদেশ, কালিকট, বিজাপুর, নাগপুর, সাতারা, অমৃতসর, কানপুর।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

'ক' বিভাগ (যে কোন **দুইটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(ক) টীকা লিখ : গান্ধার শিল্প।

(খ) শিবাজীর চরিত্র বর্ণনা কর।

(গ) রামকৃষ্ণ পরমহ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

'খ' বিভাগ (যে কোন **দুইটি** প্র. র উত্তর দাও।)

(ঘ) ইংরেজদের অর্থনৈতিক শোষণ এবং শিক্ষিত ভারতীয়দের বেকারত্ব কিভাবে ভারতবাসীর ঐক্য ও জাতীয়তাবোধ বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে লিখ।

(ঙ) বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) দ্বারা যে নূতন প্রদেশ গঠিত হইয়াছিল তাহার নাম কি ছিল? 'রাখীবন্ধন' উৎসব কি ছিল?

(চ) খিলাফৎ আন্দোলনের কারণ কি?

(ছ) 'ওয়াভেল পরিকল্পনা' (১৯৪৬) কি ছিল?

'গ' বিভাগ (যে কোন **একটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

(জ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ।

(ঝ) নির্বাচকমণ্ডলী ও নির্বাচনী এলাকা কি?

'ক' বিভাগ (যে কোন **তিনটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।)

৩। (ক) ভারতবর্ষের ইতিহাসের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব নিরূপণ কর।

(খ) প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় হইতে স্কন্দগুপ্তের সময় পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ সাম্রাজ্য গঠনের প্রচেষ্টা সংক্ষেপে বিবৃত কর।

(গ) ইলতুৎমিস ও রাজিয়ার কৃতিত্ব আলোচনা কর।

(ঘ) শাহ্জাহানের রাজত্বকালকে মুঘল শাসনের স্বর্ণযুগ ৲ ায়া অভিহিত করা কতদূর সঙ্গত?

(ঙ) গুরু অঙ্গদ হইতে গুরুগোবিন্দ সিংহ পর্যন্ত শিখ গুরুগণের কার্যকলাপ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

(চ) ভারতবর্ষের ইতিহাসে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকাল এত স্মরণীয় কেন?

'খ' বিভাগ (যে কো ‵টি প্রশ্নের উত্তর দাও।)

'বঙে ... মাড ... প্রস্তাব ... কি ছি ... এবং নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই ... লি আলোচনা কর।

(জ) ...স নেতাগণের বিভক্ত হইয়া প ... শ্নের ... অরবিন্দ ঘোষের অবদান নির্ণয় কর।

(... ভারতে সংগ্রামশীল জাতীয়তা ...

১। দুই এক কথায় উত্তর দাও :

'ক' বিভাগ (যে কোন

(ক) উপনিষদ কি ?

(খ) যে সাতবাহন রাজা শ... দিগকে ... তাঁহার নাম কি ?

(গ) কোন্ গুপ্ত সম্রাট্ 'পরাক্রমাঙ্ক' উপ...

(ঘ) আরবরা কত খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু জয় ক...

(ঙ) তুর্করা যখন বঙ্গদেশ ... করে ...

(চ) 'আকবরনামা' গ্রন্থের প্রণেতা কে...

(ছ) কত খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীবের মৃত্যু হয়...

(জ) কোন্ যুদ্ধের ফলে ভা... ইঙ্গ-ফ...

(ঝ) বেসিনের সন্ধি (১৮০... কাহাদে...

'খ' বিভাগ (যে কোন এ...

(ঞ) 'অনুশী...

(ট) '...

(ঠ)

(ড)

অ...

অবস্থ...

BO ... ISTORY approved by the West Bengal Board of Secondary Education

...ক্টর কিরণচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত

For CLASS X

স্বদেশকথা ● জাতীয় আন্দোলন : সংবিধান ও নাগরিকতা

For CLASSES IX—X

স্বদেশকথা ● জাতীয় আন্দোলন : সংবিধান ও নাগরিকতা

For CLASS VIII

1. আধুনিক সভ্যতার ইতিহাসকথা
2. **History of Modern Civilizations**

For CLASS VII

1. মধ্যযুগের ইতিহাসকথা
   (Notification No. TB/VII/H/81/77, dated 8-1-81)
2. **Medieval Civilizations**
   (Notification No. TB/VII/H/81/120, dated 3-2-1981)

For CLASS VI

1. প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসকথা
   (Notification No. TB/VI/H/79/33, dated 5-12-79)
2. **History of Ancient Civilizations**
   (Notification No. TB/VI/H/79/45, dated 5-12-79)